সাহিত্য-সভা-গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ২য়।

বঙ্গের কবিতা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত।

সাহিত্য-সভা হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—o—

কলিকাতা ;
১২ নং রামচন্দ্র মৈত্রীর লেন, "জুনো প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" যন্ত্রে
শ্রীহরিপদ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৭ সাল।

বঙ্গভাষানুরাগী—কাব্যামোদী

মাম্যবর

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ স্তার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে, সি, আই, ই।

বর্দ্ধমানাধিপতির

প্রতি

সম্মানের

নিদর্শন স্বরূপ

এই

গ্রন্থখানি

তদীয় নামে

সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত

হইল।

পূর্ব্বমুখ।

সাহিত্য-সভার মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্যে সাহিত্য-সভার গ্রন্থ-প্রচার বিভাগ হইতে প্রথিতনামা পণ্ডিত এবং লেখকবর্গের লিখিত বিংশতি খানি গ্রন্থ প্রচারের প্রস্তাব হইয়াছে। কলিকাতা, সভাবাজার-রাজবংশের অন্যতম সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রণীত এই "বঙ্গের কবিতা" গ্রন্থখানি, সেই বিংশতিখানি গ্রন্থের অন্যতম।

গত ১৩১৬ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, সাহিত্য-সভার ১০ম বার্ষিক ৭ম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, "বঙ্গের কবিতা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ এই গ্রন্থাকারে ১ম ভাগরূপে প্রকাশিত হইল।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর, এই ভাগে বঙ্গভাষার উৎপত্তি এবং ইতিহাস সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা করিয়া, বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদিগের কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ আরও দুই এক খানি থাকিলেও এখানি যে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন—কাব্যামোদীদিগের চিত্তরঞ্জন এবং বঙ্গীয় কবিতার প্রতি শিক্ষিত সমাজের অনুরাগ আকর্ষণ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

"বঙ্গের কবিতা"র বর্ত্তমান অবস্থা এবং প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণের কাব্যের সবিস্তর আলোচনা গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইবে।

সাহিত্য-সভার যে অধিবেশনে "বঙ্গের কবিতা" পঠিত হইয়াছিল, সাহিত্য-সভার অন্যতর সহ-অনুগ্রাহক (Vice-Patron) মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর কে, সি, আই, ই,

বৰ্দ্ধমানাধিপতি, সেই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই আনন্দের সহিত এই "বঙ্গের কবিতা" গ্রন্থ প্রচারের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য মাননীয় শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যে সাহিত্য-সভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

সাহিত্য-সভা কার্য্যালয়।
কলিকাতা,
১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট।
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
অবৈতনিক সম্পাদক।

বঙ্গের কবিতা।

বঙ্গের কবিতা সুন্দরীর জন্ম

"ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে,

মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটিরে"

সেই কুঞ্জ কুটির ধন্য হউক।

বঙ্গের আদি কবির হৃদয় নিঃসৃত "মধুর কোমল কান্ত পদাবলী"র ললিত ঝঙ্কার, বঙ্গের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবির বীণায় আজিও ঝঙ্কৃত।

"সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার!

তুমি অনন্ত নব-বসন্ত অন্তরে আমার!

অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার!

লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার!"

আমাদের কর্ণকুহরে সেই চির-পরিচিত সুধাধারাই বর্ষণ করে।

বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য কুঞ্জ-ভবনের যে গুঞ্জন সর্ব্ব প্রথম আমাদের

"কানের ভিতর দিয়া   মরমে পশিল গো

আকুল করিল সই প্রাণ,"

সেই ধ্বনির মূল মূর্চ্ছনা—

"নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং"

তখন বেণু,

বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের অন্তিম সময়ে প্রমোদ উদ্যানের বিলাস-মন্দিরে সেই বেণুই বাজিতেছিল—

"ওহে বিনোদরায় ধীরি যাও হে,

অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে।"

তখন বাঁশী;

বঙ্গের আধুনিক সাহিত্যের প্রথম উন্মেষে সুরম্য মর্ম্মর হর্ম্ম্য তলে, সেই বাঁশীই ত আমরা শুনিয়াছি—

"নাচিছে কদম্ব মূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকা রমণ!
চল সখি ত্বরা করি দেখি গে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন!"

তখন মুরলী;

বঙ্গের আধুনিক "কঙ্কনি কবির কমনীয় অসি[illegible]" সেই মুরলীই এখনও বাজিতেছে—

"আমার বাঁশীতে ডেকেছে কে!
তারে বলে আমি তোমার বাঁশী আমার প্রাণে বেজেছে!"

কিন্তু বাঁশী এখন বুঝি "ক্লারিওনেট!"

এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমিকে "বন্দে মাতরম্" বলিয়াই গৌরব করি, কিম্বা—

"কেন গো মা তোর শুষ্ক আনন
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ;
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন
কেন গো মা তোর মলিন বেশ?"

বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলি, সুখে দুঃখে, ভিন্ন ভিন্ন সুরে, আজ প্রায় শত বৎসর, সেই বাঁশীর কল কাকলী বঙ্গবাসীর হৃদয় তন্ত্রী কম্পিত করতঃ ধ্বনিত হইতেছে!

কিন্তু তবু যেন

"সোহি মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল!"

এখনও প্রাণ ভরে নাই, আশ মিটে নাই; এখনও আমাদের অতৃপ্তি রহিয়াছে, আমরা আরো চাই আরো চাই।

অদূরে মঞ্জীররব আমাদের কর্ণে পশিয়াছে, সেতার-এস্রাজের মৃদুল

নিক্কণও আসিয়াছে ; বীণরবাব-মুরজস্বরমণ্ডলও আমরা শুনিয়াছি ; মেঘ-গম্ভীর মৃদঙ্গনাদ, প্রাণ-উন্মাদক শৃঙ্গারব, চিত্তপাবন শঙ্খধ্বনি সকলই শুনা গিয়াছে ; কিন্তু আমাদের মন বাঁশীতেই মজগুল্। —"বাঁশী নিশাস-গরলে তনু ভোর" ; কিন্তু এ গরল অভিমানের—"কাঁদন মিশায়ে হাসির গারি।"—

প্রথম বাঙ্গালী কবি জয়দেব গোস্বামী।—যে বীজ জয়দেব বঙ্গবাসীর হৃদয়োদ্যানে রোপন করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুর বিদ্যাপতির স্নেহ-করে, চণ্ডীদাসের নয়ন-জলে সিঞ্চিত হইয়া রক্ষিত বর্দ্ধিত হয় ; শ্রীচৈতন্য-প্রেমে তাহা মহামহীরুহ রূপে পরিণত ! এখন শাখা-কিশলয়ে ফুলে-ফলে সেই বিরাট-তরু অপূর্ব্ব-মাধুর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছে !

মুকুন্দরাম সেই তরুমূলে গঙ্গামৃত্তিকার বেদী বানাইয়া দিয়াছেন, ভারত-চন্দ্র সেই বেদীর উপর চারু আলিপনা কাটিয়াছেন ; সেই পাদপ আজ বঙ্গের কলকণ্ঠ কত বিহঙ্গের আশ্রয়স্থল ! শ্রান্ত ক্লান্ত কত পান্থের বিশ্রামভূমি !

বঙ্গসাহিত্যের প্রথম প্রভাতে বিলুপ্ত-কীর্ত্তি কত কথক-কবি যে প্রতিমার কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস যাহার একমেটে করিয়া গঠন দিয়াছিলেন, কাশীদাস যাহায় দোমেটে করিয়া সৌষ্ঠব দিয়াছিলেন, অপ্রথিত নাম কত কবি যাহাকে রঙে রঞ্জিয়া সৌন্দর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন, সেই মহামহিমোজ্জ্বলা প্রতিমা আনিয়া সেই মহাপাদপমূলে, সেই পূত-বেদীপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে !

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দেশী বিদেশী বিবিধ পরিচ্ছদে, নানা মণি-রত্ন-অলঙ্কারে প্রাণ ভরিয়া সাজাইয়া জ্যোতির্ম্ময় ছটায় সুশো-ভিত করতঃ সেই মূর্ত্তিকে বিচিত্র শোভা-সম্পদে নয়নাভিরাম করিয়া তুলিয়াছেন !

ইতিপূর্ব্বেই রামপ্রসাদ পাদদেশ সাজ্জত কারবার জন্য "মুঠো মুঠো জবাফুল" রাখিয়া গিয়াছেন ; ঈশ্বরচন্দ্র হাসির মত এক রাশি বকফুল রাখিয়াছেন। পূজার জন্য কত ভক্তের হৃদয়-মালঞ্চ হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ কত কুসুম আসিয়া পড়িয়াছে ; বঙ্গের কুলললনাগণও বেলা যুথী মল্লিকায় সাজি সাজাইয়া পাঠাইতেছেন !

অই যেন কোন সাধক সচন্দন-তুলসীদল-হস্তে বোধন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন—

"তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দন-গন্ধ-নন্দিত ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু সাজে যেন সদা সাজে গো!"

জানি না কোন্ ভাগ্যবান মহাপুরুষ পুরোহিত-পদে বরিত হইয়া ভূত-শুদ্ধি করতঃ পূজায় বসিবেন! অকৃতী অভাজন আমরা দেবীর পবিত্র চরণ-রেণু মাথায় লইয়া, সেই চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিতে অগ্রসর রহিয়াছি!

বঙ্গ-ভারতীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই। বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, অনেক অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন। বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্য রাশি ভারে কিছু পীড়িত।" ইহা যে সময়ের লেখা, তখন সকল তত্ত্ব লোক-সমাজে প্রকাশিত হয় নাই।

সুবিখ্যাত Calcutta Review পত্রে ইংরাজী ১৮৪৯ সালে ভাষা তত্ত্ববিদ কোন সুবিজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন—"It may therefore be asserted with correctness that if the Bengalee language be several hundred years old, its scanty literature is not of older date than a century; and within the space of one hundred years what Eastern nation can be fairly expected to create for itself a permanent literature?"

সমালোচক মহাশয় পরে, হিতোপদেশ, তোতা ইতিহাস, পুরুষ-পরীক্ষা, বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিয়াছেন:—

"The other current Bengalee works may be summarily dismissed.........With the exception of a few other works and of sundry ephemeral publications, the above are really the only books, which can be said to make up the Bengalee literature."

সাহেব যদি শুধু গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্যটা জারী করিতেন, তাহা হইলে হয়ত চেয়া সহি দেওয়া চলিত ; কিন্তু তিনি যখন বাঙ্গালার পদ্য-সাহিত্যকেও এক তুড়ীতে উড়াইয়া দিয়া fiat পাশ করিলেন, তখন আমাদিগকে একটু থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। মতটা আর একটু শুনাই—"We feel that some explanation is required of our reasons for drawing attention to a language which does not possess one single prose author of stirling value, which has none of the early national poetry that sometimes compensates for the absence of a more varied literature."

বেশী দিন নয়, ইহা ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা। আর এখন? আজ পণ্ডিতবর জীবিত থাকিলে, বোধ হয় তাঁহার বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। তাঁহার অবজ্ঞার কথা তিনি প্রত্যাহার করিতেন।

এই কথা যে সময়ের লেখা, সে সময়ে বোধ হয় কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর অধিকাংশেরই এইরূপ ধারণা ছিল। গদ্য সম্বন্ধে ত বটেই, পদ্য সম্বন্ধেও বোধ হয় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী মনে করিতেন,—বঙ্গ-সাহিত্যে আছে কি? কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীদাসের মহাভারত,—সে ত মুদী-বকালির পাঠ্য, আর আছে ভারতচন্দ্র,—সে ত ঘোর অশ্লীল ; আর কতকগুলা বিকট গান আছে—'কবি'র দলের কথা-কাটাকাটি,—সমস্তই কুরুচিপূর্ণ, সমস্তই ভদ্র-সমাজের অপাঠ্য ; গুপ্ত-কবি কবিই নয়—ভাঁড়।

ইঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা মাতৃভাষায় কিছু অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন,—ভারতচন্দ্র অশ্লীল বটে, কিন্তু তিনি বড় দরের কবি ; তাঁহার ভাষা বেশ চাঁচাছোলা, পড়িতে আমোদ আছে ; কিন্তু ভারতচন্দ্রে মৌলিকতা নাই ; মুকুন্দরাম নামে একজন সাবেক কবি ছিলেন, ভারতচন্দ্রের সব সেই

মুকুন্দরাম হইতে চুরী। আর, পুরাতন বঙ্গ-সাহিত্যে কৃত্তিবাস ও কাশীদাস ছাড়া আরও দু চার জন লেখক আছেন, যাঁহারা পয়ার ও ত্রিপদী লিখিতে পারিতেন; তাঁহারা রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ে কিম্বা গৌরাঙ্গ-জীবন লইয়া কি কতকগুলা লিখিয়া গিয়াছেন। পুরাতনের ভিতর রামপ্রসাদের গান বড় সুন্দর; ইদানীর ভিতর ঈশ্বরগুপ্ত মন্দ নয়, বেশ কথার মিল জুটাইতে পারিতেন; কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্য ছাই।

এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী নিমচাঁদের মুখ দিয়া বড়াই করিতেন- "I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English!"

কিছুদিন পূর্ব্বেকার উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর ভাব দেখিয়া সূক্ষ্মদর্শী একজন বাঙ্গালীই বলিয়াছিলেন—"তাঁহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল; তাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন; দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাকুক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না।"

কিন্তু আজ বাঙ্গালী, দেশের একটা বুড়া কবির বচন আওড়াইতে শিখিয়াছে—

> "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
> বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?"

কিছু পূর্ব্বে যে বিদেশী সমালোচকের কথা শুনাইয়াছি, বলিতেই হয়, সাহেব যথোচিত অনুসন্ধান না করিয়া মন্তব্য জাহির করিয়াছিলেন। তবে, ইহাও স্বীকার্য্য—তাঁহার সময়ে, সে আজ ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা, সবিশেষ তত্ত্ব সংগ্রহের বড় সুবিধা ছিল না; মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল সামান্য। বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের বয়স শতেক বর্ষ মাত্র।

কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী তত্ত্ব-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন। ১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শনে দেখা যায়—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার

সমুদ্র বিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি জয়দেব গীতিকাব্যের প্রণেতা; পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ। কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ কবি। তৎপরে কতকগুলি কবি-ওয়ালার প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমন সুন্দর আছে যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালা-দিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য।”

ইহা গীতি কাব্যের পরিচয়, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। আর আজ? আজ বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের উদ্ধার দেখিয়া বোধ হয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আর এক সুরে গাহিতেন—

“বন্দে মাতরম্।”

১৩০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—“দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গ-ভাষার জন্মদাতা। যাঁহারা একটু বেশী জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন—জন্মদাতা ঠিক বিদ্যাসাগর মহাশয় নহেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। যাঁহারা আরও অধিক জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন, ইঁহারা উভয়েই গদ্যের জন্মদাতা—পদ্যের নহেন। তখন কে জানিত যে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ বাঙ্গালা সাধু ভাষায় লিখিত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়-দিগের বাড়ীতে বিরাজ করিত? তখন কে জানিত যে বৈষ্ণবদিগের উপা-সনা-পদ্ধতি বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত হইয়া সাড়ে তিন শত বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত ছিল? এ ত গেল গদ্যের কথা। পয়ারে লিখিত কয়েক খানা গ্রন্থ যে চলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার জো ছিল না। ভারতচন্দ্রের পরিমার্জ্জিত রচনা-প্রণালী, ইতর-ভদ্র সকলেরই প্রিয় ছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী অনেকেই

পড়িতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের এ সকল গ্রন্থের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ-দৃষ্টি ছিল ; তাঁহারা বলিতেন—

"কাশীদেসে-কৃত্তিবেসে আর বামুন ঘেসে—এই তিন সর্ব্বনেশে।"

দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে, বৈষ্ণব কবিরাই বাঙ্গালা পদ্যের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি দামুন্যার ব্রাহ্মণ কবি-কঙ্কণ ও ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ কৃত্তিবাস আকবরের সময়ে চণ্ডী ও রামায়ণ লেখেন ; আর সিঙ্গির গুরুমহাশয় কায়স্থ কাশীরাম, আওরঙ্গজেবের সময় মহাভারত লেখেন। তখন কে জানিত যে কৃত্তিবাস ফুলের মুখুটিদিগের একজন আদিপুরুষ এবং চৈতন্যের অনেক পূর্ব্বকালবর্ত্তী ? তখন কে জানিত যে চৈতন্যের প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বে বঙ্গের মুসলমান রাজগণ বঙ্গীয় কবিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া মহাভারত প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থ বাঙ্গালায় লিখাইয়া লন ? তখন কে জানিত যে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ মঙ্গল-চণ্ডী ও বিষহরির প্রতিমা স্থাপন করতঃ চণ্ডীর গান ও বিষহরির গান রচনা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা পদ্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন ? তখন কে জানিত যে ইহার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ডোম বাইতি প্রভৃতি ইতর জাতীয় পণ্ডিতগণ, ধর্ম্মঠাকুরের গান রচনা করিয়া বিলুপ্ত-প্রায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের কতকটা রক্ষা করিয়াছিল ? তখন কে জানিত যে অতি নীচ হাড়ী-জাতীয় সিদ্ধপুরুষগণ বঙ্গের অনেক হিন্দুরাজাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করতঃ আপন আপন কীর্ত্তি-কাহিনী বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিয়া গিয়াছিল ?"

বাস্তবিক, চব্বিশ পঁচিশ বৎসর আগে এ সকল তত্ত্ব কেহই জানিত না। যখন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, ভারতী, বান্ধব,—উদ্দীপনায়, গবেষণায়, বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত করিতেছিল ; কবিতায়, ধর্ম্মকথায়, শিল্পচর্চ্চায়, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে, সমাজ-সমালোচনে, জীবন-চরিতে, দেশ-বিদেশের সমাচারে, বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিতেছিল, যখন সেই—

"নিমেষে নিমেষে আলোক-রশ্মী অধিক জাগিয়া উঠে,
বঙ্গ-হৃদয় উন্মীলি যেন রক্ত-কমল ফুটে !"—

তখন পর্য্যন্তও কেহ জানিত না যে বাঙ্গালা-সাহিত্য কাব্য-সামগ্রীর এমন একটা প্রকাণ্ড কারখানা !

"ইংরাজী ১৮৯১ সাল হইতে বাঙ্গালা প্রাচীন পুস্তকের অনুসন্ধান, প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে এসিয়াটিক সোসাইটী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ কার্য্য আরম্ভ করেন। সোসাইটীর পণ্ডিতগণ, নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, যেমন সংস্কৃত গ্রন্থ ও সংস্কৃত গ্রন্থের বিবরণ সংগ্রহ করিতেন, তেমনি বাঙ্গালা গ্রন্থ ও তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা মফঃস্বলে যাইয়া দেখিতে পান যে, আরও দু একজন শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান, আপন আপন কার্য্যক্ষেত্রে, পুস্তক সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, জলাঞ্জলি-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরচন্দ্র সেন, এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড-মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন প্রধান। ক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদও পুস্তক এবং বিবরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালায় যে একটা প্রাচীন সাহিত্য ছিল, এ কথা চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়ায়, শিক্ষিত সমাজে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর হয়।" ইহাও শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা।

বঙ্গীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায়! এখন কি আর বলা চলে—"বাঙ্গালা সাহিত্য আবার কি? প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ক খানা গ্রন্থই বা আছে?" দেখিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তর গ্রন্থ প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বসু বাবুর পুস্তকাগারেই, সহস্রাধিক-প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত আছে, পরিষৎও বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছেন। গত শতাব্দীতে খৃষ্টান মিশনারীদিগের যত্নে, এবং কলিকাতা বটতলার কতিপয় পুস্তক-বিক্রেতার চেষ্টায়, যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, অপ্রকাশিত গ্রন্থ-রাশির তুলনায়, তাহার সংখ্যা অতি সামান্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আজ কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া, অমুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থরাশির যে সকল বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বাঙ্গালায় যে একটা রীতিমত প্রাচীন সাহিত্য ছিল, (ছিল বলি কেন? আছে) এ কথা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১২৭৯ সালে বঙ্গদর্শনে, সুপণ্ডিত Beams সাহেব বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা-কল্পে, এক অনুষ্ঠান-পত্র প্রকাশিত করেন; তাহার প্রথমেই এই কথা,—"ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা, বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতাবর্দ্ধনে,

বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয়-সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে।"

এ আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বঙ্গ-সাহিত্যের—বঙ্গীয় কাব্যের বর্ত্তমান সমুন্নত অবস্থা দেখিলে এবং প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অস্তিত্ব সংবাদ পাইলে, সহৃদয় সাহেব কত আনন্দিত হইতেন!

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, সম্প্রতি-আবিষ্কৃত এই সকল প্রাচীন পুঁথি প্রায় সমস্তই পদ্য গ্রন্থ—কাব্য বলিতে চান, আরও ভাল। আমার অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয়—বাঙ্গালার কাব্য। দেখিতেছেন, আপনাদের প্রাচীন সাহিত্য আগাগোড়া কাব্য; গদ্য যে সামান্য পাওয়া যায়, ছাড়িয়া দেওয়া চলে। পুরাতনের কথা ধরিলে, বঙ্গের কাব্য-সমালোচনা অর্থ, বঙ্গ-সাহিত্য-সমালোচনা।

এই প্রাচীন-সাহিত্য-উদ্ধারে, সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী, বোধ করি, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, এবং (অবশ্যম্ভাবী কোন "মহা" উপাধিধারী), প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের Encyclopedia শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যাহাতে প্রাচীন কালে, দু একজন পল্লী-কবির আবির্ভাব হয় নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্য অতি বিরাট—সূতাতন্তুজড়িত জীর্ণ-গলিতপত্র শত শত বৈষ্ণবগ্রন্থ, এখনও অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া আছে। আর কয়েক বৎসর প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান-চেষ্টা অব্যাহত থাকিলে, প্রাচীন সাহিত্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিবার উপকরণ হস্তগত হইতে পারে।"......"বঙ্গদেশের প্রত্যেক স্থলেই ভাষা-কাব্য রচিত হইয়াছিল; কোন প্রদেশই একেবারে প্রতিভা-শূন্য মরু ছিল না; আরণ্য-কুসুম ও গ্রাম্য-কবিতা সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

এই প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য কোথা হইতে উদ্ধার হইতেছে, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের অস্তিত্ব, বঙ্গীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের অজ্ঞাত; অনেক অমূল্যরত্ন, বিদ্যাভিমানী বঙ্গবাসীর

যত্নাভাবে লুপ্তপ্রায় ; কিন্তু তাহার কতক কতক, পল্লীগ্রামে ধোপা-নাপিত-কামারের ঘরে, মূল্যবান পৈত্রিক-সম্পত্তি-রূপে উত্তরাধিকার-সূত্রে বিরাজমান্! পাণ্ডিত্যসম্পর্কশূন্য নিম্ন-জাতীয় বাঙ্গালী, আগ্রহের সহিত, পুরুষানুক্রমে সেই রত্নরাজী আঁকড়াইয়া ধরিয়া, সাহিত্যের প্রতি,—"মাতৃসম মাতৃভাষা"র উপর, অন্ধভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে! অনেকস্থলে এই সকল প্রাচীন পুঁথি লেখাও, সমাজের অধস্তন স্তরের লোক দ্বারা! আমরা দেখিতে পাই, "প্রাচীনকালে গ্রাম্য-কবিগণ, বংশদণ্ডাগ্রে ব্লটিং কাগজের অভাবে চূণ দ্বারা শোষিত তুলোট কাগজের উপর অনেক মুক্তারাশি ছড়াইয়া গিয়াছেন।" দীনেশ বাবুর সন্ধান হইতে জানা যায়, ভদ্রলোকের গৃহে পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথি বড় একটা পাওয়া যায় না, কিন্তু নিম্ন-শ্রেণী বাঙ্গালীর কুটিরে অনেক দুর্লভ সামগ্রী মিলে।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—"ধোপানাপিতের ঘর হইতে সংগ্রহ হইতেছে এমন যে সব পুরাতন পুঁথি, সে সকল কি? সে সমস্ত সাহিত্য নামের—কাব্য নামের উপযুক্ত কি না? সে সকল ক্ষৌরকর্ম্মপদ্ধতি না বস্ত্র-প্রক্ষালন-প্রণালী? বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া সে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার যোগ্য কি না?" এ সকল প্রশ্নের উত্তরে এখন বলিতে পারা যায় যে, এই সমস্ত প্রাচীন পুঁথি উদ্ধারে জানা গিয়াছে,—আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আদ্যন্ত কাব্য-গ্রন্থ বটে; ইহার ভিতর দর্শন-বিজ্ঞান তেমন নাই, প্রত্নতত্ত্ব-শিল্পবিদ্যা তেমন নাই, দেশভ্রমণে বহুদর্শীতার নিদর্শন তেমন নাই, কিন্তু নিরুদ্যম বাঙ্গালী জাতির যাহা প্রাণ—ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, কবিত্ব, প্রচুর পরিমাণে আছে। ইতিহাসও আছে; History of the people যাহাকে বলে, বাঙ্গালীর কাব্যগ্রন্থ হইতে তাহার পরিচয় যথেষ্ট মিলে। সংস্কৃত সাহিত্যেও যেমন কি ধর্ম্মকথা, কি দর্শন-বিজ্ঞান-তত্ত্ব—সমস্তই কাব্যে স্ফুরিত, বঙ্গসাহিত্যেও তেমনি ধর্ম্মতত্ত্ব, ঐতিহাসিক-তত্ত্ব সমস্তই কবিতায় বিকশিত।

ঐই প্রাচীন গ্রন্থরাশির আংশিক আবিষ্কারে সম্প্রতি আমরা জানিতে পারিতেছি যে দেশের কবি ও কাব্য সম্বন্ধে, এতকাল আমাদের কতকগুলি ভুল ধারণা ছিল। এখন আমরা জানিতে পারিতেছি—

রামায়ণের ভাষাকবি বলিয়া, যাঁহার নাম আমাদের কাছে প্রথিত, সেই কৃত্তিবাসের আসল রচনা এখন দেখিতে পাইবার উপায় নাই, বর্ত্তমান কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে, পরবর্ত্তী নানা কবির জাল বলিলেও চলে। অনেকগুলি পরগাছা পালা সংযোজনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রচলিত কৃত্তিবাসে এমন একটি পংক্তি বিরল, যাহাতে কিছু না কিছু রূপান্তর ঘটে নাই। কৃত্তিবাস চৈতন্য দেবের ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেকার কবি, পরবর্ত্তী নহেন। মুকুন্দরাম বা কাশীদাস, ঘনরাম বা ভারতচন্দ্র প্রভৃতি যাঁহাদের নাম আমাদের নিকট সুপরিচিত, তাঁহারা যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার মৌলিকতায় দাবী তাঁহাদের অল্প। চণ্ডী-কাব্যের বা ভাষা মহাভারতের, ধর্ম্মমঙ্গলের বা বিদ্যাসুন্দরের অধিকাংশ, ঐ সকল কবিগণের বহু পূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গ সাহিত্যে বিদ্যমান। শুধু ভাব নয়, অনেক স্থলে পদকে পদ, ছত্রকে ছত্র পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ গ্রহণ করিয়া, আপনাদের রচনার সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন।

এই প্রাচীন পুঁথি উদ্ধারে আমরা বুঝিয়াছি রামায়ণের অনুবাদক হিসাবে আমরা কৃত্তিবাসকেই চিনিতাম কিন্তু এখন জানিতে পারা গিয়াছে, সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে কৃত্তিবাসের পর রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত রামায়ণের সংখ্যা আটখানির নিকট হইবে। ইহা ব্যতীত রামায়ণের অংশ বিশেষের অনুবাদ অনেক আছে। ৫০।৬০ খানির সংবাদ পাওয়া যায়।

আমরা কাশীদাসকেই মহাভারতের অনুবাদক বলিয়া চিনি, কিন্তু এখন জানা গিয়াছে, কাশীদাসের দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে তিন চারি জন কবি সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া মহাভারতের আংশিক অনুবাদ অনেকগুলি কাশীদাসের পূর্ব্বকাল হইতে রহিয়াছে। তাঁহার সমকালে এবং পরেও এ বিষয়ে বিস্তর পুঁথি রচিত হয়। একত্রিশ বত্রিশ খানি ত ইতিমধ্যে মিলিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন অনুবাদের কথা আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে শুনি নাই, কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, সে কাল— ৩০০—৩৫০ বৎসর আগে।

কার সর্দার হইতে সাত আট খানি অনুবাদ মালা নামে রচিত হইয়াছিল সকলগুলি সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নহে।

আমরা মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীই চিনি; কিন্তু এখন জানিতে পারা গিয়াছে, এক রাশ চণ্ডীর ব্রত-কথা ছাড়িয়া দিলেও মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী চারি পাঁচখানি চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। পরেও কয়েকখানি রচিত হয়। চণ্ডীদেবীর সংক্রান্ত মঙ্গল-কাব্য বলিয়া কালিকা-মঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতিকে চণ্ডী-কাব্য ধরিলে সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায়।

মনসার ভাসান রচয়িতার হিসাবে আমরা ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের নামই শুনিয়াছি; কিন্তু এখন জানা গিয়াছে, এই কবির তিন শত বৎসর পূর্ব্বকাল, ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে, মনসার গান রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পদ্মপুরাণ বা বিষহরির পাঁচালী বা মনসার ভাসান এ পর্য্যন্ত বাসট্টি খানি মিলিয়াছে।

মনসা-মঙ্গল ভিন্ন ষষ্ঠি মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, শনির পাঁচালী, সূর্য্যের পাঁচালী, দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান প্রভৃতি ব্রত কথা ও পঞ্চালিকা অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। শীতলামঙ্গলও আট দশ খানি পাওয়া গিয়াছে।

আমরা রামেশ্বরের শিব-সংকীর্ত্তন ও সত্য নারায়ণের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু "ধান ভানতে শিবের গীত" বহু পূর্ব্বকাল হইতে আমাদের দেশে চলিত আছে সন্দেহ নাই। প্রাচীন শিবায়ন গুলিতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার কতকটা আভাস মিলে, তাহাতে বোধ হয়, বৌদ্ধ যুগের পর হইতেই শিবের গান আরম্ভ হইয়াছে। পাঁচ ছয় খানি প্রাচীন শিবায়ন দেখা দিয়াছে। সত্যপীরের ব্রত কথা হিন্দু মুসলমানের সৌহার্দ্দের নিদর্শনরূপে সম্ভবতঃ পাঠান-রাজত্বকাল হইতে বর্ত্তমান। এই পালা বিস্তর কবি রচনা করিয়াছেন, দেখা যায়।

আমরা ঘনরাম-প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলের নাম শুনিয়াছি, এখন দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষের চিহ্ন স্বরূপ এই মঙ্গল-কাব্যের কবি বার তের জনের কম নহে। বঙ্গ-ভাষার আদি যুগের গ্রন্থ মধ্যে ধর্ম্ম-পূজা পদ্ধতি মিলে; সে আজ সহস্র বৎসরের কথা।

আমরা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামে শিহরিয়া উঠি; কিন্তু এখন প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতচন্দ্রের বহু পূর্ব্ব হইতে এই উপাখ্যান কাব্যাকারে বিরাজমান;—অবশ্য ঘটনাংশ ভিন্ন। চার পাঁচখানি বিদ্যাসুন্দর মিলিতেছে; বিষয় একই। অমন যে সাধক রামপ্রসাদ, তিনিও বিদ্যাসুন্দর গড়িয়াছেন; তাঁহার রচনাই ভারতচন্দ্রের আদর্শ! তখনকার সমাজের লোকের রুচির দিকে চাহিয়া আমরা অবাক্ হই!

আমরা মহাপ্রভুর জীবন-চরিত—চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের নামই জানি; এখন দেখা যাইতেছে, অনেক ভক্তের অনেক মঙ্গল-কাব্যে প্রেমাবতারের লীলা উদ্ভাসিত রহিয়াছে। প্রাচীন পুঁথির কথাই বলিতেছি। প্রকাণ্ড পদকল্পতরুতে বৈষ্ণব-পদাবলীর সংখ্যা কিঞ্চিদধিক তিন সহস্র দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন জানিতে পারা গিয়াছে, ইহাপেক্ষা বৃহৎ সংগ্রহও আছে; একখানির নাম পদসমুদ্র; তাহাতে পদ-সংখ্যা পনর হাজার! পদকল্পতরু প্রভৃতিতে ১৩৫ জন পদ-কর্ত্তার নাম মিলিয়াছে; ইহাও অসম্পূর্ণ; ইহার ভিতর ৩ জন স্ত্রী-কবি ও ১১ জন মুসলমান গীত-রচয়িতার ভণিতা মিলে। "সাহিত্য" পত্রিকায় দেখিতেছিলাম, পদাবলী সাহিত্যের ভণিতায় ১৪।১৫ জন মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়। বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যাসরে মুসলমান কবিগণেরও স্থান আছে, ইহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই; এ বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিষ্ঠাই সমধিক।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যাই বড় বেশী; এইজন্যই ত দেশময় তন্ত্রাতন্ত্র পণ্ডিত-মূর্খের নিকট, শাস্ত্রোক্ত উপদেশমালা ও পৌরাণিক আখ্যান-নিচয়, এত প্রচার লাভ করিয়াছে। মনে রাখা উচিত, এই অনুবাদ সকল কেবল মূল বিষয় ভাষান্তরিত করা নহে; পুরাণ-ইতিহাস হইতে মূল আখ্যানের ছায়া গ্রহণ করিয়া, স্বকপোলকল্পিত নানা কথা সংযোজনে, বাঙ্গালী কবিগণ কাব্য-রচনায় স্বীয় প্রতিভা—স্বীয় কল্পনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সেই কারণেই ত কৃত্তিবাস ও কাশীদাস বড় কবি। মৌলিক রচনাও যে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে নাই, এমন নহে; তবে সে সকল অধিকাংশই স্থানীয় উপন্যাস, গল্পের শাখা

উপশাখাসমেত পদ্যে আবৃত্তি। অপ্রথিত-নাম কোন কোন কবির এই জাতীয় কাব্যে, স্থলে স্থলে এমন সুন্দর রচনা দৃষ্ট হয় যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপরিচিত কাব্য-প্রণেতার গ্রন্থমধ্যেও তাহার সমতুল্য রচনা মেলা দুর্ঘট।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, সকল তত্ত্ব না পাইয়াও, বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি, কবি-সুলভ দৈব-শক্তি-বলে গাহিতে পারিয়াছিলেন—

"মাতৃভাষা রূপে খনি;—পূর্ণ মণিজালে।"

বাঙ্গালা প্রাচীন-সাহিত্য সংরক্ষণ বিষয়ে, বটতলার কৃতিত্ব কম নহে। বেণীমাধব দে কোম্পানীর নাম, বোধ হয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কাগজ বা ছাপাই মন্দ হউক, কিম্বা বর্ণাশুদ্ধিই থাকুক, বটতলা কৃপা না করিলে, বঙ্গের অনেক প্রাচীন সদ্গ্রন্থ এতদিনে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যাইত।

বঙ্গ-সরস্বতীর সুসন্তান, জনকতক বঙ্গবাসী আপনাদের লুপ্ত প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার-কল্পে, কত কি করিতেছেন দেখাইবার জন্য, অনেক কথা তুলিয়াছি। অবশ্য সকলের নাম করিতে পারি নাই; কিন্তু বোধ হয়, মুন্সী আবদুল করিম সাহেবের নাম এই সঙ্গে গ্রহণ না করিলে, অন্যায় হয়। ইনি পূর্ব্ব বঙ্গের—বিশেষতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক প্রাচীন পুঁথির সন্ধান দিয়াছেন। সিভিলিয়ান-পুঙ্গব গ্রীয়ার্সন সাহেবের নামও এ স্থলে উল্লেখ করা উচিত। প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের অবিকৃত রচনা—বিশুদ্ধ পাঠ আবিষ্করণ বিষয়ে ইঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও ব্যয়ে অনেক প্রাচীন পুঁথি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। সাহিত্য-সভাও কি মাতৃ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যথাসাধ্য এই ব্রতে ব্রতী হইয়া, বঙ্গভারতীর লুপ্তোন্মুখ শোভা-সৌষ্ঠবের পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইবেন না?

অধ্যাপকবর **Max muller**এর একটি উক্তি আপনাদিগকে শুনাইয়া রাখি,—

"যে দেশের লোকবৃন্দ স্বীয় প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত না হয়, তাহারা জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বন-শূন্য

হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। যখন জর্ম্মনী রাজ্য রাজনৈতিক অবনতির নিম্নতম গহ্বরে পতিত হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয় লোকবৃন্দ, স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রাচীন সাহিত্য পাঠে তাঁহাদের মনে ভাবী উন্নতির নূতন আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল।"

"প্রাচীন" "প্রাচীন" এত যে করিতেছি, অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—'কত দিনের প্রাচীন?—বাঙ্গালা ভাষাই বা কত দিনের? বঙ্গ সাহিত্যই বা কত দিনের পুরাতন? বাঙ্গালীর কবিতাই বা কত দিনকার?"

"প্রাচীন" অর্থে আপনারা যদি সংস্কৃত কিম্বা লাটিন গ্রীকের কথা পাড়েন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা সে হিসাবে প্রাচীন নহে। কিন্তু এখনকার ইয়োরোপীয় ভাষার বয়স ধরিয়া যদি তুলনা করিতে চান, তাহা হইলে বঙ্গভাষা অপ্রাচীন নহে।

অধুনাতন ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সুসংস্কৃত ভাষা পাঁচটী;—ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মান, ইটালীয় ও স্পেনীয়। এই কয় ভাষার উন্নতি বড় বেশী দিনের নহে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক তিন শত বর্ষ, এই পঞ্চ ভাষা মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত হইয়া উন্নতির পথে আরূঢ় হইয়াছে। কিন্তু এই তিন শত বা সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের মধ্যে কতদূর গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে!

বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্য নিতান্ত আধুনিক নহে; কিন্তু ইউরোপীয় ভাষা, ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায়, এমন একটা বিশাল সাহিত্য সত্ত্বেও যদিও শুধু পদ্য-সাহিত্য—কোথায় পিছাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে!*

ভারতবর্ষে যে সকল প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বঙ্গভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় সংস্কৃত ভাষার অনুকরণ করিয়া আসিতেছে; কিন্তু ভাষার ও পদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছে, সেই সর্ব্বতোমুখী সাহিত্য প্রতিভার অনুসরণ বড় অধিক দূর করে নাই।*

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং তৎপরে সংস্কৃতমূলক পালি প্রভৃতি অতি প্রাচীন ভাষা; বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি, সংস্কৃতমূলক অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন ভাষা।

পালি সম্ভবতঃ পল্লী শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের কতকাংশে এক সময়ে ইহা জনসাধারণের কথিত ও লিখিত ভাষা ছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব এই ভাষায় কথোপকথন করিতেন। ইহাকে মাগধী ভাষাও বলে। খ্রীষ্ট-জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা মগধ দেশের ভাষা ছিল, তখন হইতে ইহার নাম মাগধী। স্ত্রীলোক এবং সাধারণ লোকের কথাবার্ত্তার জন্য সংস্কৃত হইতে সহজ হইয়া যে ভাষা চলিত হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল, তাহার নাম প্রাকৃত; প্রাকৃত ভাষা কালক্রমে চতুর্থা মূর্ত্তি ধারণ করে; -মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী ও মাগধী; সুতরাং মাগধী প্রাকৃত ভাষারই অংশ বিশেষ। এই মাগধী-প্রাকৃত হইতে আমাদের বঙ্গভাষার উৎপত্তি। প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিগণ কেহ কেহ বঙ্গভাষাকে 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই উৎপত্তি কত দিন পূর্ব্বে হইয়াছে দেখা যাউক। ভূতত্ত্ব-বিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে অতি পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ ছিল না, হিমালয়ের মূল পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমুদ্রবাসী জীবের কঙ্কাল হিমালয় পর্ব্বতে পাওয়া গিয়া থাকে। সমুদ্র যে অনেক দূর আগাইয়া ছিল, বঙ্গদেশের মধ্যে "অগ্রদ্বীপ" "নবদ্বীপ" দ্বীপ নাম ধরিয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। "তীরভুক্তি" বা ত্রিহুত বোধ হয় সেই প্রাচীন সমুদ্র-সীমার সংবাদই ঘোষণা করিতেছে। এ বহু পূর্ব্ব-কালের কথা।

আর্য্যজাতির আদি সাহিত্য বেদ ও ব্রাহ্মণ। বেদ-ব্রাহ্মণে বঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে, কিন্তু স্মৃতিকারেরা বঙ্গদেশে পদার্পণ প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ীভূত করিয়াছেন, ইহা হইতে বুঝা যায়, বঙ্গ তখন আর্য্যভূমি নহে। স্মৃতি-সঙ্কলন-কালে আর্য্যাধিকারের শেষ সীমা মিথিলা। মিথিলা বঙ্গের পশ্চিম দেশ।

পুরাণেতিহাসে দৃষ্ট হয়,—আর্য্যাবর্ত্তে গঙ্গাতীরে বলি নামক এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পাঁচ পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম; ইঁহাদের নামানুসারে পঞ্চরাজ্য স্থাপিত হয়।

রামায়ণে বঙ্গের নাম পাওয়া যায়, বিশেষ পরিচয় মিলে না; মহাভারতে

বঙ্গের পরিচয় মিলে, কিন্তু দেখা যায় বঙ্গ তখন অনার্য্যভূমি। বঙ্গবাসীর ভাষা তখন পর্য্যন্ত অবশ্য অনার্য্য ভাষা।

আমাদের এখনকার এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতোৎপন্ন আর্য্যভাষা।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-ইতিহাস ললিতবিস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন। ইহা খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বের কথা। এই বঙ্গলিপি অবশ্য আমাদের ব্যবহৃত এখনকার বঙ্গলিপি না হইতেও পারে।

বৌদ্ধযুগে বঙ্গের খবর মিলে; তখন পালিই রাজভাষা; বঙ্গের অধিবাসীর ভাষা কি, স্থির করা কঠিন। দেখা যায়, সে সময়ে বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে পালি ভাষা ভাঙ্গিয়া আর এক আকার ধারণ করিতেছিল।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—প্রথমে কোল-বংশীয় অনার্য্য, তার পর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য, তার পর আর্য্য—এই তিনের মিশ্রণে আধুনিক বাঙ্গালীজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

আর্য্যজাতি পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন; অনার্য্যগণ হটিতেছিল, কতকটা সংমিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী।

জাতির যেমন পরিবর্ত্তন হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। বঙ্গদেশে আর্য্যাধিকার যেমন বৃদ্ধি পাইতেছিল, বঙ্গবাসীর ভাষাও তেমনি, ক্রমশঃ আর্য্য ভাষা হইয়া আসিতেছিল।

সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়োন্থসাং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণে আগমন করেন; তাঁহার সময়ে, এখন আমরা যাহাকে বাঙ্গালা বলি, সে দেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। তখন বঙ্গ, বেহার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কিয়দংশের ভাষা এক ছিল। এই ভাষা বোধ হয় মাগধী-প্রাকৃতোৎপন্ন এক প্রকার হিন্দী ছিল। এই ভাষা হইতেই সম্ভবতঃ বেহার অঞ্চলের হিন্দী (বা মৈথিল) ও বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই ভাষার সহিত বঙ্গের আদিম অধিবাসীর ভাষাও কতক কতক মিশিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার ভার সাহিত্যসভা হইতে যোগ্যতর ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে; সে বিষয়ে বেশী কিছু

বলিয়া আমি আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না; মোটের উপর বলিয়া যাই:—

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বাঙ্গালা ভাষার রচনা কিম্বা পুঁথি পত্রের সম্বাদ অদ্যাবধি কিছু পাওয়া যায় নাই।

অধুনা বিংশ শতাব্দী; ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, লিখিত বাঙ্গালা ভাষার বয়স প্রায় সহস্র বৎসর।

কিন্তু একেবারে সাহিত্য জন্মায় না, সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের বয়স আরও কিছু কম।

বঙ্গের সুন্দরবনে মাটীর ভিতর হইতে কতকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহার একখানি পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন দেখিয়াছিলেন;— সেখানি লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত সনন্দ। লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ; সুতরাং সে খানির বয়স প্রায় আট শত বৎসর। উহাতে খোদিত ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু অক্ষরগুলি না দেবনাগর না বাঙ্গালা। অনেকেই অনুমান করেন, দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষর উৎপন্ন হইবার সন্ধিকালের নিদর্শন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন,—"সেখানি দেখিলে বুঝা যায় যে, সেই সময়কার অক্ষর রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক বঙ্গাক্ষরের মত দাঁড়াইতেছিল।"

শুনা যায়, ৯৩০ শকের হাতের লেখা এক খানি কাশীখণ্ড সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে, উহার অক্ষর কুটিল অক্ষরের লক্ষণাক্রান্ত—প্রাচীন বঙ্গলিপি।

অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, আমাদের ব্যবহৃত এই বঙ্গাক্ষরের বয়স, আট শত বৎসরের কম নহে।

কামধেনুতন্ত্রে ককারাদি বঙ্গাক্ষরের তত্ত্ব আছে। সে যে আমাদের ব্যবহৃত এখনকার এই অক্ষরের কথা, তাহার সন্দেহ নাই। সে তন্ত্রখানি যে আধুনিক, অর্থাৎ সাত আট শত বৎসর অপেক্ষা অধিক দিনের নহে, ব্রাহ্মণঠাকুরেরা ইহা স্বীকার না করিলে, তন্ত্ররচনা-কালে বাঙ্গালা অক্ষর ছিল মানিয়া লইতে হয়; জানি'না সে বেশী দিনের কি স্বল্পদিনের কথা?

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত পালরাজগণ বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন ; সমগ্র বাঙ্গালার না হউক,—মগধ বা বেহার, পৌণ্ড্র (বর্দ্ধন) বা বরেন্দ্রভূমি ও পশ্চিম-বঙ্গ বা গৌড়ের রাজা ছিলেন। তখন পালি ভাষারই প্রাধান্য। তাঁহাদিগের নিকট হইতে পূর্ব্ববঙ্গের বা বিক্রমপুরের হিন্দু-রাজা আদিশূর গৌড়-সিংহাসন কাড়িয়া লন।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, মোগল-শাসনের সময় হইতে বঙ্গ বা গৌড় প্রদেশ বিস্তৃতি লাভ করিয়া "বাঙ্গালা" নাম ধারণ করে। ইহার পূর্ব্বে এমন এক সময় ছিল, যখন "পঞ্চগৌড়" বলিতে, কনোজ-কাশী হইতে কামরূপ-উৎকল পর্য্যন্ত বুঝাইত ; বাঙ্গালার গৌড় তাহারই ভগ্নাবশেষ।

বৌদ্ধ রাজার অন্তর্দ্ধানের পর হইতে, গৌড়ের রাজসিংহাসনে হিন্দু রাজার অভ্যুদয় হইতে, এখন যে ভাষাকে আমরা বাঙ্গালা ভাষা বলি, সেই ভাষার নিদর্শন কিছু কিছু মিলিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা গিয়াছেন, রাজধর্ম্ম আর বৌদ্ধধর্ম্ম নহে ; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব রাতারাতি রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে না, সেই জন্য এই সময়ের যে সমস্ত পুঁথিপত্র পাওয়া যায়, তাহার ভিতর বৌদ্ধধর্ম্মের আভাষ মিলে।

বাঙ্গালা ভাষার—বাঙ্গালা রচনার আদি যুগের নিদর্শন,—গোপীপাল-মহীপাল রাজার স্তুতিগান, শূণ্যপুরাণ, ধর্ম্মপুরাণ, মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতি।

ডাক ও খনার বচন বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ; ভাষার সহিত সংস্কৃতের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। বোধ হয় বঙ্গের আদিম অধিবাসী অনার্য্য জাতির ভাষার সহিত আর্য্যভাষার প্রথম সংমিশ্রণের ফল। ভাষা জটিল—হেঁয়ালীর মত। ইদানীং আমরা ডাক বা খনার বচন বলিয়া যাহা দেখিতে পাই, তাহা বাঙ্গালীর মুখে মুখে চলিত হইয়া কালক্রমে কতকটা রূপান্তরিত ও সরল হইয়া পড়িয়াছে। আসল ডাক বা খনার বচন এত সহজবোধ্য নহে। "বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড, আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড"—বুঝিতে পারা সহজ নহে। শুনা যায়, নেপালে সংরক্ষিত বাঙ্গালা ডাকার্ণবের ভাষা বিলক্ষণ জটিল।

খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বিরচিত কয়েক খানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্প্রতি নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; ভাষা আদি বঙ্গভাষার লক্ষণযুক্ত। বাঙ্গালী কাণুভট্ট-বিরচিত "বোধিচর্য্যাবতার" ও "চর্য্যাচর্য্যাবিনিশ্চয়" অতি প্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা।

সে দিন কোথাও দেখিতেছিলাম,—শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রচিত কানুভট্ট, শান্তিদেব, সরোজপাদ, লুইচন্দ্র, ভোম্বিপাদ প্রভৃতি দশ জন প্রাচীন কবির বাঙ্গালা দোঁহা বা গাথা সংগ্রহ করিয়াছেন।

আবার একবার স্মরণ করাইয়া দিই,—বঙ্গভাষার শৈশবকালের রচনা (শুধু শৈশবই বা বলি কেন?) সমস্তই পদ্য ও গাথা বা গীত-কাব্য বলা চলে। যা কিছু সামান্য গদ্য মিলে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে ভাটগণের গীত বা পদ্য-আবৃত্তি খুব প্রাচীন প্রথা।

সকল দেশে সকল ভাষাতে পদ্যই আগে; বরং বলা চলে, গীত সর্ব্বাগ্রে। সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক সর্ব্বত্রই এক কথা। জগতের সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্য-নিদর্শন ঋক্‌মন্ত্র—দেখিতে গদ্যের মত, কিন্তু তাহারও সুর লয় ছন্দ আছে।

তত্ত্ববিদ্ সুধীগণ বলিয়া থাকেন,—জগতের সমস্ত জাতিরই প্রথম সাহিত্য-সাধনার প্রয়াস কবিতার মাধুরীতে বিকশিত হইয়াছে দেখা যায়। যুক্তি এবং বিচার-শক্তি আসিবার পূর্ব্বে হৃদয়ের কোমল ভাব গুলি দেখা দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপুষ্ট হইবার আগে মস্তিষ্কে কল্পনা দেবীর ক্রীড়ার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। মনুষ্য প্রকৃতির লীলা ও সৌন্দর্য্য নেত্রগোচর করে এবং তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; স্বভাবের কোন্ নিয়মে কি ঘটিতেছে, ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্য-কারণ বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বে মানব যাহা দৃষ্টিগোচর করে, তাহাতে আত্মহারা হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক জন্মিবার পূর্ব্বে কবির আবির্ভাব হইয়া থাকে। কবির উচ্ছ্বাস নিঃসৃত হইবার পর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক—যুক্তি-তর্ক, আশ্লেষণ-বিশ্লেষণ লইয়া মাপকাটিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা দ্বারা কঠোর সত্যের

আঁলোচনা করিতে বসেন; কবি হাসিয়া সে বিচারের বাহির থাকিতে চাহেন।

আদিশূর উপাধিধারী মহারাজ জয়ন্ত খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমাংশ গৌড়দেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার আমন্ত্রণে কণোজ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আইসেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ভট্টনারায়ণ। ইনিই প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক বেণীসংহারের রচয়িতা। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের আর একজন শ্রীহর্ষ, কাহারও কাহারও মতে ইনিই বিখ্যাত সংস্কৃত মহাকাব্য নৈষধের প্রণেতা; কিন্তু এটি সন্দেহস্থল। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে, যদিও এই সময় হইতে আমরা অল্পস্বল্প বাঙ্গালা রচনা ও বাঙ্গালা পুঁথিপত্রের সন্ধান পাইতেছি, তথাপি রাজদ্বারে সংস্কৃতের আদর।

আদিশূরের প্রায় দেড় শত বৎসর পরে, কাশী-কণোজ-বিজয়ী সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মণসেন গৌড়দেশের রাজা। এই রাজারই কীর্ত্তিধ্বজা প্রসিদ্ধ অব্দ "ল-সং" (লক্ষ্মণ সম্বৎ)। এই সন আজ পর্য্যন্ত সেই রাজার রাজ্যাংশ মিথিলায় প্রচলিত রহিয়াছে। ইঁহার রাজত্বকাল খ্রীষ্টাব্দ ১১০১ হইতে ১১২১। এই মিথিলা পঞ্চগৌড়ান্তর্গত; লক্ষ্মণসেন পঞ্চ-গৌড়েশ্বর ছিলেন। মিথিলা বা বেহার অদ্যাবধি বাঙ্গালা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই মিথিলার কবি বলিয়াই পরবর্ত্তী যুগের বিদ্যাপতি আমাদের ব্যবহৃত ভাষায় না লিখিলেও বাঙ্গালী কবি। বিদ্যাপতির অনুকরণে ভাঙ্গা-ভাষা—মৈথিল ও বাঙ্গালা ভাষার সংমিশ্রণোৎপন্ন "ব্রজবুলি"-বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের এক মধুর উৎস।

গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় উমাপতিধর, ধোয়ী কবিরাজ, শরণ ও গোবর্দ্ধনাচার্য্যের সহিত বঙ্গীয় কাব্যকাননের প্রথম কোকিল শ্রীজয়দেব বিরাজ করিতেন। জয়দেব যে ভাষায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা যদিও সংস্কৃত, কিন্তু সুধাবর্ষী গীতগোবিন্দ পাঠ করিতে করিতে বুঝা যায়—যে বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা, যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় আমরা লেখা পড়া করি, সে ভাষা দেখা দিয়াছে।

জয়দেবের "চল সখি কুঞ্জং", "ধীরসমীরে যমুনাতীরে", "চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসনবনমালী" পাঠকালে বাঙ্গালীর বাঙ্গালা লেখা পড়িতেছি মনে হয়।

জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী। বঙ্গের কবি ভট্ট-নারায়ণ ও শ্রীহর্ষ, জয়দেবের পূর্ব্বগামী, কিন্তু তাঁহাদিগকে ঠিক বাঙ্গালী কবি বলা চলে না, কেন না তাঁহারা কণোজের লোক। জয়দেব বঙ্গবাসী; জয়দেব আদি বাঙ্গালী কবি।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের আবির্ভাব। জয়দেব মহাকবিগণের মধ্যে আসন পাইয়াছেন; জয়দেবের গীতগোবিন্দ অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহা-কাব্য বলিয়া পরিগণিত। জয়দেবের গীতগুলির ভাষাও সংস্কৃত পরিচ্ছদে বাঙ্গালা বলা চলে। কাব্যের যে ভাব সেটা বাঙ্গালীর নিজস্ব।

বঙ্গসাহিত্যের আরম্ভ এই সময় হইতেই ধরা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষার ঠিক না'হউক, বাঙ্গালা দেশের—আমাদের মৃদুপ্রাণ এখনকার এই বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য এই সুরু।

বঙ্গভাষার একটু আধটু পরিচয় ইহার দুই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে পাওয়া যাইতেছে, অগ্রেই বলিয়াছি।

আমরা দেখিলাম,—আমাদের ব্যবহৃত এই বাঙ্গালাভাষার বয়স সহস্র বৎসরের কম নহে।

বঙ্গসাহিত্যের বয়স আট শত বৎসর ধরা যাইতে পারে।

বঙ্গাক্ষরের বয়সও আট শত বৎসরের কম নহে বরং বেশী।

বঙ্গভাষার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গকবিতার জন্ম। শৈশবের অস্ফুটবাক্ ছাড়িয়া দিলে, যে সময় হইতে বাঙ্গালী-রচিত যথার্থ কাব্যের নিদর্শন আমরা পাই, সে আজ আট শত বৎসরের কথা বটে, কিন্তু প্রকৃত বাঙ্গালা কবিতার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আরও প্রায় তিন শত বৎসর পরবর্ত্তীকাল হইতে। আমাদের ব্যবহৃত এখনকার এই বঙ্গভাষায় প্রথম গীতরচয়িতা চণ্ডীদাস, প্রথম কাব্য-প্রণেতা কৃত্তিবাস; আবির্ভাবকাল বোধ হয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি কিম্বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম। বিদ্যাপতিও এই সময়ের কবি; সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস কিছু পরবর্ত্তী।

লক্ষ্মণসেনের প্রায় বিশ বৎসর পরে, সেই নামেই সচরাচর খ্যাত লাক্ষ্মণেয় সেন। ইঁহার আমলে বক্তিয়ার খিলিজি গৌড় জয় করেন।

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ মুসলমানের অধীন হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তাচলে প্রয়াণ করিয়াছেন; সে আজ সাত শত বৎসর; বাঙ্গালী সাত শত বৎসর পরপদানত।

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী কি ছিল? মার্জ্জনা করিবেন, ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা উন্মোচন করি। কি আক্ষেপের বিষয়, বাঙ্গালীর ইতিহাস বাঙ্গালী জানে না, বঙ্গদেশে নাই; বাঙ্গালীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয়—সিংহল, তিব্বত, কাশ্মীর, চীন, গ্রীস হইতে! বাঙ্গালী জাতির আদিম ইতিহাস কুহেলিকাচ্ছন্ন; কিন্তু সিংহলের মহাবংশ নামক প্রাচীন ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়,—সিন্ধুপার সিংহল দ্বীপ কোন বাঙ্গালী রাজপুত্র জয় করেন এবং বাঙ্গালী রাজগণ পুরুষানুক্রমে সেই দূর দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

আমরা দেখিতে পাই, কালিদাস রঘুবংশে বঙ্গবাসীকে জলযুদ্ধে নিপুণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

প্রমাণিত হইয়াছে, ভারত-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ—যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ প্রভৃতি বাঙ্গালীর উপনিবেশ।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তি ভারতবর্ষীয় জাতির সমুদ্রযাত্রার বন্দর ছিল, চৈনিক পরিব্রাজকগণ দেখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় অপর কোন জাতির এরূপ ভারতের বহির্ব্বর্ত্তী দেশ অধিকার ও তথায় উপনিবেশ-সংস্থাপন করিবার পরিচয় মিলে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকরূপে বাঙ্গালী ধর্ম্ম-প্রচারকগণ হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে শিল্প ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা পুরাবিদ্‌গণ প্রমাণ করিয়াছেন। শিলাভদ্র ও চন্দ্রকীর্ত্তির কীর্ত্তি বৌদ্ধ-ইতিহাস হইতে ঘুচিবার নহে।

গ্রীক-ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে—গঙ্গারাঢ়ী জাতি অর্থাৎ রাঢ়বাসী বাঙ্গালীর পরাক্রমের পরিচয় শুনিয়া ভুবনবিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সেনাদলও ভারতে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই।

আধুনিক বঙ্গের পশ্চিমাংশ প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কনরেন্দ্র-গুপ্ত কণোজের অধিপতি সুবিখ্যাত দ্বিতীয় শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন, ইহাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা।

বাঙ্গালী-রাজগণ অনেক সময়ে উত্তর-ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন; পালবংশীয় বাঙ্গালী-রাজা ধর্ম্মপালদেব সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করেন।

বাঙ্গালী-রাজা দেবপাল-দেব ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত। কাষ্ঠফলকে মুদ্রিত তিব্বতীয় ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, গৌড়েশ্বর দেবপাল বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত সেনাবলের সাহায্যে মগধ ও বরেন্দ্রভূমি জয় করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের প্রামাণিক ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণীতে গৌড়ীয় সেনাদলের বাহুবিক্রম, তাহাদের অলৌকিক স্বদেশ-প্রেম ও আত্মবিসর্জ্জনের কথা কীর্ত্তিত আছে।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরাজা আদিশূর পশ্চিম বঙ্গের বৌদ্ধ পাল-রাজাকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অধীশ্বর হন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন নেপালরাজ নান্যদেবকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী-রাজা লক্ষ্মণসেনের দিগ্বিজয়ের পরিচয় বাঙ্গালাদেশের বাহিরেও পাওয়া যায়। তাঁহার জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে; তিনি বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্ততঃ তৃতীয়াংশের অধিপতি ছিলেন।

গঙ্গাবংশ-পরিচয়ে বাঙ্গালী-রাজা বহুকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন; ইহাও কল্পনাকাহিনী নহে।

মুসলমানেরা গৌড় জয়ের পর বহুকাল ধরিয়া সমগ্র বাঙ্গালা করায়ত্ত করিতে পারেন নাই, ইহা কে না জানে?

বাঙ্গালী কি চিরকাল কাপুরুষ নগণ্য ও হীন? বাঙ্গালী চিরকাল "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী"—ইহা অভিমানের—ক্ষোভের অসত্য বাণী। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না কি—"সিংহের ঔরসে শৃগাল"ও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে?

যে বঙ্গবাসী, লক্ষ্মণসেনের সময় প্রয়াগ হইতে উৎকল বিজয় করিয়াছিল, সেই বঙ্গবাসী স্বল্পদিন পরে লাক্ষ্মণেয়সেনের কালে, পরাধীন হইবার পর,

একেবারে নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন, উচ্চাকাঙ্ক্ষাশূন্য কেমন এক প্রকার হইয়া গেল! দেড শত দুই শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর আর কোন খবরই মিলে না! বাঙ্গালী জাতি ত জাহান্নমে গেল, কিন্তু এই সুদীর্ঘ কাল বঙ্গসাহিত্যাঙ্গন একেবারে অন্ধতমসাচ্ছন্ন কি না, তাহা পুরাবিদ্‌গণের গবেষণার বিষয়।

ইতিপূর্ব্বে পোষাকী ভাষা সংস্কৃত ছিল, আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু কথিত ভাষা—জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষা কি ছিল? সম্ভবতঃ পালি,—কিন্তু তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, এই সময়কার অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার আদি-যুগের সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ ও বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রচার আছে বলিয়া, হিন্দু রাজার আনুকূল্যে ধর্ম্মকলহে বিজয়ী ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা বঙ্গভাষার আদি সাহিত্য স্থায়ী হইতে দেন নাই।

পাল-রাজত্বের শেষ সময়ে এবং শূর বা সেন রাজত্বের প্রথমকালে গৌড়-বঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্ম ও বৈদিক হিন্দুধর্ম্মে সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশে এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ব্রাহ্মণেরা জয়ী হন, কিন্তু বোধ হয় সেই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির ধাত বদলাইয়া গেল।

মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-অধিকারের সার্দ্ধশতাধিক বৎসর পরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে—কাব্যোদ্যানে বাঙ্গালীর খবর মিলে; কিন্তু যাহা মিলে, তাহাতে বুঝা যায়, এ জাতি—সে জাতি আর নাই।

কেহ কেহ অনুমান করেন,—"মায়াবাদে একান্ত আশ্রয়-পরায়ণ, বিষয়-বিমুখ হিন্দুর শিথিলমুষ্টি হইতে, পার্থিব সুখসম্ভোগে ব্রতী, রণপটু মুসলমানগণ অতি সহজে তাঁহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।"

কাহারও কাহারও বা ধারণা,—সেন-রাজগণের সময়ে ব্রাহ্মণ জাতির উদ্ভাবিত আচার-বিচারের "আষ্টেপৃষ্ঠে" বন্ধনে এবং গুণ-নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণগণের একান্ত প্রাধান্য-স্থাপনে উত্যক্ত হইয়া, প্রজাসাধারণ রাজ্যরক্ষায় রাজার সহায়তা করিতে অগ্রসর হয় নাই বলিয়াই, মুসলমানগণ অত সহজে বঙ্গ-বিজয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, বুঝা যায়, এ সময়টায় বাঙ্গালীজাতির মনের অবস্থা কেমন এক প্রকার থম্‌থমে হইয়াছিল। সাহিত্য, দেশের অবস্থা ও জাতীয়-চরিত্রের প্রতিবিম্ব।

অন্তর্দর্শী চিন্তাশীল বঙ্গের জনৈক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিয়াছেন—

"পরাধীন বাঙ্গালী জাতির উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখ-পরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্ট হইল—তাহা গীতি-কাব্য। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাশক্ত, গৃহসুখ-পরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দাম্পত্য প্রণয়ের চরম পরিচয়। অন্য সকল প্রকার সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর ধরিয়া, বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে, এই জন্যই বঙ্গে গীতিকাব্যের এত আদর, এত বাহুল্য।"

আমরাও কি বলিতে পারি না, এই কাব্যের প্রকৃত কবি বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ আজ বঙ্গের "সাহিত্য-সম্রাট" ?

এই জন্যই সর্ব্ব প্রথমে বলিয়াছি—বঙ্গে বাঁশীই বাজিতেছে, বাঙ্গালী বাঁশী বাজাইতেই মজবুত।

সমীচীন সমালোচকেরা বলেন,—"সাহিত্য, জাতীয় হৃদয়ের আদর্শ—জাতীয় চরিত্রের ইতিহাস। যে জাতির হৃদয় যে সময়ে যে ভাবে পরিপূর্ণ কিম্বা পরিপ্লুত থাকে, সেই জাতির সেই সময়ের সাহিত্যও সেই ভাবেই সম্পূর্ণরূপে বিলসিত রহে।" এ কথা যথার্থ ধরিলে, আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ের কি পরিচয় আমরা দিয়া আসিতেছি!

বঙ্গদেশ পরাধীন হইবার প্রায় দুই শত বৎসর পরে বঙ্গ-মিথিলায় আবার সেই আদি কোকিলের কল-কাকলীর প্রতিধ্বনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া সঙ্গীতের স্রোত বহাইয়াছেন; সে এক দেব-সঙ্গীত! জগতে তাহার তুলনা বোধ হয় অধিক মিলে না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে গৌড়মণ্ডলে এই সুধাধারা বহিতেছে।

খ্রীষ্টাব্দ ১২০৩ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত বঙ্গে পাঠান রাজত্ব

কাল। মধ্যে একবার বৎসর কয়েকের জন্য ক্ষণিক বিজলী চমকাইয়াছিল, সে রাজা গণেশ বা কংশনারায়ণের স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব। বঙ্গের কবিগুরু কৃত্তিবাস ইঁহার সভা-কবি হইয়াছিলেন।

পাঠানেরা বঙ্গদেশকে অধীন করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের কোন ক্ষতি তাহাতে হয় নাই। এই সার্দ্ধ তিন শত বৎসর, পাঠানের পারসী ভাষা কেবল রাজদরবারের ভাষা মাত্র ছিল; জনসাধারণের পারসীর সহিত কোন সম্পর্ক ছিল বলিয়া বোধ হয় না; বাঙ্গালীর ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা ভাষাই ছিল; এক আধটা পারসী শব্দ প্রয়োগ গ্রাহ্য করিবার নহে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে পাঠান রাজত্বের শেষকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানদিগের পারসীর যোগে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম ১৫০।২০০ বৎসর সাহিত্যাকাশ অন্ধকার।

পাঠানেরা বঙ্গদেশ জয় করিয়া এইখানেই বসবাস করিতে লাগিলেন; বঙ্গদেশকে তাঁহারা নিজের পিতৃভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গালী গোরুকে খড়-ভূষী খাওয়াইয়া পুষ্ট করিয়া দুগ্ধদোহন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; মামুদ-নাদিরের মত জ্বালাইয়া পোড়াইয়া কেবল ধন রত্ন-লুণ্ঠন তাঁহাদের মৎলব ছিল না; সুতরাং বঙ্গবাসী বোধ হয় এ সময়ে সুখ স্বচ্ছন্দে ছিল, বাঙ্গালী প্রাচীন কবিরা অনেকে বিধর্ম্মী গৌড়েশ্বরের গুণ গান করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য আমার বলা উদ্দেশ্য নহে যে পাঠানেরা কখনও কাফের হিন্দুদিগের উপর নির্য্যাতন-কশা চালিত করেন নাই, কাজির বিচার বিশ্ববিশ্রুত।

পাঠান-শাসন-কালের মাঝামাঝি সময় হইতে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি সমধিক উজ্জ্বল দেখা যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—পঞ্চগৌড়ান্তর্গত বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় পাঠান রাজত্বকালেই আবির্ভূত। শুনা যায়, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাঠানরাজ নসরত সাহার আদেশে মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল—তাহার নাম ছিল "ভারতপঞ্চালী।" বঙ্গ-সাহিত্যের পিতৃস্থানীয় প্রবীণ-কবি কৃত্তিবাস এই পাঠান রাজত্বের প্রাদুর্ভাবকালমধ্যেই রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাস এই যুগের মধ্য-সময়ের

কবি, কিন্তু কৃত্তিবাসের আসল রচনা এখন আর দেখিতে পাইবার উপায় নাই; প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়-লাভ আমাদের অদৃষ্টে নাই। পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত কতকগুলি পালা ছাড়িয়া দিলে, কৃত্তিবাসের রচনার আদত বিষয়টা ও ভাবটা ঠিক আছে, ভাষা এবং ছন্দ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহাই অবশ্য বলিতে হয়। আসল কৃত্তিবাসের রচনা ছিল পাঁচালী গান; প্রাচীন সরল গানে বা পদ্যে অক্ষরের বাঁধাবাঁধি নাই, মাত্রার দিকেই দৃষ্টি অধিক; আমরা জানি মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের সহজ রচনাকে হাল নিয়মানুযায়ী অক্ষর-শৃঙ্খলে বাঁধা হইয়াছে। প্রচলিত কৃত্তিবাসের গায়ে যে তিলক মাটীর ছাপ--রাম নাম আঁকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে যোজনা; ভাষা-রামায়ণে শক্তি পূজার পালাগুলি, শাক্তগণ কর্ত্তৃক তাহারই "উত্তোর" গান মনে হয়—প্রক্ষিপ্ত অংশ।

শুধু কাব্যাংশে নয়, পাঠান-রাজত্বকালেই অদ্বিতীয় বাঙ্গালী নৈয়ায়িক ন্যায়-শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্মার্ত্তকুলতিলক রঘুনন্দন সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যা প্রকাশ করিয়া ভারতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

পাঠান-রাজত্বকালেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাব। এই যুগেই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী—চৈতন্যদেবের সমকালিক এবং পরগামী মধুর বৈষ্ণব-সাহিত্য--প্রায় সমস্তই কাব্য—বাঙ্গালা কবিতা ও গীত; কবিতার কতক সংস্কৃত; গীতগুলির কতক মনমোহন ব্রজবুলী—কিন্তু সে ত বঙ্গভাষারই অংশ। কাহারও কাহারও মতে, বাঙ্গালা গদ্য রচনার আরম্ভও এই সময় হইতে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই এই সমস্তের অভ্যুদয়। এই দুই শতাব্দীতে বঙ্গবাসীর মানসিক জ্যোতিধারায় বঙ্গভূমি আলোকিত। কি এক ঐশীশক্তিবলে ওদিকে বৃন্দাবন, এদিকে উৎকল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ যেন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল!

* খ্রীষ্টাব্দ ১৪৯৭ হইতে ১৫২১ সাল পর্য্যন্ত সুবিখ্যাত পাঠান নরপতি হুসেন সার রাজত্ব কাল; সে বাঙ্গালীর এক স্বর্ণযুগ, বাঙ্গালা ভাষার গৌরবের দিন! হুসেন সার আমলে তাঁহার উৎসাহে রামায়ণ, মহাভারত,

শ্রীমদ্ভাগবৎ বাঙ্গালা পদ্যে অনূদিত হয়; পদ্মাপুরাণ, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ এই সময়ে হইয়াছিল; শ্রীচৈতন্যের লীলা, তাঁহার সহচর অনুচরবর্গের সংস্কৃতে এবং বাঙ্গালায় অপরূপ কাব্যস্ফূর্ত্তি এই হুসেন সার সময়েই দেখা দিয়াছিল।

মহাপ্রভুর ও তাঁহার ভক্তগণের জীবন-চরিত নিচয়—আদ্যোপান্ত কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী সমূহ—বিরাট ব্যাপার, এই পাঠান-রাজত্বের শেষ সময়েই, অথবা পাঠান-রাজত্বের জের থাকিতে থাকিতেই রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন—বৈষ্ণবগণ বঙ্গভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা-সমূহের সঙ্গে সমকক্ষতা করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করেন।

পাঠান-শাসন-কালে বঙ্গসাহিত্যের আশ্চর্য্য বিকাশ! এই বিকাশের ফলে বৈষ্ণব-কাব্য দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার বঙ্গভূমিতে বিশিষ্টরূপে হইয়াছিল।

কোন কবি-সমালোচক বলিয়াছেন—"এ সংসারে প্রচার কার্য্য বরাবর দুই উপায়ে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে; প্রথম উপায় কবিতা, দ্বিতীয় বাগ্মিতা। বোধ হয় কবিতা ও বাগ্মিতা উভয়ে বৈমাত্রেয় ভগিনী; নিকষ কুলীনের মেয়ে বলিয়া এক যোগ্যপাত্রে উভয়কেই সম্প্রদান করা হইয়াছে, পাত্রের নাম ভাবোচ্ছ্বাস, জন্মভূমি তার মনুষ্য-হৃদয়। উভয়েই পতিপ্রাণা এবং পতিসোহাগিনী, এবং সেজন্যই উভয়ের সৌন্দর্য্য; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য দেখিতে হয় শুধু হৃদয় দিয়া। উভয়ের প্রকৃতি অবশ্য ভিন্ন; কবিতার—

হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনে অন্য দিকে ধায় না।"

আর বাগ্মিতা? তিনি একটু প্রগল্‌ভা; হাসিটুকু তাঁর কক্ষে কক্ষে তরঙ্গায়িত হয়। কবিতা আধ্যাত্মিক—নির্জ্জনে ধ্যানধারণার ফল; বাগ্মিতা সামাজিক—দশজনকে লইয়াই তাঁহার কারবার।"

এক সময়ে নবদ্বীপধামে মূর্ত্তিমান ভাবোচ্ছ্বাস করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গকে বরণ করিয়া কোন সুন্দরী ধন্যা হইয়াছিলেন? তখন—

"শান্তিপুর ডুবুডুবু, প্রেমে নদে ভেসে যায়!"

স্বনামধন্য মোগল-সম্রাট আকবর বাদশাহের নানা গুণে আমরা মুগ্ধ,

কিন্তু আকবর বাদশাহই প্রকৃত পক্ষে বঙ্গদেশকে বাঙ্গালী জাতিকে পরাধীন করেন।

বঙ্গভাষাকে তিনিই প্রথমে "খাটো" করিয়া দেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে, পাঠানদিগের নিকট হইতে আকবর শাহ বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়া লন। তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দুদিগের রাজ-দরবারে উন্নতি-প্রতিপত্তির বাসনায় রাজস্বসচীব হিন্দুরাজা টোডরমল্ল নিয়ম করেন, রাজস্ববিষয়ক সমস্ত কাগজপত্র পারসী ভাষায় রাখিতে হইবে; উন্নতির—রাজসরকারে চাকরীর আশায় সকলেই পারসী শিখিতে লাগিল। মোগল-বিজিত বঙ্গদেশ—বঙ্গবাসীরাও মৌলভী রাখিয়া পারসী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় হইতেই বঙ্গভাষা আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। পাঠান আমলের পরই, আকবর শাহের শাসন-সময়ে, বঙ্গভাষার বৈষ্ণব-স্রোতে পারসী-স্রোত আসিয়া মিশিল; ভাষা এক নূতন পথে চলিল। প্রথমটা ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

এই সময়ে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের অভ্যুত্থান। মুকুন্দরামের রচনা হইতে বুঝা যায় যে বাঙ্গালা ভাষার অন্তরে অন্তরে পারসী শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে; এবং আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালা কবির কবি-প্রতিভা সম্যক বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহা নহে, এই সময় হইতে বাঙ্গালীর ইতিহাস লেখা আরম্ভ হইয়াছে। মুকুন্দ-রামের চণ্ডী শুধু কাব্য নহে--বাঙ্গালীর সামাজিক এবং গার্হস্থ্য ইতিহাস, অধিকন্তু প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী চৈতন্য-ভাগবতাদিও কতকটা ঐতিহাসিক গ্রন্থ—তাহাও কাব্য।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত মোগল সুবাদারীর যুগ। কায়স্থ-কবি কাশীরাম দাস এই যুগের মাঝামাঝি সময়ের কবি; এই সময়ের বিস্তর ভাষা-কবির মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ। কাশীদাসের বর্ণনাশক্তি স্থলে স্থলে অতি উৎকৃষ্ট; ইঁহার সময়ে বঙ্গভাষা আরও পরিষ্কার ও মার্জ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। ইদানীং শুনা যাইতেছে, আমরা কাশী-দাসের বলিয়া যাহা জানি, তাহার আদ্যোপান্ত তাঁহার স্বরচিত নহে। এই সময় হইতে বঙ্গীয় কাব্যে ভাব গুণের হ্রাস এবং সংস্কৃত গ্রন্থের অলঙ্কার ও

উপমা রাশির অনুকরণে রচনায় শব্দাড়ম্বরের প্রতি সমধিক দৃষ্টি লক্ষিত হয়, পরদেশী সাহিত্যের আবছায়াও যেন বুঝা যায়। এই সময় হইতে রচনায় কথিত বাঙ্গালা অপেক্ষা পোষাকী বাঙ্গালার প্রভাব অর্থাৎ সাধু ভাষার ব্যবহার অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

কাশীদাসের পর শতাধিক বর্ষ বঙ্গভাষা—বঙ্গসাহিত্য—বাঙ্গালা কাব্য একগতি চলিতেছিল; শেষাশেষি, আলিবর্দ্দী-সিরাজুদ্দৌলার আমলে, বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ নবদ্বীপে, সংস্কৃত চর্চ্চার প্রাবল্য-নিবন্ধন এবং সাহিত্যানুরাগী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে, ভাষা আবার এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর তাহার উদাহরণ। কবিরঞ্জনের কাব্য হইতে বুঝা যায়, তিনি দু নৌকায় পা দিয়াছিলেন। এই সময়ে দেশের রাজার উচ্ছৃঙ্খলতার আদর্শেই হউক, বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্রবেই হউক, কিম্বা দেশবাসীর রুচিবিকারের নিদর্শন রূপেই হউক, কাব্যের বিষয়-বর্ণনা সুনীতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিল। কি আশ্চর্য্য! যে রামপ্রসাদের সঙ্গীত, গৈরিক নিঃস্রাবের মত স্বচ্ছ সহজ অনাবিল ভাবের উৎস, সেই পরম সাধকের লেখনী হইতে নিঃসৃত হইল কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর! এ এক প্রহেলিকা।

রামপ্রসাদের নিকট হইতে বঙ্গভাষা—কাব্য-সাহিত্য যখন রায়গুণাকরের কাছে পঁহুছিল, তখন গুণাকরের গুণে, ভাষা যেন filtered হইয়া, কুলুকুলুধ্বনিতে বঙ্গবাসীর মন মোহিত করিয়া আর এক স্রোতধারায় প্রবাহিত হইল; কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভাব—বিষয়-বর্ণনা সমধিক কলুষিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের কপালে কলঙ্কের ছাপ চিরমুদ্রিত করিয়া দিল। ভারতের রচনাকে একজন সমালোচক "ভাষার তাজমহল" আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিক, দু'চা'র পারসী বা উর্দ্দু শব্দ গুলা বাদ, ভারতচন্দ্রের যে ভাষা—"শব্দমন্ত্র"—সেই সুমার্জ্জিত সরল বঙ্গভাষা এখনও আমাদের আদর্শ।

সুখের বিষয়, এই সময়কার মন-মোহন কাব্যোত্থিত সর্ব্বনাশকর বাষ্প প্রায় এক শতাব্দী ঘুরিয়া ফিরিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে; অধুনা বঙ্গসাহিত্য-গগন আবিলতাশূন্য।

ভারতচন্দ্রের স্ফূর্ত্তির পরেই ইংরাজাধিকার ; ইংরাজাধিকারের প্রথমটা দোষে গুণে ভারতের সুরের রেশই ছিল, "গুপ্ত কবি"র সহিত সে তান লুপ্ত হইয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই "কবিওয়ালা" দলের আবির্ভাব ; স্বীকার করিতে হয়, ইঁহাদের গীত-প্রবাহিনীর পঙ্কিল ক্ষীণ স্রোতে সেই সাবেক মর্ম্মস্পর্শী ভাবের মাধুরী-তরঙ্গ মধ্যে মধ্যে উছ্‌লাইয়াছিল।

তারপর, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে ও আদর্শে, জ্ঞানবিদ্যার সম্প্রসারণে, বঙ্গবাসীর রুচির পরিবর্ত্তনে, কাব্য-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনে—বঙ্গকবিতা বৈচিত্র্যে, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় ভাবের সম্মিলিত প্রভায় ইদানীং বঙ্গকবিতা নূতন আশায়, নূতন ভাষায়, নূতন রঙ্গে, নূতন ঢঙ্গে, উন্নতির সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নয় শত বৎসর বঙ্গভাষার যে সাহিত্য, তাহা আদ্যোপান্ত পদ্য-সাহিত্য,—কাব্য বলা যায় ; এইটীকে আমরা ধরিব প্রাচীন ভাগ। সাহিত্য জাতীয়-জীবনের মুকুর। এই নয় শত বৎসরের বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য হইতে বাঙ্গালী-জীবনের কি পরিচয় আমরা পাই?

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ, পৌরুষের অভাব ও ভাব-রসের প্রাচুর্য্য।

বাঙ্গালী রাজপুত্র সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা পার হইয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন ; বঙ্গবাসী ভারতবর্ষের বহির্ব্বর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; বাঙ্গালী হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন—শিল্প-সাহিত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ;—এ সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা ; সে গৌরবের গীত বাঙ্গালীর নাই ; সে গীত কেহ গাহিলেও বোধ হয় বাঙ্গালীর কোমল প্রাণের সুরে মিলিত না। বৌদ্ধ-বাঙ্গালী-রাজা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন, হিন্দু-বাঙ্গালী-রাজা বৌদ্ধ-রাজাকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশের একেশ্বর অধিপতি হইয়াছিলেন ; সে বিজয়-গীত বাঙ্গালীর নাই, থাকিলেও

বোধ হয় মৃতপ্রাণ বঙ্গবাসীর ভাল লাগিত না। বাঙ্গালি-রাজা প্রয়াগ হইতে উৎকল বিজয় করিয়া দেশে দেশে স্বীয় জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন, সে বীরত্বের কাহিনী বাঙ্গালী কবি গাহেন নাই; তিনি জানিতেন সে গৌরবের গীত বঙ্গবাসীর মধুর-কোমল ধাতে মিশ খাইবে না।

যথার্থ মহাকাব্যের যে উপকরণ, তাহা আমরা উপেক্ষা করিয়াছি! কিন্তু আপন কোমল প্রাণের অনুরূপ কাব্যের যে অংশ, সেটুকু প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পরম ভক্ত, আপন ইষ্টদেবতাকে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলাইয়া চরিতার্থ হইয়াছি!

আমরা বুঝিয়াছিলাম—

"পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
এ তিন ভুবনে সার।"

আমরা সে রস "পরাণ সহিত নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি" উপভোগ করিয়াছি।

আমরা শুনিয়াছিলাম—

"চৌরি পিরিতি হোয় লাখ গুণ রঙ্গ।"

সে রঙ্গ বঙ্গ-কবি চূড়ান্তরূপ দেখাইয়া, রঙ্গকে বেরঙ্গ করিয়া ছাড়িয়াছেন! অবশ্য আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত, এই 'পিরিতি'তে 'কামগন্ধ' নাই; ইহা উপাসনা-রস—যাজন ভজন।

ব্রজের সেই নবনী-মথিত বাৎসল্য, ব্রজধামের সেই রাখাল বালকগণের সরল-মধুর সখ্য, বাঙ্গালী শুনিয়াছিল, বঙ্গ-কবি গাহিয়াছিলেন—

"দুগ্ধ স্রবি খড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম-অঙ্গ চাটে।"

বঙ্গবাসী অন্তরে অন্তরে সেই স্নিগ্ধ-কোমল ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে।

এ কথা ঠিক যে বাঙ্গালাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল সেই বৈষ্ণব-যুগে; নিরীহ বাঙ্গালীজাতির ধাতে খাপ্ খাইয়াছিল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম; বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আগাগোড়া সবই মধুর, সবই সুন্দর, সবই কোমল; ধনকুবের হইতে নিরন্ন কাঙ্গালী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী শান্তভাবে, কান্তভাবে, দাস্যভাবে, সখ্যভাবে, বাৎসল্যভাবে, যাঁহার যেরূপ

প্রাণ চায়, সেইভাবে ভজিয়াছেন ; বঙ্গীয় কবিকুলতিলকগণ অধিকাংশই এই ধর্ম্মে মাতিয়াছেন ; অগাধ সমুদ্রে গা ঢালিয়াছেন—

"পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়,
যত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি যায়।"

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আমাদের পৌরুষহীন প্রাণকে অধিকতর কোমল করিয়া বংশীধ্বনিতে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। এমনি আশ্চর্য্য, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধুরভাবে—ব্রজলীলায়—ব্রজধামের আসল বাসীন্দা যাহারা, তাহারা মজে নাই, মজিল চারি শত ক্রোশ দূরের লোক—বঙ্গবাসী !

কোমল-প্রাণ বাঙ্গালী পৌরুষের সহিত এমন ভাবে সম্পর্ক ঘুচাইল যে, শক্তিপূজায়—শক্তি-আবাহনে নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া "মা মা" রবে আব্দার জানাইয়া শক্তিহীনতার মাধুর্য্যই অনুভব করিয়াছে !

কোন কবি বলিয়াছেন, মাধুর্য্যের ভাব গীতিকবিতার সম্পত্তি ; চণ্ডী-পূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে ও স্নিগ্ধরসে সুমধুর হইয়া উঠিল, তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল। কোমল হইতে কোমলতর ধাপে আমরা নামিয়া আসিলাম। শক্তিপূজার, শক্তি-আবাহনের মূল উদ্দেশ্য দূরে রাখিয়া, শক্তিশূন্য আমরা, আগমনী বিজয়ার গানেই একান্ত মুগ্ধ ! সেই বাঁশী !

বীররসাশ্রিত রামায়ণ গাহিতেও, বাঙ্গালীর কাছে অত বড় বীরকে আমাদের মত বাঙ্গালীই বানাইতে হইয়াছে ! বাঙ্গালীর রুচি ও আদর্শের উপযোগী করা হইয়াছে বলিয়াই, ভাষা-রামায়ণ আজ পাঁচ শত বৎসর বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে আদৃত হইয়া, ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালী-কবি রামের বীরত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, নাম-মাহাত্ম্যে ভুলাইয়াছেন, গাহিয়াছেন—

"শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম,
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।"

আমরা বীরত্বের মাধুর্য্য বুঝি না ; যাহা বুঝি, দেখিয়াছি ; শত্রুর—

"অঙ্গে লেখা রাম নাম রথের চারি পাশে,
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে।"

ইহাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে! অট্টালিকাবাসী হইতে চাষাভূষা পর্য্যন্ত আমরা ইহাতেই—বীরোচিত শক্তি অপেক্ষা ভক্তি দেখিয়াই, মোহিত!

তীরধনুকের ধার আমরা ধারি না, বাঁশীই বুঝি; তাই প্রবীণ বাঙ্গালী কবি রামের মত বীরের হাত হইতে ধনুক খসাইয়া আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছেন! বিনতানন্দনের অনুরোধে রাম—

"দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমরূপ ধরে,
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।"

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই "বংশী বাজাওয়ে চিকণ কালা!" কোথায় রাম আর কোথায় কৃষ্ণ!

বলা বাহুল্য এ সকল কথা মূল রামায়ণে নাই।

আদিরস-রসিক বিলাসী বঙ্গবাসী, রাসবিহারী নটবরকেই চিনে, ব্রজের গোপালকেই জানে; নরনারায়ণের মহিমা উপলব্ধি, তাহার বোধ হয় সামর্থ্যে কুলায় না; তাই বুঝি প্রাচীন বাঙ্গালী কবি মহাভারত গাহিতে গীতা শেষ করিয়াছেন এক নিশ্বাসে, আমাদের মন হরণ করিয়াছেন সুভদ্রাহরণে!

ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী মহাভারতের মহাভারতত্ব বুঝুক আর নাই বুঝুক, পাপ পুণ্য বুঝে; তাই বঙ্গকবি গাহিয়াছেন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"

শুনিলেও যে পুণ্য! আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সস্তায় এই পুণ্য অর্জ্জন করি!

বঙ্গবাসী বুঝিয়াছিল ভক্তি কি, বঙ্গকবি গাহিয়াছিলেন—

"কাশীতে ম'লেই মুক্তি, আছে বটে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে, বীর্য্যের পথে লইয়া যায় নাই; বরং কর্ম্মে ঔদাসীন্য শিখাইয়া দেবতার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেই শিখাইয়াছে।

ইহা অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের এই বাঙ্গালী-চরিত্র উত্তেজনা-শূন্য ; যথার্থ মহাকাব্য যাহাকে বলে, উত্তেজনা না থাকিলে সম্ভব নয় ; এই জন্যই বোধ হয় বঙ্গসাহিত্যে—বিশেষতঃ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যথার্থ মহাকাব্য নাই। আয়তন হিসাবে কিম্বা অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী 'মহাকাব্য' মিলিতে পারে, কিন্তু মনে হয় না কি সেটা 'মহা' শব্দের অপব্যবহার ?

রসজ্ঞগণ বলেন,—সৃষ্টিকৌশল, উদ্ভাবনী-শক্তি কবির প্রধান গুণ ; রসের উদ্দীপন কবির আর একটি গুণ। মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহার চিত্তবৃত্তি ; সেই চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয় ; সেই বেগের সমুচিত বর্ণনা দ্বারা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য ; সেই সৌন্দর্য্য হইতে রসের উদ্দীপন হয়,—পাঠকের মনে নানা ভাবের আবির্ভাব হয়।

আমাদের বাঙ্গালী কবির সৃষ্টি-ক্ষমতা, আমাদের কবিগণের রসজ্ঞান—পাঠকের মনে রস-বিশেষ উদ্দীপন করিবার সামর্থ্য, ঘটনাপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে মনুষ্য-হৃদয় বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি, মানব-হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, কতকটা সীমাবদ্ধ ; বহির্জগতের জ্ঞানও বোধ হয় সঙ্কীর্ণ।

পরাধীন, উদ্যমহীন জাতি আমরা, আমাদের কবি আদিরস, করুণরস, শান্তরস সংক্রান্ত কোমল বিষয়ের বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ; কিন্তু যাহাতে হৃদয়ের তেজ প্রকাশ পায় এমন কিছু—হাস্য-বীর-ভয়ানক-রসে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে বঙ্গকবির সমস্তই অদ্ভুত-রসে পর্য্যবসিত হয়। অবশ্য প্রাচীন কবি-দিগের কথাই আমি বলিতেছি।

বঙ্গ-কবির পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, শোক, বৈরাগ্য, ভক্তি বর্ণনা মনোরম; বঙ্গকবির কুটির, উপবন, বসন্ত বর্ণন সুন্দর ; কিন্তু গভীর বা উন্নত ভাবের অবতারণা করিতে হইলে বাঙ্গালী কাঙ্গালী। যুদ্ধ, বীরত্ব, আত্মত্যাগের বর্ণনায় বঙ্গকবি সক্ষম নহেন ; পর্ব্বত, সমুদ্র বর্ণনা বঙ্গকবির নাগালের ভিতর আইসে না। বাক্‌পটু কাশীদাস এক একবার মাথা ঝাড়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু স্বীকার করিতে হয়, আধুনিক বঙ্গকবিগণ এ সকল অভাব অনেকটা ঘুচাইয়াছেন।

আমরা এই বাঙ্গালী জাতি কতকটা কূপমণ্ডুকধর্ম্মী; আমাদের কবি আপনার গ্রামের, আপন পল্লীর, আপন গার্হস্থ্য-জীবনের, সংসারের দৈনন্দিন ঘটনার নিখুঁৎ ফটো তুলিয়া দিতে পারেন; কিন্তু বাহিরের কিছুর সংস্রবে আসিতে হইলেই "হালে পানি মিলে না।" গৃহের প্রাঙ্গন পার হইতে গেলেই বাঙ্গালী কবির কল্পনা "দুর্ব্বলপদ শিশুর মত টলিয়া পড়ে।"

প্রাচীন বঙ্গকবি বঙ্গরমণীর ঘাটের বাটের কাহিনী, বঙ্গরমণীর পতিনিন্দা, বঙ্গরমণীর সপত্নীকোন্দল, বাঙ্গালী গৃহের বারমাসী বিবর্ধণ, সমাজের দলাদলি গালাগালি প্রভৃতি পল্লীচিত্র যথাযথ আঁকিতে পারেন। বাঙ্গালী-ঘরের কচি মেয়েটির বিবাহের পর শ্বশুরালয়-যাত্রার কথায়, মেনকা রাণীর নিকট হইতে উমাদেবীর বিদায় গ্রহণের দৃশ্য উদ্ভাসিত করিয়া বঙ্গ-কবি লোকের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে পারেন; ইষ্টদেবতার প্রতি অন্ধভক্তির আবদার গঞ্জনা শুনাইয়া পাষণ্ডের প্রাণও গলাইতে পারেন।

আমাদের কবি নিজ পাড়ার ভাঁড়ুদত্ত—

"ফোঁটাকাটা মহাদম্ভ ছিড়া যোড়া কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান,"

কিম্বা নিজ গ্রামের দুঃশীল বেণিয়া—

"মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে কড়ির ঝুলি.
হড়পী নিথুতি লয়্যা হাতে,"

এমন সব জীবন্ত চিত্র দেখাইতে বিলক্ষণ পটু।

বঙ্গকবি—

"যেই ঘরে দু সতীনে না হয় কন্দলি,
সেই ঘরে দাসী বৈসে বড়ই পাগলি,"

এমন একটা ঘরভাঙ্গানী দাসী,—কিম্বা

"আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে,
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে,"

এমন একটা আধাবয়সী বাজারের মালিনী আঁকিতে আশ্চর্য্যরূপ নিপুণ। অথবা—

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায় পড়ে,
আলুথালু কবরী বন্ধন,
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাত নাড়া ঘন ডাক
চমকে সকল পুরজন।"

এমন একটা গেরস্থারী গিন্নিবান্নি মানুষ আঁকিবেন হুবহু।

আমাদের কবি আপন হাট বাজারের, চণ্ডীমণ্ডপের, ঘরকন্নার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়া, এমন কি গাছপালা, পশুপক্ষী, জাতিধর্ম্ম, আহারব্যবহারের খুঁটিনাটিতে আমাদিগকে চমৎকৃত করিতে পারেন; কিন্তু একটু গণ্ডীর বাহির যাইতে হইলেই বঙ্গ-কবির কল্পনা অন্ধকারে হাৎড়াইয়া হাস্য রসেরই উদ্রেক করে। তখন আমাদের কবি খেলাঘরের রাজা, খেলাঘরের রাজপুত্র, খেলাঘরের সওদাগর লইয়া যেন শিশুর মত, খেলাঘরের খেলা খেলিতে থাকেন।

নিজের গ্রামের নদীটুকু বাহিয়া বেশীদূর যাইতে হইলেই কাঁকড়াদহ, সর্পদহ, শঙ্খদহ, কুম্ভীরদহ থাকে থাকে সাজানো! দরিদ্র বঙ্গকবি—

"ভেরাণ্ডার থামে—ভাঙ্গা কুঁড়িয়া তালপাতার ছাওনি"

বর্ণিতে পারেন বেশ, কিন্তু ক্ষুদ্র জমীদারের সভা বর্ণনা করিতে হইবে ত শাহেন শা বাদশাহের দেওয়ানী আম্ বা কোথায় লাগে! যথাযথ বর্ণনা যে কোথাও নাই, এ কথা বলিতেছি না। কৃত্তিবাসের রাজা মাদুরে বসিয়া মাঘ মাসে রোদ পোহাইতেন।

বাঙ্গালী-কবি ব্যাধ-নিতম্বিনী গড়িতে পারেন খুব ঠিক, কিন্তু বড়ঘরের ঝি-বউ গড়িতে গেলে কষ্টকল্পনার সাহায্যে বিকৃত চরিত্রেরই সৃজন করিয়া বসেন।

বিদেশে সওদাগরী করিতে গেলেই তাঁহার আশা—

"মূলার বদলে গজদন্ত,"—কিম্বা—

"শুকুতি বদলে মুকুতা পাব, ভেড়ার বদলে ঘোড়া।"

বঙ্গকবিকে জুয়াচুরীর নমুনা দিতে হইবে ত "অষ্টপণ আড়াইবুড়ী কড়ি"

হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে "সাত কোটি টাকা!" রূপ দেখাইতে হইবে ত—

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা,
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।"

সাবেক ধারণা অনুসারে বোধ হয় বিকট অতিরঞ্জনই প্রকৃত কবিত্ব; তাই বোধ হয় সূর্য্যদেবকে পবন-নন্দন বগল-দাবায় পূরিতে পারিয়াছেন!

আমাদের কবি আপন বাগান খানির ছবি দিবেন সুন্দর—

"নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ে বৈসে অলিকুল
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥"

কিন্তু রাজপুত্রের বর্ণনা করিতে হইলে, আবার তাঁহাকে যদি নায়িকার সন্ধানে বাহির হইতে হয়, তাহা হইলে—

"কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ,
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ!"

ঘরের বাহির হইতে হইলেই চাই পক্ষীরাজ ঘোড়া!

এমন সব কথা অন্য সাহিত্যে—কবিতায় যে নাই এ কথা আমি বলি না; কিন্তু এ সকল শোভা পায় বহু প্রাচীন সাহিত্যে, বহু প্রাচীন কালের বর্ণনা-পটে বা চরিত্র-চিত্রণে।

বঙ্গ-কবি কখন কখন মনোহর বর্ণনার মধ্যে খামকা বিকট অদ্ভুত-রসের অবতারণা দ্বারা অনেক স্থলে সৌন্দর্য্যকে চাপা দিয়া ভিন্ন প্রকার বিস্ময় রসের আবির্ভাব করাইয়া বসেন। অমন সুন্দর কমলেকামিনী—একে ত অলৌকিক ব্যাপার, না হয় হইল দৈবকাণ্ড বা মায়া; তার উপর "শশীমুখীর" হস্তীগ্রাস ও উদ্গীরণ সৌন্দর্য্যকলার কোন পর্দা? আমাদিগকে কোন রসে নিমজ্জিত করে?

বলিয়া রাখা ভাল, মুকুন্দরাম এ বিষয়ে পূর্ব্বকবির অনুগামী। ভারতচন্দ্র "তারে বাড়া" কবি, সুতরাং তিনি আরও এক পৈঠা উপরে উঠিয়াছেন—

"আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর
ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করিবর।"

স্রোতের জল, তায় ভাসিতেছে পদ্ম, তার উপরে ভ্রমর, ভ্রমরের ছয় পায়ে ছয় হাতী! অবশ্য কবির সাত খুন মাপ। কিন্তু সৌন্দর্য্যের কথা হইতেছে।

বঙ্গ-কবি সকলের চেয়ে মাটী করিয়াছেন বীররস-বর্ণনায়। বঙ্গকবির বীরের রণ-রঙ্গে "লাখ লাখ অস্ত্র" আছে; "অযুত অযুত হাতী ঘোড়া" আছে; "বারান্ন হাজার ঢালী"ও থাকে; "ব্যাল্লিশ বাজনা"ও বাজে; যোদ্ধার পায়ে "বাজন নূপুর"ও বাদ যায় না; লম্ফ ঝম্ফও কম নহে; কিন্তু নাই কেবল আসল জিনিষটি—বীরত্ব। বঙ্গকবির বীর খাইবার সময়—"ছোট গ্রাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল," কিন্তু কাজের বেলায়—

"খুল্লনার কথা শুনি হিতাহিত মনে গণি
লুকাইছে বীর ধান-ঘরে!"

তখন স্ত্রীর উপদেশ, স্ত্রীর অঞ্চলই সার—অসার খলু সংসারে।

কৃত্তিবাসে যুদ্ধক্ষেত্র সঙ্কীর্ত্তনের আখড়া বিশেষ; কাশীদাসে স্থলে স্থলে বর্ণনা গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক হইলেও লক্ষ্যভেদের পর প্রপলায়মান সৈন্যদিগের সুন্দর অবস্থা পড়িলে বুঝা যায়, আমরা যুদ্ধের কোন অংশে দড়।

একখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে—দেবী চণ্ডী যুদ্ধে দৈত্য বধ করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে সহচরীগণের নিকট হইতে একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন!

বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব এইখানেই; এই জন্যই "ভারত-উদ্ধার" কাব্যও লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে না। এখনকার কালে এমন সব কথা ভয়ে ভয়েই বলিতে হয়। মনে রাখিবেন, আমি কবির চিত্রিত চরিত্রের কথাই বলিতেছি; সীতারাম প্রতাপাদিত্যকে ভুলি নাই।

দেবচরিত্র-চিত্রণে দেবত্ব বঙ্গকবি একেবারে মোটেই দেখাইতে পারেন নাই। ষড়রিপুর স্থলে ছত্রিশ রিপুর বশীভূত করিয়া বঙ্গকবি দেবতা গড়িতে অনেক স্থলে যাহা গড়িয়াছেন, তাহা মুখে উচ্চারণ না করাই শ্রেয়। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে মহাদেবকে আসল চাষা, দেবীকে বাগ্দিনী

তোমিনী গড়িয়া দেবদেবীর শীলতাবর্জ্জিত রসালাপ (?) বর্ণনে হিন্দু-কবি যে কি হিন্দুত্ব ফলাইয়াছেন স্থির করা কঠিন। ধর্ম্মসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী, কবির সে কাব্যসকল দেব-দেবীর সংক্রান্ত বলিয়া ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকে; দেব-চরিত্রে মহত্ত্বহীনত্বের তোয়াক্কা রাখা আবশ্যক মনে করে না।

বঙ্গকবি উদারচরিত্র মহৎচরিত্র আদর্শচরিত্র নায়ক আঁকিতে অপটু; কিন্তু কোমল-প্রকৃতি বাঙ্গালী কোমলতর নারী-চরিত্র চিত্রণে অসাধারণ দক্ষ। বোধ হয় এ বিষয়ে বাঙ্গালী-কবি জগতের কোন কবির সহিত তুলনায় ন্যূন নহেন।

রমণী-চরিত্র হিসাবে আমরা যাহা চাই, তাহার উদাহরণ দেখাইতে জনৈক পণ্ডিত যথার্থই বলিয়াছেন—"স্ফীতপলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃত পতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ও নির্ভয়মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।"

জানি না এ দৃষ্টান্তে এখনকার এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দিনে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন কি না!

মানিতেই হয়, বাঙ্গালী কবির পুরুষ-চরিত্র যতই অনুন্নত ও বিকৃত হউক না কেন, নারী-চরিত্রের সহিষ্ণুতা, নারী-চরিত্রের পবিত্রতার চিত্র, এখনও পুরাণ-কথিত রমণী-শিরোমণিগণের আদর্শ ভ্রষ্ট হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে—বঙ্গীয় কাব্যে গার্হস্থ্য জীবনের ত্যাগস্বীকার ও রমণীর সতীত্বের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সততই প্রকটিত দেখা যায়। যেখানে ব্যতিক্রম, সেখানেই কবির অপযশ। তাই আজ ভারতচন্দ্র অত বড় কবি হইয়াও নিন্দাভাগী—"grossly indecent." কিন্তু ভারতচন্দ্র চরিত্র-চিত্রণের জন্য যতটা না হউন, বিকৃত বর্ণনার উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই অপরাধী অধিক।

প্রাচীন সাহিত্যের কথাই এতক্ষণ বলিলাম; ভারতচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের গণনীয় কবিগণের মধ্যে শেষ কবি। আমি দোষের দিকই

দেখাইয়াছি; স্বীকার করি দোষ অপেক্ষা বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে গুণের ভাগ অধিক।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ত্রুটি মালিন্য, প্রাচীন কবিগণের ন্যুনতা বোধ হয় আধুনিক কবিগণ অনেকাংশে ঘুচাইয়াছেন। কল্পনার উদ্দাম ক্রীড়া মধুসূদন দেখাইতে পারিয়াছেন; দেব-চরিত্রের মহত্ত্ব-গাম্ভীর্য্য হেমচন্দ্র ফুটাইতে পারিয়াছেন; বীরের প্রকৃত প্রকৃতি নবীনচন্দ্র আঁকিতে পারিয়াছেন: বিমল হাস্যরসও কাজী সাহেবের কলমে দেখা দিয়াছে; অন্তরের নিগূঢ় ভাবের অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের হাতে "মুক্তার মত জমিয়া টলটল" করিতেছে;—বঙ্গীয় কাব্যে অধুনা "ভাবের সম্মিলিত সহস্র ঝরণায় ঝরিয়া" পড়িতেছে!

কিন্তু আধুনিক কবিগণের সহিত প্রাচীন কবিগণের তুলনায় সমালোচনা, কতকটা বোধ হয় ঠিক নহে। প্রাচীন বঙ্গকবিগণের জ্ঞানের পরিসর ছিল অল্প; সংস্কৃত-সাহিত্য ভিন্ন অন্য কিছু তাঁহাদের জানিবার শুনিবার উপায় ছিল না; যাহা জানা ছিল তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে, বোধ হয় কেবল পৌরাণিক অংশ এবং সে টুকুও পর-প্রসাদাৎ। আধুনিক কবিগণ সে হিসাবে অধিকতর ভাগ্যবান; একে ত তাঁহারা স্বয়ং সংস্কৃত সাহিত্যে রসজ্ঞ, তাহার উপর ইংরাজের কৃপায় জগৎ-সাহিত্য এখন তাঁহাদের করায়ত্ত। হোমার-ভার্জ্জিল, ডাণ্টে-গেটে, সেক্সপীয়ার-মিল্‌টন্, বায়রণ-সেলী, এখন তাঁহাদের কবিত্ব-প্রতিভা উদ্দীপিত করিতে সহায়তা করে। ইহার উপর আবার শিক্ষা-দীক্ষার প্রভেদে আমাদের রুচিরও পরিবর্ত্তন, হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অবশ্য কেহ কেহ তর্ক করিতে পারেন—

"কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!"

এ কথার উত্তর চলে না।

যাহাই হউক, বঙ্গীয় কাব্যের দিন ফিরিতেছে, মনে হয়। যদিও অক্ষকুলবধূর ডরে আতঙ্কিত "ভিখারী রাঘব"কে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই; সর্ব্বত্যাগী লক্ষ্মণকে "বীরকুলগ্লানি" চিত্রিত দেখিয়া সন্তপ্ত হই; চন্দ্রের তারাকে "বীরাঙ্গনা" শুনিয়া ক্ষুব্ধ হই; যদিও দেবেন্দ্রাণী শচীর প্রতি বীর

রুদ্রপীড়ের ব্যবহার, দেবরাণীর উদ্দেশে দৈত্যরাণীর পাদোত্তলন দেখিয়া মর্ম্মাহত হই ; যদিও আমরা সুলোচনা-কৃষ্ণ-রঙ্গ শুনিয়া বিরক্ত হই ; ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি অযথা আক্রমণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হই ; সুভদ্রাকে অভিমন্যুকে রণক্ষেত্রে আহত সেবায় নিযুক্ত দেখিয়া স্পষ্ট বিদেশীয় ভাবের আঘ্রাণ পাই ; যদিও আমরা আজ এই নৈতিক উন্নতির ধূয়ার দিনে, সময়ের শ্রেষ্ঠ কবির মুখে—

"ফেল গো বসন ফেল ঘুচাও অঞ্চল,
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ !"

শুনিয়া চমকিয়া উঠি ; তথাপি আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের, বর্ত্তমান যুগের কবিতার, সুপ্রস্ফুট বিকাশ দেখিয়া কোন্ বঙ্গবাসীর প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া না উঠে ? সোণার তরী এ কূলে ভিড়িতেছে মনে হয়।

প্রমীলার তেজস্বীতা, বীরাঙ্গনার হৃদয়োচ্ছ্বাস, ইন্দুবালার কমনীয়তা, মহাসতীর লীলাকাহিনী, নারায়ণের মহাভারত, শৈব্যার আত্মত্যাগ, উত্তরার অশ্রুধারা ভগ্ন হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস, প্রেমিকার মর্ম্মব্যথা যখন আমাদের মানস পটে উদয় হইতে থাকে, তখন আমাদের কাব্য রস-তৃষাতুর প্রাণ কোন্ আশায় আশান্বিত না হয় ?

কে বলিতে পারে স্বল্পকালের ভিতর বঙ্গের মেদুর কাব্য গগনে, সহসা কোন ভাস্বর মহাজ্যোতিষ্ক আবির্ভূত হইয়া কবিতা-কিরণে বঙ্গবাসীর মুখ উজ্জ্বল করতঃ জগতের মহাকবিপুঞ্জ মধ্যে গৌরবের স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে না ?

"কবি" কাহাকে বলে ? কবিত্ব বা কাব্য কি, এখন দেখা যাউক। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে পণ্ডিতমাত্রকেই কবি বলিত। আদিগুরু বাল্মীকিও কবি, মন্ত্রজ্ঞানী শুক্রাচার্য্যও অভিধানে কবি। শাস্ত্রবেত্তাগণ সকলেই কবি। ধর্ম্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞও কবি ; আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রবিদ্ ত "কবিরাজ !" বাত-পিত্ত-কফের সহিত কবিতার কি সম্পর্ক, বুঝিয়া উঠা কঠিন।

তার পর 'কবি' শব্দের অর্থে কতক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মনে হয়।

"কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ" বচনটার কাব্যের আইন-সঙ্গত গ্রন্থ লিখিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না তাহারই যেন হয় আভাস। কিন্তু

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥"

এখানে কালিদাস অপেক্ষা মাঘকে বাড়াইতে গিয়া কবি ও কাব্যের এক বিষম সমস্যা দাঁড় করান হইয়াছে।

আমাদের এই বঙ্গদেশে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে চীৎকার (শ্রীবিষ্ণু—সঙ্গীত) করতঃ পরস্পরের বাক্-চাতুর্য্যের উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন; সেই বাক্-লড়াইএর নাম ছিল "কবি"। ইহার এক অংশ "দাঁড়া-কবি" এবং আবার এক অপকৃষ্ট অংশের নাম ছিল "ঝুমুর-কবি"। কবি নানাবিধ; কিন্তু প্রকৃত কবি বলে কাহাকে?

যে কবি সম্বন্ধে বাঙ্গালী গাহিয়াছেন—

"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।"—

তিনি—উন্মাদ-পাগল, প্রেম-বিহ্বল ও কবি—এই তিনকে একসূত্রে গাঁথিয়া পরিচয় দিয়াছেন—

"The lunatic, the lover, and the poet
Are of imagination all compact.
• • • • •
The poet's eye in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth,
from earth to heaven;
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name!"

এ পরিচয় ভারি উঁচু সুরে বাঁধা। কিন্তু যে জাতির কবি দেখা ইয়াছেন—

"অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
কামিনী কমলে রবি সংহারে বারণ॥"

যে জাতির কবি এমনী চরিত্রও আঁকিয়াছেন, যাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে—

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ,
ধরে দিতে পারি চাঁদ।"

সে জাতির কবি উদ্ধৃত পরিচয়ের যোগ্য কি না, দেখিতে কৌতুহল হয়।

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন তাঁহার রচনায় অন্য গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসার কিছু নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের অধিকাংশই পুরাণেতিহাসের পদ্যে অনুবাদ বা গ্রাম্য উপন্যাসের কবিতায় আবৃত্তি। প্রায় সমস্তই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। সে কালের কবিগণের প্রচলিত আচার ব্যবহার বা বিশ্বাস-ধারণার বাহিরে যাইবার যো ছিল না; ইহাতে সৃষ্টি-ক্ষমতা বিকাশের অবসর অল্প। কিন্তু আখ্যানবস্তু পুরাতন হইলেও বাঙ্গালী কবি ইহার ভিতরও নূতন কথা পাড়িয়া, নূতন চরিত্র সৃজিয়া নানা কৌশলে উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় যে না দিয়াছেন এমন নহে।

আধুনিক কবিগণ প্রসার পাইয়াছেন বেশী, ক্ষমতা দেখাইতে পারিয়াছেনও বোধ হয় অধিক। সুবিজ্ঞ সমালোচকেরা কেহ কেহ কিন্তু বলেন—সাবেক কবিগণের বিষয়-প্রসার সঙ্কীর্ণ, কবিত্ব প্রগাঢ়; আধুনিক কবিগণের ইহা বিপরীত।

ভাবগ্রাহী সমালোচকগণের মতে—কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী ও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হওয়া চাই। এইখানেই বাঙ্গালা কাব্যে একটু গোলযোগ আসিয়া পড়ে। বাঙ্গালী কবি যতক্ষণ গণ্ডীর ভিতর থাকেন, ততক্ষণ স্বভাব ও সৌন্দর্য্যের দিকে খর দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু বাঁধাবাঁধি গণ্ডীর বাহিরে গেলেই বাঙ্গালী কবি দারুণ অস্বাভাবিকতায় বিকৃত সৌন্দর্য্যেরই সৃষ্টি করিয়া বসেন। এ কথা প্রাচীন কবিদিগের প্রতি যতটা খাটে আধুনিকগণের সম্বন্ধে তত নহে।

বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান কবি গাহিয়াছেন—

"সেই কবি মোর মতে, কল্পনা-সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,—
অস্তগামী ভানু প্রভা সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।
আনন্দ আক্ষেপ ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে;
মরুভূমে তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে!"

এখানে দেখা যাইতেছে, অস্বাভাবিকতাই কবিত্ব; অথবা ঠিক তাহা নহে; অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিকতাতে পরিণত করিতে পারাই যথার্থ কবিত্ব। ইহা যার তার কাজ নহে। সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে যদি এই কঠিন পরিচয়ের যোগ্যপাত্র কেহ থাকেন, তাহা হইলে এই কবিস্বয়ং। সেইজন্যই ত মাইকেল মধুসূদন বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি।

আর কবিত্ব কি?—অবশ্য শুধু উদ্দাম কল্পনাই কবিত্ব নহে; মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল গম্ভীর উন্নত অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে ব্যক্ত করাই কবিত্ব।

আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালী কবি এই কোমল ভাবটুকুই ধরিতে পারিয়াছেন ঠিক; গম্ভীর ভাবও ধরি ধরি করিয়াছেন; উন্নত ভাবটা ধরিতে পারেন নাই। সাবেক কবিরা ত আদবে পারেন নাই, আধুনিক কবিগণ কতকটা পারিয়াছেন।

পৌরুষ-সম্পর্ক-হীন কোমল-প্রাণ আমরা,—আমাদের কবি দুঃখের কবি। হৃদয়ের অব্যক্ত দুঃখ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যেখানে, সেইখানেই বাঙ্গালী কবির কবিত্ব ফুটিয়াছে সুন্দর,—কি সেকালে, কি একালে।

জনৈক শ্রেষ্ঠ ইংরাজ-কবি গাহিয়াছেন—"Our sweetest songs

are those that tell of saddest thought," তাই বাঙ্গালীর কবিতা এত মিঠা!

বাঙ্গালী চিরদুঃখী, দুঃখের গান বাঙ্গালীরই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় গাহিতে পারিয়াছেন; এইখানেই বঙ্গ-কবি প্রকৃত কবি।

হিন্দু বাঙ্গালী-রমণী চিরদুঃখিনী, তাই রমণী-চরিত্র-চিত্রণে বাঙ্গালী সিদ্ধহস্ত।

এই কারণেই বাঙ্গালীর হাতে মিলন অপেক্ষা বিরহ খুলিয়াছে ভাল। বঙ্গসঙ্গীতে মিলন—বঙ্গ-সাহিত্যে মিলনান্ত কাব্য থাকিলেও বুঝা যায়, আমোদ আহ্লাদের মধ্যেই অন্তরে অন্তরে ফল্গুনদীর মত শোকের ধারা বহমান; সুখের ক্ষণস্থায়ীত্বে চিত্ত সদাই সন্দিহান। কি কবিকঙ্কণ, কি ভানুসিংহ সর্ব্বত্রই তাই।

ভারতচন্দ্র ভিন্ন সুর ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে,—তাঁহার "খেঁড়ুর" গুণে, বোধ হয় জগতের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হইয়া আছে।

পর-পদানত, পর-নিগৃহীত, সামাজিক নানা শৃঙ্খলে চির-শৃঙ্খলিত আমরা, নানাবিধ দুঃখে আমাদের মন পূর্ণ; দুঃখের বর্ণনাই আমাদের মনের মত হয়; আমাদের প্রাণের তন্ত্রীতে বাজে, তাই দুঃখের কবিতা হইতেই আমরা স্ফূর্ত্তি পাই, তাহাতেই আমাদের চিত্তরঞ্জন হয়। পাঠকের চিত্তরঞ্জনই ত কাব্যের প্রাণ।

কাব্যের জন্যই কবির আদর; সুকাব্য সচরাচর জন্মায় না; প্রকৃত কবি সুলভ নয়। প্রতিভা না থাকিলে কবি হওয়া যায় না; প্রতিভা—অসাধারণ মানসিক ধর্ম্ম,—দেবী যাহাকে তাহাকে কৃপা করেন না। তাই বুদ্বুদের মত রাশি রাশি কাব্যলেখক আবির্ভূত হন, বুদ্বুদের মত অচিরকাল মধ্যেই কাব্য সহিত মিলাইয়া যান—টিঁকিয়া থাকা শক্ত।

প্রতিভাবান কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসই যথার্থ কবিতা; প্রকৃত কবির রচনাই যথার্থ কাব্য; ছন্দোবন্ধে কতকগুলা বাক্য রচনাই কাব্য নহে। কিন্তু বাক্যও চাই; সুশব্দও উৎকৃষ্ট কবিতার অঙ্গ। উৎকৃষ্ট কাব্যের ভাষাও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

সংস্কৃত শাস্ত্রে বলে—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"—রসাত্মক বাক্যই কাব্য।

ভাষা ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদি লইয়া কবিতার বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি গঠিত হয়। ছন্দ ও পদ কবিতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার—বাহ্যিক চটক।

নারীর প্রথম আকর্ষণ যেমন রূপ, কাব্যের প্রথম আকর্ষণ তেমনি তাহার ভাষা। ভাষার মাধুর্য্যে প্রথম আকৃষ্ট না হইলে পাঠক শীঘ্র কাব্য মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহেন না। যে ভাষাতে ভাবের ছায়া লক্ষিত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট ভাষা। ইংরাজীতে ইহাকে বলে "ভাবের প্রতিধ্বনি"।

একই কথা, প্রকাশ করিবার ভাষার তারতম্যে কি তফাৎ শুনায়!

গল্প আছে, সভার দুই রত্নের পার্থক্য বুঝিবার জন্ত রাজা বিক্রমাদিত্য পথে যাইতে যাইতে, সম্মুখে একটা মরা গাছ দেখিয়া বররুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কি?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন—"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।" রাজা কালিদাসের দিকে চাহিলেন; কবি ভাবিলেন—

"নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি।"

একই ত কথা, কিন্তু প্রকাশ করিবার ক্ষমতার কি প্রভেদ! কবির ভারতী শুনিবামাত্র অন্তরে যেন তড়িৎ সঞ্চার হয়।

আমাদের কবিগণের একজন গাহিয়াছেন—

"কোকিলে কুহু বলে, উহু প্রাণ হহু জ্বলে";

অন্ত একজনের দেখিয়াছি—

"আজি কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে পিক কুহু কুহু গায়!
না জানি কিসের তরে প্রাণ করে হায় হায়!"

তুচ্ছ বিষয়, সকলই কবি-লেখনী-নিঃসৃত, কিন্তু প্রকাশ করিবার ক্ষমতার অল্লাধিক্যে কি আশ্চর্য্যরূপ বিভিন্ন মনে হয়! বর্ষাবর্ণনায় এক কবি গাহিলেন—

"ভেক করে মক্ মক্";

আর একজন গাহিয়াছেন—

"বাঙ ডাকে ব্যাঙ করে ব্যাঙ [illegible]!"

অপর একজন গাহিয়া গিয়াছেন —

"মত্ত দাহুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া!"

ব্যাঙের ডাকেও ছাতি ফাটে!

যথার্থ কবির হাতে পড়িলে ভাষার গুণে সামান্য বিষয়ও কি সুন্দররূপে ব্যক্ত মনে হয়!

"কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
কতক্ষণ ঝুড়ি চাপা থাকয়ে বানর।
কতক্ষণ মিথ্যা করে সত্যকে অন্তর॥"

ভাবুকগণ ইহার মধ্যে কবিত্ব রস না পাইতে পারেন, কিন্তু ইহা নীরস নহে। পদ্য হইলেই কবিতা হয় না; পদ্য না হইলেও গদ্যও "কবিতা" পদবাচ্য হইতে পারে। "কমলাকান্ত" পদ্য নহে, কিন্তু ভাষার চমৎকারিত্বে (ভাবের গুণে) তাহাকে কাব্যশ্রেণীভুক্ত করা যায়; আর

"ঈশানের উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥"

এ জাতীয় রচনা রীতিমত পদ্য, কিন্তু কোন পুরুষে কবিতার ভাষা নহে।

"তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন,"

কিম্বা

জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ,"

অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদাহরণ রূপেই শোভা পায়।

"শিরে হানি পাণি রাণী বলে কর কি।
শুন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝি॥"

সুকবির রচনা হইলেও মনে হয়, এ সকল শুধু শব্দের জিম্‌ন্যাষ্টিক্।

বিষয়ের গুরুত্ব সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ কবির রচনায়—

"বলম্বা অম্বরে তাম্র——"

অথবা

"যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে,"

শুনিলে আমাদের ডরাইয়া উঠিতে হয়।

"দ্বিকর-কমল, কমলাক্ষি-তল, ভুজ কমলের দণ্ড"

ভাষার উপর জবরদস্তী গোছ দেখায়। কিন্তু আর একজনের হাতে এইরূপ শব্দ-সংঘাতই কি সুন্দর শুনাইয়াছে!

"লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥"

শুনিলে মনে হয় না কি ইহাকেই বলে ভাবের প্রতিধ্বনি?

ভাষা সহজ হইলেই কবিতার ভাষা, নহিলে নয়, এমন কথা নাই; ভাবের মাধুর্য্যও চাই;

"এক ফুলে মকরন্দ পান করি সদানন্দ
ধায় অলি অপর কুসুমে।
এক ঘরে পেয়ে মান গ্রামযাজী দ্বিজ যান
অন্য ঘরে আপন সম্ভ্রমে॥"

পড়িলে কাহার না মনে হয় সুন্দর কবিতা?

একই বিষয়, সরল ভাষায় ব্যক্ত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে পড়িয়া ভাবের তারতম্যে কি তফাৎ মনে হয়!

"পতি-শোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে,
আহা আহা হরি হরি উহু উহু মরি মরি
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই!"

পড়িতে পড়িতে বাহ্যিক কাতরতাই বেশী দেখা যায়; সেই স্থলে—

"মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক জীয়ে
আমি মরি তোমার বদলে।"

পড়িলে কাহার না মনে হয়, ভাবের গুণে ইহাই অধিক আন্তরিকতা-ব্যঞ্জক? সমধিক মর্ম্মস্পর্শী।

সুন্দরীর সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু, আশে পাশে চুলগুলি উড়িতেছে, দেখাইতেছে—

"রাহুজিহ্বা নাড়ে যেন চন্দ্রে গিলিবারে!'

ইঁহাই ত কবিতা!

স্বভাব-বর্ণনায়—

"টলটল করে জল মন্দ মন্দ বায়।"

পড়িলে মনে হয় না কি, একটি মাত্র সহজ সরল লাইনে একটা সমগ্র সুন্দর দৃশ্য নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল? ইহাকেই ত বলে যথার্থ কবিতার ভাষা।

"মনে রৈল সই মনের বেদনা;
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হল না!"

ভাষার কারিগরী না থাকিলেও, ভাবের গুণে সরল অব্যক্ত ভাবেই হৃদয়ের কাতরতার কি আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি!

শ্রেষ্ঠ কবির হাতের হইলেও অবশ্য—

"টানিল হুড়কা ধরি হুড় হুড় হুড়ে"

আমাদের কর্ণ-বিবরে পটহ-ধ্বনি করিয়া মেজাজ বিগড়াইয়া দেয়। কিন্তু শব্দের কটমটত্ব থাকিলেই সকল স্থলে কবির ভাষা নিন্দনীয় নহে।

"কূর্ম্ম কমঠী কূট উল্টীতে লটপট
লোহিত তৃষাতুর সম্পুট খুলিছে!"

অবস্থা বিশেষ বর্ণনায় সুন্দর ভাষা বলিতে হয়। প্রাচীন কবির হাতে—

"বুদ্ধিমান হৈয়ে জ্ঞান হারালি হতভাগা।
শিরে কৈলে সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা॥"

দেখিলে আমরা বিস্মিত হই না; কিন্তু এখনকার কালে কাব্যে "থুক্ থুক্ থক্ থক্" কিম্বা

"ভগবান মুণ্ড খান তোমার ভক্তির শতবার"

প্রকৃত কবির লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে দেখিলে আমরা মুখ না বাঁকাইয়া থাকিতে পারি না।

প্রাচীন রচনায় স্থলে স্থলে বিষয়-বর্ণনা বা ভাষা গ্রাম্যতা-দোষ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারা যায়, কিন্তু এখনকার দিনে পরিমার্জ্জিত রুচি ও শোভন ভাষা আমরা আশা করিয়া থাকি।

অনেক স্থলে দেখা যায়, ভাব বা অর্থের কুল-কিনারা নাই, কিন্তু ভাষা ও পদের মিল বেশ—

"শান্তিপুরে খাসা খই
বর্দ্ধমানের বসা দই
বঁধু আমি তোমা বই
আর কারো নই।"

আমাদের কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির রচনা হইতেও এই ধাতের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। স্বীকার করিতে হয়, সে সকল কবিত্বও নয়, কবিতার ভাষাও নহে।

ভাষার অপ্রাঞ্জলতার জন্যই "ছুচ্ছুন্দরী"র আবির্ভাব, ভাবের অতলস্পর্শতার জন্যই "রাহু"র অভ্যুদয়।

বিদেশী কবি Popeএর একটা উক্তি আছে—

"I lisped in numbers, for the numbers came."

ঘুমাইয়া ঢুলিয়া পদ্য লেখা যাইতে পারে, কবিতা তাহার ত্রিসীমাবর্ত্তী হন না। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য, ভগবানদত্ত ক্ষমতা না থাকিলে চেষ্টাচরিত্র করিয়া কোন ব্যক্তিকে কথার মিল জুটান যাইতে পারে সুন্দর, কিন্তু কবিতা-সুন্দরী তাহার ছায়াও মাড়ান না। অনেক পদ্যের ছন্দ সুন্দর, কাব্য নাম দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে কাব্য-রস দুর্লভ।

বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা কাব্য সংস্কৃতেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দ-প্রকরণ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে;—বাঙ্গালী-কবির স্বকল্পিত; বঙ্গকবির প্রতিভা ও লিপিচাতুর্য্যের প্রমাণ।

বাঙ্গালা পদ্য-রচনা—আরম্ভ হইতে কাশীদাসের সময় (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) পর্য্যন্ত—আমরা দেখিতে পাই, ছন্দ প্রধানতঃ পয়ার ও ত্রিপদী। কৃত্তিবাসে স্থল-বিশেষে "নর্ত্তক ছন্দ" আছে, কিন্তু তাহার আকার প্রকার নিতান্ত আধুনিক-গন্ধী। মুকুন্দরামে মধ্যে মধ্যে "মালিনী" "ঝাঁপা"

"ঝাঁপতাল" প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। "পয়ার" শব্দ বোধ হয় পাদ—পায়া শব্দ হইতে উদ্ভূত। ত্রিপদীকে প্রাচীন কালে "নাচাড়ী (নেচাড়ি)" বা "লাচাড়ি" বলিত; কেহ কেহ বলেন "লাচাড়ী"—লহরী শব্দের অপভ্রংশ।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা আর গুটিকতক ছন্দ পাই;—একাবলী, দিগক্ষরা, ভঙ্গপয়ার, মালঝাঁপ, দীর্ঘ লঘু ও ভঙ্গ ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী। ক্ষেমানন্দের গ্রন্থে "গজগতি" ছন্দ দৃষ্ট হয়।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র এবং তৎপরে মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র অনেক নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইঁহাদের আমলে বঙ্গীয় কাব্যে নানাপ্রকার সংস্কৃত ছন্দও অনুকৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত গুলি ব্যতীত বৃত্তগন্ধী, দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী, তূণক, তোটক, তরল পয়ার, ললিত পয়ার, হীনপদ-ত্রিপদী, মাত্রা ত্রিপদী, মাত্রা-চতুষ্পদী, ভুজঙ্গ-প্রয়াত, মালতী, পঙ্কচামর প্রভৃতি নাম দেখা যায়। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা পদ্যে সংস্কৃত অনুষ্টুভ ও শিখরিণী ছন্দেরও প্রয়াস করিয়াছিলেন। মদনমোহন ইহার উপর পজ্ঝটিকা, দ্রুতগতি, কুসুমমালিকা প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। কবি রঙ্গলাল "প্রামাণিকা" নামক এক ছন্দের আভাস দিয়াছেন।

এই সকল ভিন্ন আর কয়েক প্রকার সহজ সরল ছোট বড় ছন্দের বরাবরই প্রচলন আছে, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ "ছড়া" বলি। ডাক বা খনার বচনের ছড়া ও মেয়েলী ব্রতকথার ছড়া বোধ হয় ভাষার উৎপত্তি সময় হইতে আবহমান কাল চলিত। ছেলেভুলানো গানের ছড়ারও উল্লেখ করা উচিত। এ সকলের মধ্যেও ছন্দের ছাঁদ মিলে।

মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তিনি এবং হেমচন্দ্র ইংরাজীর অনুকরণে আরও কয়েকটি নূতন ছন্দের উদ্ভাবন করেন। নবীনচন্দ্রের কবিতার ছন্দের বড় নবীনত্ব নাই। কিন্তু তৎপরে রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত ছন্দের সংখ্যার সীমা পরিসীমা নাই · সে "নিতুই নব, নিতুই নব।" তাঁহার অনুকরণে এবং হনুকরণে কতই ছন্দ না দেখা দিতেছে!

সংস্কৃত ছন্দানুকৃতি এখনও শেষ হয় নাই। ইন্দ্রবজ্র, শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত

মালিনী, বংশস্থবিল প্রভৃতি ছন্দ বাঙ্গালা কাব্যে চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তেমন সুবিধা হয় নাই ; যথার্থ প্রতিভাবান কবির পাল্লায় পড়িলে কি দাঁড়ায়, এখন বলা যায় না।

বাঙ্গালা কাব্যের অলঙ্কার সম্বন্ধে বঙ্গসাহিত্যের জনৈক পণ্ডিত-সমালোচক বড় সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—"বাঙ্গালা ভাষা অতি দুঃখিনী ; ইহার নিজের কিছুমাত্র অলঙ্কার নাই ; যাহা দুই চারি খানা ইহার গাত্রে দেখা যায়, তাহা মাতামহীর (সংস্কৃত ভাষার) নিকট প্রাপ্ত। বাঙ্গালা যখন বালিকা ছিল, তখন মাতামহীর ভারী ভারী মোটা মোটা যে সকল অলঙ্কার (অনুপ্রাস উপমা রূপকাদি) তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট ছিল। এখন যুবতী হইয়াছে, এখন আর সে সকল পুরাতন মোটা অলঙ্কারে উহার মন উঠে না ; এখন জড়াও অলঙ্কারের (প্রতিবস্তূপমা, নিদর্শনা, সমাসোক্তি প্রভৃতির) প্রতি লোভ হইয়াছে এবং ছলে বলে কৌশলে এক এক খানি করিয়া বৃদ্ধার অনেক অলঙ্কারই আত্মসাৎ করিয়াছে। কামিনীগণের অলঙ্কার পরিবার সাধ পাঠকগনের অবিদিত নাই। "মল" বলিয়া দশ সের রূপার বেড়ী দিলেও মনের সুখে পরিবেন ; কাণ ছিঁড়িয়া যায় তবু সোণা পরিবেন—শেষে না হয় সোনার কাণ গড়াইবেন! ভাগ্যবন্ত গৃহের অনেক গৃহিণী অলঙ্কারের ভারে চলিতে পারেন না,—ভাল দেখায় না তবু অলঙ্কারে সাজিয়া "আহ্লাদে পুতুল" হইয়া বসিয়া থাকিবেন। বুড়া আয়ীর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার বাঙ্গালার গায়ে সাজিবে না—ইহা বাঙ্গালী বোঝে না, তাহা নহে ; তবু যে অলঙ্কারের ঝুড়ী মাথায় করিতে চাহে, সে তাহার জাতির গুণ।"

পণ্ডিতমহাশয় তবু সম্প্রতিকার তাহা বিলাতী-আমদানি, হাল-ফ্যাসিয়ান অলঙ্কার অনেকগুলি দেখিয়া যান নাই। দেখিলে বুঝিতে পারিতেন, বুড়া আয়ীর সেকেলে গহনার রেওয়াজ কমিতেছে, তৎস্থলে যাহা চলিতেছে, তাহার ঝক্‌মকিতে অনেক সময়ে আঁখি ঝলসিয়া যায় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে Tait's Diamonds আছে—ভূয়া!

বাঙ্গালা কাব্যের প্রথম অবস্থার ভাষা—কিম্বা চার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার ভাষা, আর আজকালকার ভাষায় তফাৎ আছে, মানিতে হয়।

ইহা ত বিচিত্র নয়। Chaucerএর ইংরাজী, Spenserএর ভাষা আর হাল্ ককনি ইংরাজী ভাষায় প্রভেদ কত! কিন্তু সেই প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ভাষার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সৌসাদৃশ্য দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। সে কালের রচনায় কথিত ভাষার চলন অধিক ছিল, এখন পোষাকী ভাষার প্রভাব বেশী, ইহাও স্বীকার্য্য।

একটি বিষয়ে একটু সন্দেহ হয়। এত সব প্রাচীন পুঁথি যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে। হইতে পারে না কি, বেহারবাসীরা বঙ্গবাসীকে যেমন "এক বাঙ্গালী দোসর্ ভোতুরাহ" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছিলেন, পূর্ব্বে পশ্চিম-বঙ্গবাসীগণও পূর্ব্ববঙ্গবাসী-দিগকে সেইরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন? এবং সেই জন্যই তাঁহাদিগের সাহিত্যকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন? সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য,—বিশেষতঃ প্রাচীন ভাগ—এত দিন অবজ্ঞাত এবং তজ্জন্য কতকটা অজ্ঞাত ছিল? পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগের প্রতি আমরা যে স্বল্প দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও হীনানুরাগ ছিলাম, তাহা ত অস্বীকার করা চলে না। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বাঙ্গাল ভাষায় হাস্য-পরিহাস করিতেন; মুকুন্দরামে এবং ক্ষেমানন্দের কাব্যে আমরা বাঙ্গাল মাঝির ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙ্গিবার নিদর্শন পাই; এমন কি সেদিনকার "সধবার একাদশী"তে রামমাণিক্যের প্রতি নিমচাঁদের উক্তি পড়িয়া আমরা কি বাস্তবিকই আমোদ পাই নাই? কিন্তু এখন সে দিন-কাল গিয়াছে। যে বাঙ্গালদিগকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম, বিদ্রূপ করিতাম, লাট কার্জ্জনের কল্যাণে সেই বাঙ্গালদের এখন আমরা

"ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই"

বলিয়া "রাখী" বাঁধিয়া দিতে শিখিয়াছি! আজ United Bengalএর অধিবাসীবৃন্দ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া জগত সমক্ষে সগর্ব্বে কি বলিতে পারে না—'কাব্য—পদ্য-সাহিত্য যদি সাহিত্য হয়, বাঙ্গালা সাহিত্য রীতি-মত আছে; কি প্রাচীন কি আধুনিক, কোন কালেই বাঙ্গালা দেশ বা বাঙ্গালী জাতি কাব্য-সাহিত্যে নগণ্য নহে।'

আমরা দেখিয়াছি, এই যে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য, এটির বয়স কিছু কম সহস্র বর্ষ; আর এটি নেহাৎ ছোট খাটো নয়। শেষ শ খানেক বৎসর

ছাড়িয়া দিলে ইহার আগাগোড়া পদ্য। ইতিহাস, ভূগোল, সামাজিক আচার-বিচার, ধর্ম্মতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, জীবনী, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, যা কিছু পাওয়া যায়, সমস্তই পদ্যে,—শুধু পদ্য বলি কেন?—কাব্য, শুধু কাব্য নয়—গীতি-কাব্য। অগেয় গীতি-কাব্য নয়, গীত হইত এমন গীতি-কাব্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—ইঁহাদের প্রায় সমস্ত রচনা ত রীতিমত গান—সুর-লয়-তাল যোগে গেয়। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী হইতে বাঙ্গালা সকল মঙ্গল কাব্যগুলিই পাঁচালী;—চামর ঢুলাইয়া, মন্দিরা বাজাইয়া গান করা হইত। বৈষ্ণব-যুগের জীবন-চরিতগুলি পর্য্যন্ত গীত হইত, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন কাব্যে স্থলে স্থলে পয়ার ও ত্রিপদী পর্য্যন্ত রাগ রাগিণীর সংজ্ঞায় অভিহিত দেখা যায়। কবিকঙ্কণ প্রভৃতিতে বসন্ত, মল্লার, মালসী, বরাড়ী, ভৈরবী, মঙ্গল-গুর্জ্জরী প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। প্রাচীন সাহিত্য ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত—এমন কি তাহারও কিছু পর পর্য্যন্ত, সমস্ত কাব্য গান করা হইত। প্রাচীন সকল কাব্যই পালায় বিভক্ত এবং পাঁচালী নামে অভিহিত।

সেকালে দেবতার মহিমাত্মক যে সমস্ত গ্রন্থ গীত হইত, সে সমুদয়ের নাম "মঙ্গল" গ্রন্থ। চণ্ডী-মঙ্গল, দুর্গা-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতিতে এক এক দেবতার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মঙ্গল-গ্রন্থগুলি লিখিবার পূর্ব্বে, কবিগণ স্বপ্নে দেবতার নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইতেন; জাগরিত হইয়া তাঁহারা অদ্ভুত-কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িতেন। মঙ্গল-গানগুলি অষ্টরাত্রি সপ্তদিন গীত হইত, তজ্জন্য সচরাচর "অষ্টমঙ্গলা" নামে পরিচিত। মঙ্গল-গীতগুলি সবই পাঁচালী। পাঁচালী পথে ঘাটে, ভদ্রলোকের আঙ্গিনায়, রাজসভায় পর্য্যন্ত গান হইত, ভিড় জমিয়া যাইত, লোকে শুনিত, শাস্ত্রপুরাণ শিখিত,—শাস্ত্র-বহির্ভূত অনেক কথাও যে না শিখিত এমন নহে।

কেহ কেহ বলেন, "পাঁচালী"—পঞ্চালিকা শব্দের অপভ্রংশ। পঞ্চাল দেশ হইতে এই জাতীয় কাব্য বা গীতের আমদানী, তাই এই নাম। পণ্ডিত রামগতি, পাঁচালী=পাঁচ+আলি বা পঞ্চ সখীর গীত—অর্থ করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যে ত্রিপদীর নাম "নাচাড়ি"; পণ্ডিত মহাশয় নাচাড়ীকে 'নট্যালি' ধরিয়া, নটী+আলি—অর্থাৎ নটীগণ নৃত্য করিয়া যাহা গান

করিত, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা যথার্থ হইলে, আমাদের কল্পনা করিয়া লইতে হয়, কেমন করিয়া কতকগুলা পুরুষ, গোঁফ কামাইয়া, সখী সাজিয়া, মন্দিরার তালে নাচিয়া নাচিয়া, মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডীর মত গুরুগম্ভীর বিষয়ের গান পথে ঘাটে গাহিয়া বেড়াইত! রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্রের কাব্যের এক জন সুর বাঁধিয়া দিতেন, ইহার "গায়েন" ছিল, কবি আপনিই বলিয়াছেন। তার পর, আধুনিক যুগেও, ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল গান—কবি, টপ্পা, ঢপ, তুক্ক, তর্জ্জা, ছড়া, কীর্ত্তন ইত্যাদি। বঙ্গসাহিত্য নয় শত বৎসর আদ্যন্ত গীতি-কাব্য। তাই প্রথমেই বলিয়াছি—বাঙ্গালী বাঁশী বাজাইতেই মজবুত।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কাব্য বা কবিতা ও কবি কাহাকে বলে কতকটা দেখা গেল। কথা আছে,

"কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।"

এই অমরত্বে বাঙ্গালী কবির দাবী দাওয়া কতটা আমরা আর এক সময়ে দেখিব; দেখিব বঙ্গের কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস কবিতা—না কাব্য—না "কাব্যি"। মোটামুটি এইটুকু বলিয়া রাখিতে পারি—তূর্য্য-নিনাদই হউক, শিঙ্গাই বাজুক, আর শঙ্খধ্বনিই উঠুক, বাঙ্গালীর প্রাণ বাঁশীর আওয়াজেই মশ্‌গুল্। এখনও আমরা শুনিতে পাই—

"বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই?"

বঙ্গদেশের এই নয় শত বৎসরের গীতিকাব্য বা কাব্য-সাহিত্য হইতে আমরা কি শুধু কাব্য-রসই পাই? এই কিঞ্চিদূন সহস্র বৎসরের বিশাল সাহিত্য কেবল গান আর পাঁচালী? উদ্দেশ্য কি কেবল নৃত্য-গীত? না, তাহা নহে। এই কাব্য-সাহিত্যই বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস—অন্ততঃ লৌকিক বা সামাজিক ইতিহাস ত বটেই। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত—সামাজিক আচার-ব্যবহার, সাময়িক পদার্থতত্ত্ব,—এ সকলও এই কাব্য-সাহিত্য হইতে আমরা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হই।

বঙ্গের প্রথম যুগের কাব্যনিচয় হইতে আমরা জানিতে পারি—তখন-কার (সহস্রাব্দ পূর্ব্বে) রাজারা সোণার খাটে বসিয়া রূপার চৌকীতে পদস্থাপন ও স্বর্ণ-থালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সহ অন্ন আহার করিতেন। ইহার

মধ্যে কতকটা বর্ণনা কবি-কল্পনা কি না বলা যায় না, কেন না তাঁহাদের নিত্য-জীবনে বড় অধিক বিলাসের ভাবের সন্ধান মিলে না। "ইন্দ্রকম্বল" "দণ্ডপাখা" ও "পাটের শাড়ী" বিলাস-সামগ্রী মধ্যে দেখা যায়। খাদ্যের মধ্যে "ইন্দ্রমিঠা" নামক একরূপ মিষ্টান্নের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। আহারের পর "বংশহরির গুয়া" খাইয়া মুখশুদ্ধি করা হইত। মাণিকচাঁদের গান এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয়, তখনকার কালে ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকও কৃষিকর্ম্ম করিতেন; এবং স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত অক্ষক্রীড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। শূন্য-পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে দেখা যায়, এই শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি তখনও সেই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বকালে—নানা প্রকার ধান্যের ভাণ্ডার ছিল। কৃষকগণ সেই ধানের আদরের নাম রাখিত "লালকামিনী" "মাধবীলতা" "সোণা-খড়কী" প্রভৃতি। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ মাণিকচাঁদের গীতে কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের কথা লিখিত আছে; কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের প্রথা হিন্দু-শাসন কালে প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন বঙ্গ-কাব্যের দ্বিতীয় যুগের রচনা হইতে আমরা জানিতে পারি;—সে সময়ে (প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে) পূর্ব্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ ছিল না। "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে" রমণীগণের কণ্ঠে সুবর্ণহার, কর্ণে কুণ্ডল, নাসায় গজমতি, হস্তে বলয় কঙ্কণ, কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টি, পদে মঞ্জীর প্রভৃতি আমাদের পরিচিত অলঙ্কারের মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ দেখা যায়। চণ্ডীদাস "কাণাড়া ছাঁদে" কবরী বন্ধনের ও "মল্ল ভাড়ল" নামক এক প্রকার ভূষণের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা এখনকার কালে খোট্টা রমণীগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি বিজয়গুপ্ত হস্তে সুবর্ণ বাউটি, সুবর্ণ ঘাগিরা ও শিলামণি কাচ, কণ্ঠে হাসলি, কর্ণে সোণার মদনকড়ি, পিত্তলের খাড়ু ও "লোটন খোঁপা" নামক একরূপ কবরীর উল্লেখ করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কবি গোবিন্দদাস সুন্দরীগণের চরণোপরি "যাবক-চিত্র" লিখনের পরিচয় দিয়াছেন—"মদন-পরাজয়-পাত্র!"

ষোড়শ শতাব্দীর কাব্য হইতে সে সময়কার একটি সামাজিক আচারের খবর পাওয়া যায়, যাহা এখনকার কালে অবধান-যোগ্য। সে সময়ে সমস্ত অভিভাবকগণ বালবিধবাদিগকে পট্টবস্ত্র ও (শাঁখার স্থলে) সুবর্ণের চুড়

পরিতে দিতেন। কোন কোন বালবিধবা সিন্দুরের পরিবর্তে আবিরের ফোঁটা কপালে পরিতে পাইতেন। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দেখা যায়, বেহুলার ভ্রাতৃগণ পতিবিয়োগকাতরা ভগ্নীকে বলিতেছেন—

"খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী ;
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চূড়ী ;
সিন্দুর বদলে দিব ফাগুয়ের গুঁড়ি ॥"

নারায়ণ দেবের গ্রন্থে আছে—

"মৎস্য মাংস এড়ি বহিন যত উপহার,
সর্ব্ব দ্রব্য দিমু আমি তুমি খাইবার।
শংখ সিন্দুর মাত্র না পরিবা তুমি,
নানা অলঙ্কার তোমা দিমু আমি।"

সে সময়কার আর একটি লৌকিক আচার এখনকার এই সভ্য সমিতি ও গগনভেদী চীৎকারের দিনে প্রণিধানের উপযুক্ত। গরীবের ঘরের বিবাহ-বারের একটু নমুনা দিই। চৈতন্য-প্রভুর বিবাহের প্রস্তাব কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন—

"আমি যে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাঞি,
কন্যামাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।"

বলা বাহুল্য, ইহাতে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় নাই। তাঁহার দ্বিতীয় বার বিবাহে খুব ধুমধাম হইয়াছিল, সে ধুমধামে প্রধানতঃ গুয়া পান ও মাল্য চন্দনেরই ছড়াছড়ি।

আমাদের পুরাতন কাব্য সাহিত্য হইতে আমরা কাব্য রস ব্যতীত, কবিগণের সমসাময়িক আচার-ব্যবহারের অনেক সমাচার প্রাপ্ত হই। আমরা জানিতে পারি, সে সময় বাঙ্গালী জাতির আচার-ব্যবহার অতি সাদাসিধে রকম ছিল। রাজা-রাজড়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে বড় লোকেরা হাঁড়ী কতক দই, কাঁদি কতক কলা, কয়েক ভার নারিকেল, দোখড়ি গুয়া, পানের দোনা এবং "ঘোড়া যোড়া শাড়ি" ও "মুকারিয়া জোড়া" লইয়া অগ্রসর হইতেন। "গঙ্গাজল নাড়ু" ও সঙ্গে যাইত। "গঙ্গাজল নাড়ু", মেঘডম্বুর শাড়ী, মকমাল ও "পামরী জোট" (ভুটানি কম্বল ?)

সে কালে বড় দরের সামগ্রী ছিল। রাজারা সন্তুষ্ট হইলে চড়িবার ঘোড়া ও গায়ের খাসা যোড়া ও পাটের কাপড় দান করিতেন। চন্দনের ছড়া দিয়া সম্মান প্রদর্শন করা হইত। (রাজ-কবি কৃত্তিবাস এইরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন)। পাটের দোলা প্রধান যান ছিল। বড় লোকের আগে পাছে পাইকেরা বড় লোকের মহিমা গান করিতে করিতে ছুটিত। কোন নিয়োগে আদেশ দিবার সময় আদিষ্ট ব্যক্তিকে তাম্বূল দানের ব্যবহার ছিল; তদ্দারা আদিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। এক বাটায় পান খাওয়া বিশেষ প্রণয়ের চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত।

মুকুন্দরামের কাব্য হইতে আমরা সেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি সময়কার অনেক খবর পাই। পূর্ব্ব-কালে বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্র যাতায়াত করিতেন। কোন দীর্ঘ-যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীর সন্তান হইবার সূচনা লক্ষিত হইলে, তাহাকে একখানি "জয়পত্র" বা মুক্তিপত্র (Certificate?) দিয়া যাওয়া হইত। সমুদ্র-পথে গমনাগমনের জন্য বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গবাসী নাবিকগণই বিশেষ দক্ষ ছিল; (এখনও হয় ত তাই)।

"কারো হাতে কেরোয়াল কারো হাতে ফাঁশ।
কারো হাতে দণ্ড কারো হাতে রায়বাঁশ॥"

মাঝিদিগের তত্ত্বাবধায়ক "গাবুর" নিযুক্ত থাকিত; ইহারা "সারি" গাহিয়া মাঝিমাল্লাকে কার্য্যে আকৃষ্ট রাখিত ও মাঝিরা কার্য্যে অবহেলা করিলে তাহাদিগকে "দাঙ্গা" দিয়া প্রহার করিত। প্রধান ডিঙ্গার নাম থাকিত "মধুকর"। ডিঙ্গাগুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযুক্ত নানাবিধ দ্রব্য রহিত এবং কোন কোন খানিতে হাট মিলিত। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ ছিল মনে হয়। সমুদ্র-পথে "ফিরাঙ্গির দেশ" ছিল এবং "হারমাদের ডর" ছিল। এই "হারমাদ" সম্ভবতঃ জলদস্যু। ("হারমাদের" শব্দকে কেহ কেহ "হারামদের" ধরিয়া "হারাম" অর্থাৎ 'দুর্ব্বৃত্তগণের' অর্থ করিয়াছেন। কেহ বা বিখ্যাত পর্ত্তুগিজ-সেনাপতি Almeida নামের অপভ্রংশ ধরেন।) সমুদ্রে ঢেউ উঠিলে নাবিকগণ তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঢেউ নিবারণ করিত। (পাশ্চাত্য সাহিত্যেও এ বিষয়ের প্রবাদ আজও দেখা যায়—Pouring oil over troubled waters)। ডিঙ্গার

নিকটে ভিঙ্গড়ী মৎস্যের উপদ্রব হইলে গুড় চাউল ফেলিয়া, কাঁকড়ায় নৌকা আটক করিলে শিয়াল-ডাক ডাকিয়া, কুম্ভীরের উৎপাত হইলে পোড়া ছাগল ফেলিয়া দিয়া, জোঁকের দৌরাত্ম্য হইলে ক্ষার চূণ ছড়াইয়া প্রতিকারের চেষ্টা হইত ; শঙ্খের উৎপাত দেখিলে মৎস্য-মাংসের গন্ধ লাগাইয়া তাড়াম চলিত ; সর্প-ভয় হইলে বাবুই ইসারমূল বাঁধা হইত।

বঙ্গদেশ হইতে সমুদ্র যাইবার সময় পথে ত্রিবেণী হইতে "মিঠা পানি" (পানীয় জল ?) তুলিয়া লওয়া হইত। মুকুন্দরাম প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কবি, তখনকার কালে সপ্তগ্রামের খুব বোল্‌বোলাও—

"সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥"

তখন কলিকাতা, কালীঘাটও ছিল—আর এখনকারই মত ছিল—

"ধন্য ক্ষেত্র জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত।"
কিন্তু—"প্রসাদ গুথান অন্ন ভেদ নাহি চারি বর্ণ।"

এই সময়ের কাব্যাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্য-নির্ব্বাহের প্রথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বট, বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যক কড়ি দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইত। মাটী কাটা ও কোন দ্রব্য ওজন করিবার জন্য "পুরুষ" নামে একরূপ মাপ ছিল ; বোধ হয় উহা এখনকার গজকাটির ন্যায় কিছু হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে পাটের পাছড়াকে "পাটের খনি" বলিত। কাব্যের গায়নেরা একখানি পাটের খনি পাইলেই কৃতার্থ হইতেন। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কাঁচুলী পরিধানের রেওয়াজ ছিল ; কাঁচুলী-নির্ম্মাণে বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত।

সম্পন্নগৃহে স্ত্রীলোকগণ "হীরা নীলা মতিমালা কলধৌত কণ্ঠমালা" কুণ্ডল, স্বর্ণচূড়ী "শতেশ্বরী হার" "কণক সাপড়া," অঙ্গদ, কঙ্কণ, কর্ণপূর প্রভৃতি নানাবিধ মণিমুক্তা ও সুবর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিতেন ; "গুয়ামুটি" (গুয়াঠুটি ?) প্রভৃতি নানা ছাঁদে খোঁপা বাঁধিতেন—"মণিময় জাদ তথি দোলে"। "কুলুপিয়া শঙ্খ" ধারণ করিতেন এবং "মেঘডম্বুর সাটী" ও "বিনোদ কাঁচুলী" এবং আবশ্যক মত দোছুটি করিয়া তসরের শাড়ী পরিতেন।

বড় ঘরের কন্যা-বধূরা "পাটের জাদ—মণিময় সূত্র তার বেড়ি" —পাইতেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর নারীগণ "খুঞা" বা ক্ষৌম বাস পরিত ; খুঞা এক প্রকার অল্প মূল্যের বস্ত্র। রমণীগণের অঙ্গ-মার্জ্জনার জন্য তখন সাবান উঠে নাই, হরিদ্রা কুঙ্কুম ও আমলকীই সে কাজ সারিত। স্বর্ণালঙ্কারের সঙ্গে ফুলও সাজ-সজ্জার উপকরণ ছিল।

তখনকার কালে পুরুষেরাও বালা পরিতে লজ্জা বোধ করিতেন না এবং দরিদ্র ব্যক্তিও কর্ণে একটু সোণা পরিয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিত। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ "খোসালা" নামক একরূপ শীতবস্ত্র গায়ে দিত। এই সকল প্রথা এখনকার কালে ছোট-লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। তখনকার দিনে কায়স্থসুত দেখা যাইত "কাণে কলম হাতে দ্বত।"

মুকুন্দরাম প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কবি। মুকুন্দরামের কাব্যে বাজার করার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে দৃষ্ট হয়, সে সময়ে জিনিষ-পত্র সমস্তই অতি সুলভ-মূল্য ছিল।

বাজারে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে কড়ি-প্রত্যাশী দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইত ; প্রথম—লগ্নাচার্য্য, ইনি পঞ্জিকা শুনাইয়া কিছু যাচ্ঞা করিতেন। অপরজন "কুশারী" উপাধিবিশিষ্ট ওঝা ; ইঁহার কাঁধে একটা বড় কুশের বোঝা থাকিত ; কখন বা "হাতে কুশ কাঁধে ঝুলি"। ইনি বেদ পাঠ করিয়া অভ্যাগতকে আশীর্ব্বাদ করতঃ কিছু আদায় করিতেন ; কখন বা পুরোহিত, ঘটক কিম্বা দৈবজ্ঞ-ঠাকুর সাজিতেন।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন-গ্রন্থ কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে, কাব্য-রস ছাড়া আমরা আরও কিছু পাই। গর্ভবতী নারী কি ব্যঞ্জনের সাধ করে, অন্নকষ্ট-কাতর ব্যক্তির ভোগ-লালসার সীমা কতদূর, সন্তান প্রসবের পর কি কি কার্য্য করিতে হয়,—(সে সময়ে আটকৌড়েও ছিল) ; বিবাহের সময় কি কি বিধি পালন আবশ্যক, অভাগিনী পত্নী পতি-সোহাগ-কামনায় কি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, এ সকল তত্ত্বও জানা যায়। সেকালে স্ত্রীলোকগণের মধ্যে "ওষুধ" করিবার প্রথা বড় বেশী চলিত ছিল ; তখন বহু-বিবাহের আমল, স্বামী-জীবটিকে বশে রাখিবার জন্য নানা প্রকার "তুকতাক্" আবশ্যক হইত। সপত্নী-বিদ্বেষে কি বিষময় ফল ফলে, ঘরের পুরাণো দাসী কেমন

চুচুগ রাখিবার চেষ্টা করে—এ সকলও আমরা দেখিতে পাই। হাটে কি দ্রব্যের কি দর, কি দ্রব্য-সংযোগে কি ব্যঞ্জন রাঁধিতে হয়, নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনের নাম, লৌকিক আচার-বিচার-সংস্কার-প্রণালী, পল্লীগ্রামে মালা-চন্দন লইয়া কেমন দলাদলি হয়, সামাজিক ভোজের সময় শত্রুতা করিয়া লোককে কেমন নাকাল করা হইত, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবসায় কি, কোন্ কোন্ ব্যবসায় তখন প্রচলিত ছিল, জাতি-বিশেষের চরিত্র কি প্রকার, আচার ব্যবহার কিরূপ—ইত্যাদি; নানান্ তত্ত্ব আমরা জানিতে পারি। সহমরণ-প্রথার দূর-সংবাদও যেন পাওয়া যায় এবং সতীত্ব-প্রমাণার্থ পরীক্ষা-নিদর্শনের আভাসও মিলে। সেই প্রাচীন-কাব্যে বন্ধু-জন্তুর নাম, গ্রাম্য পশুপক্ষীর নাম, এমন কি নানাজাতি পারাবত ও ছাগলের নাম, বিবিধ ফুলের নাম, অরণ্য বৃক্ষের নাম, কোন্ গাছের গন্ধে সর্প পলায়ন করে—তাহা পর্যন্ত আমরা পাই। "অষ্ট অলঙ্কার" এবং "বিবিধ আভরণ, "বাছিল বাজনা," যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র—এ সমস্ত আমরা কবিকঙ্কণের চণ্ডী-কাব্য হইতে জানিতে পারি। ভারতচন্দ্র এ সকল বিষয়ে মুকুন্দরামের অনুকারী। ইহা ব্যতীত ভূগোলতত্ত্বও বাদ যায় নাই; অবশ্য যেটুকু কবির নিজের পরিচিত, সেইটুকুই ঠিক, বাকি সমস্ত কাল্পনিক; শুধু কাল্পনিক নয়—অস্বাভাবিক ও অলৌকিক।

ছন্দোবন্ধে এত সব কথা আছে বলিয়াই মুকুন্দরামের "চণ্ডী" বাঙ্গালীর কাছে মহাকাব্য এবং কবিকঙ্কণ "মহাকবি"। নচিলে সংস্কৃত-কাব্যের লক্ষণ অনুসারে "চণ্ডী" মহাকাব্য নহে, আন্তরিক কবিত্ব-গুণ হিসাবে এই বিরাট গ্রন্থ মহাকাব্য কি না বিবেচ্য।

এই সময়কার কাব্য-গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি, সেকালে বঙ্গদেশে লেখাপড়ার চর্চা বিলক্ষণ ছিল। চণ্ডী-কাব্যে শ্রীপতি বণিকের শাস্ত্রে অধিকারের বিষয় বর্ণিত আছে। তাহার পিতা ধনপতি বণিকও— "নাটক নাটিকা কাব্যে যাঁহার উল্লাস"—বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। সংস্কৃত টোলে বাঙ্গালা অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরের পুস্তক লিখিত হইত। ধনপতি বণিক সিংহলে "নাগরী বাঙ্গালা যার পড়িবারে জানি"—বলিয়া স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন। সে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের ভিতরও

লেখাপড়ার চর্চা যে আদৌ ছিল না এমন নহে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেখা যায়—বণিক-ঘরণী খুল্লনা স্বামীর হস্তাক্ষর চিনিতেন এবং তাহা লইয়া সতিনীর সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতেও জানা যায়, মহাপ্রভু যে সাড়ে তিন জন শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্রের কথা উল্লেখ করিতেন, তন্মধ্যে শিখি মাহীতির ভগিনী—মাধবী দাসী আধ জন। এই মাধবী অতিশয় শুদ্ধাচারিণী ছিলেন, তাঁহার রচিত বৈষ্ণব-পদাবলী আছে। বৈষ্ণব-পদাবলী-রচয়িতাগণের ভিতর তিন জন স্ত্রী-কবির নাম পাওয়া যায়। চণ্ডিদাসের রজকিনী রামী তাহার মধ্যে একজন। ইহা অবশ্য গেল চার পাঁচ শ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও যে বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল, ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা ত বিদ্যার জাহাজ ছিলেন; তাঁহাকে কাব্যের নায়িকা বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও, ভারতের অব্যবহিত পরেই আমরা বিদুষী আনন্দময়ী দেবীর রচনা পাইতেছি। "হরিলীলা" নামক সত্যনারায়ণের কথায় আনন্দময়ীর হাত আছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিন চারি শত বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি সর্ব্বদা ঘটিত এবং এই ভীরু বঙ্গবাসীর মধ্যেও সৈনিক পুরুষের অভাব ছিল না। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে ব্রাহ্মণ পাইক, কর্ম্মকার পাইক, চামার পাইক, নট পাইক, বিশ্বাস পাইক ও বাঙ্গাল পাইকের বিবরণ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণ ও বলিষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু সাহসের পরিচয় বোধ হয় অল্পই দিতে পারিতেন। বঙ্গদেশে সীতারাম প্রতাপাদিত্য ছিলেন, কিন্তু অমন দু একজন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত। অবশ্য এমন দিন ছিল, যখন বাঙ্গালীর জয়পতাকা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে উড়িত, যখন ভারতের বহির্ব্বর্ত্তী কোন কোন স্থানও বাঙ্গালীর শাসনাধীন ছিল, যখন বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত সেনাবলের সাহায্যে রাজগণ দেশ জয় করিতেন, কিন্তু সে বহু পূর্ব্বের কথা—সহস্র বর্ষ বা তৎপূর্ব্বেকার "অতীত কাহিনী ও"।

তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বেকার কাব্য-গ্রন্থ হইতে যে সকল তত্ত্ব পাওয়া

যায়, তাহাই অধিক বলিলাম ; কিন্তু ইহারও শত বর্ষ পূর্ব্বের তত্ত্ব —এত না হউক, কতক কতক আমরা কৃত্তিবাস প্রভৃতির কাব্য হইতেও প্রাপ্ত হই। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ-দুঃখের কতকগুলি মনোরম চিত্র ভারা রামায়ণও আমাদের নিকট তৎকালিক বঙ্গের অনেক সংবাদ আনিয়া দেয়।

বঙ্গের প্রাচীন কাব্য সাহিত্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ; (১) অনুবাদ শাখা, (২) লৌকিক ধর্ম্ম বা উপাখ্যান শাখা। প্রথমটির পরিপুষ্টি হইয়াছে, আমাদের দেশের কথকদিগের গুণে ; দ্বিতীয়টি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে,— বঙ্গীয় কবির প্রতিভা প্রভায়। কথকদিগের কথা" হইতে বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাঁহারা পুরাণের সংস্কৃত শব্দসকল চলিত ভাষায় যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করেন ; ঐ সকল ব্যাখ্যা গীত-স্বর-সংযুক্ত হওয়ায়, সাধারণের মনে অঙ্কিত হইয়া যায় ; সুতরাং সেই সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে ভাষার মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করে। ফলতঃ কথকতার প্রচার না থাকিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত বোধ হয় আমরা কখনই প্রাপ্ত হইতাম না। কথকতার ব্যবসায় আমাদের দেশে নূতন নহে। পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন কবি কৃত্তিবাসও গাহিয়াছেন —

"পুরাণ শুনিয়া গীত রচিনু কৌতুকে।"

আড়াই শ তিন শ বৎসরের কবি কাশীদাসও গাহিয়াছেন—

"শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।"

এ বিষয়ে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের মতটা শুনাই —

"গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, বেদী-পিড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, কথক ঠাকুর—সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়-জয়, রাক্ষসীর প্রেম-প্রবাহ, দধিচীর আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার-যুক্ত করিয়া, আপামর সাধারণের সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পিঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত— শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন,—বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন ; যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড—পুণ্যের

পুরস্কার আছে; যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য; যে অহিংসা পরম ধর্ম; যে লোকহিত পরম কার্য্য—সে শিক্ষা এখন কোথায়? সে কথকতা এখন কোথায় গেল?"

বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিতীয় ভাগের বিকাশ সম্বন্ধে স্বভাব কবি রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে বলিয়াছেন—

"দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকরা কাব্য হইয়া চারিদিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন কবি সেই টুকরা কাব্যগুলিকে একটা বড় কাব্যের সূত্রে এক করিয়া একটা বড় পিণ্ড করিয়া তোলেন। হরপার্বতীর কত কথা, যাহা কোন পুরাণে নাই; রামসীতার কত কাহিনী, যাহা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না;—গ্রামের গায়ক কথকদের মুখে মুখে, পল্লীর আঙিনার আসরে, ভাঙ্গা ছন্দ ও গ্রাম্য ভাষার বাহনে কত কাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন সময়ে কোন রাজসভার কবি যখন কুটিরের প্রাঙ্গনে নহে কোনও বৃহৎ বিশিষ্ট সভায় গান গাহিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, তখন সেই গ্রাম্য-কথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, মার্জ্জিত ছন্দে, গম্ভীর ভাষায় বড় করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও এক পর্ব্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়।

মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য। তাহা বাঙ্গালার ছোট ছোট পল্লী-সাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনই করিয়া একটা বড় যায়গায় আপনার প্রাণ পদার্থকে মিলাইয়া দিয়া, পল্লী-সাহিত্য ফল-গর্ভা হইলেই, ফুলের পাপড়িগুলার মত ঝরিয়া পড়িয়া যায়।"

এই জাতীয় কাব্য লিখিতে গেলেই কবির উপর দেবতার আদেশের আবশ্যকতা হইত; সুতরাং এই সকল কাব্য "মঙ্গল-কাব্য" রূপে ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইত।

মুকুন্দরাম গাহিয়াছেন—

"দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ-ছায়া,
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
হাতে লৈয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব॥"

ক্ষেমানন্দ গাহিয়াছেন—

"মা গো তুমি মম মন্ত্র দিলা কাণে।
সেই মহামন্ত্র-বলে পূর্ব্ব আরাধন ফলে
কবিতা নিঃসরে তেকারণে॥"

ভারতচন্দ্র গাহিয়াছেন—

"স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া।
সেই আজ্ঞামত কবি রায়-গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নব রসতর॥"

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কোনও কাব্যের আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা সহজ নহে। অধিকাংশ কবির সময় নিরূপণ অসাধ্য ব্যাপার।

বাঙ্গালা রামায়ণের কবি বিস্তর। কিন্তু কৃত্তিবাস যে আদি, সে বিষয়ে সংশয় নাই। এখন কলিকাতা বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী-রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয়, আসল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস ওঝা দীর্ঘ পাঠান-রাজত্বের মধ্যে বৎসর কতকের স্বাধীন গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ বা কংশনারায়ণের সভা-কবি ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কৃত্তিবাস কবি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী লোক; এখনকার কৃত্তিবাসের অবয়বে যে নিতান্ত বৈষ্ণব-বৈরাগী-লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পরবর্ত্তী কবিগণের যোজনা। মহীরাবণ-অহীরাবণের পালা, রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা, বীরবাহু-তরণীসেনের কথা, রাবণের মৃত্যুবাণ-কাহিনী, হনু কর্ত্তৃক সূর্য্যদেবকে বগলদাবায় স্থাপন, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত রক্ষরাজের নীতি-উপদেশ প্রভৃতি অংশও তাই। কৃত্তিবাস-রচিত মূলানুযায়ী সংক্ষিপ্ত রামায়ণ-পুঁথির সঙ্গে পরবর্ত্তী শাক্ত-বৈষ্ণব কবিগণ নানা

পুরাণ-সঙ্কলিত এবং স্বকপোলকল্পিত প্রস্তাবাংশ ক্রমশঃ একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহা নহে, প্রাচীন কবির সাময়িক সহজ সরল ভাষা ও ছন্দকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। এখন নব পরিচ্ছদ পরাইয়া কৃত্তিবাসকে এমনতর দাঁড় করান হইয়াছে যে সে আদি কবিকে আর চিনিবার জো নাই। সর্ব্বশেষে যিনি এই সংশোধন ও যোজনাদি করিয়াছেন, তিনি মাত্র বৎসর ষাট পূর্ব্বের লোক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জনৈক অধ্যাপক --পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। ইনি কৃত্তিবাসের সরল পয়ার ছন্দকে চতুর্দ্দশ অক্ষরে বাঁধিয়া, ত্রিপদীকে হাল নিয়মে কসিয়া, আসলের দফা রফা করিয়া ফেলিয়াছেন। কত জয়গোপাল অপ্রকাশিত নামে কৃত্তিবাসের বিকৃতি সাধনে সহায়তা করিয়াছেন কে জানে? প্রাচীন কবি-গণের ভিতর একা কৃত্তিবাস কবিই "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়াছেন কি না, কে বলিতে পারে?

কৃত্তিবাসের পর অনন্ত-রামায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তার পর বোধ হয় ষষ্ঠিবর ও গঙ্গাদাস সেনের নাম আইসে; তার পর ভবানীদাস, ভবানী-শঙ্কর, কাশীরাম, দুর্গারাম, জগৎরাম, শিবচন্দ্র সেন, লক্ষ্মণ বন্দ্যো, রাম-গোবিন্দ, গোবিন্দদাস, মাণিকচন্দ্র, জগৎবল্লভ, ভিষক শুক্লদাস, ফকিররাম, দয়ারাম, রামপ্রসাদ, অদ্ভুত আচার্য্য, কবিচন্দ্র, শঙ্কর, রামমোহন, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি ২২ জনের উপর রামায়ণ-কবির নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রায় সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বের কবি রঘুনন্দনের "রাম-রসায়ন" খানি বেশ সুপপাঠ্য।

চণ্ডী-কাব্যের আদি কবি কে, স্থির করা কঠিন। এখন আমরা জানিতে পারিতেছি, দ্বিজ জনার্দ্দন নামক কবির অতি প্রাচীন এক সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর ব্রতকথা ছিল; বোধ হয় তাহা হইতে মাল-মশলা লইয়া মাধবাচার্য্য চণ্ডী-মঙ্গল রচনা করিযাছিলেন। তার পর বলরাম-কবিকঙ্কণ চণ্ডী-কাব্য রচনা করেন। মাণিক দত্ত নামে এক কবির মঙ্গল-চণ্ডী একখানি পাওয়া গিয়াছে, ইহাও বোধ হয় প্রাচীন। এ গুলির পর ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের হস্তে চণ্ডী বর্ত্তমান শ্রী ধারণ করিয়াছে। মুকুন্দ-রামের পর লালা জয়নারায়ণ আবার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কমলামঙ্গল-রচয়িতা হিসাবে আমরা গুণরাজ খান, শিবানন্দ কর, মাধবাচার্য্য, ভরত পণ্ডিত, পরশুরাম, দ্বিজ অভিরাম, জগমোহন মিত্র, রণজিতরাম দাস প্রভৃতির নাম পাই। সারদামঙ্গল-প্রণেতার মধ্যে দয়ারাম দাস ও গণেশমোহনের নাম দেখা যায়। (চণ্ডী কাব্যের ভিতরও একখানি "সারদামঙ্গল" পাওয়া যায়—মুক্তরাম সেনের রচনা)। গঙ্গামঙ্গল অনেক কবি রচিয়াছেন; মাধবাচার্য্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, কমলাকান্ত, জয়রাম দাস, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গঙ্গাবন্দনা-রচয়িতাদিগের মধ্যে আমরা কবিচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, নিধিরাম, অযোধ্যারাম প্রভৃতির নাম পাই। সূর্য্যের পাঁচালী-লেখকদিগের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস, রামজীবন বিদ্যাভূষণের নাম দেখা যায়।

সত্যনারায়ণের কথা বহু পূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গে প্রচলিত। সত্যপীরের পালা হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাবের নিদর্শন। অনেক হিন্দু-কবি এই মুসলমান-দেবতার বহু পালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—অনেক মুসলমান-কবিও হিন্দু দেব-দেবীর বিষয়ে বিস্তর চিত্তমুগ্ধকর সঙ্গীত রচনা করিয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাসে উদারতার এবং কাফের হিন্দুজাতির প্রতি প্রীতি-সহানুভূতির চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কাব্যও মিলে।

দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি মাধবাচার্য্য, দ্বিতীয় কবি কৃষ্ণরাম; আরও কতক আছেন।

মনসা, শীতলা, ষষ্ঠি, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায়, বাঁকুড়া রায় প্রভৃতি বাঙ্গালীর আপন ঘরের দেবতা। ইঁহাদের শাস্ত্র সংস্কৃতে বিরল, বঙ্গভাষাতেই লিখিত। ইঁহাদের পূজার পুরোহিত বঙ্গীয় গৃহস্থ-বধূ। ইঁহাদের ছড়া পাঁচালী মুখস্থ করা বাঙ্গালী গৃহস্থ-কুল-রমণীগণের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইদানীং শ্রীমান "মিস্রি বাবা"গণ বোধ হয় এ সকল ফুৎকারে উড়াইতেছেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হুসেন সাহার রাজত্বকালে মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন—সমগ্র গ্রন্থের নহে—সে অনুবাদের নাম দিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণবিজয়"। মালাধরের পথ অনুসরণ করিয়া মাধবাচার্য্য ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রভৃতি কয়েক জন ভাগবতের

অনুবাদ করিয়াছেন। ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথের অনুবাদ বোধ হয় সম্পূর্ণ। কবিচন্দ্র, অভিরামদাস, সনাতন চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস, জীবন চক্রবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর, দ্বিজ বংশীদাস, কবিশেখর, কবিবল্লভ, যশশ্চন্দ্র, যদুনন্দন, ভক্তরাম, আদিত্যরাম, নন্দরাম ঘোষ, গোপালদাস, দ্বিজ বাণীকণ্ঠ, দামোদর দাস, দ্বিজ লক্ষ্মীনাথ প্রভৃতি কয়েক জনের নামও অংশ-অনুবাদকের মধ্যে মিলে। ইঁহারা প্রায়শঃ দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, গোবিন্দ-মঙ্গল, গোপাল-বিজয়, গোকুল-মঙ্গল প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি উপাখ্যানানুবাদও আছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি কোন পুঁথিই মূলের অবিকল অনুবাদ নহে।

গৌড়মণ্ডলে বৌদ্ধ-রাজত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম পতনের পর, হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান কালে বোধ হয় শৈব-ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রথম মস্তক উত্তোলন করে। ধ্যানী-বুদ্ধ-মূর্ত্তি হইতে যোগীন্দ্র-মহেশ্বরের কল্পনা সাধারণ জনের পক্ষে অতি সহজ হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের পাল্লায় পড়িয়া দেব-দেব মহাদেব কি হীনবর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন! চাষা শিবের সহিত বাগ্দিনী-রূপিণী ভগবতীর শালীনতাহীন রসাভাস প্রাচীনত্বেরই নিদর্শন মনে হয়। কবিচন্দ্র-প্রণীত "শিবায়ন" এবং পরবর্ত্তী রামেশ্বরের 'শিব-সঙ্কীর্ত্তন" প্রাচীন "ধান ভানতে শিবের গীত" হইতেই সঙ্কলিত সন্দেহ নাই। রতিদেব, রাম-রায়-শ্যাম রায় ও রঘুরাম রায়ের "মৃগলুব্ধ" এবং শঙ্কর, দ্বিজ হরিহর ও দ্বিজ ভগীরথের "শিবমাহাত্ম্য"---এ গুলি আরও প্রাচীন গ্রন্থ। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বেকার প্রাচীন পুঁথি মিলিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গে নিম্নশ্রেণী জন-সাধারণের হাতে পড়িয়া বিকৃত রূপ ধারণ করতঃ "ধর্ম্মপূজা' চলিতেছিল। এই ধর্ম্মপূজার বিষয়ে বঙ্গভাষায় রামাই পণ্ডিতের কাব্য প্রথম—তাহার নাম "শূন্য-পুরাণ"। তার পর মাণিক গাঙ্গুলীর "হাকন্দ পুরাণ" ও ধর্ম্ম-পূজা-পদ্ধতির প্রাচীন গ্রন্থ। তার পর ময়ূরভট্ট ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন; তৎপরে খেলারাম এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহার পর রূপরামের কাব্য প্রচারিত হয়। এই সকল কাব্য হইতে উপকরণ

সংগ্রহ করিয়া ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" কাব্য লিখিয়াছেন। প্রভুরাম, সীতারাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, সেন পণ্ডিত, ইঁহারাও বোধ হয় ঘনরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। সহদেব চক্রবর্ত্তী ও "অনাদিমঙ্গল" প্রণেতা রামদাস আদক বোধ হয় ঘনরামের পরবর্ত্তী। বঙ্গভাষার আদি যুগের রচনা—যোগীপাল মহীপালের গীত, মানিকচাঁদের গান, গোবিন্দ রাজার গীত প্রভৃতি, কতকটা এই জাতীয় রচনা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভারতচন্দ্রের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে কবি কৃষ্ণরাম দাস "কালিকামঙ্গল" নামে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন। ইহারও পূর্ব্বে গোবিন্দদাস নামে কোন কবি "বিদ্যাসুন্দর" নামক এক কাব্য রচনা করেন, তাহাতে অশ্লীলতার লেশমাত্র নাই। কৃষ্ণরামের পর, ভারতচন্দ্রের স্বল্পদিন পূর্ব্বে, সাধক রামপ্রসাদ সেন "কবিরঞ্জন" নাম দিয়া বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন করেন। এই দুই কাব্য হইতে মাল-মসলা লইয়া মাজিয়া ঘসিয়া রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার সর্ব্বনেশে-সুন্দর কাব্য রচিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের পর পাগল-প্রাণারাম নামে আর একজন কবি এই বিষয়ে লেখনী চালাইয়া পাগলামী করিয়াছেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী, তাঁহার লীলা-কাহিনী ও তদীয় পারিষদবৃন্দ-সম্বন্ধে গ্রন্থ অসংখ্য। বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-ভাগবত" ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত"ই আমরা চিনি। লোচনদাসের "চৈতন্য-মঙ্গল"ও একখানি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থ। চৈতন্য-ভাগবতের নামও প্রথমে "চৈতন্য-মঙ্গল" ছিল, চৈতন্য-চরিতামৃতে এই নামই আছে। প্রবাদ আছে, লোচনদাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে কিছু বাক্-বিতণ্ডার পর, বৃন্দাবনদাসের পুঁথির নাম বদল হয়। "চৈতন্যমঙ্গল" নামে আরও একখানি গ্রন্থ আছে—কবি জয়ানন্দের রচিত। "গোবিন্দদাসের করচা"ও চৈতন্য-জীবন সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ভক্তি-রত্নাকর, প্রেম-রত্নাকর, শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী; প্রেমামৃত, অদ্বৈত-মঙ্গল, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী (ভাগবত), ভক্তমাল, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতি রাশি রাশি বৈষ্ণব-প্রেম-

ভক্তির পুঁথি মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালের রচনা ;—সে এক প্রেম-ভক্তির "হরির লুট।"

বৈষ্ণব-পদাবলী সংগ্রহও অনেকগুলি আছে। বাবা আউল মনোহর দাসের "পদ-সমুদ্র"ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বপ্রথম ; খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এ সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। ইহার পরেই রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত-সমুদ্র"। তাহার পর তদীয় শিষ্য বৈষ্ণবদাসের "পদকল্পতরু"। তৎপরে পদকল্পলতিকা, গীত-চিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, পদচিন্তামণিমালা, লীলা-সমুদ্র, পদার্ণব-সারাবলী, গীত-কল্পতরু প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সংগ্রহের নাম পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণের মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; তৎপরে গোবিন্দদাস ; তার পর জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায় শেখর, ঘনশ্যাম, রায় বসন্ত, যদুনন্দন, বংশীবদন ও বাসু ঘোষের নাম করিতে হয়। (১৬৫ জনের নাম মিলিয়াছে ; আরও আছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি)।

সম্প্রতি বঙ্গীয় বিবিধ সমাজের বহুসংখ্যক প্রাচীন কুলজী গ্রন্থ (প্রধানতঃ নগেন্দ্র বসু বাবুর চেষ্টায়) আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনের আখ্যায়িকা এই সকল পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। কুলজী-গ্রন্থের কতক কতক বল্লাল সেনের সময় হইতেই রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থ গত ৪০০ হইতে ১৫০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ পুঁথিও প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত—ইহার ভিতর কাব্য-রস পাওয়া যায় কি না জানি না, তবে স্থলে স্থলে রস আছে স্বীকার করা চলে। এই সঙ্গে একটা উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ; ত্রিপুরার মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের সময় (১৪০৭ – ১৪৩৯ খৃঃ) "রাজমালা" বঙ্গীয় পদ্যে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। ত্রিপুরার মহারাজগণ বঙ্গভাষার কিরূপ উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন, ইহা দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে ; কথিত আছে, প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বকাল হইতে ত্রিপুরা-রাজসভায় বঙ্গভাষা গৃহীত হইয়াছিল। গৌড়মণ্ডলের অন্য কোন রাজ-দরবারে বঙ্গভাষা এতাদৃশ সম্মানিত হইয়াছেন কি না অদ্যাবধি জানা যায় নাই। তবে, বঙ্গের অনেক রাজা মহারাজা যে বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট ছিলেন, বঙ্গীয় কবিগণকে বিবিধরূপে উৎসাহ প্রদান করিতেন—এমন কি কেহ কেহ স্বয়ং বাঙ্গালা

কবিতা রচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ মিলে। (সম্প্রতি আমরা "সাহিত্য-সংহিতা"র সুসম্পাদিপত্রি ৺ মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহের রচিত কাব্যের পুনরুদ্ধার দেখিতেছি)।

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকলহে বা স্ব স্ব ধর্ম্মপ্রভাব স্থাপন-উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। আবিষ্কৃত সকল পুঁথি এখনও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই; ক্রমশ লোক-লোচন গোচর হইবে আশা করা যায়। অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের তত্ত্ব নগেন্দ্র বাবু ও দীনেশ বাবুর সংগ্রহ হইতে সঙ্কলিত স্বীকার করিয়া রাখি।

অল্প দিনের ভিতর বঙ্গ-ভারতীর কৃতী সন্তান চারি পাঁচ জন বাঙ্গালীর চেষ্টায় এ যাবৎ যতগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি—প্রায় সমস্তই পদ্য-গ্রন্থ বা কাব্য অযত্নের অন্ধতমঃ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই কীটদষ্ট ছিন্ন জীর্ণ গ্রন্থগুলের নাম শুধু যদি উল্লেখ করিতে যাই, বোধ হয় দুই তিন ঘণ্টা সময় লাগিবে এবং আপনাদেরও বিশেষ বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। এখনও সংগ্রহ চলিতেছে, বিস্তর বাকি আছে, বুঝা যাইতেছে। মোটের উপর এইটুকু বলা যাইতে পারে অধুনা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারা গিয়াছে যে বাঙ্গালা ভাষাও যেমন (প্রবন্ধোল্লিখিত সমালোচকের ভাষায়) "Several years old," বঙ্গসাহিত্যও অন্ততঃ কাব্যভাগে তদনুরূপ বিশাল। শুধু প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ধরিলেও "Scanty literature" নহে। এই বিশাল প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য নাড়া-চাড়া করিতে করিতে হয় ত গণ্ডী "Mute inglorious Milton"এর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের বয়স কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর মাত্র। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিসনারীগণ শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত করেন। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি অধিকাংশই অধিক লোকের দৃষ্টি-পথের অতিথিলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহার উপর একে বাঙ্গালী বহু কাল পরাধীনতা বশতঃ তেজো-গর্ব্ববিহীন, তাহাতে কতকটা কূপমণ্ডুকধর্ম্মী; সুতরাং বাঙ্গালীর গৌরব করিবার সামগ্রী যেটুকু আছে, তাহাও লোক-সমাজে প্রচারিত হইতে পায়

নাই। হায়! কীটের আশ্রয়ীভূত হইয়া কালের স্বধর্ম্মে জলবায়ুর প্রকোপে জীর্ণ গলিত হইয়া এবং হয়ত অগ্নির কবলে পড়িয়া কত অমূল্য রত্ন লয়প্রাপ্ত হইয়াছে কে বলিতে পারে?

সম্প্রতি যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, সে সমস্ত ধরিয়া, বঙ্গের নূতন-পুরাতন কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ইহাকে কয়েকটি বিভিন্ন যুগে বিভাগ করিয়া লওয়া চলে।

প্রথম— { বৌদ্ধযুগ।—অর্থাৎ বৌদ্ধরাজগণ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইবার কিছু পূর্ব্ব ও পর সময়।
(খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।

ডাক ও খনার বচন।

কানুভট্ট প্রণীত—চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয় বোধিচর্য্যাবতার। (বোধিচর্য্যা-সমুচ্চয়?)

রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণ বা ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি।

গোবিন্দ রাজার গান; যোগীপাল মহীপালের গীত।

মাণিকচাঁদের গীত, প্রভৃতি—এই যুগের সাহিত্যের নিদর্শন।

দ্বিতীয়— { গৌড়ীয় যুগ।—হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগ। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব-সাহিত্য।
(দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত)।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী।

কাণা হরিদত্তের মনসার পাঁচালী।

কৃত্তিবাস ও দ্বিজ অনন্তের রামায়ণ।

সঞ্জয়, বিজয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত।

মালাধর বসুর শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়)।

বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ।

দ্বিজ জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডী, প্রভৃতি—এই যুগের সাহিত্যের নিদর্শন।

তৃতীয়— { শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য।—নবদ্বীপের প্রথম যুগ।
(ষোড়শ শতাব্দী—কিঞ্চিৎ পর সময় পর্য্যন্ত)

গোবিন্দ দাসের কড়চা। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত।

লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত।

ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিনী (শ্রীমদ্ভাগবত), ভক্তি-রত্নাকর, অদ্বৈত-মঙ্গল, প্রেমবিলাস ভক্তমাল। বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলী প্রভৃতি ; বৈষ্ণব-কাব্য-নিচয়—এই যুগের সাহিত্য-নিদর্শন।

চতুর্থ — সংস্কার যুগ।—(অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সকল কাব্যের পত্তন ছিল তাহার কতক কতক সুসংস্কৃত, বর্দ্ধিত ও পুনঃ নবীকৃত হয়। ব্রতকথা মঙ্গল-কাব্যে পরিণত হয়)।

(ষোড়শ শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত)।

মাধবাচার্য্য, বলরাম ও মুকুন্দরামের চণ্ডী।

কবিচন্দ্র, শঙ্কর ও রামেশ্বর প্রভৃতির শিবায়ন ও সত্যনারায়ণের কথা।

ক্ষেমানন্দ-কেতকাদাস প্রভৃতির মনসা-মঙ্গল।

ময়ূরভট্ট, মানিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতির ধর্ম্মমঙ্গল।

নানা কবির শীতলা মঙ্গল, কমলা-মঙ্গল গঙ্গা-মঙ্গল, শনির পাঁচালী, ষষ্টীর পাঁচালী, সূর্য্যের পাঁচালী প্রভৃতি লৌকিক ধর্ম্ম-কাব্য।

কাশীরাম দাস নিত্যানন্দ ঘোষ, ষষ্টিবর সেনের মহাভারত। অন্যান্য বহু কবির মহাভারতীয় অংশ বা আখ্যান বিশেষের অনুবাদ প্রভৃতি,—এই যুগের সাহিত্যের নিদর্শন।*

পঞ্চম — কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ।—নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

(অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত)।

মুসলমান-কবি আলোয়ালের পদ্মাবতী।

কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)। (সময়ে ঠিক না হইলেও, এই দুই গ্রন্থ ভাবে এই যুগের)।

রামপ্রসাদের কবিরঞ্জন (বিদ্যাসুন্দর), সঙ্গীতাবলী, কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর মানসিংহ), রসমঞ্জরী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা---প্রভৃতি ; এই যুগের সাহিত্যের নিদর্শন।

ষষ্ঠ— { আধুনিক যুগ। (প্রথমাংশ)
অষ্টাদশের শেষার্দ্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত —
(ইংরাজী শিক্ষার ভাবাবেশ হইবার পূর্ব্বকালীন ভাগ)।

রঘুনন্দন গোস্বামীর রাম-রসায়ন।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিনী। (সাবেক পাঁচালীর শেষ তান)।

আনন্দময়ী দেবীর হরি-লীলা। (স্ত্রীকবির রচনা বলিয়া উল্লেখ-যোগ্য)।

(ক)। গীতি-ভাগ ;— নিধু বাবুর টপ্পা। রাম বসুর বিরহ গান। হরুঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ, নিতাই দাস প্রভৃতি এক গঙ্গা কবি-ওয়ালার গীত। (ইঁহাদের মধ্যে আণ্টুনি ফিরিঙ্গী—ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া এবং যজ্ঞেশ্বরী—স্ত্রীলোক বলিয়া নাম উল্লেখ-যোগ্য)।

দাশরথী রায়ের ছড়া - পাঁচালী।

অনেক গায়কের সুমধুর কীর্ত্তন।

বহু কবির আগমনী, বিজয়া এবং শ্যামা-বিষয়ক গীত।

কথকের কথা ;— ঢপ, তরজা, টপ্পা, তুক্ক।

বহু অধিকারীর যাত্রার গান কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই-উন্মাদিনী প্রভৃতি পালা।

(খ) কাব্য-ভাগ ; - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতা। (ইনিই প্রাচীন দলের শেষ কবি)।

{ আধুনিক যুগ।—(দ্বিতীয়াংশ)
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতে এখন পর্য্যন্ত —
(ইংরাজী-শিক্ষার ভাবাবেশের পরবর্ত্তী কাল)।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম-সঙ্গীত এবং মদনমোহন—রঙ্গলালের নাম যোগে। গ্রহণ করিয়া আমরা বঙ্গীয় কাব্যাকাশের জ্যোতিষী

ভাস্কর মধুসূদনের শরণাগত হই ;—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র রবীন্দ্র,
দ্বিজেন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গ কাব্যের ইন্দ্র-চন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করি।
এখন বলা যাইতে পারে— বঙ্গ-কাব্য পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।'

বলা বাহুল্য, সকল যুগ হইতেই Survival of the fittest হইয়া, জনকতক মাত্র কালের খোপে টি'কিয়া থাকিতে পারিয়াছেন।

আমি কবিতা ও সঙ্গীতকে একত্র করিয়া পরিচয় দিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের প্রাচীন কাব্য সমস্তই সঙ্গীত কতক স্পষ্ট গান—অধিকাংশ পাঁচালী। তার পর আধুনিক যুগের প্রথমাংশ বিলকুল গান। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ-কবিতার সময় হইতে বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে অন্যের কবিতার আরম্ভ দেখা যাইতেছে। ইহার কতকাংশও গীতি-কাব্য আখ্যা পাইয়াছে।

কবিতা আগে কি গীতি আগে স্থির করা দুরূহ। উভয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ; বোধ হয় উভয়ে যমজ ভগিনী। সুন্দর গান কবিতাময় না হইয়া যায় না ; যথার্থ কবিতা—গীতিরই রূপান্তর মনে হয়।

অধুনা বঙ্গদেশ গীতি-কাব্যের অনন্ত উৎস ; কিন্তু মানিতে হয় সকল ধারায় ভাবের অন্ত খুঁজিয়া মেলা ভার। অধিকাংশ কবি এখনও বর্ত্তমান, সকলেই তাঁহাদের পরিচয় পাইতেছেন, নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রব্য-কাব্যের পরিচয়ই আমার দিবার কথা ; দৃশ্য-কাব্যের উল্লেখ আমার বিষয়ের অন্তর্ভূত নহে ; কিন্তু এই সঙ্গে দীনবন্ধু ও শ্রীযুক্ত গিরীশ-চন্দ্র ঘোষের নাম না করিলে অন্যায় হয় ; প্রকৃত কবিত্ব ইঁহাদের রচনায় দৃষ্ট হয়। আর গীত বা পদ্য না হইলে কবিতা হয় না, এমন কথা নাই ; গদ্যও (বিশেষতঃ উপন্যাস-নবন্যাস) উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে ; সেই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে বরেণ্য নাম বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ করিয়া ধন্য হই।

সাহিত্য-সভা।

PATRON:

THE HONOURABLE SIR EDWARD NORMAN BAKER,
K. C. S. I.
Lieutenant-Governor of Bengal.

VICE-PATRONS:

THE HONOURABLE A. EARLE, ESQ. I. C. S.—Offg. Secretary to the Home Department of the Government of India.

H. H. the Hon'ble Maharajadhiraj Sir Bijaychand Mahatab Bahadur K. C. I. E. of Burdwan.

PRESIDENT:

RAJA BINAYA KRISHNA DEB BAHADUR.

উদ্দেশ্য।

১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন।

২। সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষা-সমূহের চর্চ্চা, অনুশীলন এবং ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুরাতন ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্দ ও ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার।

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের গবেষণা ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন।

৪। নানা উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্নতত্ত্ব, গবেষণা ও সাহিত্যানুশীলনে

উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থ-সাহায্য প্রদান।

৫। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি, কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী অন্যান্য উপায়ের অবলম্বন।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণের দেয় চাঁদা অগ্রিম বার্ষিক ৬৲ টাকা।

সাহিত্য-সভা-কার্য্যালয়।
১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
সাহিত্য-সভার সম্পাদক।

সাহিত্য-সংহিতা।

(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা।)

ইহাতে বঙ্গের প্রধান প্রধান লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনা মূল্যে পাইয়া থাকেন। অপরের পক্ষে ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩৲ টাকা মাত্র।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
সাহিত্য-সভার সম্পাদক।

সাহিত্য-সভা গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ২য়।

বঙ্গের কবিতা।

দ্বিতীয় ভাগ।

(ইংরাজী প্রভাবের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত)

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।
প্রণীত।

—(১০:)—

সাহিত্য-সভা হইতে
শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

বঙ্গভাষানুরাগী—কাব্যামোদী

মান্যবর

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর

কে, সি, আই, ই ; কে, সি, এস, আই

বর্দ্ধমানাধিপতির

প্রতি

সম্মানের

নিদর্শন স্বরূপ

এই

গ্রন্থখানি

তদীয় নামে

সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত

হইল।

নিবেদন—
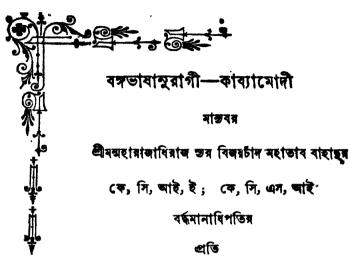
মুখপাতেই গ্রন্থকারের দু একটি কথা জানাইয়া রাখিবার আছে; এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ-বিশেষ বলা চলে

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ভাগ সম্বন্ধে যে সকল সুধীজন মাথা ঘামাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ভাণ্ডার হইতেই এই গ্রন্থে কিছু কিছু 'হরণ' দৃষ্ট হইবে,—তা অপহরণই বলুন আর আহরণই বলুন। শ্রীযুক্ত দীনেশ সেন বাবুই প্রকৃত ভাণ্ডারী, তাঁহার উপর দৌরাত্ম্যটা অধিক হইয়াছে।

যাঁহারা ইদানীন্তন সম্প্রকাশিত বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা রাখিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ ইহার ভিতর নূতন কিছুই পাইবেন না। স্থলে স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী সমালোচক মহাশয়গণের ভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে; সে সকল কাহারও কাহারও নিকট পুনরুক্তির অত্যাচার মনে হইতে পারে; তাঁহাদের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনীয়, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এ গ্রন্থ নহে।

বাঙ্গালা কাব্যাদির অনুশীলন যাঁহাদিগের নিকট সময়ের অপব্যয় বা অপব্যবহার মনে হয়, কিম্বা বাঙ্গালা ভাষাকে যাঁহারা নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, (সাহিত্য-সভাতেই একজন মান্য গণ্য পণ্ডিত সভ্য কোনদিন প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছিলেন 'আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করি'—), তাঁহাদের জন্যই প্রধানতঃ এই সংগ্রহ। বাঙ্গালা ভাষায়—বঙ্গের কবিতায় ভাল কিছু রচনা থাকিতে পারে, দেখাইয়া দেওয়াই সঙ্কলয়িতার মূল উদ্দেশ্য।

এই সংগ্রহের পাতা উল্টাইয়া মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগহীন কোন মহোদয়ের ভ্রান্ত ধারণা অপনীত হইবার যদি সম্ভাবনা ঘটে, সংগ্রহকারের সকল শ্রম সর্ব্বথা সার্থক হইবে।

এ খানি বঙ্গভাষার ইতিহাস নহে, কবিগণের জীবন-বৃত্তান্ত ইহার ভিতর বড় একটা নাই। এই গ্রন্থে ধারাবাহিক কালক্রমের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বিষয়-বিভেদ অনুসারে কবিগণের রচনার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে;—এইটুকুই ইহার নূতনত্ব।

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেবস্য।

সূচী।

(১) বৈষ্ণব সাহিত্য।

(পৃষ্ঠা।)

(২) অনুবাদ শাখা।

(৩) লৌকিক ধর্ম্মোপাখ্যান শাখা।

(৪) গীতি-সাহিত্য।

(ক) গ্রাম্য গীতি।

(খ) শক্তি-বিষয়ক (সাধক) সঙ্গীত।

(গ) কবিওয়ালা।

(ঘ) অন্যান্য গীত-রচয়িতা।

(ঙ) পাঁচালী ওয়ালার গান।

(চ) যাত্রা-ওয়ালার গান।

(ছ) নানা বিষয়ক গান।

(৫) অগেয় কবিতা।

"আজি গো তোমার চরণে জননি, আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান—
ভক্তি-অশ্রু সলিল সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান!"

বঙ্গের কবিতা।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলং।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীং॥"

যদি হরিস্মরণে মন প্রেমে সরস হয়, যদি বিলাসশাস্ত্র পাঠে কৌতূহল থাকে, তবে মধুর কোমল কমনীয় পদাবলীময় জয়দেবের বাণী শ্রবণ কর—এই মধুর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বঙ্গের আদি কবি তাঁহার অমর কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত কাব্যের মূলমন্ত্র ইহাই। বাঙ্গালী কথায় বলে—"কানু ছাড়া গীত নাই।" বাঙ্গালীর প্রকৃত কবিতা কানাইয়ের সহিত—কৃষ্ণলীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণবকবিগণই প্রকৃত কবি। জয়দেব গোস্বামী সেই বৈষ্ণবকবিগণের রাজা।

জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অদ্যাবধি ত্রিসন্ধ্যা এই গীতগোবিন্দের গান না শুনাইলে শ্রীধামে জগন্নাথদেবের সেবা ও পূজা সম্পূর্ণ নহে। বাঙ্গালীর এই আদি কাব্যের মহিমা অতুল। প্রবাদ আছে—গীতগোবিন্দের প্রাণ-উন্মাদিনী বাণী—"দেহি পদপল্লবমুদারম্"—শ্রীগোবিন্দের স্বহস্তলিখিত!

গীতগোবিন্দের রচয়িতা বলিয়া জয়দেব দেবসম্মান পাইয়া আসিতেছেন। আটশত বৎসর হইল তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছে,—অজয় নদী তীরে তাঁহার জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামে আজ পর্যান্ত তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতি মাঘী পূর্ণিমায় মহাসমারোহে এক মেলা বসিয়া থাকে, তথায় লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী সমবেত হইয়া ধর্ম্মের নামে কাব্যের এবং কবির সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

জয়দেবের মহাকাব্য শ্রীহরির অসীম গুণরাশির কোন্ গুণ গানে পরিপূর্ণ? "হরিস্মরণের" সঙ্গে সঙ্গে কবি "বিলাসকলার" উল্লেখ করিয়াছেন। শুনিলে প্রথমটা আমাদের চমকাইয়া উঠিতে হয়। হরিস্মরণের কথা উঠিলেই কাহাকে আমাদের মনে আসে? "যিনি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের স্রষ্টা ও পাতা, শাস্ত্রে যাঁহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে; যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রজ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বারম্বার আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ প্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জ্জনে একান্ত-মনে ধ্যান মনন ও অতিকঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বা মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ সংসারে বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিসর্জ্জন করিয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন; এইরূপে যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীস্থ সকল লোকেই অতি দুষ্কর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছে, সেই অনাদি অনন্ত অভিলষিত-ফলদাতা বিশ্বপাতা চরাচর-গুরু"—মহাভারতের মহাযোগীই ত আমাদের হৃদয়াকাশে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীহরির কথা হইলে আগে ত সেই ধ্রুব-প্রহ্লাদের আরাধ্য দেবতা, ভীষ্মার্জ্জুনের ধ্যান-ধারণার মহাপুরুষই ত আমাদের স্মৃতি-পদ্মে বিরাজ করেন। তাঁহার সহিত "বিলাসকলা"র সম্পর্ক কি?

এই বিলাসকলা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ

বুঝিতে হইবে—বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম। "এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম—ব্রজগোপীতত্ত্ব—মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্র ভাবে আছে, হরিবংশে ইহাতে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে; তাহার পর ভাগবতে আদি রসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে; শেষ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।"—(বঙ্কিমচন্দ্র)। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—তিন মহাপুরাণ মন্থন করিয়া এই ধর্ম্মের উদ্ভব বলিলে চলে।

এই ধর্ম্ম মতে—"ঋষিগণের প্রগাঢ় ভক্তিযোগ-সমন্বিত, দীর্ঘকাল-ব্যাপী উপাসনায় কৃষ্ণের যে তৃপ্তি না হয়, একটি অভিমানী ভক্তের মানভঞ্জনে তাঁহার তাহা অপেক্ষা শতসহস্রগুণে অধিক আনন্দ বোধ হয়।" পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদ-স্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥"

ভক্তের কথা হইতে "প্রিয়া" আসিয়া পড়িল।

প্রাচীন ভারতে নয়টী রস ছিল; শান্তিরস তাহার মধ্যে একটি, সেই শান্তি-রসের একটি শাখা ভক্তি রস।

ঈশ্বরে ভক্তি—হরি-ভক্তি বলিতে লোকে সচরাচর যাহা বুঝে, বৈষ্ণবগণ তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন—প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি প্রদর্শন পঞ্চ ভাবে হয়—সনকাদির ন্যায় শান্ত ভাবে, সাধারণ উপাসকের ন্যায় দাস্য ভাবে, সুবলাদির ন্যায় সখ্য ভাবে, যশোদাদির ন্যায় বাৎসল্য ভাবে, এবং ব্রজগোপীদিগের ন্যায় মাধুর্য্য ভাবে। ইহার মধ্যে মাধুর্য্যভাবই সর্ব্বোত্তম। এই ভাব—নায়িকা হইয়া নায়কের উপাসনা। এই ভাবে ভক্তিই ভক্তির চরম। এই ভক্তি হইতেই কৃষ্ণের "প্রিয়া" হওয়া যায়। পরিণীতা ভার্য্যা যে ভক্তিতে ধর্ম্মকামার্থ লাভের উদ্দেশে সহধর্ম্মিণী হইয়া আপন স্বামীকে আত্মসমর্পণ করে, সে ভক্তি এই মাধুর্য্য ভাবের অন্তর্গত নহে। কুলবধূ যেরূপ

প্রেমচাঞ্চল্যের বশীভূত হইয়া পরপুরুষের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়, ভক্ত যদি সেইরূপ প্রেমচাঞ্চল্যের সহিত লজ্জা ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব অর্পণ করে —শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহাই হইল এই মাধুর্য্য ভাব। ব্রজবিলাসিনী শ্রীরাধাই এই মাধুর্য্য ভাবের মূর্ত্তিমতী দেবী; প্রেমময় শ্রীচৈতন্যদেব এই ভাবের মূর্ত্ত অবতার।

রূপোল্লাস, পূর্ব্বরাগ, প্রেমবৈচিত্র্য, মান, অভিসার, বিরহ, মিলন, সম্ভোগ, রসালস, ভাব-সম্মিলন প্রভৃতি এই ভাবের অঙ্গ। কিন্তু ইহার ভিতর প্রধান কথাটাই বড় আশ্চর্য্য। কুলবধূর পরপুরুষের সহিত মিলন—কিন্তু তন্মধ্যে "কামগন্ধ" নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, কাম ও প্রেমে প্রভেদ আছে। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ ব্যক্ত করিয়াছেন—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোক-ধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম বেদ-ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ-সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম।
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজন করিব যত তাড়ন ভর্ৎসন।
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেম সেবন।
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণ-দৃঢ়-অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।"

(চৈতন্যচরিতামৃত—আদি)

এই প্রভেদ না বুঝিলে, বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যনিচয় বুঝিবার উপায় নাই। ইহা না বুঝিলে, বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী—বৈষ্ণব কবিগণের হৃদয়-উচ্ছ্বাসকে রুচিবাগীশ লোকদিগের সহিত আমাদিগকে বলিতেই হয়—"নিছক খেউড়।"

কোবিদকুলের কেহ কেহ কহেন,—প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের কবিতার—বিশেষতঃ জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। অনেক সুধীজন—এমন কি ইংরাজ কবি Edwin Arnold, ভাষাশাস্ত্রবিৎ ডাক্তার Grierson সাহেব পর্য্যন্ত জয়দেব-বিদ্যাপতির বিলাসকলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে—বৃন্দাবনবিহারিণী ব্রজগোপীগণের সহিত কৃষ্ণের যে বিলাস, সে বিলাস অর্থে ঐহিক সুখ—যে সুখ কিছুকালের নিমিত্ত আমাদের অন্তর আকর্ষণ পূর্ব্বক ভাবে বিভ্রান্ত করিয়া রাখে; রাধা-প্রেমই প্রকৃত ভূমানন্দ, পাপীতাপীর মন ক্ষণস্থায়ী ঐহিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে সেই আনন্দের দিকেই ফিরে। জয়দেবের পঞ্চ গোপী প্রকৃত পক্ষে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি এই পঞ্চ অনুভূতির শরীরী মূর্ত্তিমাত্র। ইঁহাদের মতে বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধিকার কৃষ্ণ-প্রেম বর্ণনায় রূপক দ্বারা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার ভালবাসা সম্বন্ধই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

পণ্ডিত গ্রীয়ারসন্ সাহেব বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"But his chief glory consists in his matchless sonnets (Pada) in the Maithili dialect, dealing allegorically with the relations of the soul to God under the form of love which Radha bore to Krishna. These were adopted and recited enthusiastically by the celebrated reformer Chaitanya."

(*Modern Vernacular Literature of Hindustan— by Grierson.*)

আরাধ্য ও আরাধকের সম্বন্ধ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-ভক্ত একজন পরম বৈষ্ণবের ব্যাখ্যাও এইখানে জানাইয়া রাখি ;—

আরাধ্য দেব কহিতেছেন—

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর গীত বংশীস্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এই মত জগতের সুখ আমা হেতু। রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥

(চৈতন্য চরিতামৃত—আদি)।

এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি প্রদর্শন তাঁহাদের নিকট ত সাধনার অঙ্গ; রাধাকৃষ্ণের বিহার বর্ণনায় অশ্লীলতা বা রুচিবিকারের আঘ্রাণ তাঁহারা ত পাইবেনই না।

সুকবি Edwin Arnold গৃহীত জয়দেবের পঞ্চগোপীতত্ত্ব শুনাই—

One with star-blossomed champac wreathed,
woos him to rest his head,
On the dark pillow of her breast
so tenderly outspread ;
And o'er his brow with roses blown
she fans a fragrance rare,
That falls on the enchanted sense
like rain in the thirsty air,
While the company of damsels wave
many an odourous spray,
And Krishna laughing, toying
sighs the soft Spring away.

Another gazing in his face
sits wistfully apart,
Searching it with those looks of love
that leaps from heart to heart;
Her eyes a-fire with shy desire,
veiled by their lashes black—
Speak so that Krishna can not choose
but send the messege back;
In the company of damsels
whose bright eyes in the ring
Shine round him with soft meanings
in the merry light of Spring.

The third one of that dazzling band
of dwellers in the wood—
Body and bosom panting with
the pulse of youthful blood—
Leans over him, as in the ear
a lightsome thing to speak,
And then with leaf-soft lip imprints
a kiss below his cheek;
A kiss that thrills, and Krishna turns
at the silken touch
To give it back,—Ah Radha!
forgetting thee too much.

And one with arch smile beckons him
away from Jumna's banks,
Where the tall bamboos bristle
like spears in battle ranks;
And plucks his cloth to make him
come into the mangoe-shade,
Where the fruit is ripe and golden

and the milk and cakes are laid ;
Oh ! golden-red the mangoes,
and glad the feasts of Spring,
And fair the flowers to lie upon
and sweet the dancers sing.

Sweetest of all that Temptress
who dances for him now
With subtle feet which part and meet
in the *Ras* measure slow,
To the chime of silver bangles
and the beat of rose-leaf hands,
And pipe and lute and cymbal
played by the woodland bands ;
So that wholly passion-laden
eye, ear, sense, soul o'ercome—
Krishna is theirs in the forest ;
his heart forgets its home.

জয়দেবের কাব্যে আদ্যোপান্ত এই আধ্যাত্মিক অর্থ মিলাইতে পারা যায় কি না জানি না ; কিন্তু তাহা না হইলেও ভাষার কমনীয়তায়, বর্ণনার ঐশ্বর্য্যে, (বৈষ্ণবীয়) ভাবের মাধুর্য্যে গীতগোবিন্দ ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত হইলেও, বুঝা যায়, তিনি যখন তাঁহার অমৃত-নিষ্যন্দিনী কাব্য রচনা করিয়াছেন, তখন আমাদের ব্যবহৃত এখনকার এই বঙ্গভাষা দেশের লোকের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার ভাবে বাঙ্গালী জাতি আজিও বিভোর।

জয়দেবের গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়—
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ; ভক্ত কামনা করিয়াছিল—

"রময় ময়া সহ কেশীমথনমুদারম্"

তিনি তাহাদের আশা মিটাইয়াছিলেন; আমরা দেখিয়াছি তিনি

"শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাং।
পশ্যতি সস্মিত চারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাং॥"

কৃষ্ণ কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেছেন, কাহাকেও চুম্বন করিতেছেন, কাহাকেও বা সস্মিতবদনে সুন্দর অবলোকন করিতেছেন; কোন রামাকে আনন্দিত করিতেছেন এবং অনুরাগ ভরে অপর কোন রামার অনুগমন করিতেছেন।

তাঁহার আদর্শ ভক্ত—শ্রেষ্ঠ অনুরাগিনী—রাসরসময়ী রাধা; শ্রীরাধার জন্য তিনি কি করিয়াছেন, কি করিতে পারেন, কবির আপন ভাষায় তাহার পরিচয় লউন। দেখা যায়, "মুনীজনমানসহংসের" ভৃগুপদ-লাঞ্ছিত বক্ষঃস্থল প্রণয়িণীর চরণালক্তকে রঞ্জিত হইয়া ত ছিলই, সেই শ্রীচরণ ক্রমে ভগবানের শিরোমণ্ডন হইয়া উঠিয়াছে! কি সাধনা! ভক্তের মান ভাঙ্গাইতে আরাধ্য দেবতা সাধিতেছেন—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী।
হরতি দরতিমিরমতি-ঘোরং॥
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং॥
প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়নশরঘাতং।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং।
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি ভবজলধিরত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নং।

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ-রূপং।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশং।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশং॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগং।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥
ইতি চটুলচাটুপটু চারুমুরবৈরিণো
রাধিকামধিবচনজাতং।
জয়তি পদ্মাবতি-রমণ জয়দেবকবি-
ভারতী ভণিতমতিশাতং॥

প্রিয়ে চারুশীলে, আমার প্রতি অকারণ-মান পরিত্যাগ কর; দেখ, তোমার দর্শন মাত্রেই মদনানল আমার মানস দগ্ধ করিতেছে; আমায় তোমার মুখ কমলের মধু পান করিতে দাও; অয়ি, যদি প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত একটি মাত্রও কথা কও, তবে তোমার দশন-জ্যোতিরূপ জ্যোৎস্নায় আমার ঘোরতর ভয়রূপ তিমির বিনষ্ট হইবে; তোমার বদন-চন্দ্রমা আমার নয়ন-চকোরকে মনোহর অধর-সুধা-পানে প্রলোভিত করিতেছে।

হে সুদশনে, যদি সত্যই আমার উপর কুপিতা হইয়া থাক, তবে

তোমার খর নয়নশরাঘাতে আমায় জর্জ্জরিত কর, ভুজপাশে বন্ধন কর এবং দশনাঘাতে ক্ষত বিক্ষত কর, তোমার যাহাতে সুখ হয় তাহাই কর।

তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার পক্ষে সংসার-সমুদ্রের রত্নস্বরূপ। আমার হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ যে তুমি সতত আমার প্রতি অনুরাগবতী হও।

হে কৃশাঙ্গি, তোমার নীলোৎপলশ্যাম-লোচনযুগলও রক্তোৎপলের রূপ ধারণ করিয়াছে, এখন যদি কৃষ্ণকে সানুরাগে অবলোকন করিয়া রঞ্জিত কব, তবে উহার অনুরূপ কার্য্য করা হয়।

কুচকলসের উপর মণিময় হার চঞ্চল হইয়া তোমার হৃদয়দেশকে রঞ্জিত করুক; মেখলাও ঘন জঘনমণ্ডলে শব্দায়মান হইয়া মন্মথের আজ্ঞা ঘোষণা করুক।

হে স্নিগ্ধমধুরভাষিণি, একবার আমায় আজ্ঞা কর আমি এই রতিরঙ্গের পরম সহায়, স্থলপদ্মের পরাভবকারী এবং আমার হৃদয়রঞ্জন তোমার চরণযুগলকে সরস অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি।

স্মরগরলের খণ্ডনকারী তোমার এই উদার পদপল্লব আমার মস্তকে প্রদান কর, ইহা আমার শিরোদেশের ভূষণস্বরূপ হউক; দারুণ মদনানল আমার দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে, তোমার চরণ-কৃপায় সে সন্তাপ দূর হউক।

মুরারির রাধিকার প্রতি বিবিধ প্রকার মনোরম চাটু-উক্তি স্বরূপ পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবির এই অতি বিশদ বাক্য উৎকর্ষ লাভ করুক।

আমরাও বলি—তথাস্তু।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব কবি বৃন্দাবনলীলা গাহিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশ বা গৌড়মণ্ডল স্বাধীন। প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজা লক্ষ্মণসেন তখন পঞ্চগৌড়েশ্বর। বাঙ্গালী জাতি সে সময়ে কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছিলেন, এই মাধুর্য্য রসের ছড়াছড়ি হইতেই কতকটা বুঝা যায়। এই সময়ের অল্পদিন পরেই বঙ্গের ভাগ্যবিপর্য্যয়

ঘটিল। কাশী-কণোজ-বিজয়ী লক্ষণ সেনের পৌত্র বৃদ্ধ রাজা লাক্ষ্মণেয় সভাসদ্মুখে শুনিয়াছিলেন, যবন কর্ত্তৃক গৌড় রাজ্য অধিকৃত হইবে; দেখিলেন যবন আসিয়াছে, খিড়কী দ্বার দিয়া নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে তীর্থ-যাত্রা করতঃ শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করিলেন। যাহাই হউক, ইহার পর ২৫০। ৩০০ বৎসর গৌড়মণ্ডলে বৃন্দাবন-লীলা কি কোন লীলারই আর বড় উচ্চবাচ্য শুনা যায় না।

প্রায় তিন শত বৎসর পরে, পঞ্চ-গৌড়ান্তর্গত মিথিলার এক রাজ-দরবারে এবং ভারতী দেবীর লীলাক্ষেত্র বীরভূমির এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে প্রায় একই সময়ে জয়দেবের সেই সুপ্ত বীণার তন্ত্রীতে আবার ঝঙ্কার উঠিল। তান আরও কোমল, আরও মধুর, আরও মর্ম্মস্পর্শী। আবার সেই বিরহিনী রাধা, মানময়ী রাধা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, অভিসারিকা, উন্মাদিনী প্রেমের পুতলী রাইকিশোরী ফুটোন্মুখ পদ্মের মত আমাদের মানস-সরোবরে ভাসিতে থাকেন।

রাধা কুলবধূ, ঘরে বিধবা শাশুড়ী ননদিনী আছে, তাহারা অভীষ্টপথে অন্তরায়। তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া প্রেমিকাকে প্রেম-যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিতে হইয়াছিল! সে প্রেম-পাগলিনীর বয়স কত জানিতে কি আপনাদের কৌতুহল আছে? রাজকবি ইঙ্গিতে আভাস দিয়াছেন—

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই; ক্ষণে ক্ষণে বসন ধূলী তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস। ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে কর বাস॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ। মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর। ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট। লখই ন পারই জ্যেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান। তরুণিম শৈশব চিহ্নই ন জান॥

তরুণী কি বালিকা চিনিতে পারা কঠিন!

রাধাসুন্দরীর রূপের পরিচয়ও বোধ হয় আপনারা চাহেন, কবির কথায় বুঝিতে পারেন কি না দেখুন—

কবরী ভয়ে চামর গিরিকন্দরে, মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গতি ভয়ে গজ বনবাস॥
সুন্দরি, কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ভয়ে ইহ সব দূরহি পলায়ল, তুঁহু পুন কাহে ডরাসি॥
কুচ ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু, ঘট পরবেশে হুতাসে।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু, শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ ভয়ে কনক-মৃণাল পঙ্কে রহু, কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন কহব মদন প্রতাপে॥

বুঝিলেন কি? বোধ হয় হইল না; এ ত ভারতীয় সাহিত্যের কতকগুলা বাঁধাবাঁধি উপমার মামুলী বুলী। তবে দেখুন কবির অন্য কথায় বুঝিতে পারেন কি না—

যব্ গোধূলী সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ পসারিয়া গেলি॥
ধনি অলপ বয়সী বালা জনু গাঁথনী পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল বাড়ল মদন জ্বালা॥
গোরি কলেবর নূনা জনু আঁচরে উজর সোনা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণি দুলহ লোচন কোণা॥
ঈষৎ হাসনি সনে মুঝে হানল নয়ন-বাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

এই গাঁথনি পুষ্পমালা—আঁচলে বাঁধা উজ্জ্বল সোণাটুকুকে বুঝিতে পারিলেন কি? বোধ হয়, আরও একটু স্পষ্ট পরিচয় পাইলে আপনারা খুসী হন; কবি আপনাদের বঞ্চিত করেন নাই—

সজনি, ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি আধই নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি তব্ ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কণক কটোরা অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন পাশ পসারল কাম॥

দশন মুকুতা পাঁতি অধর মিলায়ত মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ হেরি হেরি না পুরল আশা॥

এখনও আশা মিটিল না, আকাঙ্ক্ষাই থাকুক্।

বিদ্যাপতির রাধা "অলপ-বয়সী বালা;" তাহাকে সব শিখাইয়া দিতে হয়। প্রেমের পাঠশালে অন্তরঙ্গ সখীজনই তাহার "গুরুমহাশয়"; সরলার "হাতে খড়ি" হইতেছে—

শুন শুন মুগুধিনি মঝু উপদেশ। হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ। বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ। দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি। কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্ধ। দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহিক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব। রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব। যো গুণবন্ত সোই ফল পাব॥

নবীন "পড়ুয়াটি" রীতিমত পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলেন, কবি পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন। "প্রেম" কাহাকে বলে, তাহাব পাঠও তিনি পাইতেছেন—

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী। প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দাহিতে কণক দ্বিগুণ হোয় মুল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত। যৈছন বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি। সকল কণ্ঠে নহে কোকিল বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত। সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী। প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

প্রেমের "বর্ণপরিচয়ে" স্বরের 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত সবই তাঁহার শিক্ষা হইতেছে—

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ। তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি। দিনে দিনে চান্দকলা সম বাড়ি॥
তুঁহু যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত। বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুঁহু যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ। চৌরী পিরিতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥

সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ। আর তঁহে অনুরত বরজ সমাজ ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ। রূপগুণবতীকা ইহ বড় কাজ ॥

সাদাসিধা প্রেম নয়, "চৌরী পিরিত"—লুকাচুরী প্রেমই বড় রঙ্গদার, এবং "রূপগুণবতীর" সেটা ভারি কর্ত্তব্য কাজ !

কবি বিদ্যাপতির বর্ণনা-শক্তি বাস্তবিক চিত্তমুগ্ধকর ; এক একটি ছত্রে এক একখানি জীবন্ত ছবি ফুটিয়া উঠে—

"নুপুর রুণুঝুণু আওত কান"

কিংবা—

"নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত"

পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন মূর্ত্তি আমাদের নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত !

"চমকি চললু ধনী চকিত নেহারি"

পাঠকালে মনে হয় না কি আমাদের চোখেই একবার যেন বিজলী চমকাইয়া গেল ?

কবির এক একটি উপমার যোড়া মেলা দুষ্কর—

"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার।"

অথবা—

"চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণি অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল অলি ভরে উলটায় ॥"

উজ্জয়িনী-কবির স্মৃতিই উদ্রেক করে।

বিদ্যাপতির অলঙ্কারময়ী কবিতার ভাব, বর্ণনার বৈচিত্র্যে যেন বিমানবিহারী স্বর্গীয় কিছু—"ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটী।"

কবি দৈব-শক্তি বলে হৃদয়-অন্তঃপুরের সমস্ত সংবাদই অবগত। কিশোরী সুন্দরীর রূপের পরিচয় ত কতকটা পাইয়াছেন, অন্তরের পরিচয়ও

কিঞ্চিৎ বোধ হয় ইচ্ছা করেন? প্রাণ যাহাকে চাহে, পাইতেছে না, প্রাণপ্রিয় কোথায় দূর দেশে; উন্মাদিনীর হৃদয়-ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—

এ সখি হামারি দুঃখের নাহিক ওর।

এ ভরা বাদর	মাহ ভাদর	শূন্য মন্দির মোর॥
ঝঞ্ঝা ঘন	গরজন্তি সন্ততি	ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন	কাম দারুণ	সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শতশত	পাত, মোদিত	ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী	ডাকে ডাহুকী	ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্‌ভরি	ঘোরা যামিনী	অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ	কৈছে গোঙায়বি	হরি বিনে দিন রাতিয়া।

এমন বর্ষা—কান্ত নাই কাছে—ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে! অনেক কষ্টের পর বিরহিনীর হৃদয়রাজকে পাইবার যোগাড় হইয়াছে, আনন্দ আর ধরে না—

আজু রজনী হাম্‌	ভাগ্যে পোহায়নু	পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন	সফল করি মাননু	দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ	গেহ করি মাননু	আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে	অনুকূল হোয়ল	টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল	অব্‌ লাখ ডাকউ	লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব্‌	লাখবাণ হউ	মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব্‌ মঝু যবহু	পিয়া সঙ্গ হোয়ত	তব হি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ	অলপভাগী নহ	ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

বিরহে যে সমস্ত বস্তু বিষ মনে হইতেছিল, মিলনে সেই সকলই অমৃত প্রতীয়মান হইতেছে!

নূতন প্রেমের আঁচ্‌ লাগিয়াছে, "মন্দ-শ্রাবদনী ধনী" একটুতে কাঁদিয়া ভাসায়, একটুতেই আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে! যেন পাগলিনী! পাগলিনী কিসের পাগল তাহারও পরিচয় কবি দিয়াছেন—

সে জিনিষটা কি, বুঝা বড় কঠিন ; প্রেমিক-প্রেমিকাগণ নিজেই বুঝিতে পারেন না। তাহার নাম অনেক—কাম, প্রেম, অনুরাগ, পিরিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহাতে কখনও

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ॥"

কখন বা—

"লোচন লোর তটিনী নিরমাণ।
ততহি কমলমুখী করত সিনান॥"

আপনার চেখের জলে আপনাকেই ভাসিতে হয়।

বিদ্যাপতির রাধা সে জিনিষটা কি বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।

সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নৌতুন হোয়॥
জনম অবধি হম্ রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঙাইনু না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥
কত কত রসিকজন রসে অনুমগন অনুভাব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥

প্রকৃত প্রেমিক লক্ষ জনের মধ্যেও একটি মিলে না, রসিক হইলেই ত প্রেমিক হয় না।

কবি বুঝাইয়াছেন—

"প্রেম কারণ জীউ উপখয়ে জগজন কো নাহি জানে।"

আপনারা সামগ্রীটা বুঝিয়া থাকেন ভাল, নহিলে আপাততঃ আমরা

চার। এখন আমরা নায়ক নায়িকার মিলন দেখিয়া বিদ্যাপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি।

মধুর বসন্ত—

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।

নটতি কলাবতী	শ্যাম সঙ্গে মাতি	করে কর তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগ মগ ডম্ফ	ডিমিকি ডিমি মাদল	রুণু ঝুণু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি	বলয়া কণয়া মণি	নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণ রবাব	মুরজ স্বরমণ্ডল	সা রি গা মা প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি	মৃদঙ্গ গরজনি	চঞ্চল স্বরমণ্ডল কর রাব॥
শ্রমভরে গলিত	লোলিত কবরীযুত	মালতীমাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত	রাস রস বর্ণনে	বিদ্যাপতি মতি ক্ষোভিত হোতি॥

রাজসভার কবির পরিচয় পাইয়াছেন, আসুন এইবার সেই সময়কার দরিদ্র গ্রাম্যকবির একটু পরিচয় লইবার প্রয়াস পাওয়া যাক্।

চণ্ডীদাসের রাধিকার কিছু বয়স হইয়াছে মনে হয়। তিনি "কো কহে বালা কো কহে তরুণী" নহেন। তাঁহার রূপের পরিচয়—

সখা হে, ও ধনী কে কহ বটে।

গোরোচনা গোরী	নবীন কিশোরী	নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ	সুবল সাঙ্গাতি	কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে	বসি তার নীরে	পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন	কৈরাছে আসন	আলাএলা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে	হেম হার দোলে	সুমেরু শিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে	নিতম্ব তটিতে	পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার	কলঙ্ক চাঁদার	শরণ লইল আসি॥
কিবা সে দুগুলি	শঙ্খ ঝলমলি	সরু সরু শশীকলা।
সাঁজেতে উদয়	শুধু সুধাময়	দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল সাড়ী	নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি	পরাণ সহিত মোর।

সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির মনোরথ জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে শুন হে নাগর চাঁদা।
সে যে বৃষভানু- রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা॥

সুন্দরী নাহিয়া উঠিয়া পরিধান-সাটী নিঙ্গড়াইতে নিঙ্গড়াইতে চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে নাগরের প্রাণ মোচড় খাইতেছে!

"বিনোদিনী" বিনোদ-বরের নাম-মাহাত্ম্য বিলক্ষণ বুঝেন; তার উপর প্রথম হইতেই যৌবন দান করিবার কথা পাড়িয়াছেন—

সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম?

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাশরিব করি মনে পাশরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে আপনার যৌবন যাচায়॥

এমনই নামের গুণ! আমরা পরে দেখিব—'এই নামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।'

যৌবনবতী "অবলা অথলা" একেবারে মুগ্ধ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন—

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান। অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি। বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেওলি। এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোর নিদারুণ হও। মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়। পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

এমন সাধনা না হইলে কি উপাসকের উপাস্য দেবতা মিলে?

চণ্ডীদাসের রাধা প্রাণমন অর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। অন্তরের ভাব বিকাশে—মর্ম্মের করুণ তন্ত্রীতে আঘাত করিতে কবির ক্ষমতা আশ্চর্য্য—

বঁধু কি আর বলিব আমি।

মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাহি দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি॥

আপ্ত বন্ধু কাহাকেও ত আর আপনার মনে হয় না। অকপট প্রেমের এমনই মোহ! আন্তরিক ভক্তির এমনই একাগ্রতা!

সংসার-জ্ঞানশূন্যা সরলার তন্ময়ত্ব জগতে দুর্লভ। চণ্ডীদাসে ভাবের গভীরতা অতুলনীয়—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।

দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ-গোয়ালিনী হাম অতি হীনা না জানি ভজন পূজন॥
পিরিতি রসেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুঃখ।

বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম তোমার চরণ খানি॥

কামও প্রেমের প্রভেদ রাধাই দেখাইয়াছেন।

ইহা বুঝিলে ত তবে—"কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।" ইহাইত—"লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম"—সর্ব্বস্ব অর্পণ?

"পিরিতি" জিনিষটা কি—সবাই ত বুঝে না, চণ্ডীদাসের রাধা বেশ বুঝিয়াছেন—

পিরিতি পিরিতি সব জন কহে পিরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরিতি নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরিতি অন্তরে পিরিতি মন্তরে পিরিতি সাধিল যে।
পিরিতি রতন লভিল সে জন বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে পিরিতি মিলয়ে তারে॥
পিরিতি সাধন বড়ই কঠিন কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও থাকিলে পিরিতি আশ॥

বাস্তবিক কঠিন সাধন! রাধার পিরিতি "ইয়ারকি"র সামগ্রী নহে। কবি গাহিয়াছেন—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি দুঃখ যায় তার ঠাঞি॥

এই পিরিতি-মন্ত্র-মুগ্ধাকে কাহাকেও কিছু শিখাইতে হয় না; বিরহ-কণ্টক ঘুচাইবার উপায় তিনি আপনি বাত্‌লাইয়া দিতে পারেন—

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুখায়ল তিয়াষে পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি কানুর কর।

আপনা বলিয়া বোল না তেজবি মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে বিহি সে করল বাদ ॥
সখি, হাম্ সে অবলা তায়।
বিরহ আগুণ হৃদয়ে দ্বিগুণ সহন নাহিক যায় ॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে, করিবি দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ ॥

মর্ম্মস্পর্শী ব্যাকুলতা !

সাজানো বাগানের উদ্যান-লতায় আর স্বভাব-বর্দ্ধিতা বন্যলতিকায় কিছু প্রভেদ আছে। বিদ্যাপতি রাজসভা উজ্জল করিতেন, চণ্ডীদাস গৃহস্থের আঙ্গিনায় ফিরিতেন। বিদ্যাপতির রাধা রাজার নন্দিনী প্যারী—আদুরে মেয়ে—ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত; চণ্ডীদাসের রাধা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-বধূ; তিনি আপনি দুঃখ করিয়াছেন—

কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী পিরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে ॥

শ্যাম-গুণমণি তাঁহার উপযোগী নাগর। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কখনও সাপুড়ে সাজিয়া, কখনও নাপ্‌তিনীর বেশ ধরিয়া, কখন বা বাঁশ-বাজী খেলিয়া কাজ আদায় করেন। গ্রাম্য-কবির হাতে নাগর-চূড়ামণি গ্রাম্য "নাটের গুরু" হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার পিরিতিও ক্রমে বিষম "একঘেয়ে" হইয়া দাঁড়াইয়াছে মনে হয়। যখন আমরা শুনিতে পাই—

বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে নিরমান কৈল 'পি'।
রসের সাগর মন্থন করিতে তাতে উপজিল 'রি' ॥
পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল তাহে ভিয়াইল 'তি'।
সকল সুখের এ তিন আখর তুলনা দিব যে কি ॥

শুনিতে শুনিতে আমাদের পিরিতির উপর কতকটা যেন বিতৃষ্ণা জন্মিয়া উঠে। অনবরত মধু আস্বাদনে মুখ মারিয়া যায়।

কিন্তু এই পিরিতি যে যথার্থ কি, বুঝিয়া ওঠা অতি শক্ত। রাধার পিরিতি বরং বুঝা যায়, কবির ব্যাখ্যা আয়ত্ত করা কঠিন সমস্যা। বাশুলী দেবীর মন্দির-পরিচারিকা রজকিনী রামীর সহিত পূজারী-ঠাকুর ব্রাহ্মণবটু চণ্ডীদাসের সম্পর্ক কি ছিল, আমরা জানি; এই সম্পর্কের জন্য আত্মবন্ধু-সমাজে কবি "একঘরে" হইয়া ছিলেন; সেই রামী ওরফে রামতারা ধোপানীকে সম্বোধন করিয়া ব্রাহ্মণ-কবি গাহিয়াছেন—

শুন রজকিনী রামী।

ও দুটি চরণ	শীতল জানিয়া	শরণ লইনু আমি ॥
তুমি রজকিনী	আমার রমণী	তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন	তোমার ভজন	তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
তুমি বেদবাদিনী	হরের ঘরনী	তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে	ত্রিসন্ধ্যা যাজনে	তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনীরূপ	কিশোরী স্বরূপ	কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম	নিকষিত হেম	বড় চণ্ডীদাসে গায় ॥

এ সকল শুনিয়া আমাদের 'পিরিতি' সম্বন্ধে—কাম ও প্রেম সম্বন্ধে—অকূল পাথারে দিশেহারা হইতে হয়। এ সকল "সহজিয়া" ধর্ম্মের অতি অসহজ বিবৃত্তি। "রাগাত্মিক" পদের বিষম "রাগ।" অবশ্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাধুর্য্যরসের রসিক ভক্তগণ বলিবেন—ইহা উপাসনা-রস, ইন্দ্রিয়-লিপ্সার ঊর্দ্ধে। ইহা যে রস-বিশেষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু এক একবার মনে হয়, ভক্তি-রস দুর্গম পথে গড়াইতেছে।

এই সকল ভক্ত কবিগণ—তাঁহাদের কবিতার নায়ক যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—সে বিষয়ে ত সন্দেহ করিতেন

না। জয়দেবের গীতগোবিন্দে তিনি "সাকাঙ্ক্ষ-পুণ্ডরীকাক্ষ," "ধৃষ্ট-বৈকুণ্ঠ," "নাগর-নারায়ণ" রূপে বর্ণিত হইলেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাকেই কবি স্তুতি করিয়াছেন—

সান্দ্রানন্দ-পুরন্দরাদি-দিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরাৎ
আনম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরং।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাসমাদরে প্রণত হওয়ায় তাঁহাদের মুকুটস্থ ইন্দ্রনীলমণি যে চরণ-কমলে ভ্রমরের ন্যায় শোভিত হয়, মকরন্দ-মনোহর মন্দাকিনী অবিরলধারে বিগলিত হইয়া যে পাদপদ্মকে স্নিগ্ধ করে, আমি অশুভ বিনাশার্থ শ্রীগোবিন্দের সেই চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

বিদ্যাপতিতেও "গোপ গোঙার" "ঢীট নাগর চোর" "বানর কণ্ঠে কি মোতিম মাল" প্রভৃতি সম্ভাষণ থাকিলেও কবি সেই হরির স্তব গাহিয়াছেন—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময় অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙাইনু জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতনু তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি ভব-তারণ ভার তোহারা॥

চণ্ডীদাসের মুখেও কিছু আগে আমরা শুনিয়াছি—

"অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন।"

আর বিশেষতঃ জগত-পাবন শ্রীচৈতন্যদেব পথে ঘাটে এই সকল গীত গাহিয়া যখন পাপীতাপীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করতঃ উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তখন স্বীকার করিতেই হয়, এই সকল গানে—

অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জং।
চণ্ডি রণিতরসনারবডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জং॥

"আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি, তোমার এই সুন্দর তনু সম্প্রতী রতি-রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে; চণ্ডি, লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেখলারূপ ডিণ্ডিম বাজাইয়া সানুরাগে যুদ্ধে অগ্রসর হও"— এমন সব কথা থাকিলেও এই সকল কবিতার বিলাসকলার ভিতর কি একটু আছে, যাহা অভক্তের—অরসজ্ঞের সহজ চক্ষে প্রতিভাত হয় না।

চৈতন্য-চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"*

দেখা যাইতেছে,—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—ইহারা মহা-প্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের মাধুর্য্যরসের রসিক। শেষোক্ত কবিদ্বয় শতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী, গোস্বামী ঠাকুর তিন শতাব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী।

---

* রায়ের নাটক গীতি—রামানন্দ রায়ের রচিত "জগন্নাথ বল্লভ" নাটকের গান। কর্ণামৃত—শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রচিত "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থ।

এই মধুর রস নবদ্বীপচন্দ্রের আবির্ভাবের তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে গৌড়মণ্ডলে ঝরিতেছে।

একটা বিষয় একটু অবধান-যোগ্য। গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী এই তিনজন কবি মধুর রসের সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ, তাহাই তাঁহারা গান করিয়াছেন; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রসে বড় একটা হস্তক্ষেপ করেন নাই।

যে তিনজন কবির ঈষৎ পরিচয় দেওয়া হইল, ইঁহাদের অন্যান্য রচনাও আছে, কিন্তু ইঁহাদের রচিত পদাবলীই বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্য উজ্জল করিয়া রহিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিমালাই আজ পর্য্যন্ত ইঁহাদের নাম জাজ্বল্যমান করিয়া রাখিয়াছে। জয়দেবের রচনা সহজ সরল তরল সংস্কৃত, বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিলী, চণ্ডীদাসের ভাষাই আমাদের খাঁটি বাঙ্গালা। অবশ্য পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালা।

মিথিলা বা বেহার বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়াই মিথিলাবাসী, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী কবি, মৈথিলী ভাষা বঙ্গভাষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য; মিথিলার সহিত আমাদের অন্যান্য সম্পর্ক ও কম নহে।

বিদ্যাপতি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কলকণ্ঠ কোকিল; ইঁহার রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর সহিতই বাঙ্গালী আমরা বিশেষরূপে পরিচিত, কিন্তু কবির শিবসম্বন্ধীয় ও শক্তি-বিষয়ক পদাবলীও আছে; সে সকলও অতি সুন্দর এবং তাঁহার আপন দেশে বিলক্ষণ প্রচলিত। সম্প্রতী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের যত্নে এবং বঙ্গসাহিত্যানুরাগী কৃতবিদ্য বাবু সারদা চরণ মিত্রের উদ্যোগে সে সকলের সহিতও আমাদের পরিচয় ঘটিতেছে।

একটি শিব-বন্দনায় বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—"হরি উৎকৃষ্ট চাঁপা-

ফুলের অঞ্জলি গ্রহণ করেন, মহাদেব, তুমি সামান্য ধুতুরা ফুলেই সন্তুষ্ট হও।"

কবির শক্তি বিষয়ক পদের একটি নমুনা—

জয় জয় ভৈরবি	অসুর ভআউনি	পশুপতি ভাবিনি মায়া।
সহজ সুমতিবর	দিঅও গোসাউনি	অনুগতি গতি তুঅ পায়া॥
বাসর রইনি	শবাসন শোভিত	চরণ চন্দ্রমণি চূড়া।
কত ওক দৈত্য	মারি মুহ মেলল	কতও উগিল কৈল কূড়া॥
শামর বরণ	নয়ন অনুরঞ্জিত	জলদ যোগ ফুল কোকা।
কটকট বিকট	ওঠ পুট পাঁড়রি	লিধুর ফেণ উঠ ফোকা॥
ঘনঘন ঘুঘুর	কত বোলয়ে	হনহন করতহি কাতা।
বিদ্যাপতি কহ	তুঅা পদসেবক	পুত্র বিসরু জনু মাতা॥

ইহা হইতে বিদ্যাপতির আসল ভাষার পরিচয়ও আমরা প্রাপ্ত হই। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির ভাষাকে আমরা "ব্রজবুলী" বলিয়া থাকি; এখন অনেকেই জানিয়াছেন, ব্রজধামের সহিত এ ব্রজবুলীর সম্পর্ক নাই। ইহা "বৃজ্জি" নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়-বংশের ভাষা। মৈথিলী ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদাবলী বাঙ্গালী লেখক গায়কের হাতে পড়িয়া ক্রমে কতকটা আমাদের ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ডাক্তার গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেব প্রভৃতির সংগৃহীত বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীর আসল ভাষা (খাঁটি মৈথিলী) আমাদের দুর্বোধ্য।

বিদ্যাপতি রচিত অবিকৃত বৈষ্ণব পদাবলীর একটি নমুনা—

লাখে তরুঅর কোটীহি লতা জুবতি কতন লেখ।
সবহি ফুলা মধু মধুকর মধুহ মধু বিশেখ॥ ধ্রুবম্॥
সুন্দরি অবহি বচন শুন।

সবে পরিহরি তোহি ইছ হরি আপু সরাহসি পুন।
যে মধু ভমর নিন্দ কুসুমর বাসি বিসরএ ন পার।
ওলি মধুকর জহি ডাড পল সে হে সসারক সার॥
তোরি সরাহনি তোরি এ চিন্তা সন্তছ তোরি এ ঠাম।
সপনেহু তোহি দেখি পুনু কএ লএ উঠ তোরি এ নাম॥
আলিঙ্গন দএ পাছু নিহারএ তোহি বিনু শুন কোর।
পাছিলি কথা অকথ কথা লাজে ন তেজএ নোর॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
কু দিবস রহএ দিবস দুই চারি॥

শেষ দুই পংক্তি ব্যতীত আর কোনটীর সম্যক অর্থগ্রহ আমাদের পক্ষে দুষ্কর। সাধারণপ্রচলিতবিদ্যাপতির রচনা বাঙ্গালা ভাষার কাছাকাছি আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যাপতির ভনিতা যুক্ত করিয়া বাঙ্গালী কীর্ত্তনীয়াগণ যে—

"মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।

* * *

মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালের ডালে।"

বুলী ধরিয়া কীর্ত্তন গাহেন, সে ভাষার সহিত মৈথিল বিদ্যাপতির সংস্রব আদৌ নাই।

অনেক বাঙ্গালী কবি "ব্রজবুলী"তে পদ রচনা করিয়া বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণ করিতে গিয়াছেন; তাহা এক অভিনব বস্তু—না খাঁটি বাঙ্গালা না মৈথিলী ভাষা। পরবর্ত্তী ব্রজবুলী মৈথিলী ও বাঙ্গালা ভাষার মিশ্রণে এক নূতন সৃষ্ট ভাষা।

পদাবলী সাহিত্য অনন্ত। রত্নাগারের এক আধটি রত্ন তুলিয়া দেখাইয়া ঐশ্বর্য্য বুঝান যায় না, কিন্তু তাহারই প্রয়াস পাইতে হইবে।

গোবিন্দদাসের মধুর ছন্দের, মনোরম বর্ণনাশক্তির ঈষৎ পরিচয়—

শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি শ্যামর মোহন মদন মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান কুলবতী চিত চোরণি॥
সুতল গোপী প্রেম রোপি মন হি মন হি আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত মুরলিক কলরোলনি।
বিছুরি গেহ নিজহি দেহ একু নয়নে কাজরেহ
বাঁহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু একু কুণ্ডল ডোলনি॥
শিথিল ছন্দ নীবি বন্ধ বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি গলিত বেণী লোলনি।
ততহি বেলি সখিনী মেলি কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছন মিলল গোকুলচন্দ গোবিন্দদাস বোলনি॥

গানটী শুনিয়া অনেকের শ্রীমদ্ভাগবতের বংশীবাদন মনে পড়িবে। অপর কিঞ্চিৎ,—কৃষ্ণরাধার রূপের আভাস—

ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠাম। ইহ কাঞ্চন দশবান॥
রাধামাধব মেলি। যুবতি মদন রস কেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেম যূথী রসাল॥
ও নব পদ্মিনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখ চাঁদ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দ দাস রহু ধন্দ॥

জ্ঞানদাসের একটি রাস-রসের পদ—

মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ নব সমাজ ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
দেখবি সখি শ্যাম চন্দ ইন্দু বদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র সখিনী বৃন্দ গাওত রাগ মালিকা॥

তরল তাল গতি দুলাল নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণনাথ করত হাত রাই তাহে অধিক পুর॥
অঙ্গ অঙ্গ পরশ ভোর কেহু রহত কাহু কোর।
জ্ঞানদাস কহত রাস যৈছনি জলদ বিজুরি জোর॥

গোবিন্দদাসের একটি মাথুর—অনন্ত হাহাকার—

তোহে রহল মধুপুর।

ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতী নন্দ অন্ধসম বৈঠই সাহসে চলই না পার।
সখাগণ বেণু ধেনু সব বিসরণ রোই ফিরে নগর বাজার॥
কুসুম তেজি অলি ভূমিতলে লুঠত তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত কোকিল না করহি গান॥
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব দশ দিক বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনাজল অবহুঁ অধিক ভেল কহতহি গোবিন্দ দাস॥

অশ্রুধারায় যমুনার জল বাড়িয়া গিয়াছে!

রায়শেখরের একটি মাথুর;—কৃষ্ণ বৃন্দাবন কাঁদাইয়া মথুরা প্রয়াণ করিয়াছেন, বিরহিনী রাধিকার কাতর আবেদন—

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে। একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
ওই তরু শাখায় রহিল শারী শুকে। এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিনী হরিণী। পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা। ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী। আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন। কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল দোতী চলু মধুপুর। কি কহিবে শেখর বচন নাহি স্ফুর॥

সকলের উল্লেখ আছে, কেবলমাত্র নিজের নামটি নাই; কি মর্ম্মন্তুদ আকুলতা!

জ্ঞানদাসের একটি বিরহ ;—অভিমানিনীর কাতর হৃদয়-উচ্ছ্বাস—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চান্দ সেবিনু রবির কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ-জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র বাঢ়ল মানিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি মরণ অধিক শেল॥

মরীচিকায় তৃষা বাড়িয়াই যায়।

রায় বসন্তের কিঞ্চিৎ; রাধার প্রতি কৃষ্ণ, অর্থাৎ ভক্তের ভগবান—

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব। তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জরাশি। মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দ মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি। বাঞ্ছাকল্পতরু মোর কামনা মুরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম। পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর। রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥

ভগবান ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, আন্তরিক ভক্তি তাঁহার প্রীতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়ই হয়।

বলরামদাসের বাৎসল্যরসের একটি নমুনা—

দধিমন্থ ধ্বনি শুনইতে নীলমণি আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ চুম্বয়ে চান্দ বয়ান॥
কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি কর পাতি নবনীত মাগে॥
রাণী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিনী বাজে হেরি হরষিত ভেল মায়॥

নন্দদুলাল নাচে ভালি।

ছাড়িল মন্থন দণ্ড   উথলিল মহানন্দ   সঘনে দেয় করতালি॥
দেখ দেখ রোহিনী   গদগদ কহে রাণী   যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর।
বলরাম দাস কয়   রোহিণী আনন্দময়   দুঁহু ভেল প্রেমে বিভোর॥

শুনিতে শুনিতে কোন ভক্তের প্রাণে নাড়ু গোপালের মূর্ত্তিটি ভাসিয়া না উঠে?

বংশীদাসের একটু বাৎসল্য ভাব—

ধাতু প্রবালদল   নবগুঞ্জা ফল   ব্রজবালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেড়ি   মণিমুকুতা ঝুরি   কটিতটে ঘুঙুর বাজে॥

নাচত মোহন বাল গোপাল।

বরজ-বধূ মেলি   দেই করতালি   বোলই ভালি রে ভাল॥
নন্দ নুন্দর   যশোমতী রোহিনী   আনন্দে সুত মুখে চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল   কাজরে রঞ্জিত   হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী কহই সব   ব্রজরমণীগণ   আনন্দ সাগরে ভাস।
হেরইতে পরশিতে   নাগন করইতে   ক্ষীরে ভিগল বাস॥

কচি মুখে কচি হাসিতে নবোদ্গত দন্ত দু একটি দেখা যাইতেছে, ব্রজরমণীগণের মাতৃভাব উথলাইয়া বুকের বসন ভিজাইয়া দিতেছে।

আর এক প্রকার অই—

কত ভঙ্গী জান গোপাল নাচিতে নাচিতে।
অরুণ কিরণ দিছে চরণ তুলিতে॥
ব্যাঘ্র নখর মণি হার হিয়ার মাঝারে দোলে।
চরণে নূপুর কিবা রুনুঝুনু বোলে॥

গোপাল নাচিছে ঘুড়ী দিয়া।

[illegible] গেল নন্দবাস   আনন্দ বহিয়া যায়   দেখিয়া নয়ন ভরিয়া॥
[illegible] বিচিত্র নাট   চরণে চাঁদের হাট   চমকে [illegible] পাখী।
নাথ করিয়া নাচ   নূপুর দিয়াছে পায়   পা খানি তুলিয়া নাচ দেখি।

গোপালের নাচের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের প্রাণও নূপুরের তালে তালে নাচিতে থাকে।

যাদবেন্দ্র দাসের একটু মাতৃ-স্নেহ—

আমার শপতি লাগে　　　না ধাইহ ধেনুর আগে
　　পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু　　　পূরিহ মোহন বেণু
　　ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে　　　আর শিশু বাম ভাগে
　　শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইঅ　　　সঙ্গ ছাড়া না হইঅ
　　মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥
ক্ষুধা হইলে চাইয়া খাইঅ　　　পথপানে চাহিয়া যাইঅ
　　অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কার বোলে বড় ধেনু　　　ফিরাইতে না যাইহ কানু
　　হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায়　　　মিনতি করিছে মায়
　　রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয়া　　　বাধা পানই হাতে থুইয়া
　　বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥

মায়ের মিনতির সঙ্গে আমাদের মাথার দিব্যও কি পাঠাইতে ইচ্ছা হয় না? শিরে রৌদ্র-ভয়, পদতলে তৃণাঙ্কুর-ভয়—ননীর গোপাল! সখ্যরসের কিঞ্চিৎ নমুনা—

ভোজন সমাপি　　　সবহুঁ ব্রজবালক　　　বৈঠল নীপক ছায়।
কালিন্দী তীর　　　সমীর বহই মৃদু　　　শীতল করু সব গায়॥
　　সুন্দর শ্যাম শরীর।
শ্রীদামক কোরে　　　অলসে তঁহি সুতল　　　সুবল কোরে বলবীর॥
নব নব পল্লব　　　সেহি সখাগণ　　　বীজই ছুঁহুঁজন অঙ্গে।

কোকিল ভ্রমর কানু মুখ হেরি হেরি গায়ই শবদ তরঙ্গে॥
অলস ত্যজি বৈঠল নন্দনন্দন দুরহি গেও সব ধেনু।
হেরইতে যতনে এক যোগ কারণে বাজই মোহন বেণু॥

আলস-ভরে সখা-অঙ্গে তনু হেলিয়া পড়িয়াছে, রাখাল-বালকগণ নব-পল্লব-শাখা লইয়া ব্যজন করিতেছে।

প্রেমদাসের একটু সখ্য রস—

আজু বনে আনন্দ বাধাই।

পাতিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইল ভোলা দূর বনে গেল সব গাই॥
ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখাল গণে শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা হবে নাই আনিব গোধন বেণু রবে॥
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলি লৈয়া ডাকিয়া পুরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে স্নেহে গাবি শ্যাম অঙ্গ চাটে॥
দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘনে ঘন কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি পশু পাখী পাইল চেতন॥

এ প্রেমের এমনই তরঙ্গ! ইহার হিল্লোলে পশুজাতি গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধ আপনা আপনি ঝরিতে থাকে, স্নেহ-ভরে বৎস-মাতা কৃষ্ণের অঙ্গ চাটিয়া জননী-প্রীতি অনুভব করে!

জনৈক মুসলমান কবির সখ্য ভাবের পরিচয়—

চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাচনি রে।
বেণী মুরলী খুরলি গানরি রে॥

প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি অরুণ-তনয়া তীরে কেলি
ধবলি সাঙলি আওরি আওরি ফুকরি চলতি কানরি।
[illegible] কিশোর মোহন ভাঁতি বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ গুঞ্জাহার বদনে মদন ভানরি॥
আগম নিগম বেদ সার লীলায় করত গোঠ বিহার
নসির মামুদ করত আশ চরণে শরণ দানরি॥

এই প্রেমের বাতাস বিধর্ম্মী যবনের প্রাণেও পঁহুছাইতেছিল!

বলরামদাসের একটি রূপ বর্ণনা—

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি বিজুরী চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা মদন মুরছা পায়॥
মরোঁ মরোঁ সই ও রূপ নিছিয়া লৈয়া।
কি জানি কি ক্ষণে কো বিহি গঢ়ল কি রূপ মাধুরী দিয়া॥
ঢ়লু ঢ়লু দুটি নয়ান নাচনি চাহনি মদন বাণে।
তেরছ বঙ্কনে বিষম সন্ধানে মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটাঞা লোটাঞা কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভাল সে বুঝিয়া মরে বলরাম দাস॥

কবির এই "আধ চরণে আধ চলনি" টুকু বাস্তবিক তুলনা-রহিত!

জগন্নাথ দাসের একখানি ছবি—

রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে আলুঞা আলস ভরে।
সুতলি কিশোরী আপনা পাশরি পরাণ-নাথের কোরে॥
সখি, হের দেখসিয়া বা।
চাঁদ বদনি নিন্দ যায় ধনি শ্যাম অঙ্গে থুয়ে পা॥
নাগরের বাহু করিয়া শিথান বিথার বসন ভুষা।
নিশাসে দুলিছে বেশর মুকুতা হাসি খানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি সোয়াষ না পায় মনে।
সখি, ধিরি করি বোল না করিহ রোল দাস জগন্নাথ ভণে॥

ঘুমন্ত সুন্দরী—শ্বাস-প্রশ্বাসে নাকের নোলকটি দুলিতেছে, তার সহ হাসিটুকু লাগিয়া আছে!

শিবানন্দ দাসের অঙ্কিত একখানি চিত্র—বংশী-শিক্ষা—

কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা। মদনমোহন মনোমোহিনীর সাধা॥
প্রেম রঙ্গে শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। মুরলী পূরয়ে রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
বিনা তন্ত্রে বিনা মন্ত্রে কত ফুক্ দেই। বাজে বা না বাজে বাঁশী পিয়ামুখ চাই॥
রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী। পাণী পঙ্কজ ধরি লোলয় অঙ্গুলী॥
কানু কোলে কলাবতী কেলির বিলাসে। দুহুঁক রূপ দেখি শিবানন্দ ভাষে॥

আমরা যেন দেখিতে পাইতেছি, ফুঁ দিতে দিতে শ্রীরাধার গাল ফুলিয়া উঠিতেছে, স্মিতমুখে শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গুল টিপিয়া সুর বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন! বৃথা চেষ্টা!

ভাব দেখিয়া গোবিন্দ দাসের সহিত আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে—

"ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।
কণক লতিকা রাই তমাল কোলে॥"

লোচন দাসের একটু গার্হস্থ্য মধু—কুলবধূ রাধিকার দীর্ঘশ্বাস—

এস এস বঁধু এসো! আধ আঁচরে বসো
নয়ান ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও মানিক নও হার করি পরি গলে
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লৈয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু, তোমার যখন পড়ে মনে চাহি বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন শালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥

কাজর করিয়া তোমা নয়নেতে রাখি যদি
তাহে গুরুজনা অপবাদ।
ও রাঙ্গা চরণে নূপুর হইতে
লোচন দাসেরই সাধ॥

গুরুগঞ্জনার দায় বড় দায়; শ্যাম ও রাখিতে হয় কুল ও রাখিতে হয়; হায় নারী-জন্ম!

একটা বিষয় অবধান-যোগ্য;—বৈষ্ণব পদাবলীতে জটিলা-কুটিলা-রূপী লাঞ্ছনা গঞ্জনার কথা আছে; আয়ান ঘোষের উল্লেখ নাই বলিলেও চলে।

গোবিন্দদাসে রাধার ভক্তি-রস কিঞ্চিৎ—দাস্য ঠিক না হউক, ভক্তের প্রাণের কামনা—

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ। হাম্ ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
যো দরপনে পঁহু নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পঁহু বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগণ হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরী। সো মরকত তনু তোহে কি এ ছোড়ি॥

ইহাই ত রাধা-ভাব? ইহাই ত ভক্তের উপাসনা?—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা।"

আমরা ভক্তির অপর ভাবের নমুনাও একটু দেখাই—

ভজহুঁরে মন নন্দ-নন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলভ মানুষ জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখ, এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল দল জল জীবন টলমল ভজহ হরি-পদ নিত রে॥

শ্রবণ কীর্ত্তন • স্মরণ বন্দন পাদ-সেবন দাস্য রে।
পূজন ধেয়ান আত্ম-নিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে॥

আবার একবার স্মরণ করাইয়া দিই,—পদাবলী সাহিত্যে পঞ্চদশ সহস্র পদের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; একশত পঁয়ষট্টি জন পদ কর্ত্তার নাম মিলিয়াছে—তাহাও অসম্পূর্ণ। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশিষ্টরূপ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

পদাবলী সাহিত্যে এত পদ, এত পদকর্ত্তা আছেন বটে, কবিত্ব প্রচুর, কিন্তু বর্ণিত বিষয়গুলি নিতান্তই বাঁধাবাঁধি; সকলেই গণ্ডির ভিতর ঘুরিয়াছেন; কচিত কাহারও পদে বিষয়ের নূতনত্ব দৃষ্ট হয়। একখানি পদকাব্য মিলিয়াছে, নাম—"রসকল্পলতা", কবি জয়কৃষ্ণ দাস রচিত। ইহার পদ সংখ্যা মোট ৪৮টি, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। একটি পদ আমরা উদ্ধৃত করি—

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গোষ্ঠ হইতে ফিরিবেন, শ্রীরাধিকা আপন অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; দেখিতে পাইলেন ইহ-সংসারের সর্ব্বস্ব তাঁহার কানাচিয়ালাল গোধূলীর শোভা সম্বর্দ্ধন করতঃ গোষ্ঠের পথ আলোকিত করিয়া আসিতেছেন—

অট্টালি উপরে বৈঠল রসবতী রঙ্গিনী সখী মণিমালা।
ঝাঁকি ঝোরখে ভুরু ফেরই আয়ত নাগর কালা॥
শ্রীদাম সুদাম দামহি সখাগণ বেণু বিশালাদি পুর।
গোধন গমন ধুলি-তনু অম্বরে অম্বর আদি পরিপুর॥
হোই হোই রব ঘন বোলত মধুরিম নটবর ভঙ্গিম ঠাম।
দোলহি অলক চুড়ে শিখী চন্দ্রক, খচিত কুসুমকি দাম॥
লোচন খঞ্জন ভাতু কামধনু গণ্ডহি কুণ্ডল দোল।
বনে বনমাল হৃদয়ে বিরাজত ঝলমল সুন্দর ডোল॥
ভুজযুগবর করীকর দোলত করহি বলয় রসাল।
মুখ সুধাকর কম্পিত বিম্বাধর মুরলী গায় বিশাল॥

কমল চরণে মঞ্জিরবর ঘন হেরই বিধুমুখী বালা।
মদনক বাণ বিধলি রঙ্গিনী সখী তনু অণুতনু ভেলা॥
শ্যামর চরণ গমন মন্দহি কম্প পুলক ভরল অঙ্গ।
নিজ গৃহে গমন করল বর মোহন জয়কৃষ্ণ দাস প্রেমরঙ্গ॥

"রসকমলতা"র কোথাও অশ্লীলতা (অবশ্য হাল রুচি অনুযায়ী) দোষ নাই।

আর একজন পদকর্ত্তা জগদানন্দ; ইনি প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে-কার কবি, ইঁহার রচনা-বৈচিত্র্য, কিঞ্চিৎ দেখাইব। কবির কষ্টকল্পিত যমক অনুপ্রাসের ছটায় ভাব অপেক্ষা ভাষাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে অধিক। ইঁহার রচনা হইতে অলঙ্কার শাস্ত্রের সুন্দর উদাহরণ সংগৃহীত হইতে পারে। এক একটি পদ গোবিন্দদাসকে মনে পড়াইয়া দেয়। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস চার পাঁচ জন আছেন; তন্মধ্যে একজন গোবিন্দদাসের পদে ভাবের সহিত ভাষার মাধুর্য্য স্থলে স্থলে চমৎকার—

"কেবল কানু কথা কহি কাঁদয়ে কাম-কলঙ্কিনী গোরী"

কিম্বা—

"মুকুলিত মল্লী মধুর মধু মাধুরী মালতী মঞ্জুল মাল"

প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে, শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইতে হয়। এখানে যমক-অনুপ্রাসের অনুরোধে ভাবের বলিদান নাই।

যাহা হউক আমরা জগদানন্দের পদ শুনাই—

অকরুণ পুন বাল অরুণ   উদিত মুদিত কুমুদ কদম
চমকি চুম্বি চকরী পদ্মিনীক সদন সাজে।
কি জানি সজনি রজনী ভোর   ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর
গত যামিনী জিত দামিনী কামিনী কুল লাজে।
কুকরত হতশোক কোক   অব জাগব সবহুঁ লোক
শুকশারিক পিক কাকলী নিপুণ ললিত আজে।

গলিত ললিত বসন সাজ মণিযুত বেনী ফণী বিরাজ
উচ কোরক রুচি চোরক কুচ জোরক মাঝে॥
তড়িত জড়িত জলদ কাঁতি ছুঁহু গুতি সুখে রহল মাতি
জিনি ভাদর রস বাদর পরমাদর শেজে।
বরজ কুলজ জলজ নয়নি ঘুমল বিমল কমল নয়নি
কৃত লালিশ ভুজ বালিশ আলিশ নাহি তেজে॥
টুটল কিএ ঘুণ ধনুগুণ কিএ রতিরণে ভেল তুণ শূন
সমর মাঝ পড়ল লাজ রতিপতি ভয়ে ভাজে।
বিপতি পড়ল যুবতীবৃন্দ গুরুগণ অতি কহই মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরস রসবতী রসরাজে॥

এ সকল গানে অনেক স্থলে শুধুই কথার মার।

এটি একটি "বাহ্য-চিত্র" পদ ; "অন্তশ্চিত্র" পদও আছে ; একটি নমুনা দেখাই—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে রচনার কারুকার্য্য—

নর হ রি নাম জন্ত রে অছু ভাবহ হ বে ভবসাগ রে পার।
ধর রে শ্রবণে জীব হ রি নাম সাদ রে চিন্তামণি উ হ সার।
যদি কৃ ষ্ণ পাপী আদি রে কহ মন্ত্রক রা জ শ্রবণে ক রে পান।
শ্রীকৃ ষ্ণ চৈতন্য বল্যে হ য় সেই দুর্গ ম পাপ তাপ স হ ত্রাণ॥
কর হ গৌর গুরু বৈ ষ্ণ ব আশ্রয় ব হ নরহরি না ম হার।
সংসা রে নাম লই স কৃ ত হইয়া ত রে আপামর দু রা চার॥
ইথে কৃ ত বিষয় তৃ ষ্ণ পঁহু নাম হ রা র্ত্তি ধারণে শ্র ম ভার।
কুতূ ষ্ণ জগদানন্দ কৃ ত কর্ম্ম দুর ম তি রহল কা রা গার॥

পদটির প্রতি পংক্তির তৃতীয় নবম পঞ্চদশ একবিংশ বর্ণে চিত্র আছে ; অবরোহ ও আরোহ ক্রমে পাঠ করিলে কলিযুগ-পাবন তারকব্রহ্ম নাম পাওয়া যায়—

"হরে কৃ[illegible] কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

[illegible] মূলমন্ত্র—পদাবলীর নিকট আমরা বিদায় লই। ভাগবতের

কথা আমরা অন্যত্র বলিব। পদাবলীর গীত ব্যতীত এই যুগে রাধা-কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক অন্যান্য কাব্যও পাওয়া যায়, কতকগুলি অতি সুন্দর? দু এক খানির স্বল্প পরিচয় আমরা দিব। একখানির নাম "রাধিকার মানভঙ্গ"; ক্ষুদ্র কাব্য খানি খ্যাতনামা পদকর্ত্তা, সুমধুর "গরাণহাটি" বা "রেণেটি" কীর্ত্তনের জন্মদাতা নরোত্তম ঠাকুরের রচিত।

শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও শ্রীমতীর দুর্জ্জয় মান ভঙ্গ করিতে না পারিয়া, পরিশেষে মহাদেবের নিকট হইতে তাহার যোগীবেশ ধার করিয়া আনিয়া ভিক্ষুক সাজিয়া মানময়ীর নিকট হইতে মান ভিক্ষা করিয়া লইয়াছেন; সখীগণের আর আনন্দের সীমা নাই; ললিতা সখী রাধিকা সুন্দরীকে বলিতেছেন—আজ বৃন্দাবনে চন্দ্রগ্রহণ—পুণ্যদিন, দান খয়রাৎ করিতে হয়—

আমি পুরোহিত হব কৃষ্ণ হবে দানি। তুমি বসি কর দান শুন বিনোদিনি॥
শুনিয়া ললিতার বাণী। দানে বৈসে সুবদনী॥
তিল তুলসী জল লইয়া নিজ করে। ভাগ্যবতী রাধিকা জৌবন দান করে॥
কৃষ্ণ-প্রীতি-অঙ্গ রাই সমাপন কইল। সখী সব আনন্দে জয়ধ্বনি কইল॥
তবে পুন ললিতা যে বলিল বচন। কি দক্ষিণা দিব্যা মোরে আনহ এখন॥
রাই বলে কৃষ্ণ বিন্যা যাহা চাহ তুমি। সর্ব্বস্ব দিব্যার শক্তি ধরি জেন আমি॥
কৃষ্ণ বিন্যা চাহ যেই ধন। দেই আমি এই খন॥
ললিতা বলৈন তোমার কৃষ্ণকে না চাই। যেই দক্ষিণা দিব্যা আগে সত্য কর রাই॥
রাই বলে কৃষ্ণ বিন্যা চাহ যেই ধন। সত্য সত্য সেই দক্ষিণা দিব এই খন।
রাই যদি সত্য কইল। ললিতা আনন্দ হইল॥
যে দক্ষিণা চাই আমি শুন বিনোদিনি। * * *
* * * * নিকুঞ্জে করিব্যা কেলি দুই জনে যখন॥
যখন দুজনে একত্রে হইব্যা। যুগল চরণ মাথে দিব্যা॥

ব্রহ্মা আদি দেব যারে সদাই ধেয়ায়। তুমি সে বেঁধেছ প্রেমে হেন জুয়রায়॥
যেই পদ রেণু লাগি। শঙ্কর হইল যোগী।
বল সবে হরি হরি। শমনে যাইব্যা তরি॥
রাধাকৃষ্ণ মিলন হইল। ধ্রু।

এই কাব্য খানি চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত আব্‌দুল করিম সাহেব উদ্ধার করিয়াছেন। ইনি মুসলমান হইয়াও হিন্দুর কৃষ্ণপ্রেমে ভোর। সহৃদয় মুন্সীজি নিজেই লিখিয়াছেন—"বিধর্ম্মী হইয়াও আমরা এ কাব্য পড়িতে পড়িতে আপনা ভুলিয়া গিয়াছি। মনে হইয়াছিল যেন কোন স্বপ্নময় কবিতার রাজ্যে বিচরণ করিতেছি। মানুষের লেখনী হইতে এমন সুধা বর্ষিত হইতে পারে জানিতাম না। জয় বাঙ্গালা ভাষার জয়।"

রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা পাঠে বিধর্ম্মী মুসলমানের এই ভাব, আর উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু আমরা, আমরা বলি—"এ গুলা হিন্দুধর্ম্মের বখামি !!"

এই শ্রেণীর আর একখানি ক্ষুদ্র কাব্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, নাম—"জ্ঞানদাসের নিকুঞ্জ সাজান।" ভাব ও ভাষা ধরিলে কাব্যখানি যশস্বী পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের রচনা কি না সন্দেহ হয়। ইহাতে আছে, শ্রীরাধার মান দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও মান করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, শেষ বৃন্দা দূতী যাইয়া খুব দু কথা শুনাইয়া দিয়া কৃষ্ণের গলায় আঁচল জড়াইয়া তাঁহাকে রাধাকুঞ্জে টানিয়া আনিয়াছিলেন !

"ঈষদ হাসিয়া দূতী ধর্‌লেন ছুটি করে। আঁচল ফেলিয়া দিলেন গোবিন্দের গলে॥
হাতে গলে বেঁধে নিয়ে কর্‌লেন প্রয়াণ। আনন্দে চলিয়া গেলেন রসের বয়ান॥"

জগদীশ্বর !

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাস ব্যতীত সকল পদকর্ত্তাই চৈতন্য প্রভুর সমকালিক বা পরবর্ত্তী। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র সম্বন্ধেও এই সকল পদকর্ত্তাগণ ভক্তি-অশ্রু-বিধৌত রাশি রাশি পদাবলী রচনা করিয়াছেন ;

কেহ কেহ নাম দিয়াছেন "গৌরচন্দ্রিকা।" আমরা চারি শত বৎসরের প্রাচীন বাসুঘোষের পদাবলী হইতে নমুনা স্বরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করি—

নবদ্বীপে উদয় করিলা দ্বিজরাজ।

কলি-তিমির ঘোর	গোরাচাঁদের উজোর	পারিষদ তারাগণ মাঝ ॥
কীর্ত্তনে চর চর	অঙ্গ ধূলি ধূসর	হানত ভাব তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি	বোলত হরি হরি	ক্ষণে ক্ষণে রহত ত্রিভঙ্গে ॥
বামে প্রিয় গদাধর	কান্ধের উপরে তার	সুবলিত বাহু আজানে।
সোঙরি বৃন্দাবন	আকুল অনুক্ষণ	ধারা বহে অরুণ নয়ানে ॥
আঁখি যুগ ঝর ঝর	যেন নব জলধর	দশন বিজুরী জিনি ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে	কলি-জীব উদ্ধারিতে	বরখল হরিনাম ঘটা ॥

প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য শুধু কৃষ্ণলীলা নহে, চৈতন্যলীলাও ইহার অঙ্গ।

চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সহচর-সঙ্গীগণের কয়েকজন করচা বা নোট রাখিয়া গিয়াছিলেন; সেই নোট বা সূত্র ও জনশ্রুতি অবলম্বনে এবং তাঁহার "পার্ষদ"গণের কথিত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পরে—ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে—বৃন্দাবন দাস "চৈতন্য ভাগবত" ও ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রণয়ন করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিত সম্বন্ধে একরাশি কাব্যের মধ্যে এই দুইখানি সুবৃহৎ এবং সাহিত্য-সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণববৃন্দের নিকট এই কাব্যদ্বয় শাস্ত্র-সম্মান পাইয়া আসিতেছে।

এই জাতীয় কাব্যের বিরাটত্বের আভাস ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে। চরিতামৃত-রচয়িতা যথার্থই কহিয়াছেন—

"পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি যায় ॥
এই মত চৈতন্য কথার অন্ত নাই।
যার যত শক্তি সবে তত তত পাই ॥"

চৈতন্ত-ভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ‘চৈতন্যলীলার ব্যাস” আখ্যা পাইয়াছেন। বৃন্দাবনের কাব্যকে কতকটা ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা চলে। কৃষ্ণদাসের কাব্য কতকটা দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান। উভয় কাব্যের আগাগোড়াই পয়ার ও ত্রিপদী। কাব্যরস তাহার ভিতর ভক্তগণ অবশ্য পাইয়া থাকেন, অভক্তগণ পাইবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু গৌরচন্দ্র স্বয়ং মূর্ত্তিমান কাব্য, তাহার উপর তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত নানা অলৌকিক তত্ত্বে প্রভাসিত। কত ভক্ত কত কথায় উপকথায় তাঁহার প্রেম-পূত জীবনকে কবিতাময় করিয়া তুলিয়াছে।

এই সকল জীবন-চরিত মধ্যে এমন কবিতা-কণাও পাওয়া যায়—

“বিশাল নয়নে প্রভু যেই দিকে চায়।
সেই দিকে নীলপদ্ম বরষিয়া যায়॥”

(গোবিন্দদাস কর্ম্মকারের করচা।)

কিম্বা স্বভাব বর্ণনায়—

“কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরি রাজে।
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
* * *
বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥
* * *
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥”

এই শ্রেণীর আর একখানি কাব্য লোচনদাসের “চৈতন্য-মঙ্গল।” আমরা এই গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ কাব্য-রসের পরিচয় দিব। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ কালে শোকবিধুরা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা বর্ণনা—

চরণ-কমল পাশে নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে নেহারয়ে কাতর নয়ানে।
হিয়ার উপরে পড়িয়া রাখে ভুজলতা দিয়া প্রিয় প্রাণনাথের চরণে॥

দুনয়নে বহে নীর ভিজিল হিয়ার চীর বুক বাহিয়া পড়ে ধার।
চেতন পাইয়া চিতে উঠে প্রভু আচম্বিতে বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে আরবার॥
মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি কাঁদ কি কারণে জানি কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া হিয়ার পরে চিবুক দক্ষিণ করে পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥
কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া পুছিতে না কহে কিছু বাণী।
অন্তরে দগধে প্রাণ দেহে নাহি সম্বিধান নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানি॥
পুনঃ পুনঃ পুছে প্রভু সম্বরিতে নারে তবু কাঁদে মাত্র চরণ ধরিয়া।
প্রভু সন্দ কলা ভানে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া স্থানে অঙ্গবাসে বদন মুছিয়া॥
নানা রূপে কথা ভাব কহিয়া বাড়ায় ভাব যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে।
প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া চাঁদমুখী কহে কিছু গদগদ স্বরে॥
শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা বিদরিয়া যায় হিয়া আগুণেতে প্রবেশিব আমি॥

* * *

কি কহিব মুই ছার আমি তোমার সংসার সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাব বিষ খাইয়া সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥

শুনিতে শুনিতে আমাদেরও চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠে।

বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্যে "বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা" প্রসিদ্ধ। অপর এক জন জীবনচরিত-প্রণেতা জয়ানন্দ, আমরা জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল" হইতে সেটি উদ্ধৃত করিব। নায়ক নায়িকার বারমাসী বিবরণ প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে বাঁধি গৎ, সুতরাং এ কাব্যেও বাদ যায় নাই। কিন্তু এটি মহাপ্রভুর জীবনচরিতে—বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের সহধর্ম্মিনীর মুখে অস্বাভাবিক দাঁড়াইয়াছে। কল্পিত নায়ক নায়িকায় এ সকল মানায় ঠিক। যাহা হউক, ইহাতে তৎকালীন গৃহস্থঘরের সংবাদ আছে, আমরা শুনাই—

(সিন্ধুড়া রাগ।)

ফাল্গুনে পৌর্ণমাসী তোমার জন্মদিনে। উদ্বর্ত্তন তৈল স্নান কর গৃহাঙ্গনে॥
পিষ্টক পায়স পুষ্প ধূপ দীপ গন্ধে। সঙ্কীর্ত্তনে নাচ প্রভু পরম আনন্দে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে—

তোমার জন্মতিথি পূজা। আনন্দিত নবদ্বীপ বাল্য বৃদ্ধ যুবা ॥
চৈত্র চাতক পক্ষ পিউ পিউ ডাকে। শুনিঞা যে প্রাণ করে তা কহব কাকে ॥
প্রচণ্ড উদ্ভট বাত তপ্ত সিকতা। কেমনে ভ্রমিবে প্রভু পাদাম্বুজরতা ॥
গৌরাঙ্গ প্রভু তোমার নিদারুণ হিয়া। গঙ্গাএ প্রবেশ করি মরু বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
বৈশাখ চম্পক মালা নূতন গামছা। দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা ॥
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ সরু পৈতা কান্ধে। রূপ দেখিয়া কুলবধূ বুক নাহি বান্ধে ॥
ও গৌরাঙ্গ হে বিষম বৈশাখের রৌদ্রে। তোমার বিচ্ছেদে মরি দুঃখ সমুদ্রে ॥
বসন্তে কোকিল পক্ষ ডাকে কুহু কুহু। তোমা না দেখিয়া মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু ॥
চূতাঙ্কুর খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোলে। তুমি দূর দেশ আমি জুড়ায় কার কোলে ॥
মোরে না যাইহ ত্যজিঞা। মনের পোড়'নি কারে কহিব ভাঙ্গিঞা ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে সুবাসিত জলে স্নান করাইব দিব্য ধৌত সরু বস্ত্র অঙ্গে পরাইব ॥
গঙ্গাজল চামরে চৌদিকে দিব বা। হৃদয়ে তুলিঞা থুব দুখানি রাঙ্গা পা ॥
আমি কি বলিতে জানি। বিশাল কাণ্ডেতে যেন বিকল হরিণী ॥
আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদ। দারুণ বিধাতা মোরে লাগিল বিবাদ ॥
মেঘের শবদ শুনি ময়ূরের নাট। কেমনে বঞ্চিব আমি নদীয়ার বাট ॥
মোরে সঙ্গে লয়ে জাএ। যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তা চাএ ॥
শ্রাবণে সলিল ধারা ঘনে বিদ্যুল্লতা। কেমনে বঞ্চিব আমি রহিব আর কোথা ॥
লক্ষ্মী-বিলাস গৃহে পালঙ্কী শয়নে। সে সব চিন্তিতে আমি না জীব শ্রাবণে ॥
প্রভু তুমি বড় দয়াবান। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥
ভাদ্রে ভাস্কর তাপ সহনে না জাএ। কাদম্বিনী নাদে নিদ্রা মদন জাগাএ ॥
জার প্রাণনাথ ভাদ্রে নাহি থাকে ঘরে। প্রাণ উচাটন তার বজ্রাঘাত শিরে ॥
বিষম ভাদ্রের খরা। জীয়ন্তেই মরা প্রাণনাথ নাই জারা ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা আনন্দিতা মহী। কান্ত বিনু সেই দুঃখ কার প্রাণে সহি ॥
শরত সবএ শোভা নদীয়া নগরী। গৌর চন্দ্র রমণী তারকা সারি সারি ॥
মোরে কহ উপদেশ। কথা তথা থাক প্রভু করিহ উদ্দেশ ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয় বা। করঙ্গ কৌপীনে কত আচ্ছাদিবে গা ॥
কত পুণ্য করিঞা হইলাঙ তোমার দাসী। ইবে অভাগিনী হব হেন প্রায় বাসি ॥
তুমি সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী। তোমার সম্মুখে আমি কি বলিতে জানি ॥

হেমন্ত নূতন ধান্য জগত প্রকাশে। সর্ব্ব সুখময় গৃহ কি কার্য্য সন্ন্যাসে॥
পাটনেত ভোট খেত সকলাত কম্বলে। সুখে নিদ্রা যায় আমি থাকি পদতলে॥
তুমি সর্ব্ব জীব অধিকারী। কত সুখ বিনোদ হঞা দণ্ডধারী॥
পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে। কান্ত আলিঙ্গনে শীত তিলেক না থাকে॥
তপ্ত জলে স্নান তোমার অগ্নি জ্বলে পাশে। নানা সুখ আমোদ করহ গৃহ বাসে॥
পৌষে প্রবল শীত তোমার না সহে। কীর্ত্তন অধিক সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম নহে॥
মাঘ মাসে স্নান কর হবিষ্যান্ন খায়। শ্রীভাগবত পড় আর শিষ্যেরে পড়ায়॥
বলি বৈশ্য শাস্ত্র কর ভূদেব আচার। পবিত্রতা দেখি নবদ্বীপে চমৎকার॥
বিষম মাঘ মাসের শীতে। কত নিবারণ দিব এ দারুণ চিতে।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কত কেল নিবেদন। দৃকপাত না করে প্রভু না করে শ্রবণ॥
শ্রবণ যুগলে প্রভু দিঞা দুই হাত। জয়ানন্দ বলে প্রভু হা নাথ হা নাথ॥

এই বার মাসের বিবিধ চিত্র অপেক্ষা পূর্ব্বোল্লিখিত লোচনদাসের ক্ষুদ্র ছবি খানি আমাদের প্রাণ ছুঁইয়া যায়।

কিন্তু এ ধরণের কবিত্ব গুণের জন্য এই সকল কাব্য লোকপ্রিয় নহে। এ সকল কাব্যের প্রধান বিশেষত্ব—রচয়িতা কবিগণের ভক্তি-উচ্ছাস।

চৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

"যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য় চলিতে।
সে মৃত্তিকা লয় লোকে গর্ত্ত হয় পথে॥"

আর একজন ভক্ত শুনাইয়াছেন—

"শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তবুও প্রভুর বিচ্ছেদ সহনে না যায়॥"

গোবিন্দদাসের করচায় আছে—

"ইচ্ছা অশ্রুজলে মুছি গাথানি চরণ।"

মহাপ্রভুর প্রতি এই সকল কবির এতদূর ভক্তি যে ইঁহাদের একজন নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে নিজেই গাহিয়াছেন—

"চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥"

অপর একজন মহাপ্রভুর জীবনের অলৌকিকত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া সগর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন—

"এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার মাথার উপরে ॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

অবশ্য এ সকল ভক্তির "আধিক্য।"

শেষোক্ত শ্লোক দুইটী হইতে চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবতের কবিদ্বয়ের তারতম্য বিলক্ষণ বুঝা যায়। চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস ভাগবতকার বৃন্দাবনের অশেষ সুখ্যাতি করিলেও আমাদের স্বীকার করিতে হয়, কবিত্ব সম্পর্ক হিসাবে চরিতামৃত-কারই বড়।

কিন্তু চরিতামৃতের ভাষা সংস্কৃত-হিন্দী-বাঙ্গালা-উর্দ্দু মিশ্রিত হইয়া স্থলে স্থলে বড়ই কটমট। কিঞ্চিৎ উদাহরণ—

বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার ॥
গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস ॥
ধাত্র্যশ্বত্থ গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন। সেবানামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন ॥

(মধ্য খণ্ড—২২)

পড়িতে পড়িতে আমাদের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়!

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা। দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥

(আদি—১৭)

মুসলমান কাজীর জোবান বলিয়া হয় ত উপেক্ষা করা চলে।

"যাহা" "তাঁহা" "ঐছে" "কৈছে" "বহুত" "বাত" প্রভৃতি অনর্গল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ১

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনবাসী হইয়া বৃদ্ধ বয়সে "চরিতামৃত" রচনা করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী রাশি রাশি বৈষ্ণব কাব্য-রচয়িতাগণের রচনায় বৃন্দাবনীবুলী অর্থাৎ হিন্দী ভাষার মিশ্রণ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, সে প্রেম ছড়াইবার—বিলাইবার সামগ্রী। বৈষ্ণব কবিগণের—বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রেম পণ্য দ্রব্য নহে; সে প্রেম প্রতিদান-প্রত্যাশী নহে। দান, আত্মত্যাগ—সর্ব্বভূতে প্রীতিই এই ধর্ম্মের প্রাণ: কৃষ্ণ-ভক্তিই ইহার মূল। বৈষ্ণবেব প্রধান লক্ষণ—

"করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্য আপনি পরিচয় দিয়াছেন—

"কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

এই সকল কাব্য-গ্রন্থ হইতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়কার ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ত্বও আমরা কিছু কিছু প্রাপ্ত হই।

সে সময়ে বঙ্গে—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কারো বাসে॥

বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥"

(চৈতন্য ভাগবত)

অপর একখানি কাব্য হইতে পাওয়া যায়—

"করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত দ্বারে দ্বারে॥
সভে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥"

(নরোত্তম বিলাস)

দেশ তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপে পরিপ্লুত;

বঙ্গের এই অবস্থায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ম ত অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভগবান এক সময়ে স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি·· ·········ধর্ম্মসংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" কতবার কথা রাখিতে হইয়াছিল! অধর্ম্মনাশের নিমিত্ত, ধর্ম্মসংস্থাপন-উদ্দেশে দয়াময় গোরা-বেশে, এবার বুঝি ভক্তচূড়ামণিরূপে ছিন্ন-কন্থা-ধারী হইয়া, ভক্তিপূত নিবৃত্তি-মার্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপামর সাধারণে প্রেম-প্রীতি প্রচার করিয়াছেন। সেই সব কথাই আমরা এই সকল কাব্য হইতে পাই।

সাময়িক অবস্থা এবং চৈতন্যচন্দ্র কর্তৃক চৈতন্য-সম্পাদন বুঝাইতে কাব্য হইতে একটি চিত্র আমরা দেখাইব। ঘটনাটি চৈতন্য-ভাগবতে বিস্তারিত ভাবে আছে; জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বর্ণনা কতক সংক্ষিপ্ত—সেইটুকু উঠাই—

নবদ্বীপে ব্রহ্মদৈত্য জগাই মাধাই। ধুতলিয়া সিঙ্গালিয়া দস্যু দুই ভাই॥
মনসরিয়া বৃত্তি করে থাকে নগরনে। মহাপাপী জগাই মাধাই দুইজনে॥
দস্যুগণ সঙ্গে থাকে বনে তেয়াপুরে। নিশা না জাএ লোক জগাই মাধাই ডরে॥

অন্ন যোনি বিচার নাহিক দুই ভাই। স্নান সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত জগাই মাধাই ॥
গো-বধ ব্রহ্ম-বধ স্ত্রী-বধ জত জত। বলে ছলে গুরু-পত্নী হরে কত শত ॥
গো-মাংস শূকর-মাংস করে সুরাপান। ধর্ম্মকথা না শুনে না করে গঙ্গাস্নান ॥
শিশু সব আছাড়িয়া মারে শিলাপাটে। কত কত গর্ভবতীর কত গর্ভ কাটে ॥
গলে যজ্ঞসূত্র বান্ধা জেন সিংহনাদ। উত্তম বধির প্রায় মহা পরমাদ ॥
উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি মদিরা ভক্ষণে। ঘূর্ণিত লোচন চারু পূর্ণ শক্রাসনে ॥
দস্যুগণ সঙ্গে থাকি ঘরে অগ্নি দেই। বুকে বাঁশ দিঞা কারো সর্ব্বস্ব নেই ॥
খড়্গ কোদণ্ড কাণ্ড ভ্রমে গঙ্গাতটে। নিত্যানন্দ মহাময় ঠেকিলা সঙ্কটে ॥
পথে মাধাইরে রহাইল নিত্যানন্দ। হরিনাম নেহ আজি করিঞা নিবন্ধ ॥
ব্রাহ্মণ হইঞা তোর চণ্ডাল আচার। অন্ন যোনি স্নান শৌচ না কর বিচার ॥
নবদ্বীপের লোক নিন্দ না জাএ তোমার ভয়ে। এত পাপে কেমতে তরিবে যমালয়ে ॥
হরি নাম নিব ইহা কর অঙ্গীকার। আজি মহামল্ল তোর করিব নিস্তার ॥
মাধাই বলে আরে নিত্যানন্দ অবধূত। আজি সে মাধাই তোর হইল যমদূত ॥
মরিবি মরিবি আজি আরে নিত্যানন্দ। কি করিতে পারে তোর ভাই গৌরচন্দ্র ॥
নিত্যানন্দ শিরে মাধাই মুটকি মারিল। বজ্রাঘাত সম রক্ত চৌদিকে স্রবিল ॥
নিত্যানন্দ শিরে রক্ত পড়ে বুক বাঞা। গৌরচন্দ্রে দূত সব জানাইল গিঞা ॥
জগাই বলে মাধাই কেনে মারিলে সন্ন্যাসী। পতিত ব্রাহ্মণ হৈঞা ভয় নাহি বাসি ॥
জগাইরে বন্দী কৈল মাধাই পলাইল। আর জত দস্যুগণ কান্দিতে লাগিল ॥
নিত্যানন্দ বলে মোরে মারিল মাধাই। আজিকার দুর্গে মোরে রাখিল জগাই ॥
হাসিঞা হাসিঞা বলে শ্রীনিত্যানন্দ। দুই ভাইরে প্রেম ভক্তি দেহ গৌরচন্দ্র ॥
প্রভু বলে প্রেম ভক্তি পাবেক জগাই। ব্রহ্মবধ হবেক তোমা মারিল মাধাই ॥
জগাই বলে অপরাধ ক্ষেম গৌরচন্দ্র। না জানিঞা মাধাই মারিল নিত্যানন্দ ॥
পতিত তারিতে দু ভাই এলা ক্ষিতিতলে। জগাই মাধাই তারিলে সংশয় ভাল বলে ॥
পতিতপাবন তোমার নামখানি জাগে। পতিত জগাই মাধাই প্রেম ভক্তি মাগে ॥
অনেক মহিমা হবে আমা নিস্তারিলে। তুমি না তারিলে আমা কে আর তারিবে ॥
হলাহল কালকূট যে বিষ দুর্জ্জরে। হেন বিষ জীর্ণ করিল মহেশ্বরে ॥
বাড়বাগ্নি অখিল সংসার নষ্ট করে। হেন বাড়বাগ্নি সিন্ধু জলের ভিতরে ॥
মলয় চন্দন তরু বায়ুর পরশে। শাকোটি চন্দন হয়ে জগতে বিলাসে ॥
ভাল মন্দ পোড়ে অগ্নি করে আত্মসম। দোষ গুণ না বিচারে সুজনের কাম ॥

ভাল মন্দ কুসুম না ছাড়ে ভৃঙ্গরাজ। দোষ গুণ না বিচারে সুজনের কাজ ॥
এত স্তুতি করিলেক জগাই মাধাই। কেবল প্রসন্ন তারে হইলা দু ভাই ॥
চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব। জগাই মাধাইয়ে কৃপা গাএ জয়ানন্দ ॥

জগাই বলে মাধাই ভাই এমন পাইতে নাই
পতিত-পাবন দয়ানিধি।
না ভজিতে প্রেম যাচে আর কে এমন আছে
প্রসন্ন হইল মোরে বিধি ॥

মহাপ্রভুর কৃপায় ঘোর দুর্বৃত্ত দস্যুও পরম ভক্ত বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত কৃষ্ণ-ভক্তির—বৈষ্ণব ধর্ম্মের তন্ময় ভাবের একটি প্রধান বিশেষত্ব—সার্ব্বজনীনতা;—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বর্ণবিচারের সঙ্কীর্ণতা জাল ছিন্ন করিয়া আচণ্ডাল সকলের মধ্যে প্রেম বিতরণ। গোবিন্দ-দাসের করচায় দৃষ্ট হয়, প্রেমাবতার স্বয়ং বলিয়াছেন—

"মুচি যদি ভক্তি সহ ডাকে কৃষ্ণ ধনে।
কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে ॥"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে—

"বৈষ্ণব চরণ ধূলা লাগু মোর গাএ।
সবংশে বিকামু মুঞি বৈষ্ণবের পাএ।"

এই উচ্চনীচে একাকার প্রেমের বাতাসেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়া দেশে দেশে ঘোষণা করিয়াছিল—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ।"

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত প্রচারক বৈষ্ণব-কবিগণ; আমরা দেখিয়াছি—গৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচার হইত কবিতায়—বাগ্মীতায় নহে। সেই কবিতায় সেই গানে—

"জগত ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে। যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥"

আমি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে বসি নাই; কিন্তু এই সকল কাব্য বুঝাইতে হইলে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম—কৃষ্ণভক্তি—হরিভক্তির বিশেষত্ব এই কাব্যমালা হইতে দেখাইয়া দিতে হয়। পদাবলী সাহিত্য হইতে আমরা কতকটা পরিচয় পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি মহাপ্রভু পথে ঘাটে এই কৃষ্ণভক্তি—প্রেম—বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। রাধা-কৃষ্ণলীলা বর্ণনা দ্বারা—পদাবলির প্রেমগান গাহিয়া, আপনি মাধুর্য্য রসে—রাধা-ভাবে ভোর হইয়া প্রেমময় প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া-ছিলেন।

আমরা শুনিতে পাই—"পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া আকুল গো।" আমরা দেখিতে পাই—কুক্রিয়াসক্ত পাষণ্ড মাতালও ভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছে।*

এই রাধা-ভাবের সহিত আসঙ্গলিপ্সার সম্পর্ক—কবিতায় দেখান গিয়াছে; কার্য্যেও কতটা ছিল, তাঁহার জীবনচরিত-প্রণেতাদিগের

---

* প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে, শুদ্ধ বৈষ্ণব মতে, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্য বুঝাইবার জন্য আর দু চারি ছত্র উঠাই—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোহন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি। রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥

* * * * * *

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
(চৈতন্য চরিতামৃত—আদি)

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥

এই শক্তিই কবিগণের হস্তে ভক্তের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর একজন ভক্ত-কবি শ্রীকৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"
(চৈতন্য ভাগবত—আদি)

নিকট হইতে আমরা অবগত হই। প্রভুর একান্ত ভক্ত ছোট হরিদাস শিখী মাইতির ভগিনী পরম বৈষ্ণবী মাধবীর কাছে তণ্ডুল ভিক্ষা চাহিতে গিয়াছিল—প্রকৃতি সম্ভাষণ করিয়াছিল—এই অপরাধে চৈতন্যদেব তাহার আর মুখদর্শন করেন নাই।

(চরিতামৃত—অন্ত্য)

প্রেমময় রাধা-প্রেম বিলাইতেন, কিন্তু—

"...চাপল্য করেন সব সনে।
সভে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টি কোণে॥
সভে পরস্ত্রী মাত্র নাহি উপহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন একপাশ॥

(চৈতন্য ভাগবত—আদি)

আমরা এই তত্ত্ব আরও কিঞ্চিৎ বিশদরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত মাধুর্য্য-রস-রসিক প্রেমাধারের একখানি জীবনী হইতে একস্থল উদ্ধৃত করি—

হেনকালে আইল সেথা তীর্থ ধনবান।
দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে। সন্ন্যাসীর ভারীভুরী পরীক্ষা করিতে॥
সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়। প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥
ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুইজন। প্রভুরে বুঝিতে বড় করে আয়োজন॥
তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে। সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে। সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন। সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥
থরথরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে॥
কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে। ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে॥
কেন অপরাধী কর আমারে জননি। এই মাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥
খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর। অনুরাগে থরথর কাঁপে কলেবর॥
সব এলোথেলো হলো প্রভুর আমার। কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি। রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥

* * * * * *

ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। চরণ তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥
(গোবিন্দদাসের করচা)

এই ত সেই সম্ভোগ-মিলন-বিহারাদি সম্বলিত মাধুর্য্য ভাবের পরিণতি!

ভক্ত মুসলমান-বৈষ্ণব হরিদাসকেও একবার এইরূপ অগ্নিপরীক্ষা দিতে হইয়াছিল এবং বৈষ্ণব-চূড়ামণি জয়ী হইয়াছিলেন, সে কাহিনী অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন; উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

ইহা বুঝিতে পারিলে আমরা বুঝিব রাধাকৃষ্ণ প্রেম কি, ভক্তকে কোথায় লইয়া যায়; কৃষ্ণলীলা—"দেবতার বেলা লীলাখেলা, মানুষের বেলা পাপ" মনে করিয়া হাস্য-পরিহাসের বিষয় কি না।

কিন্তু কথা আছে;—এই মাধুর্য্য-ভাব—রাধাকৃষ্ণ প্রেম—ভক্তিময় বৈরাগ্য ক্রমে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বৈষ্ণব সাহিত্যেই আমরা দেখিতে পাই। তাহারও কিছু পরিচয় দেওয়া বোধ হয় উচিত। বৈষ্ণবেও না কি গাহিয়াছেন—

"যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ॥
প্রেমারাধ্যা রাধা সম তুমি লো যুবতী।
রাখ লো গুরুর মান যা হয় যুকতি॥"

কৃষ্ণ-লীলা—রাধাভাব কালক্রমে যাহাতে পরিণত হইতেছিল দেখিয়াই বোধ হয় লোকে মাধুর্য্য-রসের স্রোতে হাবুডুবু খাইয়া প্রকৃতিতে মাতৃভাব আনয়ন করতঃ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পরেই আমরা শক্তি-দেবীর আবাহন শুনিতে পাই; মুকুন্দরামের চণ্ডী প্রভৃতির আবির্ভাব।

কথিত আছে—মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই—যখন তিনি নীলাচলে অব-

স্নান করিতেছিলেন—সেই সময়েই বৈষ্ণব-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার নিকট এক 'তর্জা' পাঠাইয়াছিলেন—

"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কালে নাহিক আউল। বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত—অন্ত্য)

এই প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ঘাটনে সকলকেই মাথায় হাত দিয়া বসিতে হইয়াছিল।

আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই; আমরা হা কৃষ্ণ হা মহাপ্রভু বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

পঙ্ক হইতে উদ্ধারিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি পঙ্কজ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রসঙ্গ শেষ করি—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি হবে বৃন্দা গোপনারী
আমার দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
ধর ধর জনার্দ্দন পাপ-ভার গোবর্দ্ধন
কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতী॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী মন-ধেনুকে বশ করি
গোষ্ঠের সাধ কৃষ্ণ পুরাও, পদে তোমার এই মিনতি॥
প্রেম-রূপ যমুনার কূলে আশা বংশী-বট মূলে
দাস ভেবে সদয় হয়ে সদা কর বসতি।
যদি বল সে রাখাল-প্রেমে বদ্ধ আছ ব্রজধামে
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হতে চায় দাশরথী॥

——:o:——

প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্য মহা-মহীরুহের আর এক শাখার তত্ত্ব এইবার আমরা লইতে চেষ্টা করিব ;—অনুবাদ শাখা।

যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, কৃত্তিবাস-রচিত ভাষা-রামায়ণই গৌড়বাসী জনসাধারণকে সংস্কৃত মহাকাব্যের গুণ পরিচয় দিবার প্রথম প্রয়াস। কৃত্তিবাস ওঝা পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি।

চণ্ডীদাস যেমন বাঙ্গালা গীতিকাব্যের আদিকবি, কৃত্তিবাস তেমনি বাঙ্গালা সাহিত্যের—প্রকৃত বঙ্গীয় কাব্যের—আদি গুরু।

ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমতঃ অনুবাদ গ্রন্থ আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, প্রসিদ্ধ উপাদেয় গ্রন্থের অনুবাদ হইতে বিস্তর শিক্ষা ও উপদেশ লাভ হয়। ভিন্ন ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থের তত্ত্ব আয়ত্ত করা অনেকের সাধ্যাতীত থাকে, অনুবাদ গ্রন্থ হইতে জনসাধারণের পক্ষে সেই তত্ত্বের অনেকটা আভাস-প্রাপ্তি সুলভ হয়। আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে আদিম মহাকবির রামায়ণ আখ্যান অবিদিত নহে, ভাষা-রামায়ণই তাহার প্রধান কারণ।

রামায়ণ মহাভারত আমাদের জাতির ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে। শুনিয়াছি কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইয়োরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদপত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার—এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণ মূলের অবিকল অনুবাদ নহে ; প্রাচীন কালে বিশেষ মূলানুগত অনুবাদের প্রথাই ছিল না।

কৃত্তিবাসের ভাষা ও ছন্দ—এখনকার প্রচলিত বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে যাহা দেখা যায়, তাহা হইতে ভিন্ন। কৃত্তিবাসের আসল রচনা—প্রায় পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বকালের নিদর্শন অধুনা দুষ্প্রাপ্য। মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান, কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বাবুর তত্ত্বাবধানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যতটা সম্ভব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া কৃত্তিবাসের আসল রচনার কতক পরিচয় দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি কিছু কিছু মিলিয়াছে; তাহাতে কৃত্তিবাসের যে ভাষা দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা ও ছন্দের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য।

কৃত্তিবাসের আদি রচনা না মিলিলেও, ইহা মানিয়া লওয়া চলে যে তখনকার ও এখনকার কৃত্তিবাসী রামায়ণে "মাংসযোজনা বিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অস্থিভাগের বড় একটা পরিবর্ত্তন হয় নাই; কবিত্ব সেই অস্থিগত।" সুতরাং কৃত্তিবাসের কবিত্বের পরিচয় এখনকার রামায়ণ হইতেও আমরা পাইব।

প্রাচীন কৃত্তিবাসের উপর অনেক আগাছা পরগাছা জন্মিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। রাম না হতে রামায়ণ, লবের অগ্রজত্ব, মহীরাবণ-অহীরাবণের গল্প, বীরবাহু-তরণীসেনের পালা, হনুর কক্ষদেশে সূর্য্যদেব, রাবণের মৃত্যুবাণ কাহিনী, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দুর্গাপূজা, মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাবণের রামকে উপদেশ, সমুদ্রের সেতুভঙ্গ, ভূলিখিত রাবণ-প্রতিকৃতির উপর সীতার শয়ন, প্রভৃতি বিষয় মূল রামায়ণের সহিত বিসম্বাদী। হরধনুভঙ্গ, রামাদি চারি ভ্রাতার বিবাহ, রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি বর্ণনা মূলানুগত নহে। পরিহাস-রসিকতার পরিচায়ক প্রসিদ্ধ "অঙ্গদ-রায়বার" অনেকের মতে শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা, কৃত্তিবাস মধ্যে প্রক্ষিপ্ত।

কৃত্তিবাসের কাব্যের ভিতর এখন যে আমরা দেখিতে পাই—

"অন্নের কি কব কথা কোমল মধুর। খাইতে মনেতে হয় কি রস প্রচুর॥
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ। চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্ব্বিধ॥
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর। যাহা নিরখিবামাত্র মতি হয় চুর॥
নিখুঁত নিখুঁতি মণ্ডা আর রসকরা। দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা॥

(ভরদ্বাজাশ্রমে বানর ভোজন)

এমন চতুর্দ্দশ অক্ষরের বাঁধুনী, পরিমার্জ্জিত ভাষা, রচনার কারিগরী, পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গভাষায় আশা করা যাইতে পারে না।

কৃত্তিবাসে ছন্দ সমস্তই পয়ার ও ত্রিপদী (নাচাড়ি)। এখনকার কোন কোন সংস্করণ কৃত্তিবাসে "নর্ত্তক ছন্দ" পাওয়া যায়—

"তবে দেখি তাহারে সেই ত দ্বারে প্লবঙ্গমগণ।
তারা তরু-শিখরী করেতে ধরি রহে সুখী মন॥"

এমন সব আয়াস-সাধ্য ছন্দ তত পূর্ব্বকালের রচনা হওয়া অসম্ভব। (আমরা এই ছন্দে এই প্রসঙ্গ পরবর্ত্তী "রাম-রসায়ণে" পাইয়াছি, সুতরাং এটি কৃত্তিবাস-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ধরিতে হয়)।

কৃত্তিবাস কবি মূর্খ ছিলেন না। কবি নিজে গাহিয়াছেন—

"পুরাণ শুনিয়া গীত গাইনু কৌতুকে।"

আমরা ইহা দেখিতে পাই বলিয়া, কৃত্তিবাস মূল আখ্যান পড়েন নাই সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ভাষা-রামায়ণে অনেক স্থলে কবির বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। (তবে 'বাল্মীকির মত' লইয়া স্থলে স্থলে গোলযোগ আছে)।

রামায়ণ ব্যতীত—"যোগাদ্যার বন্দনা," "শিব-রামের যুদ্ধ," "রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী" প্রভৃতি অপর কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়।

শ্রীরামপুরের মিসনরী সাহেবরাই এদেশে সর্ব্বপ্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত করেন—সে আজ একশত বৎসরের কথা। সেই আদর্শেই বটতলায় রামায়ণ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল, মধ্যে জনকতক বিদ্যাবাগীশ মিলিয়া ভাষা ও ছন্দকে মার্জ্জিত করতঃ উভয়ের আধুনিকত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। এই দুই সংস্করণের উত্তর কাণ্ডে অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়; বটতলার গ্রন্থে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ছায়াপাত বেশী, অপরে শৈব প্রভাব সমধিক।

বাল্মীকি-রামায়ণে শ্লোক সংখ্যা ২৪০০০, কৃত্তিবাসে—শ্রীরামপুর সংস্করণে আন্দাজ ১৬০০০ শ্লোক পাওয়া যায়। তাহার ভিতর আবার প্রক্ষিপ্ত পালা অনেকগুলি। ইহা হইতেই বুঝা যায়, আমাদের কবি মূল আখ্যান স্থলে স্থলে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্জ্জিত করিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে আপন ভাষায় রামায়ণ গাহিয়াছেন।

কৃত্তিবাস ওঝা পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি। তখন যবন-বিজয়ী প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা গণেশ (বা কংস নারায়ণ) গৌড়াধিপ। বঙ্গেশ্বরের সহিত কবির সাক্ষাৎকার বর্ণনা বেশ জীবন্ত চিত্র; তাঁহার নিজের নিকট হইতেই শুনা যাউক—(বলিয়া রাখি, ছন্দের পারিপাট্য না থাকিলেও এ ভাষা ঠিক তৎকালিক বঙ্গভাষা নহে)।

গুরুস্থানে মেলানি লৈলাম মঙ্গলবার দিবসে। গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে। পঞ্চ শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম। রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারে রহিলাম॥
সপ্ত ঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি। শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠী॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস। রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে। সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ। তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ। পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার। * রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥

তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে। পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ।।
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী। সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর। জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার। দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ।।
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে। অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজারসম্মুখে ।।
চারিদিকে নাট্য গীত সর্ব্ব লোক হাসে। চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে ।।
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরী। তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ।।
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর। মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে। নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে ॥
রাজা আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈস্বরে। রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ।।
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে। সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ।।
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে। সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে ।।
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়। শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ।।
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল। খুসী হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ।।
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া। রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ।।
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান। পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ।।
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ।।
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ।।
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার। যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ।।
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে। আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক। রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ।।
প্রসাদ পাইয়া বাহির হৈলাম সত্বরে। অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ।।
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি। পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণি ।।
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু আজ্ঞা দান। রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ।।
সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে। কৃত্তিবাস রচে গীত স্বরস্বতীর বরে ।।

এই টুকু হইতে সেই পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার আমাদের দেশের

রাজসভার আদব কায়দার যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায়; ইহার ভিতর কবি-কল্পনা নাই।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে অঙ্কিত দু একটী চিত্র আমরা দেখাই,—বৃদ্ধ স্থবির রাজা দশরথ—

অযোধ্যা নগরে দশরথ মহারাজা। দেবলোক নরলোক করে যার পূজা॥
শুকুল অভরণ রাজার শুকুল উত্তরী। চন্দনে লেপিত রাজা শুকুল বস্ত্রধারী॥
বুড়া বয়সে দশরথের পাকিল মাথার কেশ। শুকুল মালা পরে রাজা শুকুল সকল বেশ॥
রাজকার্য্য করে রাজা বসিযা সিংহাসনে। চতুর্দ্দিকের রাজা আইল রাজ সম্ভাষণে॥
হস্তী ঘোড়া রথ কত নানা অভরণে। বিভার যৌতুক নাসে দিল বাজগণে॥
সভায় নমস্কার সবে করে যোড়হাত। মহারাজ দশরথ সবাকার নাথ॥

সর্ব্বনাশী মন্থরা—

প্রাতঃকাল হৈতে এখন দণ্ড চারি আছে। মন্থরা বলে কেকয়ি না থাকিব তোমার কাছে॥
পূর্ব্ব জন্মে ছিল কুঁজী ইন্দ্রের অপ্সরা। রামের বনবাস হেতু নাম মন্থরা॥
কেকয়ীর চেড়ী সে ভরতের ধাত্রীমাতা। রামসীতার দুঃখ হেতু সৃজিল বিধাতা॥
বিভা কালে দশরথ দান পাইল চেড়ী। রাম রাজা হব বলি করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতি কুচ্ছিত দেখি তারে। সব নষ্ট হয় কুঁজি থাকে যার ঘরে॥
পিঠে কুঁজ যেন কুকুণ্ডার বুড়ী। কুঁজি হৈয়া জন্মিল সেই বুদ্ধির কুচড়ি॥

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৃত্তিবাসের রামায়ণ তাঁহার সময়কার কতকগুলি সামাজিক ও গার্হস্থ্য চিত্রে শোভমান। কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাই—

এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকে। শুনি শতানন্দ মুনি হস্ত দিল নাকে॥
গলায় বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন। তোমার পুত্রে কন্যা দিয়া লৈলাম শরণ॥
দশরথ রাজা বলে জনক রাজারে। শরণ লইলাম দিয়া চারিটি কোঙরে॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ। কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ॥
নানা বেশ ভূষা করেন সখীগণ। বেশ করিল লক্ষ্মী মোহিতে নারায়ণ॥
মাথায় কেহ কেহ দেয় আমলকি। তোলা জলে স্নান এবে করে চন্দ্রমুখী॥
চিরুনিতে কেশে করে জলের মার্জ্জন। অঙ্গ অঙ্গ অভরণ দিতেছে তৎক্ষণ॥

কপালে তুলিয়া দিল নির্ম্মল সিন্দুর। বালসূর্য্য সম তেজ দেখি যে প্রচুর॥
নাকেতে বেশর দিল মুকুতা হিল্লোলে। পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে॥
চঞ্চল নয়ন মেলি কজ্জলের রেখা। কামের কামান যেন গুণ পলিতেকা॥
গলায় তুলিয়া দিল হার ঝিলিমিলি। বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি॥
উপর হাতেতে তুলি দিল সোনার তাড়। অঙ্গে অভরণ দিয়া ভূষিল অপার॥
দুই বাহু শঙ্খেতে পরেন অতি বিলক্ষণ। শঙ্খের উপরে বাজে সোনার কঙ্কন॥
বস্ত্র যে পরিল সবে সুন্দর প্রচুর। দুই পায়ে তুলি দিল বাজন নূপুর॥
সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী। চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি॥
চারি ভগিনীতে বেশ করিল বিলক্ষণ। শুভক্ষণে মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন॥
অঞ্জলি পুষ্প দিয়া তবে নমস্কার করে। সপ্ত প্রদক্ষিণ কৈল রামের পদতলে॥
অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধুজন। লক্ষ্মী নারায়ণে হৈল শুভ দরশন॥
জলধারা দিয়া কন্যা বর লৈল ঘরে। শোয়াইল লৈয়া লক্ষ্মী অন্ধকার ঘরে॥
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ। ষষ্ঠীর পূজা করুন রাম নারায়ণ॥
হস্তে ধরি আনাইল রাম নারায়ণে। সীতার হাতে ধরি তোল বলে বন্ধুজনে॥
মনেতে ভাবিলেন তখন সীতা ঠাকুরাণী। পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমণি॥
বাম হাতের শঙ্খ করেন ঝনঝনি। হাতেতে ধরিয়া সীতায় তোলেন রঘুমণি॥
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে সেই ঠাঁয়ে। কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পায়ে॥
পূর্ব্বাপর বর কন্যা আইল দুইজনে॥ রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে॥
কন্যা দান করে রাজা বিবিধ প্রকারে। পঞ্চ হরিতকী দিয়া পরিহার করে॥
দাস দাসী অনেক রাজা দিল কন্যা বরে॥ জলধারা দিয়া কন্যা বর লৈল ঘরে॥
রাজরাণী গিয়া ঘরে করিল রন্ধন। কন্যা বর দুই জন করিল ভোজন॥
বাসর ঘর সাজাইল যত সখীগণ। রাম সীতা বাসর ঘরে বঞ্চিল দুইজন॥

বুঝিতেই পারা যায়, ইহা মূল-বহির্ভূত; কবির আপন সময়ের একটি লৌকিক আচারের বর্ণনা।

আমরা কৃত্তিবাসে পাঠ-বিপর্য্যয়ের কথা—চতুর্দ্দশ অক্ষরে বাধুঁনীর কথা বলিয়াছি। পরবর্ত্তী সংস্করণ হইতে এই বর্ণনার মধ্যবর্ত্তী কতিপয় ছত্র তুলি, তফাৎ বুঝিতে পারিবেন—

চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ। তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে। প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে॥
অন্তঃপুর ঘুচাইল যত বন্ধুগণ। সীতা রামে পরস্পর হৈল দরশন॥
জলধারা দিয়া ত্বরা কন্যা দিল পরে। শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে॥
বরকে আসিতে আজ্ঞা করে সখীগণ। আসিয়া করেন রাম ষষ্ঠীর পূজন॥
হস্তে ধরি আনাইল রামেরে তখন। সীতা হস্ত ধরি তোলে বলে বন্ধুগণ॥
তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী। পায়ে হস্ত দেন পাছে রাম গুণমণি॥
করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি। হস্তে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি॥
স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে সেই কালে। কেহ বলে হস্তে ধরে কেহ পায়ে বলে॥

ইহা ত শুধু অক্ষর বদল, স্থলে স্থলে লাইনকে লাইন যোগ বিয়োগ আছে।

খাঁটি কৃত্তিবাসের রচনার সহিত তুলনা করিলে আরও কত প্রভেদ লক্ষিত হইতে পারে।

কৃত্তিবাসের সময়ে—পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে—সহমরণ প্রথা এ দেশে প্রচলিত ছিল। আমরা সে দৃশ্যও দেখিতে পাই; জমদগ্নি-মুনীপত্নী রেণুকা দেবীর চিতারোহণ—

পুত্রের কোলে জমদগ্নি ত্যজিল জীবন।

নর্ম্মদার জলে মুনিকে স্নান করাইঞা। চিতার উপর মুনিকে এড়ে শোআইঞা॥
ব্যর্থ না যায় মাগো তোমার বচন। স্বামীর অনুগচ্ছ কর স্বর্গ গমন॥
শুনিঞা পুত্রের বোল রেণুকা ব্রাহ্মণী। ধন্য ধন্য করিঞা ভৃগুরামকে বাখানি॥
চিতার উপর বসিঞা পুত্রে দিল আশীর্ব্বাদ। প্রতিজ্ঞা সত্য রহিল বাপু তোমার প্রসাদ॥
মনের সুখে সুখী রেণুকা পুত্রে দিল বর। সূর্য্য সমান তেজ হৈছে তোমার কলেবর॥
সতী পতিব্রতা স্ত্রী সত্যে করে ভর। স্বর্গে রাজ্য করে আউট কোটি বৎসর॥
স্বামী সনে অনুমরণে মরে জে বা স্ত্রী। দেবের রথে চড়িঞা যায় স্বর্গপুরী॥
তাহার উপর জমের নাহিক অধিকার। স্বর্গলোক জাইতে পড়ে জয় জয় কার॥
তোমার কীর্ত্তি থাকিবেক আমর্ত্ত ভুবনে। সতী স্ত্রীর গতি নাহি স্বামী বিহনে॥
স্ত্রী হঞা স্বামীর সেবা বৈ আন নাহি জানে। যশ পুণ্য ধর্ম্ম পাত্র লোক তাকে বাখানে॥

স্বামী সনে মরে যে স্ত্রী আপন সাহসে। দুই কুল উদ্ধারে সে চৌদ্দ পুরুষে॥
আন জঞ্জাল ছাড়িঞা শুন সাবধানে। কৃত্তিবাস গাইল উত্তর রামায়ণে॥

দেবতাগণ উপকরণ-সম্ভার আনিয়া যোগাইলেন; মালা, চন্দন, অগুরু, শ্বেতচামর, গুবাক, নারিকেল, নানা তীর্থ-জল, তিল, তুলসী, ঘৃত, অমৃত, কাষ্ঠ, অগ্নিহোত্রদ্রব্য প্রভৃতি আনীত হইল—

দেবতা সকলের স্ত্রী আইলা দেখিবার তরে। তিন লোক আইল কেহ না থাকে ঘরে॥
স্বর্গকন্যা মর্ত্তকন্যা হঞা এক মেলি। সবে সুখে করে মঙ্গল হুলাহুলি॥
সিথাতে সিন্দুর দিল মাথে মুক্তামালা। দুকূলে প্রদীপ দিয়া রুপিলেন কলা॥
কুবের আনিয়া দিল বিলাবার ধন। মন্ত্র পড়ি অনলে করিল আরোহণ॥
শত পল সুবর্ণেতে সুধ্যা অন্ন দিয়া। পতি কোলে কৈল বামা শ্রীহরি বলিয়া॥
চিতাতে শোয়ায় ভৃগু জনক জননী। ঘৃত বস্ত্র দিয়া মুখে দিলেন আগুনি॥
মাতা পিতা দুই জনে ছোঁআয়া আগুনি। তবে সপ্ত অগ্নি দিল ভৃগুরাম মুনি॥
স্বামীর সহিত মরি চড়ি দিব্য রথে। দুই জনে ব্রহ্মলোকে গেলা স্বর্গপথে॥

সহমরণে সতীদাহ দেখিতে ধূম পড়িয়া যাইত, লোকে লোকারণ্য হইত।* (বাল্মীকি-রামায়ণে সহমরণ নাই।)

এইবার কৃত্তিবাসের কবিত্বের পরিচয় কিঞ্চিৎ দিতে চেষ্টা করি। রাজরাজেশ্বর বনবাসী হইয়া ভীষণ দণ্ডকারণ্যে গোদাবরী-তীরে পর্ণ-কুটির নির্ম্মাণ করিয়া ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত দীনভাবে কালযাপন করিতেছেন; আঁধার কুটির আলো করিয়া প্রাণের সঙ্গিনী জনকনন্দিনী কোন মতে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন; অকস্মাৎ ক্রুর রাহু

* "সতী-দাহ" দেশে যে অত্যাচার হইত মনে হয় না; যখন কোথাও হইত, একটা 'পরব' পড়িয়া যাইত; দেখিবার জন্য অন্যান্য গ্রাম নগর হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। ভারতের ভূতপূর্ব্ব ভাগ্য-বিধাতা লাট কর্জ্জন সাহেব কলিকাতা Imperial Libraryতে কতকগুলি ছবির বহি উপহার দিয়াছেন; এক খানিতে একটি সুরঞ্জিত সতীদাহের চিত্র আছে; চিত্রখানি কোন পুরাতন ছবির নকল। তাহাতে দৃষ্ট হয়, মহাজনতা—দূরদেশ হইতে লোকে হাতী ঘোড়া উট চড়িয়া পুণ্যকর্ম্ম দেখিতে আসিয়াছে।

আসিয়া চন্দ্রমাকে গ্রাস করিল—সীতা-হরণ হইল। রামচন্দ্রের সে শোক বর্ণনার অতীত—

"রামের ক্রন্দনে কান্দে বন পশু পাখী।"

লক্ষ্মণ আশ্বাস দিতে লাগিলেন। দুই ভ্রাতায় অন্বেষণ করিতে করিতে—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের পাশে। ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে আসে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ। কোথা গেলে পাব সীতা কর অন্বেষণ॥
মন বুঝিবার তরে জানকী আমার। লুকাইয়া আছেন জানহ সমাচার॥
হবে কোন মুনী-পত্নী সহিত কোথায়। গেল রে জানকী নাহি জানায়ে আমায়॥
গোদাবরী তীরে আছে কমল-কানন; তথায় কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মলতা হেমাঙ্গিনী সীতারে পাইয়া। রাখিলেন হবে কোন বনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস। চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমারে হেরিয়া সে বনিতা। হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে। রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে। কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে। লুকাইল জানকী তেমন বনান্তরে॥
কণকলতার প্রায় জনক-দুহিতা। বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ। দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ॥
হরিতে না পারে তারা তিমির আমার। এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার॥
দশদিক্ শূণ্য হেরি সীতার অভাব। সীতা বিনা অন্য নাহি হৃদয়ের ভাব॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ। সীতারে আনিয়া দেহ আমার জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান। তেঁই সে এ স্থানে আমি করি অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে। হরিলেন তপোবন সীতা নাহি ঘরে॥
শুন শুন মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা। কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন। হেরিলেন পথমধ্যে সীতার ভূষণ॥

আর কাজ নাই। বাঙ্গালী আমরা, বীর রাম অপেক্ষা এই রামচন্দ্রকে দেখিয়াই বেশী মুগ্ধ হই।

যুদ্ধকাণ্ড বা লঙ্কাকাণ্ডে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী কৃত্তিবাস রামের বীরত্ব অল্পই দেখাইতে পারিয়াছেন ; কিন্তু তৎস্থলে যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা মূল-বহির্ভূত হইলেও ভক্তিমান বঙ্গবাসীর মনোনীত।

আমাদের অধিক উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। সীতা-নির্ব্বাসনটুকু শুনাই—

লক্ষ্মণের বোলে সীতা লুটায় ভূমিতলে। ঝড়ে গাছ পড়ে যেন ভাঙ্গি ডালে মূলে ॥
ধৈর্য্য করি সীতাকে লক্ষ্মণ বীর তোলে। লক্ষ্মণেরে দিআ সীতা রামে কিছু বলে ॥
কোন পাপ কৈনু আমি জন্ম জন্মান্তর। তে কারণে বর্জ্জে রাম পৃথিবীর ঈশ্বর ॥
স্ত্রী জাতি পাপ করে দৈবের ঘটন। তেঁই মোরে বর্জ্জিলেন কমললোচন ॥
চৌদ্দ বৎসর আছিলাঙ লোক-অদর্শনে। কেমনে থাকিব বনে শ্রীরাম বিহনে ॥
মুনী সব শুধাইব তোমা কেন বর্জ্জে। তাহা সভারে উত্তর দিব কোন লাজে ॥
শ্রীরামের গর্ভ আছে আমার উদরে। তে কারণে নাহি জাঙ পাতাল ভিতরে ॥
না লঙ্ঘি ভাইর আজ্ঞা আমি ভাল জানি। আমা লাগি পাবে কেন অপযশ কাহিনী ॥
সাশুড়ি সভাকে মোর জানাবে প্রণতি। ললাটে লিখন ছিল দৈবগতি ॥
প্রভু রামে জানাবে আমার নমস্কার। প্রজার পালন করি সাসিও সংসার ॥
আমার বর্জ্জনে যদি প্রজা হএ সুখী। আমার বর্জ্জন তবে ভাগ্য করি লেখি ॥
পৃথিবী পালুন রাম করুন পৌরুষ। আমার লাগিয়া কেন সহি অপযশ ॥
আমাকে বর্জ্জিয়া দুঃখ না ভাবিহ মনে। স্ত্রীর তরে দুঃখ ভাব তুমি হেন জনে ॥
আমা স্ত্রী এড়িলে যশ ঘোষে সর্ব্বজনে। ভাগ্য করি মানি আমি আপন বর্জ্জনে ॥
আমি হেন শত নারী যশ হেতু ছাড়ি। তাঁর যশ পরিপূর্ণ হব দেশ জুড়ি ॥
জোড় হাতে লক্ষ্মণ করিআ নমস্কার। সীতা প্রদক্ষিণ করি হৈল গঙ্গাপার ॥

মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের ভিতর যশোলিপ্সু রাজার প্রতি ঈষৎ অভিমানের রেখাও যেন ফুটিয়া উঠে!

এ সময়ে আমাদের সেই বালী-পত্নী তারার অভিশাপটি মনে আসে। কৃত্তিবাসে সেটুকু বড় সুন্দর—

তারা বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তম কুলে। আমার পতি কাটিলা তুমি পাইয়া কোন ছলে ॥
দেখাদেখি যুঝিতে যদি বুঝিতে প্রতাপ। অদেখা মারিলে প্রভু বড় পাইনু তাপ ॥
প্রভু মোর শাপ না দিলেন করুণ-হৃদয়। মুঞি শাপ দিব যেন হয় ত নিশ্চয় ॥

সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপন বিক্রমে। সীতা ঘরে আসিবেন অনেক পরিশ্রমে ॥
সীতা লইয়া ঘর করিবে হেন মনে আশ। কতো দিন রহি সীতা ছাড়িবে তোমার পাশ ॥
তুমি যেমন কান্দাইলে বানরের নারী। তোমা কাঁদাইয়া সীতা যাবেন পাতালপুরী ॥

অনেকের মতে কৃত্তিবাসের আসল রচনার নমুনা এই।

"অঙ্গদ রায়বার" কৃত্তিবাসের স্বরচিত হউক বা না হউক, বহুদিন হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি প্রসিদ্ধ দৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। সেটি আমরা সংক্ষেপে দেখাইব। অঙ্গদ-রাবণের "বাক্যের তরঙ্গ" বিলক্ষণ কৌতুকপ্রদ।

রাবণের বলাবল পরীক্ষা করিতে এবং রামের প্রতাপ প্রচার করিতে কপিরাজপুত্র লঙ্কায় দৌত্যে আসিয়াছেন; তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া ভয় খাইয়া দশানন আত্মগোপন উদ্দেশে সভাশুদ্ধ লোককে আপনাকৃতি করিয়া ফেলিলেন। রক্ষরাজ-সভায় মায়ায় গঠিত বহু-রাবণ-মূর্ত্তি মধ্যে বজ্রফোঁটাধারী ইন্দ্রজিৎকে চিনিতে পারিয়া, তাহার বহুপিতৃত্বে গালি দিয়া, অঙ্গদ বলে—

"একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
ই সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা ॥"

"যোগী" অবশ্য সীতাহরণ কালের ভণ্ড-তপস্বী-বেশী।

দশানন যখন নানা শ্লেষ বাক্য সহিতে না পারিয়া রাগিয়া বানর-রাজপুত্রের পরিচয় চাহিলেন, অঙ্গদ রক্ষরাজকে পুরাকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন;—তাঁহার পিতা এক সময়ে দিগ্বিজয়ী রাক্ষসপতির গলায় লাঙ্গুল জড়াইয়া তাঁহাকে সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইয়া ছাড়িয়াছিলেন—

"পড়ে কি না পড়ে মনে হলো অনেক দিন।
হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন্ ॥"

রাবণ যখন রামকে "গুহক চণ্ডালের মিতা," "ভ্রাতৃত্যক্ত"

"বানর-সহায়" বলিয়া গালি পাড়িতে পাড়িতে, ক্ষমা ভিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি কড়ার প্রস্তাব করিলেন, তখন—

"অঙ্গদ বলে রাবণ আমরা তাই চাই।
কচ্‌কচিতে কায কি মোরা দেশে চলে যাই।"

যাহা প্রস্তাব করিতেছ, যতই কঠিন হউক, সব পারিব—

"নিম্নাইয়া দিব লঙ্কা যতেক গেছে পোড়া।
কিন্তু শূপনখার নাক কাণটি কেমনে যাবে যোড়া॥"

বানরবীর রক্ষরাজকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন—

"আপনি কুঠার মারি আপনার পায়।
অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায়॥
বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি হতভাগা।
শিরে কৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধ্‌বি তাগা॥
সর্ব্ব শাস্ত্র পড়ি বেটা হৈলি হতমূর্খ।
বল্‌লে কথা বুঝিস্ নাই এইটে বড় দুঃখ॥"

ইহার পরও যখন রক্ষপতি অঙ্গদকে রামের দল হইতে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলেন, তখন বীরকুমার আবার অস্থিভেদী ব্যঙ্গে রাবণের দর্প চূর্ণ করিয়া দিলেন—

"হিতোপদেশ কি বল্‌বি বেটা গরু।
তুই বাঁচলে মোর বাপের কীর্ত্তিকল্পতরু॥"

বাঙ্গালী যে চার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেও বিলক্ষণ বাক্য-বীর ছিলেন, এই অঙ্গদ-রায়বার হইতে বেশ বুঝা যায়। (শঙ্কর রচিত হইলেও প্রাচীন।)

মূল-বহির্ভূত কিন্তু বঙ্গবাসীর মনঃপূত আর দু একটি কথা শুনাইয়া আমরা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

অতিকায় রাক্ষস-সেনাপতিকে লক্ষ্মণ যুদ্ধে হত করিলেন,—

সমুকুট মুণ্ড পড়ে সহিত কুণ্ডলে।
অতিকায় মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে॥
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড "রাম রাম" বলে।
প্রেমানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে॥"

আবার আর এক রাক্ষসবীর যুদ্ধে যাইতেছেন—

"সাজিল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম।
আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রাম নাম॥
লক্ষ লক্ষ রাম নাম গঙ্গা মৃত্তিকাতে।
লিখিলেক রথে আর ধ্বজ পতাকাতে॥
গড়ের বাহির হয়ে দিলেক ঘোষণা।
"রাম জয় রাম জয়' বাজাও বাজনা॥"

যুদ্ধ করিতে করিতে রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া, রক্ষবীর—

"অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে স্তব করিতে লাগিল॥"

তারপর পরম দয়ালু রঘুমণির হস্তে মৃত্যু বাধিয়া যায় দেখিয়া, তাঁহাকে রাগাইয়া দিলে, রামচন্দ্র রাক্ষসের শিরশ্ছেদ করিলেন; তখন—

"তরণীর কাটামুণ্ড 'রাম রাম' বলে।"

বীরবাহুর যুদ্ধেও অই কাণ্ড; রক্ষরাজপুত্র—

"ধরণী লোটায়ে রহে জুড়ি দুই কর।
অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর।"

প্রথমে শত্রুর স্তব, পরে ছল করিয়া ক্রোধ-উৎপাদন, ক্রমে শিরশ্ছেদ, তখন—

"ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড 'রাম রাম' বলে।"

রাবণের ক্রম বীরত্ব অপেক্ষা বাঙ্গালীর রামায়ণে পদে পদে তাহার শোক-সমুত্থিত ক্রন্দন এবং—

"জন্মিয়া ভারত ভূমে আমি দুরাচার।
করেছি পাতক যত সংখ্যা নাহি তার॥
অপরাধ মার্জ্জনা করহ দয়াময়।
কুড়ি হস্ত জুড়ি রাবণ একদৃষ্টে রয়।"

এইরূপ পাপী তাপীর অনুতাপ দেখিয়া আমরা অধিকতর সন্তুষ্ট হই। এই সকল গুণের জন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমাদের গৃহের স্বল্প-শিক্ষিতা রমণীকুলের ও বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণী লোকের এত প্রিয়।

অনেকে বলেন, এ সকল অংশ কৃত্তিবাসের রচনা নহে, এ গুলি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ কর্ত্তৃক ভাষা-রামায়ণ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বিষয়।

পরম শাক্ত রক্ষ-পরিবারের বৈষ্ণবগণ-হস্তে এ হেন দুর্গতি দেখিয়া, শাক্ত কবিগণ পরে ইহার উত্তর স্বরূপে বাঙ্গালা রামায়ণে রামচন্দ্র দ্বারা দুর্গাপূজা করাইয়াছেন এবং বিষ্ণু-অবতারকে শক্তি-দেবীর সাহায্যে রণ-জয়ে সক্ষম দেখাইয়াছেন।

এই সমালোচকগণের মতে এ সব ব্যাপার মূল কৃত্তিবাসে ছিল না। একটা প্রমাণ—পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এ সকল কথা নাই।

বৈষ্ণব কবিগণের দ্বারা কৃত্তিবাসে (মূল-বহির্ভূত) আর একটী কারিগরী বড় সুন্দর। রাম ও কৃষ্ণে অভেদত্ব তাঁহারা বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতের নাগ-পাশ হইতে গরুড় আসিয়া মুক্ত করিলে, তাহার প্রার্থনারূপ পুরস্কার দিতে রাম শ্যাম হইলেন ;—

এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন। পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুৎ রচন॥
ভকত-বৎসল রাম তাহার ভিতরে। দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে। হনুমান দেখে তবে ভাবিছে অন্তরে॥
হনু বলে প্রাণপণে করি প্রভু-হিত। পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত॥
দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি। ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী॥

হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার। ধনু খসাইয়া বাঁশী দিল আর বার॥
যদি ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে। লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে। লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে॥

চমৎকার! কিন্তু সময়ের কথা ভাবিলে তাজ্জব ব্যাপার। কোথায় রাম আর কোথায় কৃষ্ণ!

আসল কৃত্তিবাসের রচনা কি না ঠিক নাই, প্রাচীন পুঁথিতে মিলে না, আধুনিক বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে এক একটী সন্দর্ভ পাওয়া যায়, ভক্তিপ্রাণ বাঙ্গালী জাতির বড়ই মনোমদ। একটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাই—

লঙ্কাজয়ের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইলেন, মহাসমারোহে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইয়া গেল; যাহার যাহা অভিলাষ নবভূপতি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম আপনার কণ্ঠের দেবদত্ত মালা খুলিয়া কপিরাজ সুগ্রীবকে পরাইয়া দিলেন, অঙ্গদকে অপূর্ব্ব ভূষণে ভূষিত করিলেন; মহাবীর হনুমানকে কিছুই দিলেন না। হনুমান কোনই উচ্চবাচ্য না করিয়া অভিমান ভরে এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্রীরামের দানেতে সকলে হয় সুখী। হনুমান কেবল মুদিল দুই আঁখি॥
অপরাধ কত কৈনু প্রভুর চরণে। সবারে তোষেণ মোরে না তোষেণ কেনে
বাহির করেন সীতা আপনার হার। কি কব তাহার মূল্য ভুবনের সার॥
সে হার দেখিয়া সবে চাহে পরস্পর। মালা রত্ন মণি মাণিক্য পরশ পাথর॥
বড় বড় সেনাপতি করে অনুমান। না জানি সীতার হার কোন জন পান॥
হস্তে হার করি সীতা রামের পানে চান। অভিপ্রায় মনে এই কারে করেন দান॥
বুঝিয়া শ্রীরাম তায় করেন বিধান। যারে তব ইচ্ছা হয় তারে কর দান॥
জানকী হনুর পানে চান বারে বারে। ধায়ে গিয়ে হনুমান গলে হার পরে॥
হনুর গলায় শোভে জানকীর হার। হনুমান প্রণমিলা চরণে সীতার॥
সীতা বলে যতকাল থাকিবে পৃথিবী। রোগ পীড়া হীন বাপ হও চিরজীবি॥

যাবৎ থাকিবে চন্দ্র সূর্য্যের প্রচার। তাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার॥
তৎকাল হও তুমি অক্ষয় অমর। হনুমান অমর পাইল এই বর॥
রাম নাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে। যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে॥
হাসিতে হাসিতে হনু হার লয়ে হাতে। ছিন্ন ভিন্ন করে হার চিবাইয়া দাঁতে॥
হনুর দেখিয়া কর্ম্ম হাসেন লক্ষ্মণ। কুপিয়া রহস্য তারে বলেন তখন॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু করি নিবেদন। হনুমানের গলে হার দিলে কি কারণ॥
সহজে বানর জাতি পশুর মিশালে। রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে॥
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ। কি হেতু ভাঙ্গিল হার পবননন্দন॥
ইহার বৃত্তান্ত হনুমান ভাল জানে। জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভা বিদ্যমানে॥
হনুমান কহে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ। বাৎসল্য দেখিয়া হার করিনু গ্রহণ॥
দেখিলাম বিচার করিয়া তার পরে। রাম নাম নাহি দেখি হারের ভিতরে॥
সেই হেতু হার আমি করিনু ভক্ষণ। পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োজন॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন পবনকুমার। রাম নাম চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার॥
তবে কেন মিথ্যা দেহ করিছ ধারণ। কলেবর ত্যাগ কর পবননন্দন॥
এতেক শুনিয়া তবে পবনকুমার। কলেবর নখে চিরি করিল বিদার॥
সভা মধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ। অস্থিময় রাম নাম লেখা লক্ষ লক্ষ॥
দেখিয়া সভার লোক হৈল চমকিত। অধোমুখে লক্ষ্মণ যে হইল লজ্জিত॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন বীর হনুমান। শ্রীরামের ভক্ত নাহি তোমার সমান॥

বাস্তবিক! এই ভক্তির জোরে হনুমান দেবতার পদবী লাভ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের দেশে—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাবধি রামচন্দ্রের পূজা অধিক, কি এই ভক্ত চূড়ামণি মহাবীরের পূজা সমধিক, স্থির করা কঠিন।

বলিয়া রাখা চলে, বাল্মীকি-রামায়ণে সীতাদেবী কর্তৃক হনুমানকে এই হার পুরস্কারের কথা আছে, পরবর্ত্তী মনোহর অংশ টুকু নাই।

কৃত্তিবাসের রাম-মাহাত্ম্যের পরিচয় একটু গ্রহণ করুন—সুন্দর স্তোত্র—

শমন-দমন রাবণ রাজা রাবণ-দমন রাম।
শমন-ভবন না হয় গমন সে লয় রামের নাম॥

রাম নাম জপ ভাই অন্য ধর্ম্ম পিছে। সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রাম-নাম বিনে মিছে ॥
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে। বিমানে চড়িয়ে যায় সেই দেব-লোকে ॥
শ্রীরামের মহিমা কি দিব রে তুলনা। তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা ॥
পাপী জন পায় মুক্তি বাল্মীকির গুণে। অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥
রাম নাম লইতে ভাই না করিহ হেলা। ভব-সিন্ধু তরিবারে রাম-নাম ভেলা ॥
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা। বনের বানর বন্দি জলে ভাসে শিলা ॥
চণ্ডালে যাহার দয়া বড় সকরুণ। পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ ॥
শ্রীরাম নামের গুণ কি দিব তুলনা। পাষাণ মনুষ্য হয় নৌকা হয় সোনা ॥
রাম নাম বল ভাই এই বার বার। ভবে নাথ রাম বিনা গতি নাহি আর ॥
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে। অশ্বমেধ-ফল হয় রামায়ণ শুনে ॥
পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে। দীন দেখি নৌকা রাম লয়ে গেল দূরে ॥
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হৈয়া। কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নাইয়া ॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান তারে যদি কর পার তবে বলি রাম ॥
আমার সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে। কর বা না কর পার কূলে আমি বসে ॥
নাবিকের স্বভাব যে আমি জানি ভালে কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥
কারে ভাঙ্গ কারে গড় এই তোমার কাজ। কারো মুণ্ডে ছত্রদণ্ড কারো মুণ্ডে বাজ
এক শত পুত্র কারো অক্ষত করি দেও। একটি সন্তান কারো তাও হরে লও ॥
আপনি যে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড়। সর্প হয়ে দংশ তুমি রোজা হয়ে ঝাড় ॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবা। পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবা ॥
সাধু জনে তরাইতে সর্ব্ব দেবে পারে। অসাধু তরাণ যিনি ঠাকুর বলি তারে ॥
অহল্যা পাষাণী হৈয়ে ছিল দৈব দোষে। মুক্তি পদ পাইল তব চরণ পরশে ॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি। তরাবারে দুটি পদ করেছ তরণী ॥
যদি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব। বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব ॥
রাম-নদী বাহিয়া যায় দেখহ নয়নে। উহায় গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে ॥
আয়রে পামর লোক পার হবে যদি। মন ভরি পান কর বহে যায় নদী ॥
মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে। সেই স্বর্গে যায় যম দাণ্ডাইয়া দেখে ॥
এমন রামের গুণ বলিতে না পারি। কৃপায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি ॥

এই সকলের জন্যই—"কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি।"

কৃত্তিবাসের পর যে কয়খানি রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনন্ত

রচিত রামায়ণ খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার ভাষা জটিল, রচনার আদত ভাষাই বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে; কৃত্তিবাসের মত কুঁদের মুখে চাঁচাই ছোলাই হইতে পায় নাই।

ইহার একটু নমুনা—সীতাহরণ কালের দৃশ্য—

কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার ঘরণী। কিবা নাম তোহ্মার কহিবে সুলক্ষণি॥
জনকনন্দিনি মঞি নাম মোর সিতা। দশরথ-পুত্র শ্রীরাম বিবাহিতা॥
পিতৃ-বাক্য পালি রাম বনে আসিলন্ত। লক্ষ্মণে সহিতে মৃগ মারিতে গৈছন্ত॥
আসি লভ ফুল জলে পুজিবা চরণ। ক্ষণেক বিলম্ব করিয়োঁক মহাজন॥
উদবিগ্ন মনে সিতা বোলে খর করি। তপসি নহিক মঞি জানিবা সুন্দরি॥
জগত রাবণ জাক শুনিআছ কর্ণে। যাহার সদৃষ বড়া নাহি তৃভুবনে॥
হেনয় রাবণ আসি ভৈলোঁ। তবু পাষ। রামক তেজিয়া বাহ্মে কর মোতে আষ॥
যত পাটেশ্বরি মোর সব তোর দাসি। জোহি খোঁজ সেহি দিবো থাকিবো উপাসি॥
মানুষ রামকে বাহ্মে দূরে পরিহব। মঞি সমে যুগে যুগে রাজ্য ভোগ কর॥
হেন শুনি ক্রোধে সিতা বুলিলন্ত বাণি। দুর গুচা পাপিষ্ঠ অধম লঘুপ্রাণি॥
নিকোঁট গোটর তোর এত মান সাম। ছুকর ডাকুলি হুঁয়া গঙ্গা স্নানে জাষ।
রাঘবর ভার্য্যাত তোহোর ভৈল মন। তিখাল খাস্তাত জিহ্বা ঘষস দুর্ষন॥
হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছাস। সপুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্ব্বনাষ॥
আনো বহুতর বাক্য বুলিলত আই। সংক্ষেপ পদত খিক দিবেহু জুআই॥

শুনা যায়, এই অনন্ত-কবি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ। ইহার উপাধি ছিল—“রাম-স্বরস্বতী”। কবি নিজেই বলিয়াছেন, তাঁহার রামায়ণ সংক্ষেপে অনুবাদ; রচনা চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অনেক গুলি রামায়ণ আছে, সে কথা বলা হইয়াছে। তিনশত বৎসর পূর্ব্বেকার কবি গঙ্গাদাস সেন রচিত ভাষা-রামায়ণ হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করি;—বাল্মীকি-আশ্রম হইতে আসিয়া সীতার অযোধ্যা-প্রবেশের পর রাম বলিতেছেন—

অগ্নিশুদ্ধা হৈয়া সীতা পুরী মধ্যে যাউক।
পাপীষ্ঠ অযোধ্যার লোক চক্ষু ভরি চাউক॥

* * * *

(সীতার)

মুক্তা জিনি বিন্দু বিন্দু চক্ষে পড়ে পানি। রাম সম্বোধিয়া বোলে গদগদ বাণী॥
সংসারের সার তুমি অগতির গতি। আপনি জান যে আমি সতী কি অসতী॥
পৃথিবী-নন্দিনী আমি তোমার ঘরণী। বিধাতা স্বজিল মোরে করি অলক্ষিণী॥
বারংবার আনি আমা দোষ পুনি পুনি। নগরে চত্বরে যেন কুলটা রমণী॥
অপমান মহাদুঃখ না সহে পরাণে। মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে॥
তবে তুমি পরে আর নাহি মোর গতি। জন্মে জন্মে স্বামী হও তুমি রঘুপতি॥
এই বলিয়া সীতাদেবী অতি মনোদুখে। মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে॥
সাগর-সঙ্গম ভার সহিবারে পার। আমার ভার মা কেন সহিতে না পার॥

এই কবি গঙ্গাদাসের পিতার নাম দ্বিজবর; দ্বিজবরের রচিত রামায়ণের অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। পিতার রচনা কতকটা সংক্ষিপ্ত, পুত্রের অনুবাদ কিছু বিস্তৃত; কিন্তু উভয়ের কবিতাই বেশ সরল ও চিত্তাকর্ষক। মহাভারত অনুবাদের কথায় আবার আমাদের পিতাপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বেকার একখানি রামায়ণ কবি রামমোহন রচিত, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি—

আষাঢ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন। যেমত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ॥
ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব। যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥
রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে। যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥
ময়ূর কররে নৃত্য নব মেঘ দেখি। রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখী॥
সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে। সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝরে॥
সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে। যেমত শোভিত রাম সেবক অন্তরে॥
মধু আশে পদ্মে অলি বাস করে মোদে। যেমত মুনীর মন রাঘবের পদে॥
জল পানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায়। রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়॥

পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘন ঘন। যেমত রামেরে ডাকে নাম-পরায়ণ ॥
নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়। যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায় ॥
অবিরত বৃষ্টিতে পৃথ্বির তাপ যায়। যেমত তাপিত রাম নামেতে জুড়ায় ॥

এই কবির বিদ্রূপ-রসিকতার ঈষৎ পরিচয়—

লঙ্কাদগ্ধের পর হনুমান বন্দী-অবস্থায় ঢাকঢোল-সমন্বিত হইয়া লঙ্কার পথে পথে নীত হইতেছেন—

হনুমান কন মোর বিবাহ না হয়। কন্যা দান করিবেন রাবণ মহাশয় ॥
রাবণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা। রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিত শালা ॥
চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর। কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর ॥
হনুমান কন বিবাহেতে কাজ নাই ; এমন মারণ খায় কাহার জামাই ॥

কবি রামমোহন পিতার আদেশে সীতারাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং হনুমানের আদেশে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হন, আপনি বলিয়াছেন।

প্রায় সেই সময়ের আর এক খানি,—রঘুনন্দন গোস্বামী রচিত "রাম রসায়ন"; বেশ মার্জ্জিত ভাষা ; এই কাব্যে নানা সুললিত ছন্দের নিদর্শন মিলে ; আমরা একটু একটু নমুনা দেখাই—

পঞ্চবটী বনে রামচন্দ্র খরের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর,—একখানি চিত্র—

এথা রঘুবর করিতে সমর সুখেতে মগন হইয়া।
অতি সুকোমল তরুণ বাকল পরিলা কটিতে আঁটিয়া ॥
শিরে অবিকল জটার পটল বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া।
পরিলা বিকচ কঠিন কবচ শরীরে সুদৃঢ় করিয়া ॥
পিঠে তূণদ্বয় বান্ধিলা অক্ষয় প্রখর শরেতে পুরিয়া।
বান্ধিলেন ভাল খর অসি ঢাল বামেতে যাইছে ছুলিয়া ॥
করি গুণার্পণ নিজ শরাসন কর-কমলেতে ধরিয়া।
এক তরুতলে অতি কুতূহলে রহিলা সুখেতে দাঁড়িয়া ॥
হসিত বদনে পথ নিরীক্ষণে রহিলা নয়ন পাতিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন হইলা মগন সে রূপমাধুরী ভাবিয়া ॥

রাম-রাবণের যুদ্ধবর্ণনা, স্থলে স্থলে বড় সুন্দর, অংশ মাত্র দেখাই—

তবে রঘুবর জুড়ি শর নিজ ধনুর্গুণে। কাটিলেন তার ধনু আর শর আর তূণে॥
আর বেগবান বহু বাণ করিয়া মোচন। কৈলা রথখান খান খান করিয়া ভঞ্জন॥
তবে পাই ডর খড়্গাবর ধরিলা রাবণ। তারে রঘুবীর এড়ি তীর করিলা ছেদন॥
পরে মহাজোরে একশরে করিয়া তাড়ন। তাহে দশগল-বক্ষস্থল করিলা বেধন॥
যেহ দেবরাজ অস্ত্র বাজ তাড়নে না গণে। সেহ রামবাণ-হতজ্ঞান কাঁপয়ে সঘনে॥
তারে বিহ্বলিত মূর্চ্ছিত হেরি রঘুবর। কৈলা সন্ধারণ সুচিক্কণ অর্দ্ধচন্দ্র শর॥
ছাড়ি সেই তীর দশশির-মুকুট সকলে। কাটি রঘুমণি সিংহধ্বনি কৈলা কুতুহলে॥
তায় পাই জ্ঞান হতমান রাজা দশানন। সেহ চাহিবারে নাহি পাবে তুলিয়া বদন॥
পরে তার প্রতি রঘুপতি কহেন হাসিয়া। ওরে নারী-চোর কথা মোর শুন মন দিয়া॥
তুমি আজ রণে কপি সনে করিয়া সমর। মহা শ্রমযুক্ত বলযুক্ত হয়্যাছ কাতর॥
এই লাগি তোরে বধিবারে আজি যোগ্য নয়। মোরা শ্রান্তজনে ভগ্নযানে নাহি করি ক্ষয়॥
তুমি নিজবল মোর বল দেখিলে নয়নে। আজি দিনু ছাড়ি ধৈর্য্য ধরি পলাও ভবনে॥
শুনি এত কথা পাই ব্যথা কাতর লজ্জায়। তবে লঙ্কাস্বামী রণভূমি ছাড়িয়া পলায়॥
তারে দেখি ভগ্ন সমুদ্বিগ্ন যত নিশাচর। তারা জ্ঞান-হত ইতস্ততঃ পলায় সত্বর॥
তাহা নিরখিয়া হৃষ্ট-হিয়া যত কপিগণ। তারা দিয়া গালি করতালি করয়ে নর্ত্তন॥

রামচন্দ্রের সমর-সৌজন্যতা, বানরগণের উল্লাস কেমন স্বাভাবিক!

লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে ভরদ্বাজাশ্রমে রামচন্দ্র ঋষির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; রঘুপতির অনুচর বানরবর্গের সেই আতিথ্য-সম্ভোগ বর্ণনা বিলক্ষণ কৌতুকাবহ; কিন্তু সে দীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান আমাদের নাই। কৌতুহলী পাঠক রাম রসায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ দেখিলে চরিতার্থ হইবেন। শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক সর্ব্বনাশী কুব্জী মন্থরার দুর্দ্দশা বর্ণনও বেশ আমোদ-জনক।

একটা নূতন কথা শুনাইব। বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (৪২অ) একস্থলে আছে—"অযোধ্যার অশোক-উপবনে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে মাল্যশোভিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া মৈরেয় মদ্য পান করাই-

লেন।” বাঙ্গালী কবি রঘুনন্দন গোস্বামী আদিকাণ্ডে বিবাহের পরেই সীতাকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন—

বিবিধ কুসুমে করি নানা আভরণ। সাজাইলা জানকীরে শ্রীরঘুনন্দন॥
এক পুষ্পে প্রিয়া সঙ্গে মধু পীয়ে অলি। তাহে দেখি দোঁহে মধুপানে কুতুহলী॥
আসিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলা। সুচতুরা সখী সব মধু আনি দিলা॥
প্রিয়া সনে মধু পান কৈলা রঘুপতি। জানকী হইলা মধু-মদে মত্তমতি॥
অরুণ হইয়া নেত্র ঘুরে ঘনে ঘন। না সম্বরে অম্বর বোলয়ে এ বচন॥

শু শু শুন প্রাণপতি চা চা চাহ মোর প্রতি দে দে দেহ পা পা পাণী ধরি।
ঘু ঘু ঘু ঘু ঘুরে ভূমি ধ ধ ধর মোরে তুমি থি থি থির হব কি কি করি॥
তু তু তুমি কে হে শ্যাম না না জা জানিনু নাম কে কে কেন নাহি কহ কথা।
স স সখী তোরা কেন হা হা হাস্য কর হেন মো মো মোরে নাহি দাও ব্যথা॥
দে দে দেখ সখি অবে ম ম মধু ভি ভিতরে সী সী সীতা রহে আর জন।
মু মু মুখ ভঙ্গী ভরে মো মোরে ইঙ্গিত করে দে দে দেখ দুষ্ট আচরণ॥
কো কো কোন স্থানে ছিল কে কে এথা আ আনিল দূ দূ দূর কর সখীগণ।
থা থা থাকে যদি এথা দি দি দিবে মোরে ব্যথা ভু ভুলাবে শ্রীরঘুনন্দন॥

গোস্বামীজি এমন মাতালের নাড়ীর খবর জানিলেন কিরূপে?

এই কাব্যে শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে হিন্দি ভাষার ছিটা-ফোঁটাও দৃষ্ট হয়। গ্রন্থখানিতে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ হইতে কোন কোন অংশ গৃহীত। রাম-রসায়ন আকারে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রায় দ্বিগুণ।

গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহে বঙ্গভাষার কৈশোর যুগে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। এই গৌড়াধিপগণের মধ্যে যবন-রাজ হুসেন সাহার নাম সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল।

৪৫০ বৎসরের অধিক হইল রামায়ণের প্রথম অনুবাদ সঙ্কলিত হয়; ৩০০ বৎসরের কিছু অধিক হইল কাশীদাস মহাভারত অনুবাদ করেন। এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক অনুবাদ-রচয়িতার আমরা সাক্ষাৎ

পাই। ইহাদের মধ্যে সঞ্জয়, বিজয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি কয়জন কবির রচিত মহাভারতগুলির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া গিয়াছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নসির খাঁ বা নসরত সাহা গৌড়েশ্বর ছিলেন; পরবর্ত্তী গ্রন্থ হইতে জানা যায়, ইনি মহাভারতের একখানি অনুবাদ করাইয়াছিলেন; ইহাই বোধ হয় প্রথম উদ্যম। (কিন্তু এই নাম ও সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হুসেন সাহার এক পুত্রের নামও নসরত খাঁ।) এই অনুবাদের নাম পাওয়া যায় "ভারত পাঞ্চালী"।*

কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত হুসেন সাহার সাময়িক। হুসেন সাহার রাজত্বকাল খৃঃ ১৪৯৪ হইতে ১৫২৫; সুতরাং চারিশত বৎসর পূর্ব্বেকার অনুবাদ—কাশীদাসের শতবর্ষ পূর্ব্বগামী। গ্রন্থের নাম "পরাগলী ভারত"। এই মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। পরাগল খাঁ গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি; সুদূর চট্টগ্রামে তাঁহার কীর্ত্তি এখনও আছে। তাঁহারই আদেশে কবীন্দ্র-পরমেশ্বর এই কাব্য বিরচন করেন। ছুটি খাঁ পরাগল খাঁর পুত্র, তাঁহার আদেশে কবি শ্রীকরণ নন্দী অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ছুটি খাঁর অশ্বমেধ পর্ব্ব ও বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

---

* একটা সংবাদ অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। আসাম ও উড়িষ্যা প্রদেশকে বঙ্গ-দেশের অন্তঃপাতী ধরিলে,—এবং আসামী ভাষা ও উড়িয়া ভাষা যখন বঙ্গভাষা হইতে বড় বেশী ভিন্ন নয়—এখানে উল্লেখ করা চলে—সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রাম-সরস্বতী ও শ্রীশঙ্কর নামক কবিদ্বয় মহাভারত ও রামায়ণ আসামীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এবং প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শূদ্রজাতীয় অশিক্ষিত কবি সারলা (সারদা) দাস উড়িয়া ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই সকল অনুবাদক কবি-গণের আবির্ভাবের সময়-নৈকট্য বিস্ময়জনক।

বিজয় পণ্ডিতের ভাষা-মহাভারতের সহিত কবীন্দ্র রচিত ভারতের মিল খুব বেশী। বিজয় পূর্ব্ববর্ত্তী; রচনা-কাল বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি; গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৮০০০; নাম "বিজয়-পাণ্ডব কথা"।

সঞ্জয় রচিত মহাভারতও কবীন্দ্রের অনুবাদ অপেক্ষা প্রাচীন। একটা প্রমাণ—সঞ্জয়ের রচনা কবীন্দ্রের পুঁথির ভিতর মধ্যে মধ্যে সংলগ্ন দেখা যায়।

নানা কারণে বিজয় ও সঞ্জয় একই ব্যক্তি এক এক বার মনে হয়। হইতে পারে, হুসেন সাহার পুত্র নসরত খাঁর চট্টগ্রাম যাত্রাকালে তাঁহার সহিত রাঢ়ীয় কবি বিজয়ের কাব্যখানি গিয়াছিল, পরে চট্টগ্রামে উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষের অনুগ্রহে বিজয় সঞ্জয়ে পরিণত হইয়াছেন। (বা লিপিকর-প্রমাদে নামের আদ্যবর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে!)

সঞ্জয়-মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহুস্থলে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকার সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে; তাহাতে মনে হয়, একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে সকলে স্ব স্ব পুঁথি রচনা করিয়াছেন, কিম্বা একজনে অপরের রচনা হইতে কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়া আপন কাব্য-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অন্যবিধ গোলও আছে—

রাজেন্দ্র দাস স্ব-কৃত শকুন্তলা উপাখ্যান সঞ্জয়-মহাভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়াছেন।

গঙ্গাদাস সেন ও ষষ্ঠিবর স্ব-রচিত অশ্বমেধপর্ব্ব তাহাতে সংযুক্ত করিয়াছেন।

গোপীনাথ কবি নিজের দ্রোণপর্ব্ব তন্মধ্যে সংলগ্ন করিয়াছেন।

এইরূপ কয়েকজন কবি আপনাদের রচনা সঞ্জয়ের সহিত মিশাইয়া সঞ্জয়-ভারতের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। অথবা ইহাও হইতে পারে, পাঁচ-

জন কবির পাঁচালী-গান একত্র করিয়া প্রবীণতম কবির নামে পুঁথি চলিত হইয়াছে।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ নন্দী ও পরবর্ত্তী অনুবাদকারগণের অনেকেই জৈমিনী-সংহিতা দৃষ্টে অনুবাদ রচনা করিয়াছেন; ব্যাসদেবের সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক অল্প।

সঞ্জয় যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা মহাভারত-অনুবাদক, এককালে নিত্যানন্দ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের তদ্রূপ ছিলেন; কিন্তু ইদানীং তিনি কাশীরাম দাসের নামের আড়ালে চাপা পড়িয়াছেন।

একখানি প্রাচীন কাব্যের মুখবন্ধে দেখা যায়—

অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥

বাস্তবিক, নিত্যানন্দ ঘোষই কাশীদাসের আদর্শ। কাশীদাসী মহাভারতের শেষ পর্ব্বগুলিতে নিত্যানন্দের রচনাই অনেক স্থলে গৃহীত হইয়াছে।

কাশীরাম দাসের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতকার কবিগণের কাহারও কাহারও রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক্—

সঞ্জয় ভারতে——কর্ণের কুরুক্ষেত্রে আগমন——

তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাড়াইতে। একে একে সবাইরে লাগিলা পুছিতে॥
কে আজি অর্জ্জুনে দেখাইতে পারে। রত্নের শকট ভরি দিমু আজি তারে॥
বৎসের সহিত দিমু ধেনু একশত। যে আজি অর্জ্জুনে দেখাইয়া দিব মোত॥
শ্বেত কালা ধোপ ঘোড়া বহে যেই রথ। তাক দেই যে দেখায় অর্জ্জুনেরে মোত॥
ছত্র হস্তি দিমু শকট ভরি সোনা। তাক দিমু অর্জ্জুনক দেখায় যেই জনা॥
চার তরুণী গীতবাদ্যে যে পণ্ডিতা। একশত সুন্দরী সুবর্ণ অলঙ্কৃতা॥
তাক দেই সেই লোকে দেখায় অর্জ্জুন। শতে শতে ঘোড়া রথ হস্তি যে সুবর্ণ॥
[illegible]বৎসা তরুণী ধেনু সুবর্ণ ভূষণ। তাক দেহো যে আমারে দেখায় অর্জ্জুন॥

শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত গ্রাম একশত। তাক দেহো সেই অর্জ্জুন দেখাএ যেত॥
কাম্বোজিয়া ঘোড়া বহে সোনার রথ খান। তাক দেই অর্জ্জুন দেখাএ আগুয়ান॥
ছত্র শত হস্তী যে সুবর্ণ বিভূষিত। সাগর তীরেতে জন্ম বীর্য্য সুসারিত॥
চোদ্দ গ্রাম দেই তাক অতি সুচরিত। নিকটে জীবন যেই নির্ভয় সতত॥
এক রাজা এক গ্রাম জুয়াএ ভুঞ্জিতে। মগধের একশত দাসী দেই তাতে॥

ইহা হইতে কবির সমকালিক ভাষার কতক আভাস মিলিতে পারে। ৪.৫০০ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা এতটা পরিষ্কার বাঙ্গালা, দেখিলে একটু আশ্চর্য্য বোধ হয়; সঞ্জয় কবি চট্টগ্রাম-বাসী ছিলেন।

আমরা এই "চাটগেঁয়ে" কবির "ভারত" হইতে আর একস্থল দেখাই;—দ্রৌপদীর অপমান ও ভীমের ক্রোধ—

রাজার আদেশ পাই দুঃশাসন গেল ধাই সভাতে আনিল একেশ্বরী।
একবস্ত্র রজস্বলা দ্রুপদ-নন্দিনী বালা রাহুএ যেন চন্দ্র নিল হরি॥
মন্দ বোলে সভাজন ধর্ম্মশাস্ত্র অকারণ উচিত না বোলে কোন জনা।
কাঁদয়ে সুন্দরী রামা রূপে গুণে অনুপমা নয়নে বহয়ে জলধারা॥
আপনে হারিল পতি মোহোর যে কোন গতি উত্তর না দেও সভাজন।
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি সভাসদে কানাকানি অন্যে অন্যে মুখ নিরীক্ষণ॥

তাহা দেখি কম্পয়ে যে বীর বৃকোদর। বজ্র সম গদা হস্তে কম্পে থর থর॥
থাউক সেবিয়া ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির রাজা। কুরুবল মারি আজি যমে করোঁ পূজা॥
কোথায় আছয়ে ধর্ম্ম কেবা তাহা জানে। কোন ধর্ম্ম সেবি রাজ্য পাইল দুর্য্যোধনে॥
কিবা যে অধর্ম্মে আমি হারি পাশা খেরি। কিবা অধর্ম্মে আনে দ্রৌপদীর কেশ ধরি॥
কোন অধর্ম্মে বিবস্ত্রা করয়ে রজস্বলা। কোন অধর্ম্মে সভাতে কাঁদয়ে সুন্দরী বালা॥
এই দুঃখে ভীমসেন কম্পয়ে দ্বিগুণ। অন্তরেতে মহাকোপ কম্পয়ে অর্জ্জুন॥
নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর। হাতে ধরি নিবারণ করে যুধিষ্ঠির॥
যত অপরাধ মোর ক্ষম ভ্রাতৃ সব। আপন অধর্ম্ম হৈতে মজিবে কৌরব॥
চক্ষু পাকায় ভীম যেন কাল যম। বন্ধনে থাকিয়া যেন সর্পের বিক্রম॥

বুঝা যায় পরবর্ত্তী কাহারো হাতে ভাষা মার্জ্জিত হইয়াছে।

দ্রৌপদীর এই অপমানে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহার অঙ্কুরোদ্গম

আর একজন কবি—বিজয় পণ্ডিত—যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন দেখাই; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরম ধীমান শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষে সন্ধি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং দৌত্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে কৌরব-সকাশে গমনোন্মুখ—

তবে যুধিষ্ঠির রাজা বলিল ইহা শুনি। সমাধান গোসাঞি করিবা আপনি॥
ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেবে। একে একে উঠিয়া বলিলা বাসুদেবে॥
সাম্য পূর্ব্বক বলিহ যে কিছু বচন। উৎকট না বলিহ মনে দুর্য্যোধন।
হেন কালে দ্রৌপদী পাইয়া অবকাশ। বাম হস্তে ধরিয়া সুগন্ধি কেশপাশ॥
অশ্রুপূর্ণ আঁখি হইয়া কৃষ্ণের অগ্রেতে। কহে কথা গদগদ কাঁদিতে কাঁদিতে॥
সন্ধি করিতে যাহ গোসাঞি আপনে। এই কেশ আমার ধরিল দুঃশাসনে॥
ইহা ত স্মরিহ গোসাঞি কি বলিব আর। ভয় যদি করে ভীম অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥
মোর বাপ যুঝিবেক বৃদ্ধ নরপতি। যুঝিবেক ভাই মোর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি॥
মোর পঞ্চ পুত্র করিবেক মহারণ। অভিমন্যু করিবেক কৌরব নিধন॥
দুঃশাসনের হস্ত যদি কাটিতে দেখিল। ধূলায় ধূসর হৈয়া ভূমিতে পড়িল॥
তবে ত শোকের শান্তি হইবে হৃদয়ে। তবে ত বাঁধিব আমি এই কেশচয়ে॥
এতেক বলিয়া বিস্তর কাঁদিলা যশস্বিনী। সকরুণ শান্তি বাক্য বলেন চক্রপানী॥
অচিরে দেখিবে তুমি দ্রুপদকুমারি। হেনমত কাঁদিবেক কৌরবের নারী॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের হইল কাল পরিপাক। শৃগাল শকুনি মাংস খাবে ঝাঁকে ঝাঁক॥
যবে শত খণ্ড হএ মেদিনীমণ্ডল। যদি বিচলিত হএ হিম ধরাধর॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে নক্ষত্র সহিত। আমার বচন ব্যর্থ নহে কদাচিত॥
কৃষ্ণের বচনে শান্ত হৈল যশস্বিনী।

যশস্বিনী তথা তেজস্বিনী পাঞ্চালীর খুব প্রদীপ্ত চিত্র।

মূলের আসল ভাবটি বিজয় পণ্ডিত বেশ রাখিয়া গিয়াছেন। কাশীদাস পরবর্ত্তী কবি হইলেও স্থলে স্থলে পূর্ব্ব কবিগণের নিকট পরাজিত স্বীকার করিতে হয়।

বিজয় পণ্ডিতের "বিজয়-পাণ্ডব" হইতে অপর কিঞ্চিৎ;—রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ—

মহাবীর ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন। কালান্তক যম যেন সমরে দুর্জ্জন ॥
রণমধ্যে শরজালে করে অন্ধকার। বাছিয়া বাছিয়া বীর করএ সংহার ॥
রাখিতে না পারে অর্জ্জুন ক্ষীণ হৈল বলে। দেখিয়া ত গদাধর মহা কোপে জ্বলে ॥
রথ হৈতে নামিলেন চক্র লৈয়া হাতে। ভীষ্মেরে মারিতে যায় দেব জগন্নাথে ॥
পৃথিবী বিদরে দুই চরণের ভরে। ক্রোধ মনে যম যেন জগত সংহারে ॥
কুরু দলে উঠিল তুমুল কোলাহল। ভীষ্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল ॥
পীত বস্ত্র না সম্বরি দেব দামোদর। বিজলী পড়িছে যেন নব জলধর ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি। ভীষ্মেরে মারিতে কৃষ্ণ ধায় শীঘ্রগতি ॥
কৃষ্ণ দেখি ভীষ্ম বীর প্রসন্ন-বদন। না করিল সন্ধান এড়িল শরাসন ॥
আইস আইস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার। তোমার প্রসাদে তরি এ ভব-সংসার ॥
তোমার হস্তেত যদি সংগ্রামেত মরি। ত্রিভুবনে যশ রহুক পরলোকে তরি ॥
পাছে পাছে ধাইয়া যায় পার্থ ধনুর্দ্ধর। দশ পদ অন্তরে ধরিল দামোদর ॥
তুমি না করিবা রণ করিলা নিবন্ধন। বিস্মিত হৈয়া কেন করহ লঙ্ঘন ॥
শত্রুর করিব অন্ত নাহিক বিস্ময়। তোমা হেন সহায়ে সংগ্রামে কিবা ভয় ॥
আজি ভীষ্ম মারিয়া সংহারি কুরুবল। অস্ত হৈয়া পূর্ণ যেন হয় শশধর ॥
নির্ব্বাণ প্রদীপ যেন পুনরপি জ্বলে। তেমন বিক্রম করে পার্থ মহাবলে ॥

এই প্রসঙ্গ সঞ্জয়-ভারতে আদপে নাই। (বিজয় ও সঞ্জয় একই ব্যক্তি না হইবার ইহা একটা প্রমাণ।)

বিজয়ই হউন সঞ্জয়ই হউন, চারিশত বৎসরের অধিক পূর্ব্বেকার কবি। ইঁহাদের আমলে ভাষা-মহাভারত দ্বারা গীতার প্রচার কতটা ছিল জানিতে কৌতুহল হয়; "বিজয়-পাণ্ডব-কথা"য় যতটুকু আছে, উদ্ধৃত করিয়া দেখাই—

দুই সৈন্য মধ্যে রথ গোবিন্দ রাখিল। একে একে ধনঞ্জয় বিপক্ষ দেখিল ॥
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল। ভাই ভাই পুত্র সব আপন মণ্ডল ॥
আপনার বন্ধু দেখি করুণা হৈল মনে। অবধান করি কৃষ্ণে নিবেদে অর্জ্জুনে ॥
যুঝিবারে আইল মোর সর্ব্ব বন্ধুগণ। প্রেমাধীন হইলাম পোড়ায় মোর মন ॥
হাত হৈতে পড়ে মোর গাণ্ডীব শরাসন। সহিতে না পারি গোসাঞি বিদারএ প্রাণ ॥

বিফল জীবন মোর নাহি কোন সুখ। কেমতে সহিব গোসাঞি জ্ঞাতিবধ দুখ॥
রাজ্যে মোর কাজ নাই জীবন অসার। কি কারণে বন্ধুগণে করিমু সংহার॥
মিত্রবধ পাতক বিশেষ কুলক্ষয়। কুলধর্ম্ম না হইলে নরক নিশ্চয়॥
এত বলি অর্জ্জুন এড়িল ধনুঃশর। বসিলা বিমুখ হইয়া রথের উপর॥
কৃষ্ণ তারে প্রবোধিলা বহুল বচনে। হিতকর্ম্ম তত্ত্ববোধ বিবিধ বিধানে॥
জীর্ণ বস্ত্র এড়ি যেন নূতন বস্ত্র পরে। এক শরীর এড়ি আর শরীর ধরে॥
কর্ম্মপাশে বদ্ধ জীব সংহার করি আমি। শুনহ অর্জ্জুন নিমিত্ত কেবল তুমি॥
অর্জ্জুন প্রবোধ পাইয়া রণে দিল মন। হাতে ধনুক শর উঠিল ততক্ষণ॥

তত্ত্বজ্ঞ পাঠক দেখিবেন, খোলসটা ঠিক আছে, শাঁস টুকুই নাই। সঞ্জয় অপেক্ষা বিজয়ের ভাষা আরও মার্জ্জিত, তবে এতটা পারিপাট্য দেখিয়া অনুমান হয়, পরবর্ত্তী পুঁথি নকলকারগণের হস্তে ভাষা ও ছন্দ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হয়, দুই কবিকে পৃথক ধরিলে, উভয়ে সমসাময়িক হইলেও সঞ্জয়কবি পূর্ব্বাঞ্চলের লোক, বিজয় পণ্ডিত রাঢ়দেশবাসী; ভাষায় কিছু তফাৎ—"প্রাদেশিকত্ব" ত থাকিবেই।

প্রাচীন সকল কবিই অনুবাদগ্রন্থে মূল-বহির্ভূত অনেক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন; আমরা একটু সেই জাতীয় রচনার পরিচয় দিই। কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত পরাগলী মহাভারতে শান্তনু রাজার পূর্ব্বজন্মাখ্যান হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি—

এ বোলিয়া মুনিগণ হৈলা অন্তর্দ্ধান। জয়মুনী কহন্ত কথা রাজা বিদ্যমান॥
আদিপর্ব্ব কহিব বংশের উতপতি। মহী নামে রাজা ছিল পূর্ব্বে কপিপতি॥
একব্রত জিতেন্দ্রিয় শঙ্কর-ভকতি। শঙ্কর আছয়ে বড় পরম পিরিতি॥
ভকত-বৎসল বীর ত্রিদশ-ঈশ্বর। তুষ্ট হৈয়া বলে কপি তুমি মাগ বর॥
বড় তুষ্ট হইয়াছি তোমা ভক্তি লাগি। মনের বাঞ্ছিত বর মোতে লও মাগি॥
সত্য সত্য বুলি আজি নাহিক সংশয়। যেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চয়॥
এতেক শুনিয়া তবে কপি নামে মহী। অতি ভয়ে কহিলেক শুন হর কহি॥

আপনে হইয়া তুষ্ট দিতে চাহ বর । মনের অভীষ্ট কহিতে বাসি ডর ।।
শুন হর মনের মোর যে অভীষ্ট । কহিতে অসভ্য কথা শুনিতে গরিষ্ঠ ।।
শঙ্করে বোলন্ত তুমি ভয় পরিহর । মনের বাঞ্ছিত যেই মাগি লও বর ।।
পাইয়া অভয় বাণী কহে কপিপতি । সুরেশ্বরী গঙ্গারে অভীষ্ট মোর মতি ।।
মহাদেব বোলে কপি আজু যাও ঘরে । কালিকা প্রভাতে তুমি যাইও গঙ্গাতীরে ।।
আনন্দিত হৈয়া কপি চলিল অগ্রেতে । মিলিলেক গঙ্গাতীরে রজনী প্রভাতে ।।
বৃষভে চড়িয়া তথা গেল পঞ্চশির । গঙ্গা গৌরী লৈয়া গেল সুরেশ্বরী তীর ।।
জলেতে নামিল হর গঙ্গা গৌরী লৈয়া । গঙ্গাতীরে আছে কপি সম্ভ্রমিত হৈয়া ।।
পরম বিস্ময় মনে আজ্ঞা দিল হরে । বিবসন হৈয়া জলে ক্রীড়া করিবারে ।।
বিবস্ত্র হইল গঙ্গা বড় পাইল লাজ । পিঠপাশে আকার দেখিল কপিরাজ ।।
কষ্টমনে গঙ্গাকে বলিল পঞ্চশির । বানরে দেখিল তোর গুপ্ত যে শরীর ।।
আমার আশ্রমে তোমার বাসা নাই । আজ্ঞা দিল চল তুমি বানরের ঠাই ।।
পুনি পুনি গঙ্গা দিলা দেব ত্রিলোচন । করযোড়ে বোলে গঙ্গা বিনয় বচন ।।
এই অপরাধে যেই এমত কর্ম্ম ফলে । শাপের শাপান্তর মোর হৈব কতকালে ।।
গঙ্গার বচন শুনি আজ্ঞা দিল হর । বানর সেবিয়া থাক দ্বাদশ বৎসর ।।
অনঘা তোমার নাম হৈব মর্ত্তলোকে । পাইলে দোষের ফল না ভুঞ্জিও মোকে ।।
আর এক কথা কহি পালিও যতনে । অষ্টবসু সব হৈব ব্রহ্মার কারণে ।
শান্তনু ঔরসে জন্ম তোমার উদরে । না রাখিব সেই শিশু বলিল তোমারে ।।
এহি কথা বলিয়া গঙ্গারে বিসর্জ্জিলা । গঙ্গা স্বাধ হেন করি কপি সম্বোধিলা ।।

গল্পটি মন্দ নয়। গঙ্গার ছলনায় এই কপিপতি অচিরে পুড়িয়া মরিলেন, মরিয়া শান্তনু-রাজা হইলেন। শঙ্করের আদেশে গঙ্গাদেবী আবার আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গল্পটীতে দেবদেব শঙ্করের চরিত্র কি হীন বর্ণে চিত্রিত!

"সপ্তপাতকসংহন্ত্রী সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী" শিব-সীমন্তিনী ভগবতী জাহ্নবীকে নশ্বর মানব শান্তনু রাজা কিছুকালের জন্য উপভোগ করিয়াছিলেন—এ কথা ব্যাসদেবও স্বীয় মহাভারতে লিখিয়া গিয়াছেন; গল্পটী বোধ হয় তাহারই কৈফিয়ৎ। কিন্তু এই আখ্যান—শিব-ভক্ত কপিপুঙ্গবের

বেয়াড়া আব্‌দার এবং ভক্তবৎসলের আপন পত্নীকে ছলনা ও বিতরণ—দ্বৈপায়ন-মহাভারতে নাই। আমাদের কবি "জয়মুনী কহন্ত" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন; তাহা হইলে জৈমিনী-ভারতে সম্ভবতঃ আছে। ইদানীং জৈমিনী ভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব মাত্র আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাহিনী হইতে প্রমাণ হয়—৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জৈমিনী-রচিত অন্যান্য পর্ব্ব মহাভারতও এদেশে প্রচলিত ছিল।

কোন কোন সমালোচকের মতে এই জয়মুনি ক্ষয়মুনি মিথ্যা, এ সব আজ্‌গুবি গল্প কবিগণের স্বকপোল-কল্পিত। এই কবিগণ মহাভারত প্রচারের কারণ উপলক্ষে এক জনমেজয় ঋষ্যশৃঙ্গ সম্বাদের কথা পাড়িয়াছেন, তাহাও উদ্ভট।

যাহা হউক, এই অপর এক চট্টল-কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কবিত্বের পরিচয় দিবার জন্য আর কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব—

দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমন—

তার পাছে দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রী রূপ ধরি। অধিক মলিন বস্ত্রে গেলা একেশ্বরী॥
দূর হৈতে যায় যেন ত্রাসিত হরিণী। নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী॥
দ্রৌপদী বোলেন্ত সৈরন্ধ্রী মোর নাম। দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা কৈলু অনুপাম॥
অন্তঃপুর নারী যত উত্তর না পাইল সুদেষ্ণা দেবীএ তাকে সাদরে পুছিল।
সত্য কহ আহ্মাতে কপট পরিহরি। কি নাম তোহ্মার কহ কাহার বরনারী॥
দুই উরু শুরু তোর অতি সুবলিত। নাভি গভীর তোমার বাক্য সুললিত॥
দশন দাড়িম্ব বিজুলি নয়ন। রাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ॥
কিবা গন্ধর্ব্বের তুহ্মি হয়সি বনিতা। নাগকন্যা তুহ্মি কিবা নগর দেবতা॥
বিদ্যাধরী কিবা তুহ্মি কিন্নরী রোহিণী। অপ্সরা কিবা তুহ্মি উর্ব্বশী মানিনী॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা বরুণের নারী। তোহ্মা রূপ দেখি আহ্মি লৈতে না পারি॥
সুদেষ্ণার বচন যে শুনিআ তৎপর। সেইখানে দ্রৌপদীএ দিলেন্ত উত্তর॥
আহ্মি দেবকন্যা নহি গন্ধর্ব্বের নারী। সহজে সৈরন্ধ্রী আহ্মি কেশ-কর্ম্ম করি॥
মালিনী মোহোর নাম দ্রৌপদী ধরিল। তোহ্মাকে সেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল॥
তেকারণে আইলুঁ দেখা বিরাট নগর। সত্য কথা কৈল এহি তোহ্মার গোচর॥

সুদেষ্ণাএ বোলেন্ত শুনহ বরনারী। মাথে করি তোহ্মারে রাখিতে আহ্মি পারি॥
নারী সব তোহ্মা দেখি পাশরিতে নারে। কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে॥
রাজাএ দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন। বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন॥
আপন কণ্টক আহ্মি আপনে রোপিব। মৃত্যুএ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব॥
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ। তেমত দেখি আহ্মি তোহ্মারে ধারণ॥

বিজয় ও কবীন্দ্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক গাহিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। সঞ্জয় স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন।

কবীন্দ্র যেমন বিজয় বা সঞ্জয়ের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, ষষ্ঠিবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন সেইরূপ অনেকস্থলে কবীন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছেন। তবে, কবীন্দ্র সম্পূর্ণ ভারত রচনা করেন নাই, গঙ্গাদাস সেন সম্পূর্ণ করিয়া-গিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র মহাভারত রচনা করেন। কবীন্দ্র লিখিয়াছেন, পরাগল খাঁ প্রত্যহ বিজয়-পাণ্ডব কথা শুনিতেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের শেষাশেষি অংশবিশেষ (অশ্বমেধপর্ব্ব) অনুবাদ করিয়াছিলেন। চারি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান বীরগণ কাফের জাতির বীরকাহিনী শুনিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। উভয় সেনাপতিই পূর্ব্বাঞ্চল-বিজয়ে চট্টগ্রামে ছিলেন, উভয় অনুবাদকও চট্টগ্রাম-বাসী।

এই নন্দী-কবির রচনা হইতে ব্যঙ্গরসের পরিচয় একটু দেখাই—অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগকালে কৃষ্ণ ও ভীমের বাক্‌বিতণ্ডা—

কৃষ্ণ কহেন—

স্থূলোদর যে জন যে জন নারীজিত। বহু-ভক্ষকের যুক্তি নহে সমুচিত॥
বহুভক্ষ হএ ভীম স্থূল কলেবর। হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্য্যা যাহার সহচর॥

ভীম কহেন—

(কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া কহিল।) মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল॥
তোমার উদরে যত বৈসে ত্রিভুবন। আমার উদরে কত ওদন ব্যঞ্জন॥
সংসার উপালম্ভ সব খাইলা তুমি। তাহা হৈতে বহু ভযঙ্কর বোলে আমি॥
ভল্লুক-কুমারী তোমার ঘরে জাম্ববতী। তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী॥
নিজ নারী সত্যভামা প্রিয় করিবার। রণে ত জিনিল জ্যেষ্ঠ ভাই আপনার॥
তুমি নারীজিত না হও আমি নারীজিত। আপনা না দেখিয়া মোক বল বিপরীত॥

ভীমের বচনে কৃষ্ণ বড় সানন্দিল।
ভাল ভাল বলি ভীম উঠি আলিঙ্গিল॥

রসিকতাটুকু মন্দ নয়; শ্রীকৃষ্ণের মুখের মতন জবাব হইয়াছে বটে। আর এক স্থল দেখাই—

অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যজ্ঞাশ্ব অনুসরণে অর্জুন দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছেন; ক্রমে অশ্ব মণিপুরে উপস্থিত হইল; তথায় চিত্রাঙ্গদাপুত্র বভ্রুবাহন রাজা। অর্জুন জানিতেন না ইনি তাঁহারই পুত্র। অবশ্য অশ্ব ধৃত হইল। অশ্বের ললাটদেশে বদ্ধ লিপি পাঠে বভ্রুবাহন বুঝিলেন কাহার অশ্ব এবং কাহার দ্বারা পরিরক্ষিত। তখন রাজা অতি বিনয় সহকারে নানা উপঢৌকন লইয়া অর্জুনকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন। বীরবর পুত্রের অক্ষত্রোচিত আচরণ দেখিয়া চটিয়া লাল—

.. কথা শুনি পার্থ মহাবীরে। ক্রুদ্ধ হৈয়া চরণে ঠেলিলা তাহারে॥
বেশ্যা-বীর্য্যে চিত্রাঙ্গদাএ তোমারে ধরিল। মোর বীর্য্যে সর্ব্বথাএ তুমি না জন্মিল॥
জ্ঞানে ধরিলেক ঘোড়া আপনার বলে। প্রথমে আমার ঘোড়া তুমি কেহ্নে নিলে॥
কোন যুদ্ধ করিয়া ভয় পাইলে দুরাচার। বেশ্যা বৃত্তি করিয়া আনিলে উপহার॥
আমার ঔরসে জন্ম হৈলে ভয়ে ভীত। কোথা সিংহ অভিমন্যু সংগ্রামে পণ্ডিত॥
চক্রব্যূহ ভেদিলেক দ্রোণ না গণিয়া। তর্পিলেক ভীষ্ম বীর সমর করিয়া॥
কোথা সিংহ অভিমন্যু সুভদ্রা-নন্দন। কোথায় শৃগাল তুমি ভয়ভীত মন॥

মোর বাণে সৈন্য তোর রণে না পড়িল। তোমার হৃদয়ে মোর বাণ না লাগিল ॥
কোন ভয় হেতু পাপ শরণ লইলে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তুমি কিছু না রাখিলে ॥
নর্ত্তকী তোমার মাও বেশ্যা ব্যবহার। বীর যোগ্য না হও তুমি কুলাঙ্গার ॥
নর্ত্তকী সভাত তুমি নৃত্য কর গিয়া। চল রে পাপীষ্ঠ তুমি ধনু বিসর্জ্জিয়া ॥
অর্জ্জুনের এ সব কথা শুনিয়া নিষ্ঠুর। বভ্রুবাহা নরপতি রুষিল প্রচুর ॥

ইহার ফলে ধনঞ্জয়কে পুত্রের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল; কৃষ্ণসখার মুণ্ড উড়িয়া গিয়াছিল। অনেক কাণ্ডের পর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মুণ্ড আনাইয়া অর্জ্জুনের কবন্ধে যুক্ত করণান্তর প্রাণদান করেন।*

(নন্দী কবি অর্জ্জুনকে পদে পদে পরাজিত দেখাইয়াছেন, কি হাত শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া রক্ষা করেন।

ষষ্ঠিবর, গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবির রচিত মহাভারতের অনুবাদ কতক কতক অংশ পাওয়া গিয়াছে। এ গুলির প্রায় দুইশত বৎসরের পুরাতন হস্তলিপি মিলিয়াছে; অনুমান করিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না—মূল পুঁথি তিনশত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। ষষ্ঠিবর রচিত স্বর্গারোহণপর্ব্বের শেষ ভাগে কবি-কর্ত্তৃক সমগ্র মহাভারত রচনার কথা উল্লিখিত আছে।

ষষ্ঠিবরের উপমা মধ্যে মধ্যে বড় সুন্দর—

স্বর্গ হৈতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী। পাতালে বহন্তি গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥
উত্তরে দক্ষিণে বহে সুরেশ্বরী ধার। পৃথিবী পরেছে যেন মালতীর হার ॥

বিদ্যাপতির—"গীম গজমতি হারা। কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি ঢারত সুরধুনী ধারা ॥" অনেকের মনে পড়িবে।

গঙ্গাদাস সেনের রচনার কিছু নমুনা—

যৌবনাশ্ব পুরী ভীম দেখিলেক দূরে। সুবর্ণ পূর্ণিত ঘট প্রতি ঘরে ঘরে ॥
বিচিত্র পতাকা উড়ে দেখিতে সুন্দর। দীপ্তমান শোভে যেন চন্দ্র দিবাকর ॥

* এই প্রকার মূল হইতে কিছু পৃথক নানা কাহিনী কাশীদাস পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত। সহস্রকিরণ বেড়ি থাকে চারিভিত ॥
যুপ আরোপিত পথে আছে সারি সারি। যজ্ঞ-ধূমে অন্ধকার গগন আবরি ॥
নানা বাদ্য নৃত্য গীত জয় জয় ধ্বনি। বেদধ্বনি নূপুরধ্বনি এই মাত্র শুনি ॥
মণ্ডপ প্রাসাদ মঠ বিচিত্র নগর। পুরী দেখি হরিষ হইল বৃকোদর ॥
ফলিত কদলী বন দেখিতে শোভিত। ডাল সনে পুষ্প ভরে হয়েছে নমিত ॥
গন্ধে আমোদিত সব সুললিত ঘ্রাণ। নানা বৃক্ষ লতাতে বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥
খর্জ্জুর পাত্রেলা যত ফলিত সঘন। দেখিতে জুড়ায় আঁখি দুঃখ বিমোচন ॥
বিদারিত দাড়িম্বে বেষ্টিত পুরী খান। পুণ্যবন্ত দেখি যেন দেবতার স্থান ॥
লেম্বু জাম্বীর আর নারাঙ্গার ফুল। অশোক চম্পক লঙ্গ কেশর বকুল ॥
সুবর্ণ কেতকী আদি জাতি ক্রম লতা। মালতী চম্পক কুন্দ লভিবা পুষ্পিতা ॥
পশু পক্ষী বেড়ি ক্রীড়া করয়ে সকলে। কোকিলের ধ্বনি আর ভ্রমরের বোলে ॥

গোপীনাথ দত্তের রচিত দ্রোণপর্ব্ব শুধুমাত্র পাওয়া গিয়াছে; উহাতে দ্রৌপদীর যুদ্ধ বর্ণিত আছে। অভিমন্যু-বধে ক্রুদ্ধা পাণ্ডব-রমণীসকল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—দ্রৌপদী হইয়াছিলেন সেনাপতি (সেনা-পত্নী ?)। বিষয়-উদ্ভাবনে কবিত্ব আছে মানিতে হয়, বর্ণনায় বিশেষ কবিত্বের পরিচয় নাই। মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত দু চারিটা শব্দ রচয়িতার নিবাস স্থান বিজ্ঞাপিত করে।

রাজেন্দ্র দাসের রচিত আদিপর্ব্বের প্রায় সমস্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে শকুন্তলা উপাখ্যানটী বড় সুন্দর। কণ্বমুনীর তপোবনের বর্ণনা একাংশ দেখাই—

শীতল পবন বহে সুগন্ধি বহে বাস। ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ ॥
মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষ সব নড়ে। ভ্রমরের পদ ভরে পুষ্প সব পড়ে ॥
নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর। থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
নির্ম্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে। লম্ফে লম্ফে বানর বেড়ায় গাছে গাছে॥
হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল। হেন পদ্ম না দেখিলুম নাহিক ভ্রমর ॥
হেন ভৃঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া। কেবা মোহ না যায়ন্ত সে বন দেখিয়া ॥

মহাভারতের উপাখ্যান-বিশেষ অনুবাদকের মধ্যে কেহ কেহ কাশী-

দাসের পূর্ব্ববর্ত্তী, পরবর্ত্তীও অনেক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে দু এক-জনের রচনার ঈষৎ পরিচয় দিব। অনুবাদ-রচয়িতাগণের সময় নির্দ্ধারণ অধিকাংশ স্থলে অসম্ভব। নকলনবীশগণের নকল করিবার তারিখ অনেকস্থলেই পাওয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় তাঁহাদের একটা সাফাই গান—"ভিমস্যাপি রণেভঙ্গ মুণিনাঞ্চ মতিভ্রম, যথা দিষ্ট তথা লিখিতং, লিখিতং নাস্তি দোষকঃ॥" (বানান ও ব্যাকরণ বিশেষত্ব তাঁহাদেরই)। এই সকল বিদ্যাবন্ত নকলকারদিগের হাতে পড়িয়া আসল রচনার কত যে পাঠ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

রামেশ্বর নন্দী সম্ভবতঃ কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি। তাঁহার শকুন্তলার রূপ বর্ণনা—শুধু মুখ খানি—

চামরে চিকুর কেশ হেন মনে লয়। চাঁচর তাহাতে নাই এই ত বিস্ময়॥
চাঁদ কুন্দ দিয়া মুখ করিল নির্ম্মিত। তাহাতে কলঙ্ক হেতু নহে পরতীত॥
অরুণ তিলক ভালে হেন লয় চিতে। সকলঙ্ক রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে॥
ভুরুযুগ নিরমিল কাম-শরাসনে॥ কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে॥
কুবলয় দলে কৈল আঁখি নিরমাণ। চঞ্চলতা নাহি তাহে কটাক্ষ সন্ধান॥
বিম্বফল জিনিয়া অধর হেন দেখি। ঈষৎ মধুর হাস তাতে নাহি লক্ষি॥

মধুসূদন নাপিতের "নল-দময়ন্তী" কাব্যের এক স্থানে স্বভাব-বর্ণনা—

কত দূর গিয়ে দেখে রম্য এক স্থান। দিব্য সরোবর তথা পুষ্পের উদ্যান॥
তীরে নীরে নানা পুষ্প লতায় শোভিত। দক্ষিণা পবন তথা অতি সুললিত॥
কোকিলের ধ্বনি তথা ময়ূরের নৃত্য। ভ্রমরা নাচয়ে তথা ভ্রমরী গাহে গীত॥
পাইয়া শীতল বারি আনন্দ হৃদয়। স্নান তর্পণ কৈল সৈন্য সমুচয়॥
ছায়া বারি শীতল পবন মনোহর। নদী তীরে ভ্রমে রাজা সরস অন্তর॥
আনন্দে করয়ে কেলি যত জলচর। চক্রবাক কমলে শোভিত সরোবর॥
হংসে মৃণাল তুলি যাচে হংসিনীকে। উড়ে পড়ে চকোরী চকোরের ডাকে॥

এই নাপিত-কবি দময়ন্তীর কপালে নিবিড় চঞ্চল কেশ-দামে ঈষদাবৃত

সিন্দুর-বিন্দু দেখাইয়া উপমা দিয়াছেন—"রাহু জিহ্বা নাড়ে যেন চন্দ্রে গিলিবাবে।"

এই সময়কার জনৈক কবি-রচিত "পরীক্ষিৎ-সম্বাদ" হইতে পরশুরাম বর্ণন—

হেন কালে আসিলেন পরশুরাম বীর। দৈত্য দানব জিনি নির্ভয় শরীর॥
বাম হাস্ত ধরে ধনু দক্ষিণ হাস্ত তোমর। পৃষ্ঠেতে বিচিত্র টোন অতি মনোহর॥
টোনের ভিতরে বাণ জ্বলদগ্নি যেন। এক এক শরমুখে যেন কাল যম॥
সুবর্ণ বর্ণ তনু লোচন লোহিত। অঙ্গ হৈতে অদ্ভুত তেজ ক্ষরিত॥
লম্বিত পিঙ্গল জটা পরশিছে কটি। বদনাগে দেখি করে হাস্য খটখটি॥

লোকনাথ দত্তের "নৈষধ" হইতে দময়ন্তীর রূপ—

দেখিয়া সুরঙ্গ তার ওষ্ঠাধর। অরুণ আকৃতি দুগ্ধ হৈতে সমসর॥
দূরে থাকি কুসুম বাঁধুলী বিম্বফল। অপমানে বলে মোর সুরঙ্গ বিফল॥
দেখিয়া চিন্তিত তার দশনের কান্তি। সমুদ্রে প্রবেশ কৈল মুকুতার পাঁতি॥
তার শ্রুতি বিমল দেখিয়া মনোহর। আকাশে উড়িল লাজে গৃধিনী সকল॥
দেখিয়া সুচারু তান দিব্য কেশপাশ চমরী বনেতে গেল হইয়া নিরাশ॥
সীমন্ত বিচিত্র তার দেখি অদ্ভুৎ। ঘন ঘন গগনেতে লুকায় বিদ্যুৎ॥
দেখিয়া বিচিত্র গ্রীবা অতি শোভান্বিত। সমুদ্রেতে গেল শঙ্খ হইয়া লজ্জিত॥
তনু কঠিন তার পীন পয়োধর। দূরে থাকি হেরিলেক সুমেরু মন্দর॥

উদ্ধৃত উপমারাশি আমাদের ভারতচন্দ্রকে মনে পড়াইয়া দেয়, কিন্তু কবি লোকনাথ পূর্ব্ববর্ত্তী। অবশ্য আরও পূর্ব্বতন কবিগণের রচনাতেও আমরা ঠিক্ এইরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি।

অনেক কবিরই পরিচয় দিবার জো নাই। পুঁথি উদ্ধার হইয়াছে কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই। অধিকাংশই কখনও মুদ্রিত হইবে কি না [illegible] স্থল। অপ্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার এই প্রবন্ধে বেশী কথা বলা চলে না। শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন অনেক গুলির সমালোচনা করিয়াছেন। আমার এই অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহের জন্য দীনেশ বাবুর

নিকট আমি বিশেষরূপে ঋণী। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু দেব-বর্ম্মণ ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ অনেক গুলির পরিচয় দিয়াছেন, কতকগুলি মুদ্রিতও করিয়াছেন; বহুস্থলে আমি সাহায্য লইয়াছি, বলা বাহুল্য মাত্র। বঙ্গীয় সাহিত্যানুরাগীদিগের যত্নে অপ্রকাশিত গ্রন্থসকল যদি সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়, তবেই সকলে তৎসমস্তের রসাস্বাদন-সুখ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। আশা হয়, সাহিত্য-সভাও এ বিষয়ে অমনোযোগী থাকিবেন না।

আমরা ভাষা-মহাভারত রচয়িতাগণের প্রধান কবিকে ছাড়িয়া এতক্ষণ অপরাপর কাহারও কাহারও পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলাম। স্বীকার করিতেই হয়, ধারাবাহিক কাব্যানুবাদ ধরিলে কাশীদাসের গ্রন্থই বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছি কাশীদাসের রচনা স্থলে স্থলে তাঁহার পূর্ব্বগামী কোন কোন কবির রচনার সহিত আশ্চর্য্যরূপ মিলিয়া যায়। কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেখাই—

সঞ্জয় কবি ও কাশীদাসে বর্ণিত "যযাতির পতন"—

অষ্টক বোলেন্ত তুমি কোন মহাজন। পরিচয় দিয়া কহ জানাইয়া আপন॥
অগ্নিপ্রায় তেজঃপুঞ্জ দেখিতে সাক্ষাৎ। কোন পাপে অধর্ম্মে হৈল স্বর্গপাত॥

* * * * *

যযাতি আমার নাম কহি শুন তোক। নহুষ নৃপতি-সুত পুরুর জনক॥
করিলে সুকৃতি নর যেবা নরে কয়। নরকেতে বাস হয় পুণ্য হয় ক্ষয়॥
কহিলুম ইন্দ্রের ঠাঁই কথা সকল। পুণ্য ক্ষয় হৈয়া মুই পড়িল ভূমিতল॥

(সঞ্জয়-ভারত)

অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন। কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন॥
সূর্য্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার। স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি। পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি॥
পুণ্যবান জনের করিনু অমান্য। সেই হেতু আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য॥

(কাশীদাস—আদিপর্ব্ব)

ভীষ্মের বীরত্ব দর্শনে কৃষ্ণের ক্রোধ বর্ণনায়—কবীন্দ্রের সহিত, বৃষকেতুর পরিচয় বর্ণনায়—শ্রীকরণ নন্দীর সহিত, গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ বর্ণনায়—নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার সহিত, এইরূপ বহু স্থলে কাশীদাসের রচনা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সহিত ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়। তজ্জন্য কেহ কেহ বলেন—এ সকল "অপহরণ"।

কিন্তু সকল স্থলে এইরূপ ঐক্য অপহরণও নহে, বিস্ময়ের কারণও নহে। সকলেই মূল সংস্কৃত হইতে এক ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন; অনুবাদ মূলানুগত হইলে রচনার সাদৃশ্য—এমন কি কথায় কথায় মিল অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য মূল-বহির্ভূত বিষয়ে বিশেষরূপ শব্দ-ঐক্য থাকিলে, পরবর্ত্তী কবির পূর্ব্ববর্ত্তী কবি হইতে সংগ্রহ বা 'অপহরণ' বলিতে পারা যায়। এক জনের অনুবাদ ব্যাস হইতে, অপরের অনুবাদ জৈমিনী হইতে,—বিষয়-বর্ণনায় মূলে যদি উভয় ঋষির প্রভেদ থাকে, অনুবাদে যদি উভয় কবির ঐক্য থাকে, তাহা হইলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে পরবর্ত্তী জনের পরধনলুণ্ঠন।

প্রবাদ আছে—

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীরাম গেল স্বর্গপুর।"

এ কথা সত্য হইলে, বিরাটপর্ব্বের কতকাংশ পর্য্যন্ত ভাষা-মহাভারত কাশীদাসের রচনা, বাকি অংশ অপর কাহারও। কেহ কেহ বলেন, কবি গ্রন্থ-সমাপ্তির ভার স্বীয় জামাতার উপর দিয়া যান, জামাতা বরাবর শ্বশুরের ভণিতাই চালাইয়াছেন। পুত্র নন্দরামের উপর এই ভারার্পণের প্রবাদও শুনা যায়। সমালোচকেরা কেহ কেহ এই দুই অংশে রচনা গুণের প্রভেদও লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেকে কিন্তু এ সকল প্রবাদ সত্য মনে করেন না; তাঁহারা "স্বর্গপুর" অর্থ করেন—কাশীধাম: কাশীদাস বিরাট পর্ব্বের কতকাংশ পর্য্যন্ত স্বগ্রামে বসিয়া

রচনা করেন, পরে কাশীবাসী হইয়া তথায় এই বিরাট গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলেন।

মূল মহাভারতে শ্লোক-সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ—অন্তত: ৯০০০০র উপর; কাশীদাসে—সচরাচর যে সংস্করণ পাওয়া যায়—শ্লোক সংখ্যা ৩৬০০০! (নগেন্দ্র বসু বাবু একখানি কাশীদাসী মহাভারতের পুঁথি পাইয়াছেন, আয়তনে মুদ্রিত কাশীদাসের দ্বিগুণ)।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদের মত কাশীদাসের মহাভারতও মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। অনেক স্থলেই কবি মূলঘটিত বহু বিষয়ের পরিবর্জ্জন ও স্বকল্পিত বহু বিষয়ের সংযোজন করিয়াছেন। সুন্দর শ্রীবংস ও চিন্তার উপাখ্যান মূল মহাভারতে একেবারেই নাই; মনোহর সুভদ্রা-হরণের অনেক কথা কাশীরামের নিজস্ব। এইরূপ বহু বিষয় কবি শাখ-প্রশাখায় পল্লবিত করিয়া আপন গ্রন্থ মধ্যে বসাইয়াছেন; স্থলে স্থলে মূল গ্রন্থের অনেক কথা সংক্ষিপ্ত করিয়াও লইয়াছেন।

কাশীরাম দাস অনেক স্থলে সুন্দর কবিত্ব-শক্তি ও কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষাও বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার; তবে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতাকার দুরূহ শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। কৃত্তিবাস মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনায় অপ্রচলিত শব্দের এবং গ্রাম্য কথার ব্যবহার, ভাষার অসুকুমারতা এবং ছন্দবিষয়ে বর্ণগত বৈলক্ষণ্য যত দেখিতে পাওয়া যায়, কাশীরামে তেমন নাই। অবশ্য কাশী অনেক পরবর্ত্তী কালের কবি; রচনায় ক্রমেই উন্নতি হইয়া আসিতেছিল বুঝা যায়।

কাশীদাসে প্রায় সমস্তই পয়ার, সামান্যই ত্রিপদী বা অন্য ছন্দ আছে। রচনায় মিত্রাক্ষরের বিশুদ্ধিতা যথেষ্ট রক্ষিত হইয়াছে।

রাক্ষস-বানরের যুদ্ধ ও অদ্ভুৎ রসের সমাবেশ প্রভৃতির জন্য কৃত্তিবাস যেমন নিরক্ষর নিম্নশ্রেণী বাঙ্গালীর অধিকতর প্রিয়, নানাবিধ

মনোমুগ্ধকর আখ্যায়িকায় শোভিত বলিয়া কাশীদাস ভদ্রঘরের বাঙ্গালীর তেমনি সমধিক আদরের কাব্য।

এখন আমরা কাশীরাম দাসের গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় লইতে চেষ্টা করি আসুন।

রণস্থলে ভীমের বীর্য্য—

মুখ তুলি বৃকোদর যেই দিকে চায়। পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়॥
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর। পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র মণ্ডলে। দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র। ভেদাভেদী হৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি। দুই দিকে তট যেন মধ্যে বহে নদী॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হৈল রঙ্গা। খর স্রোতে রক্ত বহে ভারতে যেন গঙ্গা॥

যুদ্ধ হইতে পলায়নপর যোদ্ধা—

যে দিকে পারিল যেতে সে গেল সে দিকে। পলায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্ব্বদিকে॥
উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল। পথাপথ নাহি জ্ঞান যে যেক পাইল॥
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পথ। একে চাপি আর যায় যেই বলবন্ত॥
রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার। অবস্থা হইল যত কি কব তাহার॥
ঠেলাঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধ সৈন্য মৈল। স্থানে স্থানে পর্ব্বত আকার শব হৈল॥
এক পদ কাটা কার কাটা দুই ভুজ। বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুঁজ॥
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার। মুণ্ড কেশ নাই কেহ কাণ কাটা কার॥
আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া। দন্তেতে তৃণ ধরিয়া কেহ যায় পলাইয়া॥
ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে। [illegible] ক্ষত্রি দেখি লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে॥
দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয় ক্ষত্রে দ্বিজ ভয়। দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে, ক্ষত্র দ্বিজ হয়॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল। মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥
তুলিয়া লইল ছত্র দণ্ড কমণ্ডল। ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল॥
প্রাণ ভয়ে কেহ গিয়া ডুবে রহে জলে। কেহ কাঁটা বনে পৈশে কেহ বৃক্ষডালে॥
মরার ভিতর কেহ মরা হৈয়া রহে। দূর দূরান্তরে কেহ ভয়ে স্থির নহে॥

জীবন্ত সুন্দর চিত্র—বিশেষতঃ কবির স্বজাতি হতভাগ্য আমাদের পক্ষে!

আর একটী চিত্র কেমন স্ফুটন্ত!

কুরুসৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধাবস্থ—

আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে। চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথীগণ। অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
শেল শূল শক্তি জাঠী মুষল মুদ্গর। ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দ্দিকে বরিসে তোমর॥
পর্ব্বত আকার হস্তী ভীষণ দশন। চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদ গর্জ্জন॥
দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন। দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবে যোড়েন সেই ক্ষণ॥
না হৈতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস। শরজাল করিয়া পূরিল দিক্‌পাশ॥
বরিষা কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে। দিনকর তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঁই লাগে॥
যত রথী পদাতি কুঞ্জর হয় গণ। করেন জর্জ্জর বিন্ধি ইন্দ্রের নন্দন॥
বেগে রথ চালায় সারথি বিচক্ষণ। বাতাধিক মনোজব জিনিয়া খঞ্জন॥
ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে আগে পিছে ছুটে ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে ক্ষণে শূন্যে উঠে॥
ক্ষণেক ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির। রথবেগে পড়িল অনেক মহাবীর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র মণ্ডলে। নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতূহলে॥
কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত। খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল চতুর্ভিত॥
ধনুক সহিত বাম হাত ফেলে কাটি। কাটিয়া ফেলিল কার দন্ত দুই পাটী॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখি বিপরীত। কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত॥
কাটিলেন রথধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড। মধ্যচক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
তীক্ষ্ণ বাণঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল। আর্ত্তনাদ করি পড়ে মহি বহুদল॥
চক্রাকারে ভ্রমি ভূমে দিয়া পড়ে দন্ত। পেটেতে বাজিয়া কারু বাহিরায় অন্ত্র॥
এই মত মহামার করিল ফাল্গুনী। সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনী॥

সহজ সরল বাঙ্গালায় কাশীদাসের রচনা কেমন প্রসাদগুণবিশিষ্ট দেখা গেল; কবি শুদ্ধভাষা প্রয়োগেও কেমন দক্ষ তাহার পরিচয়—

ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের রূপ—

কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন। সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি। পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা। মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥

সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল। খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর। কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত। করী-কর যুগবর জানু সুবলিত॥
বক্ষপাটা দন্ত ছটা জিনিয়া দামিনী। দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত। অগ্নি অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত॥
এই ক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য। কাশী ভণে কৃষ্ণ-জনে কি কাজ অশক্য॥

ইহার ভিতর ভাষার কারচুপীই অধিক; কবির সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয়। এ পরিচয় আমরা আরও বিশেষরূপ পাইতে পারি—

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা—

পূর্ণ সুধাকর হইতে প্রবর কে বলে কমল মুখ।
গজমতি ভুষা তিলফুল নাশা দেখি মুনী মন-সুখ॥
নেত্রযুগ মীন দেখিয়া হরিণ লাজে দৌড়ে গেল বন।
চারু ভুরুলতা দেখিয়া মন্মথ নিন্দে নিজ শরাসন।
প্রবাল শ্রীধর বিরাজে অধর পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী স্থির সৌদামিনী সিন্দুর চাঁচর চুলে॥
তড়িত মণ্ডল গণ্ডেতে কুণ্ডল হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ লজ্জায় দাড়িম্ব হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু অগাধ অম্বুধি মাঝে॥
নিন্দিত মৃণাল দেখি ভুজ ব্যাল প্রবেশিল বিলে লাজে॥
মাঝা দেখি ক্ষীণ প্রবেশে বিপিন করীহর হরি লাজে।
করে কোকনদ পাইল বিপদ নখতেজে দ্বিজরাজে॥
কনক কঙ্কন করে ঝন ঝন চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর বিহার কন্দর স্বর্ণ কাঞ্চী অবতংস॥
রাম-রম্ভা তরু চারু যুগ উরু দেখি নিন্দে হাত হাতী।
উদর সুকৃশ মাঝা মৃগ-ঈশ নিতম্ব যুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল শরীর অমল কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ হীন আভরণ সহজে মোহে অনঙ্গ॥
[illegible] বদন কমল নয়ন কমল-গন্ধিত গণ্ড॥

দ্বিকর কমল	কমলাঙ্ঘ্রি তল	ভুজ কমলের দণ্ড ॥
মন্দ মন্দ বায়	যোজনেক যায়	অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্নত	ধায় চতুর্ভিত	কমল-মধুপ বৃন্দ ॥
কুরুকুল ধ্বংসে	কমলার অংশে	সৃজিল কমল-জাত।
কমলা-বিলাসী	বন্দি কহে কাশী	কমলাকান্তের সুত ॥

ইহা অবশ্য ভাষা-বৈচিত্র্যের নমুনা। এক দিকে "কমলাঙ্ঘ্রি তল" অপর দিকে "নিন্দে হাত হাতী" লক্ষ্য করিবার জিনিস।

এই সকল পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, কাশীদাসের সময় দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বাড়িয়াছে। সংস্কৃত কাব্যাদির উপমা অজস্র বর্ষণ, যমক-অনুপ্রাস-প্রিয়তা, এই প্রকার পোষাকী রকম শুদ্ধ ভাষার ব্যবহার —তাহার নিদর্শন।

শুধু ভাষায় নহে, ভাবেও সংস্কৃত নাটকাব্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেখাই;—ধনঞ্জয় কুমারী সুভদ্রাসুন্দরীর নয়ন-পথের পথিক হইয়াছেন, প্রথম দর্শনেই—

অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত।	অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত ॥
সত্যভামা বলেন না আইস ভদ্রা কেন।	সবে গেল একক বসিলা কি কারণ ॥
সুভদ্রা বলিল সখি ধরি মোরে লহ।	কণ্টক ফুটিল পায় বাহির করহ ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেক হাতে।	নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে ॥
সত্যভামা বলেন কি হেতু দাঁড়াইলা।	নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা পড়িলা ॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি।	যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাব দেখি ॥
অর্জ্জুনের নয়ন-চাহনি তীক্ষ্ণ শর।	আজি অঙ্গ আমার হইল জরজর ॥
দেখি মম অঙ্গতাপ যন কম্পমান।	ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ ॥
ধর সত্যভামা আমি না পারি যাইতে।	এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে ॥

কাশীদাসের "সুভদ্রা হরণ" ও "শ্রীবৎস-চিন্তা"র উপাখ্যান প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে সকল দীর্ঘ প্রবন্ধের পরিচয় দিবার আমাদের স্থান নাই। আমাদের কবির বর্ণিত সুভদ্রা-হরণ অভিনব ব্যাপার—মূল আখ্যান

হইতে কিছু ভিন্ন। অর্জ্জুন-দর্শনে অনূঢ়া কৃষ্ণ-ভগিনীর প্রেম-বৈক্লব্য, কৃষ্ণ-প্রিয়া সত্যভামার সহায়তা এবং হরণ-কালে হিন্দু-রমণীর রণক্ষেত্রে সারথ্য বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে নবীনত্ব আনয়ন করিয়াছে।

এই স্থলে অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়োচিত তেজও চমৎকার;—কৃষ্ণ-সারথি-চালিত কৃষ্ণ-রথে কৃষ্ণ-ভগিনীকে তুলিয়া লইয়া পাণ্ডব-বীর ছুট দিয়াছেন; যাদবগণকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া ফাল্গুনী সারথিকে বলিলেন—

ফিরাও দারুক রথ, ডাকে ক্ষত্রগণে।
না দিয়ে প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥

কিন্তু প্রভুভক্ত কৃষ্ণ-সারথি কৃষ্ণ-পুত্রগণের সহিত যুদ্ধার্থ কৃষ্ণের রথ সম্মুখীন করিতে অক্ষমতা জানাইলে বীরবর স্পষ্ট প্রকাশ করিলেন—

কৃষ্ণ-পুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আইসে,
কিম্বা ভীম যুধিষ্ঠির সমরে প্রবেশে—

তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না। যুদ্ধে আহ্বান—অর্জ্জুনের মত বীর কি বিমুখ হইতে পারেন? ক্ষত্রিয়-রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। এ স্থানটি উচ্চ অঙ্গের বীর-রস-ব্যঞ্জক।

সকলেরই বোধ হয় মনে আছে স্বয়ং সুভদ্রাসুন্দরী অশ্ব-বল্গা ধারণ করিয়া এই সময়ে রণাভিমুখী হইয়াছিলেন।

শ্রীবৎসের উপাখ্যান ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী নহে। কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মুকুন্দরামের কাব্যেও দেখা যায়—

"কাঠুরে সহিত ছিল চিন্তা নামে নারী"।

এবং তৎসঙ্গে বনপর্ব্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু মহাভারতের বনপর্ব্বে এই আখ্যান নাই। বোধ হয় লৌকিক কোন ক্ষুদ্র উপাখ্যান দেশে প্রচলিত ছিল, মুকুন্দরাম ইঙ্গিতে আভাস দিয়াছেন; কাশীদাস সেইটীকে কাব্যাকারে সম্প্রসারিত করিয়া গাহিয়াছেন। (জৈমিনী বা মূল?) গল্পটীতে নলদময়ন্তী উপাখ্যানের ছায়া সুস্পষ্ট।

কাশীদাসের এক এক স্থল কৃত্তিবাসের অনুসরণ মনে হয়। একটী সুন্দর অংশ দেখাইয়া দিই। অশ্বমেধ পর্ব্বে অর্জ্জুন-সুধন্বা যুদ্ধে পরম ভাগবত সুধন্বার বীর্য্যাতিশয্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে আসিয়া আবার ফাল্গুনীর সারথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে; অর্জ্জুন পরাজিত-প্রায়, কিন্তু—

"মনোহর কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে;"

ভূপতিত অর্দ্ধ-ভগ্ন শব উঠিয়া গিয়া সুধন্বার মুণ্ডচ্ছেদ করিল!

"অর্জ্জুন কাটিল যদি সুধন্বার মাথা।
কাটা মুণ্ড ডাকি বলে প্রাণ-কৃষ্ণ কোথা।"

অনেকের বীরবাহু তরণীসেনের পালা মনে পড়িবে। কিন্তু মূল-বহির্ভূত এই অংশের বোধ হয় কৃত্তিবাস হইতে ভাব সংগ্রহ নহে। ছুটি খাঁর অশ্বমেধ পর্ব্বে এই প্রসঙ্গ অধিকতর বিস্তারিত ভাবে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে; তবে কাটামুণ্ডের পরিনাম লইয়া কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

আমরা কাশীদাসের কাব্য হইতে রাজচক্রবর্ত্তী-পুত্র-হারা সতী সাধ্বী রাণী গান্ধারীর বিলাপ শুনাইব—

ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন। গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লৈয়া বধূগণ॥
পুত্র মরণনে দেবী অজ্ঞান হইল। গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তারে তুলিয়া ধরিল। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥
সম্বিত পাইয়া তবে গান্ধার-তনয়া। চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন। সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার। কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনু-কুমার॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়। একেলা পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণিমুক্তাস্রজ। কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে ধায়। হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লোটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন। হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ॥
জাতি যূথি পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর। রঙ্গন মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥

এ সকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া। হেন তনু লোটে ধূলা দেখ না চাহিয়া॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী। লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি॥
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন। আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন॥
তাজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর। যুদ্ধ হেতু তোমারে ডাকয়ে বৃকোদর॥
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে। গদা-যুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ। প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্য্যোধন॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতন। প্রিয় ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বন॥

রাজবধূ, রাজমাতা, রাজপত্নী ক্ষত্রিয়ানীর কি তেজঃপূর্ণ শোকোচ্ছাস! ইহার কিছু পরের অংশ আরও সুন্দর, আরও মর্ম্মস্পর্শী; কিন্তু সে টুকু নিত্যানন্দ ঘোষের বর্ণনার সহিত ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়। নিত্যানন্দ কাশীদাসের পূর্ববর্ত্তী কবি, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে,—হয় কাশীরাম স্বয়ং সে টুকু নিত্যানন্দ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা অপর কাহারও কর্ত্তৃক সে অংশ কাশীদাসের মহাভারতমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শত-পুত্রহারা জননীর হাহাকার—

কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য মনেতে বুঝিয়া। উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা। বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল। ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে। দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্য চাঁদে॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু। দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেত্রে। ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখ তুমি নেত্রে॥
অই দেখ নৃত্য করে পতিহীন বধূ। মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু॥
ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা। কণ্ঠ শব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীর-বেশ ধরি। ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন। আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি। যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন। সে তনু ধূলায় ওই দেখ নারায়ণ॥
সন্তানে কাতর বড় মায়ের পরাণ। সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥

এক কালে এত শোক সহিতে না পারি। বুঝাইবে কি রূপে হে আমারে মুরারি॥
পুত্রশোক শেল যেন বাজিছে হৃদয়॥ দেখাবার হইলে দেখিতে মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক। পুত্রশোক তুল্য শোক নাহি তার এক॥
গর্ভধারী হয়ে যেই করেছে পালন। সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কাশীরাম দাস এমন প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাণের গাথা গাহিয়া গিয়াছেন।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কৃত্তিবাস হইতে আমরা রাম-নাম মাহাত্ম্য শুনাইয়াছি, কাশীদাস হইতে কৃষ্ণ-নাম-মাহাত্ম্য শুনাইয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

আদরিণী গরবিনী পত্নী সত্যভামা নারদের পরামর্শানুসারে ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী ইন্দ্রাণীর সমতুল্য হইবার জন্য ব্রত করিতেছেন, ব্রতের দক্ষিণা—পতিদান—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে বিতরণ—চিরকালের জন্য পরহস্তে সমর্পণ। ব্রতানুষ্ঠান সাঙ্গ হইল; প্রতিজ্ঞানুসারে দক্ষিণা দিবার সময় আসিল। পতিশ্বর্য্যের লোভে অন্ধ, পতি-সোহাগিনী পূর্ব্বে অতটা খেয়াল করেন নাই, মনে করিয়াছিলেন নামেই উৎসর্গ, এখন দেখিলেন সত্যসত্যই নারদ মুনি কৃষ্ণকে লইয়া যান। তখন কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিলেন, ঋষিবরের পা জড়াইয়া ধরিলেন। বিস্তর কান্নাকাটিতে দেবর্ষি রফা করিতে চাহিলেন—

নারদ বলেন দেবী এক কর্ম্ম কর। দান দিয়া লৈতে চাহ অধর্ম্ম বিস্তর॥
গোবিন্দ তৌলিয়া দেহ আমারে রতন। পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রের লিখন॥
শুনি সত্যভামা মনে হইয়া উল্লাস। পুত্র গণে ডাকিয়া কহেন মৃদু ভাষ॥
করহ তুলের সজ্জা যে আছে বিহিত। মম গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত॥
আজ্ঞা পেয়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ। কনকে নির্ম্মাণ তুল কৈল ততক্ষণ॥
এক ভিতে বসাইল দৈবকী-নন্দনে। আর ভিতে চড়াইল যত রত্নগণে॥
সত্যভামা গৃহে রত্ন যতেক আছিল। তুলে চড়াইল তবু সমান নহিল॥
রুক্মিণী কালিন্দী নগ্নজিতা জাম্বুবতী। যে যাহার ঘর হৈতে আনে শীঘ্রগতি॥
চড়াইল তুলে তবু সমতুল্য নহে॥ ষোড়শ সহস্র কন্যা নিজ ধন বহে॥

কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া। ত্বরাত্বরি চড়াইল তুলে সব লৈয়া॥
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা। দ্বারকাবাসীর দ্রব্য যার ছিল যথা॥
শকটে উষ্ট্রেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ। নহিল কৃষ্ণের সম দেখে সর্ব্বজন॥
পর্ব্বত আকার চড়াইল রত্নগণে॥ ভূমি হৈতে তুলিতে নারিল নারায়ণে॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন। ক্রোধ-মুখে বলেন নারদ তপোধন॥
উপেন্দ্রাণী বলিয়া বলিলা এই মুখে। রত্নে জুখি উদ্ধারিতে নারিলে স্বামীকে॥
শিশুপ্রায় পুনঃপুনঃ করিস্ রোদন। হেন জন হেন ব্রত করে কি কারণ॥
এবে জানিলাম ধন না পারিবি দিতে। 'উঠ' বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণ-হাতে॥
শুনি সত্যভামা মুখে উড়িল যে ধূলি। ভূমে গড়াগড়ি যায় সবে মুক্তচুলী॥
হেন কালে কান্দে সব যাদবী যাদব। হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব॥
আপন শ্রীমুখে কহিয়াছেন যাদব। আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর॥
চিন্তিয়া বলিল সবে মম বোল ধর। যত রত্ন আছে তুলে ফেলাহ সত্বর॥
একৈক ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে। কোন দ্রব্য সম করি তুলিবা তাঁহাকে॥
এত বলি আনি এক তুলসীর দাম। তাতে দ্বি অক্ষর লিখিল 'কৃষ্ণ' নাম॥
তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত। নীচে হৈল তুলসী উপরে জগন্নাথ॥
দেখি উল্লাসিত হৈল সকল রমণী। সাধুবাদে উদ্ধবের হৈল মহাধ্বনি॥
কৃষ্ণ নাম গুণের নাহিক বেদে সীমা॥ বৈষ্ণব সে জানে কৃষ্ণ নামের মহিমা॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ-নাম ধন বড়। জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্ত করি দড়॥
বরি হরি বলিয়া পাইবে হরি-দেহ। হরির মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ॥
নাম-পত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান। সত্যভামা রত্নগণ ব্রাহ্মণে বিলান॥

এমনই কৃষ্ণ-নামের গৌরব! অসংখ্য ধন রত্ন ইহার নিকট তুচ্ছ। এই সকল বর্ণনার কারণেই—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

এই হরি-নাম-মাহাত্ম্য অন্তবিধ আমরা মুকুন্দরাম কবির "চণ্ডী"র শেষ ভাগে দেখিতে পাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চৈতন্য প্রভুর সমকালিক গৌড়েশ্বর সুলতান

আলাউদ্দীন হুসেন সাহ বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তাঁহার আমলে মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদ করেন,—নাম দিয়াছিলেন "শ্রীকৃষ্ণবিজয়।" মালাধর বসু হুসেন সাহ হইতে "গুণরাজ খাঁ।" উপাধি ভূষণে-ভূষিত হইয়াছিলেন।

তখনকার কালে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া অনুবাদ করার প্রথা প্রচলিত ছিল না; শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও খুব মূলানুগত অনুবাদ নহে, ভাব-সঙ্কলন মাত্র; অবশ্য মূলের সহিত সংস্রব অল্প বলা চলে না; মূলাতিরিক্ত কথাও আছে, মূল পরিত্যাগও আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয়—বাল্যলীলা—

প্রভাতে ভোজন করি শিঙ্গা বাজাইয়া। পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া ॥
একত্র হইল সব যমুনার তীরে। নানা মতে ক্রীড়া করি যায় দামোদরে ॥
কথাতে কোকিল পক্ষিগণে নাদ করে। তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে ॥
কথাতে মর্কট শিশু লাফ দেই রঙ্গে। সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে ॥
কথাতে ময়ূর পক্ষী মধু নাট করে। সেই মত নৃত্য করে দেব দামোদরে ॥
কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই। তার ছায়া সঙ্গে নাচে রাম কান্হাই ॥
কথা বা সুগন্ধি পুষ্প তুলিয়া মুরারি। কত ছন্দে মস্তকে শ্রবণে কেশে পরি ॥

পংক্তিগুলি আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী মনে পড়াইয়া দেয়। এই কাব্য সেই অমৃত-নির্ঝর যুগেরই রচনা।

আর একটু শুনাই—কৈশোর-লীলা; কানাইয়ের বাঁশী বাজিয়াছে—

সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া। বেণু-দ্বারে গোপী-চিত্ত আনিল হরিয়া ॥
ছাওয়ালেরে স্তন পান করে কোন জন। নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন ॥
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে। গুরুজন সমাধান করে কোহ্ন জনে ॥
ভোজন করয়ে কেহ করে আচমন। রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহ্নজন ॥
কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবারে যায়। তৈল দেহি কোহ্ন জন গুরুজন পাএ ॥
কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে। কেহ ছিল কার কার্য্য অনুরোধে ॥
হেন হি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে। চলিল গোপীকা সব যে ছিল যেমনে ॥

মূলের সহিত মোটামুটি ঐক্য আছে; তবে মূলে রাধিকা নাম নাই, বৈষ্ণব কবিগণের ভাগবত-অনুবাদে রাধিকা প্রসঙ্গ আছে।

মূল ভাগবতে অবর্ণিত কৃষ্ণলীলা (যাহা বৈষ্ণব পদাবলীর কবিগণ কেহ কেহ গাহিয়া গিয়াছিলেন) মালাধর বসু সে অভাবও কতক পূরণ করিয়াছেন। "দানলীলা" "নৌকাবিহার" প্রভৃতি মূল-বহির্ভূত বিষয়। সুন্দর কৃষ্ণ-গোপী রঙ্গ; একটু নমুনা দেখাই;—প্রেমিক আরোহী বক্ষে লইয়া নৌকাখানি দক্ষিণ-পবনে যমুনা-সলিলে টলমল করিতেছে, তখন—

"কি হৈল কি হৈল কাঁদে গোপনারী।"

কিন্তু—

"কাঁধে কেরোয়াল করি হাসয়ে মুরারি।"

তখন অগত্যা চতুর রসিক কাণ্ডারীকে উৎকোচে বশ করিবার উদ্যোগ হইল —

কেহ বলে পরাইমু পীত বসন। চরণে নূপুর দিমু বলে কোন্ত জন॥
কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে। মণিময় হার দিমু কোন্ত সখী বলে॥
কটিতে কঙ্কন দিমু বলে কোন্ত জন। কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন॥
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়। কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাএ॥
কেহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে। মকর কুণ্ডল পরাইমু শ্রুতিমূলে॥
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কান। কর্পূর তাম্বুল সনে যোগাইমু পান॥

কিন্তু এই সকল সামান্য উৎকোচের কাম নয়; বিপদ-বারণ কাণ্ডারী-ঠাকুর মস্ত পুরস্কারের লোভে ইচ্ছা করিয়া এই বিপদ ঘটাইয়াছিলেন; সময় বুঝিয়া তিনি চাহিয়া বসিলেন—

"প্রথমে মাগিয়ে আমি যৌবনের দান।"

রাধিকা-সুন্দরী প্রস্তাব শুনিয়া বড় রাগিয়া গেলেন; রসিক-চূড়ামণি নাগরালি করিতে লাগিলেন—

"কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই।
নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা বাহি নাই॥"

আর বোধ হয় উঠাইবার আবশ্যক করে না। কবি যেখানে মূল ছাড়াইয়া চলিয়াছেন, সেখানে কবিত্ব ফুটিয়াছে বেশী।

শ্রীচৈতন্যদেব যে সমস্ত ভাষা-গ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া সুখী হইতেন, এই "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" তাহার অন্যতম।

"শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাব লইয়া অনুবাদ। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচর কবি মাধবাচার্য্য "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" নামে দশম স্কন্ধের অনুবাদ রচিয়াছিলেন। এখনও বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-সহযোগে "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" গীত হইয়া থাকে। তৎপরে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস অতি সংক্ষেপে ভাগবতের অংশ-বিশেষের পরিচয় প্রদান করেন। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন; এই অনুবাদ প্রায় বিংশতি সহস্র শ্লোকে পূর্ণ। নগেন্দ্র বসু বাবুর যত্নে এই পুঁথি উদ্ধারিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন; ইহার নাম "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"। (বঙ্গবাসী প্রেস হইতেও এই প্রাচীন কাব্য ছাপা হইয়াছে।)*

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বের রচিত এই কাব্য; অনেক স্থলে রচনা বেশ প্রাঞ্জল অথচ মূলানুগত।

কিঞ্চিৎ উদাহরণ—

কুক্কুর শূকর উষ্ট্র গর্দ্দভ সমান। যার কাণে নাহি যায় হরিগুণ গান॥
গর্ত্ত তুল্য তার দুই শ্রবণ-বিবর। কেশব চরিত্র যার নাহিক গোচর॥

---

* "বঙ্গবাসী" আরও কতকগুলি প্রাচীন কাব্য প্রকাশিত করিয়া কাব্যামোদী বঙ্গবাসীকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

যে জিহ্বায় গোবিন্দ-মহিমা নাহি গায়। ভেকের সমান কিবা গুণ আছে তায়॥
বিচিত্র মুকুট পাগ যেবা শিরে ধরে। তার হেন মানে যদি প্রণাম না করে॥
কঙ্কন ভূষিত হস্তে কর্ম্ম নাহি করে। কেবল মড়ার হস্ত আছয়ে বিফলে॥
বৈষ্ণব বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখেনা নয়নে। ময়ূর পাখার চক্ষু জানিহ সমানে॥
যে চরণে হরিক্ষেত্র না গেল চলিয়া। বৃক্ষমূল আছে যেন ভূমিতে পড়িয়া॥
বৈষ্ণব চরণ-ধূলী যে না নিল মাথে। জীয়ন্তেই মরা তাকে জানিহ সাক্ষাতে॥
শিলার অধিক তার কঠিন হৃদয়। হরি নামে নহে যদি বিকার উদয়॥

মোটামুটি মূলের সহিত মিল আছে, মানিতে হয়।

আমরা রাসলীলা প্রসঙ্গ হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাই—

গোপিকার কাম্য সিদ্ধি করিতে মুরারি। বৃন্দাবন পুলিনে চলিল শ্রীহরি॥
শরৎ সহায় আর পূর্ণিমা রজনী। মনোহর মুরলী বাজান যদুমণি॥
এ চন্দ্র মিলিঞা আইল যত ঋতুগণ। যমুনা-লহরী তাহে সুমন্দ পবন॥
প্রফুল্ল কমল দল ভ্রমর গুঞ্জরে। কুহু কুহু কোকিল করয়ে সুমধুরে॥
আনন্দিত তরুলতা পশুপক্ষিগণ। মল্লিকা মালতী জাতী প্রফুল্ল কানন॥
সুখ দুঃখ নিবর্ত্ত হইল জগজনে। হরিল সবার চিত্ত বংশী আকর্ষণে॥
শুনিঞা বাঁশী রসাল যত ব্রজনারী। অধৈর্য্য হইল মনে পড়িল মুরারি॥
মদনে পীড়িত অঙ্গ হইল বিহ্বল। কৃষ্ণ দরশনে গোপী চলিল সকল॥
কোন গোপী ছাওয়ালেরে দুগ্ধ পিয়াইতে। ফেলিয়া বালকে রামা ধাইল ত্বরিতে॥
কোন গোপী গৃহকর্ম্ম রন্ধনেতে ছিল। তাজিয়া সকল কর্ম্ম সত্বরে চলিল॥
কোন গোপী পতি সঙ্গে ছিল পরিহাসে। লজ্জা ভয় নাহি যায় কানুর উদ্দেশে॥
কোন গোপী গোরস আবর্ত্তে একমনে। ফেলিয়া চলিল দুগ্ধ পড়িল আগুণে॥
কোন গোপী এক কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া। কোন গোপী ধায় মনে উন্মাদ হইয়া॥
কেবা কি করিবে কারো নাহি অবধান। চলিল সকল গোপী শুনি বাঁশীর গান॥
কোন গোপিকারে ধরি রাখে তার পতি। বন্ধুগণে রাখে কারে করিয়া শকতি॥
কোন গোপী রাখে কেহো ঘরেতে ভরিয়া। কোন গোপিকারে কেহো রাখয়ে বান্ধিয়া॥
যে যে গোপী ঘর হৈতে যেতে না পাইল। কৃষ্ণ-পদ-যুগ ধ্যান করিতে লাগিল॥
বিরহ তাপে গোপী ত্যজিল জীবন। কর্ম্মবন্ধ ছুটিল পাইল নারায়ণ॥

[illegible] তাঁরা পাঠ করিয়াছেন, বুঝিতে পারিবেন, অনুবাদ যথেষ্ট মূলানুগত।

কিন্তু বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের রাধা ছাড়িবার যো নাই। রাসলীলা-বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—শ্রীকৃষ্ণ কোন একজন গোপীর সহিত ক্ষণ-কালের নিমিত্ত অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন, গোপীটির নাম নাই। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ তাঁহার নাম বলিয়া দিয়াছেন—রাধা। বাঙ্গালী আমরা সেই হইতে রাধা লইয়া ভোর; ভক্ত বৈষ্ণবগণ রাধা-ভাবেই মত্ত। এখন আব আমরা রাধা ছাড়া কৃষ্ণ চিনি না।

শ্রীমদ্ভাগবত-অনুবাদ গাহিতেও বাঙ্গালী কবিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের রাধাঠাকুরাণীকে আনিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

আমরা কিঞ্চিৎ শুনাইব—

এইরূপ লীলা করি ভ্রময়ে কাননে। কৃষ্ণ-পদচিহ্ন দেখে সখী এক স্থানে॥
এক সখী বলে অয়ে শুন প্রাণসখি। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন এই পদে দেখি॥
পদ অনুসারে সখি চল সবে যাই। দেখি কতদূরে আছে নিঠুর কানাই॥
চলিল সকল গোপী পদ অনুসারে। দোঁহার পদের চিহ্ন দেখে কতদূরে॥
দেখ সখিগণ এই সখী পুণ্যবতী। দূরেতে আনিল কৃষ্ণ করিয়া পিরীতি॥
এই সখী আমা সবা নৈরাশ করিয়া। আপনি সম্ভোগ করে বিরল পাইয়া॥
কৃষ্ণের অধর সুধা পীয়ে একাকিনী। সফল রাধিকা নামে জন্মিল ভাবিনী॥
হের দেখ রাধাকৃষ্ণ বসি দুই জনে। কুসুম তুলিল কৃষ্ণ রাধার কারণে॥
ভকতের গতি কৃষ্ণ রসিক সুজন। যেই যারে বাঞ্ছে তারে দেন নারায়ণ॥
গোপীসম শুদ্ধ ভাব নহে ভক্তগণ।

শেষ তিনটি পংক্তিই বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা। ভাগবত-অনুবাদের ভিতর মূলাতিরিক্ত 'রাধা' কিন্তু ঠিক থাপ থায় নাই; কারণ দু চারি ছত্র পরেই কবিকে 'রাধা' ছাড়িয়া আবার 'গোপী' ধরিতে হইয়াছে। কিন্তু থাক্, এ তত্ত্ব আলোচনায় আমাদের আর কাজ নাই। ভাগবতাচার্য্যের "কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী" একখানি উপাদেয় কাব্য।

কবিচন্দ্র-প্রণীত সুললিত "গোবিন্দমঙ্গল"ও ভাগবতের অনুবাদ

গোবিন্দমঙ্গলের নানা অংশ বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া আছে দেখা যায়। এই কাব্যের সামান্য একটু—নমুনা স্বরূপ উঠাই—

রাধিকার প্রেমনদী রসের পাথার।
রসিক নাগর তাহে দেন যে সাঁতার॥
কাজলে মিশিল যেন নব গোরোচনা।
নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাঁচা সোণা॥
কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম।
কালো মেঘ মাঝেতে বিজলী অনুপাম॥
পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকার কোলে।
কালিন্দীর জলে যেন শশধর হেলে॥

উপরে লিখিত আমাদের মন্তব্য যিনি পড়িয়াছেন, এ কাব্যের দোষগুণ তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কাব্য মধ্যে রস আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন গ্রন্থাবলীমধ্যে একখানি কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন—নাম "রাধিকা-মঙ্গল।"—কবি কৃষ্ণরাম দত্ত রচিত। নামেই প্রকাশ—রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য; ভাগবতের দশম স্কন্ধের ভাব-সঙ্কলন। ইহাতে একটী নূতন তত্ত্ব আছে—কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় অধিষ্ঠিত, একদিন অকস্মাৎ তাঁহার বৃন্দাবনের কথা মনে পড়িল; তিনি নন্দ যশোদা গোপীকুলের—তাঁহার রাধার—সংবাদ লইতে উদ্ধবকে ব্রজধামে পাঠাইলেন। উদ্ধব আসিয়া সেই অনন্ত হাহাকার প্রত্যক্ষ করিলেন, ফিরিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন; কৃষ্ণ সকলকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন। শ্রীরাধাও শ্বশুর শাশুড়ীর (অবশ্য আয়ান ঘোষের পিতামাতার) নিকট বিদায় লইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণের মহিষীরা প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক রাধিকার অভ্যর্থনা করিলেন। তার পর——স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত আসিয়া রাধিকার স্তব গাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

শুন প্রিয়া রসবতী মোর নিবেদন। অপরাধ করিয়াছি তোমার চরণ।
এহাতে বিরস যেবা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা। সেবকের অপরাধ না লয় সর্ব্বথা॥
তোমার সমান কেবা আছে তিন লোকে। দাস জ্ঞানে সর্ব্বদোষে ক্ষমা কর মোকে॥
কৃষ্ণের মুখেতে শুনি বিনয় বচন। দণ্ডবৎ হইয়া রাধা পড়িলা চরণ॥
যে করিলা সেই হৈল তোমা দোষ নাই। অখনে আমারে দেও রাঙ্গা পদে ঠাঁই॥
গোবিন্দে বোলেন প্রিয়া শুন নিবেদন। এই সুখসম্পদ মোর করহ গ্রহণ॥
সকলের মুখ্য তুমি সংসারের সার। তোমার সেবক মোর যত পরিবার॥
রাধা বোলে শুন প্রভু দেব চক্রপাণি। আর মোরে না কহিবা এ সব কাহিনী॥
জনমে জনমে পাম তুমি হেন পতি। এ সুখ সম্পদ মোর কিছু না লয় মতি॥
সপত্নী সহিত মোর নাহি প্রয়োজন। রহিবারে স্থান দেও পদে নারায়ণ॥
কান্দিয়া সুন্দরী রাধা হইল বিকল। প্রভুর চরণে পড়ে নয়ানের জল॥
সেই ত সময় প্রভু প্রসন্ন বদন। রাধার গলেতে ধরি দিলা আলিঙ্গন॥
মুনী বোলে শুন রাজা কি দিমু উপমা। দৃঢ় আলিঙ্গনে তুষ্ট হৈলা তিলোত্তমা॥
লীন হৈয়া রৈলা রাধা গোবিন্দ-চরণ। দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হৈল মন॥
মগ্ন হৈলা তিলোত্তমা গোবিন্দের অঙ্গে। নিভৃতে করেন ক্রীড়া গোবিন্দের সঙ্গে॥
প্রভুর বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে। কেহ ত না পুছে রাধা গেল কোথাকারে॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণে শ্রীরাধা লীন হইয়া গেলেন!

অভিরাম দাস, সনাতন চক্রবর্ত্তী, কাশীধামের অগ্রজ কৃষ্ণদাস প্রভৃতির রচিত ভাগবতানুবাদ আছে। "গোপাল-বিজয়" "গোকুল-মঙ্গল" "গোবিন্দলীলামৃত" প্রভৃতিও ভাগবতের আংশিক অনুবাদ। ইহা ব্যতীত ভাগবতের উপাখ্যান ভাগ—ধ্রুব-চরিত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র ইত্যাদি অনুবাদে বহু কবিই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, উপস্থিত পরিচয় দিবার সুবিধা নাই।

হরিবংশের অনুবাদও মিলিয়াছে; একখানি পুঁথির লেখক—শ্রীভাগ্যবন্ত ধুপী; এই রজকবর যে কাব্য নকল করিতে লেখনী ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহার শ্লোক-সংখ্যা ৩১৬৮; নেহাৎ ছোট নয়।

বায়ু-পুরাণ, কালিকা-পুরাণ, গরুড়-পুরাণ প্রভৃতি প্রায় সকল পুরাণ-গুলির প্রাচীন অনুবাদ কতক কতক পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিজ মুকুন্দের "ইন্দ্রদ্যুম্ন-উপাখ্যান," রাজারাম দত্তের "দণ্ডীপর্ব্ব," রাম-নারায়ণ ঘোষের সুন্দর "নৈষধ-উপাখ্যান," "সুধন্বা-বধ" ইত্যাদি মিলিয়াছে।

ইহা ব্যতীত রঘুবংশের অনুবাদ, বেতাল-পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি পুঁথিও দেখা দিয়াছে। এই সকল হইতে বুঝা যায়, সেকালেও লোকে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াও অনুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, কেবল কথকের কথা শুনিয়া কাব্য রচনায় মাথা ঘামাইতেন না। বলা বাহুল্য—সকল অনু-বাদই পদ্যে রচিত, অবশ্য কবিত্ব-রস সর্ব্বত্র সুলভ নহে।

একজন প্রাচীন কবির কথা কিছু বলা কর্ত্তব্য। কবিচন্দ্রের উল্লেখ করা গিয়াছে; "কবিচন্দ্র" উপাধি; এই উপাধিধারী অনেক কবি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আছেন। কবি মুকুন্দরামের এক ভ্রাতা কবিচন্দ্র ছিলেন—ইঁহার নাম অযোধ্যারাম—মতান্তরে নিধিরাম। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র এক জনের নাম পাওয়া যায়। রামায়ণের অঙ্গদ-রায়বারে কবিচন্দ্রের নাম আমরা করিয়াছি। গোবিন্দমঙ্গলের রচয়িতাও কবিচন্দ্র। আমরা যাঁহার পরিচয় দিতে যাইতেছি, বোধ হয় ইনিই তিনি; ইঁহার নাম কি ঠিক টের পাওয়া যায় নাই—কেহ কেহ বলেন শঙ্কর—উপাধি ছিল "কবিচন্দ্র"। এই কবি বিশেষ ক্ষমতাশালী, ইঁহার রচিত পুঁথির তালিকা—

অক্রূর আগমন, অজামিলের উপাখ্যান, অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ, অর্জ্জুনের বাঁধ বাঁধা পালা, উঞ্ছবৃত্তি পালা, উদ্ধব সংবাদ, একাদশী ব্রত, কংস বধ, কণ্ব মুনির পারণ, কপিলা মঙ্গল, কুন্তীর শিবপূজা, কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ, [illegible] সংবাদ, গেড়ু চুরী, চিত্রকেতুর উপাখ্যান, দশম পুরাণ, দাতাকর্ণ, দিবা-রাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, ধ্রুবচরিত্র, নন্দবিদায়,

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, পারিজাত হরণ, প্রহ্লাদ চরিত্র, ভরত উপাখ্যান, মহাভারত—বনপর্ব্ব, উদ্যোগপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, কর্ণপর্ব্ব, শল্য-পর্ব্ব, গদাপর্ব্ব; রাধিকা-মঙ্গল, রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড), রাবণ বধ, রুক্মিণী হরণ, শিব-রামের যুদ্ধ, শিবি উপাখ্যান, সীতা হরণ, হরিশ্চন্দ্রের পালা, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, অঙ্গদ রায়বার, কুম্ভকর্ণের রায়বার, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ, দুর্ব্বাশার পারণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল। এই ত ৪৬ খানি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পুঁথি মিলিয়াছে, হয়ত আরও আছে। কতকগুলি ক্ষুদ্র পুঁথি—২০০।২৫০ শ্লোকে সমাপ্ত; অনেকগুলি বৃহৎ। বিষয়ের ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য দেখিলে বুঝা যায়, তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও প্রতিভা-বান্ কবিগণ নানা বিষয় বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিতেন; কেবল মাত্র সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা ভাবসঙ্কলনেই তাঁহাদের প্রতিভা আবদ্ধ থাকিত না। এই কবিচন্দ্র কাশীদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী, বোধ হয় নিত্যানন্দ ঘোষের সমসাময়িক।

শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদের মধ্যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ সংক্ষেপে উল্লেখ-যোগ্য। ২৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কবি ভবানীপ্রসাদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; ইহার রচিত "দুর্গামঙ্গল" প্রকাশিত হইতেছে। এই কবির একটু বিশেষত্ব আছে—ইনি জন্মান্ধ। অন্ধ কবির রচনায় মিত্রাক্ষরের মিল সর্ব্ব স্থানে রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রসাদগুণ দুর্লভ নহে। ইঁহার "চণ্ডী" হইতে সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করি—

যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী দয়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥*

---

* এই "দুর্গামঙ্গল" মতে সীতা-উদ্ধারার্থ লঙ্কা-প্রয়াণ কালে রামচন্দ্রের বানর-সেনা প্রথমতঃ সমুদ্রে সেতু বন্ধনে অশক্ত হইয়াছিল; তখন রঘুপতি জাম্ববানের পরামর্শা-

রূপনারায়ণ ঘোষ প্রায় সমসময়েই অপর একখানি ভাষা চণ্ডী প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে স্থলে স্থলে রচনা সংস্কৃত কাব্যের উপমা রাশির ছায়া। কর্ণশোভী কুণ্ডলের সহিত মদনের রথ-চক্র উপমিত হইয়াছে—

"যো রথ আরোহি মদন বীর। জিনিল পিণাকপাণী ধীর ॥"

কালিদাসের নকলও "চণ্ডী"তে উঁকি মারিতেছে—

গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে। দুস্তর সাগর চাহি উড়ুপে তরিতে ॥
প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ। তাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন ॥
পরন্তু ভরশা এক মনে ধরিতেছে। বজ্র বিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে ॥

ইঁহারা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি সময়ের কবি।

রামায়ণের এবং মহাভারতের অংশ বিশেষের অথবা উপাখ্যান বিশেষের (ভাব সঙ্কলন) অনুবাদে কিম্বা তদানুসঙ্গিক কল্পিত পালা (যথা—"কালনেমীর রায়বার" "কুন্তীর বাণভিক্ষা" প্রভৃতি) রচনায় অনেক কবি অগ্রসর হইয়াছেন, পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রভাস-খণ্ডের অনুবাদও কয়েক খানি পাওয়া গিয়াছে। স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের অনুবাদ শতাধিক বর্ষ প্রাচীন দুই খানি মিলিয়াছে। এক খানি শূদ্র-পণ্ডিত কেবল কৃষ্ণ বসু প্রণীত; অপর খানি ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কর্ত্তৃক দুইজন অধ্যাপক সাহায্যে অনুবাদিত। শেষোক্ত খানি সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত করিতেছেন;—ইহার পরিশিষ্ট অংশ—রাজার স্বরচিত "কাশী-পরিক্রমা" মুদ্রিত হইয়াছে।*

নুসারে অগস্ত্য মুনীকে স্মরণ করিয়া পুনরায় গণ্ডূষে সমুদ্র-শোষণার্থ তাঁহাকে অনুরোধ করেন; মুনীবর তাহাতে অসম্মত হইয়া রামচন্দ্রকে দুর্গাদেবীর পূজা করতঃ সফলকাম হইতে উপদেশ দেন; প্রসঙ্গক্রমে ভগবতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন—

"যেহি মত শুনিয়াছি মার্কণ্ডপুরাণে। সেহি কথা রাম কহি তোমা বিদ্যমানে।"

* "কাশী-পরিক্রমার" ন্যায় নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত "নবদ্বীপ-পরিক্রমা" ও "ব্রজ-পরিক্রমা" মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রাচীন কবিগণ সকলেই গীত হইবার জন্য কাব্য প্রণয়ন করিতেন, অগেয়কাব্য প্রাচীন সাহিত্যে প্রায় নাই ; এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখা যায়।

কবি কেবল কৃষ্ণ বসুর রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্টা ও মূলানুসারিণী। গ্রন্থে নানা ছন্দ আছে। আমরা গো-মাহাত্ম্য টুকু তুলিয়া দেখাই—

মাতৃ সমতুল্য গাবী শুন দেবগণ।	যাহার গৃহেতে থাকে ধন্য সেহি জন ॥
যেহি জন গাবী দান করে পৃথিবীত।	তার পিতা পিতামহ আনন্দ-মোহিত।
নৃত্য করে পিতৃলোক হৈয়া পুলকিত।	দেব ঋষি মুনীগণ শুনি হরষিত ॥
গাবী দানে তার তাপ হয় পলায়ন।	ব্যাধির নাশক হয় কহিল কারণ ॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার গাবী গৃহে যার।	খুররেণু গঙ্গাতুল্য কহিলাম সার ॥
শৃঙ্গ গৃহে সর্ব্ব তীর্থ মধ্যে গৌরী হরে।	বিরাজে থাকয়ে বিষ্ণু তাহান অন্তরে ॥
গোময়ে নর্ম্মদা আর গোমূত্রে যমুনা।	সে স্থান পবিত্র যথা পড়ে বিন্দু কণা ॥
দুগ্ধ গঙ্গাতুল্য হয় শুন দেবগণে।	গাবীর অধিক আর নাহিক ভুবনে ॥
তাঁহার পুচ্ছের বাড়ি লাগে যার গায।	পাপ নাহি থাকে সর্ব্ব রোগ ত্যাগ পায় ॥

বলিয়া রাখি এই শূদ্র-পণ্ডিত মৈমনসিং-বাসী।

মূল কাশীখণ্ড একশত অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। রাজা জয়নারায়ণ এই একশত অধ্যায় অবিকল অনুবাদ করাইয়াছেন। এই অনুবাদ ১১২০০ শ্লোক-পূর্ণ। মূলের আদ্যোপান্ত অনুবাদিত হইবার পর, তাঁহার অবস্থানকালে তিনি বারানসীর অবস্থা যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎকালে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে) যেরূপে কাশীযাত্রা সম্পন্ন হইত, কাশীর প্রতি পল্লীতে যে যে দেবদেবী বিদ্যমান ছিলেন, যে যে দ্রষ্টব্য স্থান ছিল, সাধারণের ব্যবহার্য্য ও বাণিজ্যোপযোগী যে যে সামগ্রী পাওয়া যাইত, প্রতিদিন পুণ্যধাম বারানসীতে যে যে উৎসব হইত, সেই সমস্ত বিষয়গুলি রাজ-কবি "কাশী-পরিক্রমায়" নানাছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উচ্চদরের কবিত্ব বা রচনা-পারিপাট্য এই কাব্যে নাই, কিন্তু কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহাতে একশত বৎসরের পূর্ব্বেকার কাশীধামের অবিকল

মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই চিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অল্প নহে। বর্ণনাও বেশ সবল স্ফুটন্ত ও সুন্দর।

কবি গঙ্গার অর্দ্ধগোলাকৃতি তীরের উপর বক্রভাবে স্থিত কাশীকে মহাদেবের কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন; একটু আধটু নমুনা উদ্ধৃত করি—

বাঙ্গালীটোলা—

মহাজনটোলীমধ্যে রাস্তাতে সর্ব্বথা। দিনকর হিমকর কররহীন তথা॥
একারণ নিশাযোগে পথিকের প্রীতে। দীপশিখা করে সবে নিজ খিড়কীতে॥

মোহন্ত মহারাজ—

দশনামী সন্ন্যাসীর কত শত মঠ। বাহে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপট॥
সদাগরী মহাজনী ব্যবসা স্বভাব। এক এক জনার বাটী পর্ব্বত আকার॥

ভণ্ড পাণ্ডা—

কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরবাড়ী। বাটী পরিপাটী হেরি যেন রাজধানী॥

কাশীর গুণ্ডা—

এই মতে প্রতি মাসে প্রায় হয় দ্বন্দ। ক্ষণমাত্রে গড়াগড়ি যায় কত কন্ধ॥

কাশীবাসিনী ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণের বর্ণনাও আছে, রূপবর্ণনাও আছে—

গণ্ডারের চূড়ী কারু কনক-রচিত। ঘোর ঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত॥

কাহারও—

কি উপমা দিব সেই পিঠে দোলে বেণী। অখণ্ড কদলীদলে বিহরে নাগিণী॥

তাহাদের নাসিকার নথে—

বড় দুই মুক্তামাঝে চুনি শোভা করে। যেমত দাড়িম্ববীজ শুকচঞ্চু ধরে॥

কবিলোক, আরও একটু অগ্রসর হইবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই—

কারু উরঃদেশে মুক্তা মালার দোলনী। হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী॥

কিন্তু সতর্ক কবি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন—

এ সব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত অন্যভাব মনেতে নহিবে ॥

রাজা জয়নারায়ণ প্রণীত আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে।

দুইশত একশত বৎসরের পুরাতন গ্রন্থকে 'প্রাচীন' বলা সঙ্গত নহে, কিন্তু আমরা ইংরাজী শিক্ষার ফলে অভিনব ভাব আবির্ভাবের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত যুগটাকে প্রাচীন ভাবের যুগ বলিয়া তৎকালমধ্যে রচিত কাব্য-সাহিত্যকে 'প্রাচীন' ধরিয়া লইতেছি।

গীতগোবিন্দেরও প্রাচীন অনুবাদ আছে। আমরা জয়দেবের গীত-গোবিন্দকে বঙ্গের কবিতার অন্তর্ভূত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পরিচয় দিয়াছি। প্রথম কারণ—জয়দেব বঙ্গবাসী এবং তাঁহার কাব্যের ভাব বাঙ্গালীরই নিজস্ব; দ্বিতীয় কারণ—জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত হইলেও এমন তরল সংস্কৃত, বাঙ্গালা ভাষার এত নৈকট্যযুক্ত যে গীতগোবিন্দের গানগুলি বাঙ্গালা রচনাই দেখায়।

রসময় দাস কৃত গীতগোবিন্দের অনুবাদ আগাগোড়া পয়ার ছন্দে রচিত,—"একঘেয়ে" মনে হয়; মূলের পদলালিত্যের অভাব তাহাতে বিদ্যমান। ভারতচন্দ্রের ১৫।১৬ বৎসর পরে প্রণীত কবি গিরিধরের অনুবাদ একখানি আছে; তাহা হইতেছ এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমা-দের কথাটা প্রমাণ করি, মূল কাব্যের রসাস্বাদন-সুখে যাঁহারা বঞ্চিত, তাঁহাদের জন্য মূলও সঙ্গে দিই—

মূল—

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটিরে।
বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতী-জনেন সমং সখি বিরহীজনস্য দুরন্তে ॥
উন্মাদ-মদন-মনোরথ-পথিকবধূ-জন-জনিত-বিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-সমাকুল-বকুল কলাপে ॥

মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশম্বদ-নবদল-মাল-তমালে।
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখরুচি-কিংশুকজালে ॥

অনুবাদ—

এ সখি সুন্দরী যুবতী জনে হরি, নাচত কত প্রকার।
পবনে লবঙ্গলতা মৃদু বিচলিত শীতল গন্ধ বহায়।
কুহু কুহু করি কোকিলকুল কুজিত কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায় ॥
বকুল ফুলে মধু পীয়ে মধুকরগণ তাহে লম্বিত তরু ডাল।
পতি দূরে যার তার প্রতি মনোরথ মন-মথনে হয় কাল ॥
মৃগমদগন্ধে তমাল পল্লব বাসিত হইল সুবাস।
যুবজন হৃদয় বিদারিতে কামের নখ কিবা হইল প্রকাশ ॥

মূল—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর-বেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশং ॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুং ॥
বহুমনুতে ননু তে তনু সঙ্গত পবন চলিতমপি রেণুং ॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং ॥
মুখর মধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলং ॥

অনুবাদ—

যমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া বনমালী।
কর অভিসার, করি রতিরস মদন-মনোহর বেশে।
গমনে বিলম্বন না কর নিতম্বিনি চল চল প্রাণনাথ পাশে ॥
তুয়া নিজ নাম শ্যাম করি সঙ্কেত বাজায় মুরলী মৃদু ভাবে।
তুয়া তনু পরশি ধুলি রেণু উড়ত তাতে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে ॥
উড়ইতে পক্ষী বৃক্ষদল বিচলিতে তুয়া আগমন হেন মানে।

দ্রুতগতি শেষ করত, পুনঃ চমকই নিরখত তুয়া পথ পানে ॥
শবদ-অধীর নুপুর দূরে রিপুর সদৃশ রতিরঙ্গে।
অতি তমপুঞ্জ কুঞ্জবনে সখি চল, নীল ওড়নি নেহ অঙ্গে ॥

স্বীকার করিতে হয়, এ অনুবাদ প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর।
অন্য ছন্দও একটু দেখাই—

মূল—

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে।
তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপু-তনু ভৃঙ্গং
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

অনুবাদ—

তব দন্ত অগ্রে ধরণী রয়
যেন চন্দ্রে লীন কলঙ্ক হয়
জয় জগদীশ হরি, অদ্ভুত শূকররূপ ধরি।
হিরণ্যকশিপু ধরিয়া করে
দলিলে ভৃঙ্গের মত নখরে
জয় জগদীশ হরি, অদ্ভুত নরহরিরূপ ধরি।

এ গুলি গেল গানের অংশ, শ্লোকের অনুবাদও একটি দেখাই,—

মূল—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥

অনুবাদ—

মেঘ আচ্ছাদিলা সব গগনমণ্ডলে। মেঘাবৃত চন্দ্রমা হৈয়াছে সেই কালে ॥
বনভূমি তমালের বর্ণ সর্ব্বস্থানে। শ্যাম হইয়াছে—কেহ নাহি জানে ॥

যদি বল মনুষ্যের গমনাগমনে। যেমনে চলিবে তার শুন বিবরণে॥
অন্ধকারে অভিসরি বেশভূষা করি। চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি॥
আনন্দে নিদেশ লভি চলে দুই জন। প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জলীলা করে বিহরণ॥
অশ্বকুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করে। চলিলেন বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহারে॥
প্রিয়া মিলনের ইচ্ছা জানি সেই কালে। মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলে॥

আমরা রসময় দাস কৃত অনুবাদেরও কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইব। সহজ সরল অংশই একটু উঠাই। এই প্রবন্ধের আদ্যভাগে উদ্ধৃত ইংরাজ-কবি Edwin Arnoldর অনুবাদ টুকু পাঠকবর্গের মনে পড়িবে :—

মূল—

চন্দন-চর্চ্চিত-নীল কলেবর পীতবসন বনমালী।
কেলি-চলন্মণিকুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ডযুগ স্মিতশালী॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে।
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে
পীনপয়োধর-ভার ভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত পঞ্চম-রাগং॥
কাপি বিলাস-বিলোল-বিলোচন খেলন-জনিত মনোজং।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদন বদন-সরোজং॥
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে॥
কেলিকলা-কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনা বনকূলে।
মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে॥
করতল তাল-তরল-বলয়াবলি কলিত-কলস্বন বংশে।
রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে॥

অনুবাদ—

চন্দনচর্চ্চিত সব নীল কলেবর। পীতবস্ত্র বনমালা অতি মনোহর॥
কেলিপরে গলে দোলে মণির কুণ্ডলে। মণ্ডিত হইয়া পুনঃ হাসির হিল্লোলে॥
পীন পয়োধর ভার ভরে গোপনারী। হরি-পরিরম্ভণেতে অনুরাগ করি॥
কোন গোপবধূ করে সঙ্গে একতান। উঠায়ে পঞ্চমরাগ কেহ করে গান॥

কেহ রাস-বিলাস-বিলোল বিলোচন। জন্মিয়াছে অনঙ্গজ খেলা বিবর্ত্তন॥
কোন মুগ্ধ-বধূ কৃষ্ণ-বদনারবিন্দ। ধ্যান করি অধিক বাড়িছে সুখবৃন্দ॥
কেহ কেহ কপোলতলেতে হাত দিয়া। শ্রুতিমূলে মুখ দিল চুম্বন করিয়া॥
কিমপি কহিব বলি চারু চুম্ব দিল। সেই নিতম্বিনী পুনঃ পুলকে ভরিল॥
কোন গোপী কেলি-কলা-কৌতুকিনী হৈয়া যমুনার জলে যায় কৃষ্ণে আকর্ষিয়া।
মঞ্জুল বেতসকুঞ্জ মধ্যে কৃষ্ণে আনি। পীতাম্বর ধরিয়া কর্ষয়ে নিতম্বিনী॥
কিছু বাক্য আছে তাহা কহিব নিভৃতে। কৃষ্ণসহ নিজে সুখে বিহার করিতে॥
করতল তালি সুবলিত কোন নারী। তরল বলয়শ্রেণী সুখে নৃত্য করি॥
কলিত বংশীর সহ কলস্বন গীত। রাস-রস সহ নৃত্য কৃষ্ণ প্রশংসিত॥

গীতগোবিন্দের আরও একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ (প্রাচীন) আছে, কিন্তু থাক্, আর বোধ হয় পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। একটি কথা বলিয়া লই;—গীতগোবিন্দের সংস্কৃত টীকা ৪।৫ খানি আছে; টীকাগুলির সব পৃথক পৃথক নাম; তন্মধ্যে 'গঙ্গা' নামক টীকাখানিতে সমগ্র গীত-গোবিন্দের শিব-পক্ষে ব্যাখ্যা আছে! শিব-পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টীকাকার পণ্ডিতকে অনেক স্থলেই কষ্টকল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাহাতে 'রাধা' শব্দের অর্থ আদ্যাশক্তি দুর্গা; 'নন্দ' অর্থে নন্দী, ইত্যাদি। গীতগোবিন্দের আধ্যাত্মিক অর্থের কথা পূর্ব্বে শুনাইয়াছি, এই আর এক কথাও জানিয়া রাখিতে দোষ নাই। শ্রীমধু-সূদন নামক টীকাকার প্রসিদ্ধ শিবস্তব 'মহিম্ন স্তোত্রের' কৃষ্ণপক্ষে অর্থ করিয়াছিলেন, শৈবগণও কৃষ্ণস্তুতি আপনার করিয়া লইতে ছাড়েন নাই। হরি ও হরের ভেদ-জ্ঞান ঘুচানই বোধ হয় এই কোবিদগণের উদ্দেশ্য। যাহা হউক আমরা ভক্ত কবির আপনার বাণীতে বলি—

শ্রীজয়দেব ভণিত হরি রমিতং।
কলিকলুষ জনয়তু পরিশমিতং॥

জয়দেব ভণিত হরি-চরিত্র সকল।
কলুষ করিয়া নাশ করুক মঙ্গল।

কলি-যুগ-কলুষ করিয়া সব নাশ।
শ্রবণাদি করি চিত্তে হউক প্রকাশ॥

অনুবাদ-শাখায় আমরা আর একখানি পদ্য-গ্রন্থের নাম গ্রহণ না করিয়া শেষ করিতে পারি না। ব্রহ্মভাষায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'থাড়ু-থাঙ' পুস্তকে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে নির্ব্বাণ-তত্ত্ব প্রচার পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত আছে। নীলকমল দাস নামক জনৈক বঙ্গীয় কবি এই পুস্তকের একখানি পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন; নাম দিয়াছেন—'বৌদ্ধ-রঞ্জিকা'। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা ধর্ম্মবক্সের প্রধানা মহিষী রাণী কালিন্দীর আদেশ ক্রমে এই পুস্তক বিরচিত হয়। রচনার সময় জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু এ গ্রন্থের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা একশত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত বোধ হয় এই খানিই একমাত্র। বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার সামগ্রী বলিয়াই আমরা এই কাব্যের নাম করিলাম, নহিলে গ্রন্থমধ্যে কবির কবিত্ব-পরিচায়ক তেমন কিছুই নাই। ইহার আত্ম-পরিচয়—

শ্রীমতী কালিন্দী রাণী ধর্ম্মবক্স রাজরাণী
পুণ্যবতী সুশীলা মহিলা।
তান আজ্ঞা অনুবলে দাস শ্রীনীলকমলে
এ বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রকাশিলা॥

প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের অনুবাদ-শাখা যে নানামুখী হইয়াছিল, তাহা প্রমাণার্থ আমরা আর যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রচিত "গৌরীমঙ্গল" নামে একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—পাকুড়রাজ পৃথ্বিচন্দ্র বিরচিত। ইহার মধ্যে তৎকালে পরিজ্ঞাত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কতক ইতিহাস আছে,—

সত্য যুগে বেদ-অর্থ জানি মুনীগণ। সেই মত চালাইলা সংসারের জন॥
ত্রেতা যুগে বেদ-অর্থ জানিতে নারিল। তেকারণে মুনীগণ পুরাণ রচিল॥

অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল। দ্বাপরে মনুষ্যগণ ধারণে নারিল ॥
স্মৃতি করি মুনীগণ সংগ্রহ করিল। কলিযুগে লোকে তাহা বুঝা ভার হৈল ॥
মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মণ ॥
বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে। জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে ॥
বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস। মনসা-মঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত কৈল শ্রীকবিকঙ্কণ। কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন ॥
ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান। চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈষ্ণব বিজ্ঞান ॥
বৈষ্ণবের শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল। অন্নদা-মঙ্গল ভাষা ভারত করিল ॥
মেঘ ঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা। শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা ॥
অষ্টাদশপর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ ॥
চোর চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি ভাষায় করিল। বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার রচিল ॥
দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঁচালী কবিল। কবিচন্দ্র চোর কবি ভাষায় হইল ॥
গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানী-মঙ্গল। কিরীট-মঙ্গল আদি হইল সকল ॥
এ সকল গ্রন্থ দেখি মন আশা হৈল। গৌরীমঙ্গলের পুঁথি ভাষায় রচিল ॥

এই কয় ছত্র হইতে বুঝা যাইতেছে—স্মৃতি, বৈদ্যক, জ্যোতিষ প্রভৃতি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেরও প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। রাধাবল্লভ শর্ম্মার প্রণীত স্মৃতি-গ্রন্থ, শিবরাম গোস্বামীকৃত 'তড়িতের পাতা' —ভক্তিলতা, চোর চক্রবর্ত্তী প্রণীত পয়ার ছন্দে বিক্রমাদিত্য-চরিত, গঙ্গানারায়ণ রচিত ভবানী-মঙ্গল এবং কিরীটি-মঙ্গল প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। একশত বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত—এই গৌরীমঙ্গল রচনা কাল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও সেগুলি বিদ্যমান ছিল। অনুসন্ধান করিলে পুনঃপ্রাপ্তি অসম্ভব নহে। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের পুনরুদ্ধার-ব্রতী সাহিত্যিকগণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এই অংশ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আর এক খানি কাব্যের উল্লেখ করিতে আমি ন্যায়তঃ বাধ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি দ্বিজ-রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এক খানি কাব্য রচিত হয়—নাম "মাধব-মালতী"; সংস্কৃত সাহিত্যে মালতী-মাধব নামে নাটক না থাকিলে এ গ্রন্থের বোধ

হয় সেই নামই হইত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুঁথির গুণ-গ্রাহী সমালোচক মহাশয় এই কাব্যখানি পুনঃপ্রকাশের যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যের গ্রন্থসূচনার কয়েক ছত্র এই—

মহারাজ নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী। তাঁহার বর্ণনা আমি কি রূপেতে করি॥
আরোপিত কথনের নাম হয় গুণ। সে সব বর্ণনা হবে নাহে অসম্ভব॥
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম। সেই মত তাবৎ ইঁহার দেখি কর্ম্ম॥
তাঁর ছিল নব রত্ন ইঁহার সেরূপ। সভাস্থলে কিবা কব নিকে বনরূপ॥
সাক্ষাৎ বরদা-পুত্র নামে জগন্নাথ। তর্কপঞ্চানন রূপে ভুবনে বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর ভুবনে শঙ্কর। বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিবরাম পসতুরে ও সাথ কৃপারাম। শান্তিপুরে বাস গোঁসাঞি ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদে। আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদে॥
মান্যের কি কব যার উজীরের পদ। হুকুম আছিল যার করিবারে বধ।
বিলাতের বাদসাহ করিলা সম্মান। গবর্ণরের বাবে যিনি সদা চৌকি পান॥
অধিকার হাতেগড় গঙ্গামণ্ডলাদি। জন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী॥
রূপের তুলনা নাই মানে গোষ্ঠীপতি। যুদ্ধ বিনা কর্ম্ম নাই তাঁহার সন্ততি॥
তাঁর পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ। কি কব তাঁহার গুণ ন শ্রুত ন দৃষ্ট॥
পিতা তুল্য মান্যবান তাবৎ কর্ম্মেতে। বিশেষ তাঁহার গুণ দয়ার ধর্ম্মেতে॥
দেওয়ান বঙ্গালের যেবা ছিল ঘাটি। কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটি॥
তাঁর পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম। নবীন প্রবীন যিনি সর্ব্ব গুণধাম॥
আদ্যাশক্তি কমলার ... বিশেষ। কবি রামচন্দ্র প্রতি করিলা আদেশ॥

কলিকাতার পাঠকমণ্ডলীকে বোধ করি জানাইয়া দিতে হইবে না যে এই "মহারাজ নবকৃষ্ণ" শোভাবাজার রাজবংশের আদিপুরুষ। যে সাহিত্য-সভা হইতে এই নগণ্য সংগ্রহ—"বঙ্গের কবিতা"—প্রকাশিত হইতেছে, সেই সভার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তিনি প্রপিতামহ।

(৩)

এইবার আমরা বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের আর এক শাখার দিকে দৃষ্টি ফিরাইব—লৌকিক ধর্ম্মোপাখ্যান শাখা।

স্বনামপ্রসিদ্ধ মহারাজা আদিশূর পূর্ব্ববঙ্গের অধিপতি ছিলেন; পশ্চিমবঙ্গের বা গৌড়ের অধিপতি বৌদ্ধ পাল-বংশীয় ভূপতিকে পরাজিত করিয়া তিনি পূর্ব্বপশ্চিম উভয় বঙ্গের অধীশ্বর হয়েন। গৌড়েশ্বর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবেন, দেশে আচার-নিষ্ঠ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না! তখন বঙ্গের এমনই অবস্থা! বঙ্গদেশ বা গৌড়মণ্ডল তখন বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত! সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার সংবাদ মিলে; সমগ্র গৌড়মণ্ডলে মাত্র সাতশত ঘর—অধিক নহে। কিন্তু এই সপ্তশত পরিবারের মধ্যেও রাজাকে যজ্ঞ করাইতে পারে, এমন ব্রাহ্মণ মেলা দুর্ঘট হইয়াছিল। অগত্যা বঙ্গাধিপকে কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিতে হয়। ইহা প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। এই সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কবিতাদি রচনার সংবাদ আমরা পাই। সময়টা কেমন আভাস পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং এই সময়ের রচনায় বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন কিছু কিছু থাকিবেই। কিন্তু দেশের রাজা হিন্দু; দেশের লোকের ধর্ম্ম বৌদ্ধ-হিন্দু-মিশ্র বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় দাঁড়াইয়াছে। রাজার উৎসাহে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। নানাবিধ নির্য্যাতনে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু দেশের ধর্ম্মে ও সাহিত্যে আপনার ছাপ অঙ্কিত করিয়া গেল।

আমরা কানুভট্টের নাম করিয়াছি। কানুভট্ট দশম শতাব্দীর শেষভাগে বিরাজ করিতেন। কানুভট্ট বাঙ্গালী ছিলেন; যে ভাষায় তিনি

পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা অতি প্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা। সেই সমস্ত কবিতা প্রেম-সম্বন্ধীয়; তন্মধ্যে বামাচারী বৌদ্ধগণের নারীপূজার ভাব বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানকালে "সহজিয়া" নামে যে মত বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত, এবং চণ্ডীদাস কবিকে যে মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া আমাদের ধারণা, তাহা এখন বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের উদ্ভাবিত বলিয়া জানা যাইতেছে।

জানি না সর্ব্বপ্রাচীন বৈষ্ণব-কবিগণের বিহারাদি সম্বলিত গান, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্ম্মের ম-কার বিশেষে নিমজ্জিত-প্রাণ বঙ্গবাসীকে তাহাদেরই সাধন-মার্গ দিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অনুরাগী করতঃ হিন্দুত্বে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস কি না।

বঙ্গভাষার আদি-যুগের রচনায় আমরা বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রচারও দেখিতে পাই—

নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্হা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আবর॥
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার।
দস দিক্‌পাল নহি মেঘ তারাগণ।
আউ মিত্তু নহি ছিল জমর তাড়ন॥
সুন্নত ভরমণ পরভুর সুন্নে করি ভর।

(শূন্যপুরাণ)

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত। বঙ্গীয় কাব্যের প্রথম যুগের রচনার নমুনা এই। এই উক্তি মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শূন্যবাদ-মূলক।

সাময়িক গান-গল্প হইতে কিঞ্চিৎ দেখাই। (বলা বাহুল্য, নিম্নোদ্ধৃত রচনার ভাষা পরবর্ত্তী কালে মার্জ্জিত হইয়া আধুনিকত্ব লভিয়াছে)—

প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম্ম আদ্যের গোসাঞি।
যার অগোচর কিছু ত্রিভুবনে নাঞি॥
যোগসিদ্ধ হাড়ি পা কানুফা গোক্ষ মীন।
সাত সিদ্ধ অবতার গৃহ বাস হীন॥
ধর্ম্ম অবতার হৈল সিদ্ধ সাত জন।
গুরু শাপে হাড়ি পা যান পাটিকা ভুবন॥

(গোবিন্দচন্দ্রের গীত)

এই সিদ্ধগণ বৌদ্ধাচার্য্য বা ধর্ম্মের পাণ্ডা।

গোবিন্দচন্দ্রের গীত বা গোপীপালের গান বহু প্রাচীন। গোবিন্দ পাল বঙ্গের শেষ পাল-রাজাগণের অন্যতম। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার লোক। (এই সময়কার "মাণিক চাঁদের গান" "ময়নামতীর গান" গীতি-শাখায় আমরা পরে শুনাইব)। এ সমস্ত গান; এই জাতীয় কাব্য ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি বা ধর্ম্মমঙ্গল নামে খ্যাত। ধর্ম্মমঙ্গল অনেকগুলি আছে। নানা কারণে আমরা এই শ্রেণীর কাব্যের বিশেষ পরিচয় এখন দিব না, অল্পস্বল্প উঠাইব। ইহার মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রচিত কবি ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যখানি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং ইহার শ্লোক-সংখ্যা ৯১৪৭। এই গ্রন্থ হইতে আমরা একটু বীভৎস রসের নমুনা দেখাই—

পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী। নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি॥
ফড়া কড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী। কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি॥
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ ধরে তুল। কেহ চাখে কেহ ভখে কেহ করে মূল॥
রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা। বহে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা॥
মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি। যাচিয়া যোগায় যত যোগিনীর ঝি॥
খর্পর পুরিয়া কেহ নিবারিছে ক্ষুধা। চুমুকে রুধির পীয়ে সম তার সুধা॥
কাঁচা মাংস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে। মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে॥
দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়। মোয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড়॥

হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে। লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাসে॥
পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট। মরা মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট॥
ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ড দানা। হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কালুরায় নামক ধর্ম্মদেবতার স্বপ্নাদেশে রচিত আর একখানি ধর্ম্মমঙ্গল হইতে কিছু প্রহেলিকাত্মক কবিতা শুনাই—ইহার কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী।—

গুরুদেব নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল পর্ব্বত ভাসিয়া যায়॥
গুরু হে বুঝহ আপন গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল পল্লব মুঞ্জরিল পাষাণ বিঁধিল ঘুণে॥
হের দেখ বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচল চর্ম্ম মণ্ডিত করিয়া ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥
শিল নোড়াতে কোন্দল বাধিল সরিষা ধরাধরি করে।
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল পুঁই শাক হাসিয়া মরে॥
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল ছেলে চায় পায়রার দুধ॥
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু বাঁকড়া ধরিল কাছি।
মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥
আগে নৌকা উড়িল পশ্চাৎ পুড়িল মাঝে বায় উড়িল ধূলা।
সরিষা ভিজাইতে জলবিন্দু নাই ডুবিল দেউল চূড়া॥
বাঘে বলদে হাল জুড়িনু মর্কট হইল কৃষাণ।
জলের কুম্ভীর গড়া ঝাড়ি গেল মুষিকে বুনিল ধান॥
তালের গাছে সোলের পোণা সয়তান ধরিয়া খায়॥
সাগর মাঝে কই মৎস্য মুড়লি পঙ্গু পলই লয়্যা ধায়॥
মধ্য সমুদ্রে দুয়াড়ি পাতিনু সাজিকি পড়ে ঝাঁক ঝাঁক।
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল হরিণী পলায় লাখে লাখ॥
তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু আঁধার কৈল পুরী।
সহদেব গায় ভাবি কালুরায় শরীর বর্ণন চাতুরী॥

সিদ্ধ সাধু মীননাথ রমণী-নিক্ষিপ্ত জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, এই অবস্থায় শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া এই প্রহেলিকাময় কবিতাদ্বারা তদীয় চৈতন্য সঞ্চার করিতেছেন !

কবি মাণিক গাঙ্গুলি রচিত একখানি প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল হইতে ধর্ম্মের বন্দনা শুনাই—

বন্দ নিরঞ্জন সৃজন পালন দেবতার চূড়ামণি ।
তোমার মহিমা অপার অসীমা কি বর্ণিতে আমি জানি ॥
তান রাগ মান না জানি কেমন সকলি তোমার ঠাঁই ।
অতি জ্ঞানহীন তায় অভাজন আমারে ত্যজিও নাই ॥
দেবতা কিন্নরে পশু পক্ষী নরে সকলে সমান দয়া ।
উরহ আসরে রক্ষ নায়কেরে দেহ চরণের ছায়া ॥
কৈলাস শিখর ত্যজি একবার কণ্ঠে হও অধিষ্ঠান ।
আপনার গুণ শুনহ আপন প্রভু দেব ভগবান ॥
তুমি পরাৎপর বিষ্ণু মহেশ্বর কে আছে তোমার পর ।
তুমি কৃত্তিবাস অনন্ত আকাশ তুমি সূর্য্য শশধর ॥
ইন্দ্র আদি দেব তোমার বৈভব তুমিই দিবার বিধি ।
তুমি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অব্যয় নাহি জন্ম জরা আদি ॥
ধবল আসন ধবল ভূষণ ধবল চন্দন গায় ।
ধবল অম্বর ধবল চামর ধবল পাদুকা পায় ॥
পরম সাদরে পূজিলে তোমারে ধন পুত্র লক্ষ্মী পায় ।
মনের আঁধার ঘুচে সবাকার আপদ দূরেতে যায় ॥
মার্কণ্ডেয় মুনী কহে কটু বাণী ধবল হইল অঙ্গে ।
বল্লুকার তীরে পূজিল তোমারে নানা বাদ্য গীত রঙ্গে ॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে অবনী লোটায়ে কহিল কাতর বাণী ।
হলে অনুকূল ব্যাধি দূরে গেল আনন্দিত মহামুনী ॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা সর্ব্বগুণে তেজা দানেতে কর্ণ সমান ।
অকাতর হয়ে তোমারে পূজিয়ে পুত্র দিল বলিদান ॥
কাতর কিঙ্কর ডাকে বার বার মনে বড় কষ্ট পাই ।

হইয়া সদয় শত্রু কর ক্ষয় প্রভু বাল্লার সখাই ॥
মনে অভিলাষ রচি ইতিহাস তোমার আদেশ পেয়ে।
অনুকূল হবে সমাপ্ত করিবে চরণের ছায়া দিয়ে ॥
অজ্ঞান কুমতি কি জানি যে স্তুতি নিবেদি তোমার পায়।
তোমার চরণ করিয়া স্মরণ দ্বিজ শ্রীমাণিক গায় ॥

এক আধটি কথা বদল করিলে স্পষ্ট শিব স্তুতি মনে হয়।

কবি ধর্ম্মকে নমস্কার করিয়াছেন—

"উলুকং বাহনং ধর্ম্মং কামিন্যা সহিতং শিবং।
ধৌত-কুন্দেন্দু ধবল-কায়ং ধ্যায়েদ্ধর্ম্মং নমাম্যহং ॥"

ধর্ম্মঠাকুর ও শিবঠাকুরে বড় বেশী তফাৎ থাকে না। *

ধর্ম্মের গাজন ও শিবের গাজন একই প্রকার।

মালদহ অঞ্চলে অদ্যাবধি প্রচলিত "গম্ভীরা উৎসব" উভয়ের সমন্বয়।

প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যে ধর্ম্মঠাকুর ক্রমে শিবঠাকুরে পরিণত হইয়াছেন—ইহা অনেক সুধীজনের বিশ্বাস। ধর্ম্মঠাকুরের গান ভাঙ্গিয়া এদেশে ছোট-ঘরে স্ত্রীলোকগণ ধান ভানিবার সময় শিবের ছড়া গাহিত।

এই শিবের ছড়ায় শিবঠাকুর ক্ষেতের মশা ও জোঁক তাড়াইবার উপদেশ দিতেছেন দেখা যায়। বঙ্গের প্রাচীন কবিগণ দেবদেব মহাদেবকে হল-কোদাল-হস্ত বলীবর্দ্দ-লাঙ্গুলমর্দ্দী গড়িয়া তাঁহার দ্বারা তুলা মূলা কাপাস বুনাইয়া লইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তিম সময়ে বঙ্গদেশে ঠাকুর দেবতারা ক্ষেতের কাজে নিবিষ্ট থাকিয়া গোলাদার চাষা হইয়া পড়িয়াছেন দৃষ্ট হয়। ক্রমে অবশ্য পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রচারে তাঁহারা কাব্য-আসরে সভ্য ভব্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

---

* স্থলে স্থলে ধর্ম্মঠাকুরকে "বৈকুণ্ঠেশ্বর" বলিয়া বন্দনাও আছে—কখন বা তিনি "আদিদেব নিরাকার"। ধর্ম্মমঙ্গলে পৌরাণিক নানা দেবতার আখ্যান আছে, ধর্ম্মদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই সময়ে—সহস্রবর্ষ পূর্ব্বকালে—গৌড়মণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপ খর্ব্ব হইতেছিল, শৈব মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। প্রজাসাধারণ বৌদ্ধ ও শৈব দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—মিশামিশি চলিতেছিল, শিবায়ণ ও ধর্ম্মমঙ্গলাদি কাব্য হইতে বুঝা যায়।

ধর্ম্মমঙ্গল বৌদ্ধধর্ম্মের হিন্দু সংস্করণ বলিলেও চলে। অধিকাংশ ধর্ম্মমঙ্গলে হিন্দু দেবদেবীর বন্দনাদিও আছে। আমরা বুঝিতে পারি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ভদ্রসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া ডোম হাড়ী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির আশ্রয়ে মাথা গুঁজিবার স্থান করিয়া লইয়াছে। সেখানে ক্রমে বিকৃতভাব ধারণ করিয়া "ধর্ম্মপূজা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ধর্ম্মপূজার ভিতর হিন্দু দেব-দেবতার কেহ কেহ আছেন—হীন বর্ণে রঞ্জিত। শিব ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। এই ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট "ময়নামতীর গানে" দেখিতে পাওয়া যায়,—

> "কচু বাড়ী দিআ বুড়া শিব জাএ পলাইআ।
> ঢোলা ব্যাঙের মতন মএনা নিগাএ নেদিআ।"

ধর্ম্মপূজার ন্যায় চড়কপূজা ও শিবের গাজন আজিও ছোটলোকের মধ্যেই আবদ্ধ।

ধর্ম্মমঙ্গলের অপ-শিব আদর্শেই প্রাচীন শিবায়ণগুলির শিবঠাকুর চিত্রিত মনে হয়। শূন্যপুরাণের শিবের সহিত প্রাচীন আদর্শে গঠিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক রামেশ্বর কবি রচিত শিবায়ণের শিবের সাদৃশ্য খুব বেশী। এই শিবঠাকুর শুধু চাষা নহেন, শাঁখারীও সাজিয়াছেন। কোন কোন শিবায়ণে "বাগ্‌দিনীর পালা" নামক অংশে পার্ব্বতীর বাগ্‌দিনী বেশে শিবকে প্রতারণার চেষ্টা, মহাদেবের বাগ্‌দিনীর প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি যে সকল কুৎসিত চিত্র আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, সে সব বর্ণনা শিবায়নের বা শিবের গানের প্রাচীনত্বেরই জ্ঞাপক; তখন সমাজ ও সাহিত্য অত ভব্যতার ধার ধারিত না। (আর এক-

খানি প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যে ভগবতীর ডোমিনীরূপে শিবকে প্রতারণা করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়।)

মালদহের প্রসিদ্ধ "গম্ভীরা" গান হইতে প্রাচীন শিব-বন্দনার ঈষৎ নমুনা দেখাই—

বোবাই ধান ভাই লাগ্যাছে।
বুঢা ক্যান বা দোরা আয়্যাছে॥
(বুঝি) পুশে কোল্যাসে যায় দেখ্যা বুঢা লাজ্যা সাটাং দিয়্যাছে।
খালবোৎ নামজ্যা আয়্যাছে॥
বুঢার মাট্কির মোতন প্যাট্টা
মাথাং কতই গহন জ্যাপটা
ফের ফোয়্যা আছে স্যাংটা
বুঢা কতুই ক্যাকম ধরাছে।
এবার দিন বাবত কতো খাট্যা
কোরল্ল আলুগ্যা উসনা চালট্যা
বুঢা এমনি বে ভাই পালল ঠ্যা
দেখ্যা খাইতে আয়ল লুঠ্যা
মোন হয় কবি ৬র্কা পিট্যা
যা না, যেদ্যাশে লোক্কি গিয়্যাছে।
যারা চাকরি বাকরি কর্যা
ব্যারায় দ্যাস বিদ্যাশে ঘুর্যা
তারখে ধর গা না তুই ত্যারা
তোকে খাওযাবে প্যাট ভোর্যা
তারা ম্যালাই ট্যাকা উর্যাছে॥

গানটী নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় রচিত; বোধ হয় অনেকের অর্থগ্রহ পক্ষে অসুবিধা হইবে, ইহার ভাবার্থ এই—

ভাই বোরা ধান লাগান হইয়াছে, বুড়া কেন দৌড়িয়া আসিয়াছে? বোধ হয়, তাহাই দেখিয়া কৈলাস হইতে সটান দৌড়িয়া আসিয়া মালদহে

নামিয়াছে। বুড়ার পেটটা যেন মটকির মত, মাথায় গঙ্গা ফুলিয়া আছে, আবার তাহার উপর বুড়া ন্যাংটা হইয়া আছে, বুড়া কতই রূপ ধরে! এবার দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া আশুধান উৎপন্ন করিয়াছি, বুড়া এমনি পেটুক যে তাহা দেখিয়া লুটিয়া খাইতে আসিল! আমার ইচ্ছা হইতেছে যে উহাকে হুড়কা-পেটা করি। অরে বুড়া, যে দেশে লক্ষ্মী গিয়াছে, তুই সে দেশে যা না। যাহারা চাকুরি বাকুরি করিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, তুই তাহাদিগকে তাড়াইয়া ধরিতে যা না। তাহারা তোকে পেট ভরিয়া খাওয়াইবে, তারা যে বিস্তর টাকা উড়াইয়া দিতেছে।"

ইহার নাম বন্দনা! হিন্দু নামে পরিচিত ভক্তের হস্তেও যোগীন্দ্র পরমেশ্বরের কি বিরাট দুর্গতি!

আমরা প্রাচীন আদর্শে রচিত শিবের একটি চিত্র দেখাই—

ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈশান বলে ভাল। চারি দণ্ডে চৌদিক চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান। হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বারটি বারঠে ঢেকুড়ার ঝড়াউড়ি। গুনা মুথি পাতি মারে পুতে যায় নুড়ি॥
দল দুর্ব্বা সোনা শ্যামা ত্রিশিরা কেশুর। গড়গড় নানা ঘড় উপাড়ে প্রচুর॥
থর থর খুজিয়া খড়ের ভাঙ্গে ঘাড়। কুসি করি ধাইল ধান্যের ধরে ঝাড়॥
কিতা জুড়ে ভিতা বেড়ে মাঝে গিয়া রয়। উলট পালট করে বার পাঁচ ছয়॥
এইরূপে সেই কিতা সারে চটপট। কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সটসট॥
বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া। সাৰ্দ্ধি যামে সারে উঠে শত শত কুড়া॥

উদ্ধৃত অংশটী খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত শূন্যপুরাণের শিব-চিত্রের অংশ বিশেষের সহিত খুব মিলিয়া যায়।

তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন কাব্য শঙ্কর-কবির "বৈদ্যনাথ-মঙ্গল," দ্বিজ ভগীরথের "শিবগুণ-মাহাত্ম্য", প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি রতিদেব ও রঘুনাথ রায়ের "মৃগলুব্ধ", রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের "শিবায়ন" পাওয়া গিয়াছে; সবই এই জাতীয় কাব্য।

সম্ভবতঃ আরও অধিক প্রাচীন কাব্য ছিল, সে গুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বটতলার আশ্রয় লাভ করতঃ অপেক্ষাকৃত আধুনিক (প্রায় দুই শত বৎসরের পূর্ব্বতন) রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের রচিত "শিব-সঙ্কীর্ত্তন" খানি বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছে।

একটি প্রাচীন গাথা শুনাই—

সভ সঙ্গে রস রঙ্গে বৈসেছেন ভবানী। বিনয়ে বলে কুতুহলে শুন সকল বাণী ॥
তুমি ত শুইয়ে, আমি ত মেয়ে, থাক রাত্রি দিনে।
তোমার কপালে পড়ে, আমার সাধ নাইকো পুরে ॥
রুপা সোণা অলঙ্কার না পরিলাম গায়ে।
শিবায় মরে দেবের মাঝে। হাত বাড়াতে মরি লাজে ॥
হাত বাড়াতে নারি। দুহাতে দুগাছি শঙ্খ দেহ পরি ॥
হাসিয়ে হর বল্‌ছে শুন হে শঙ্করি।
আমি কড়ার ভিখারী ত্রিপুরারি শঙ্খ পাব কথি।
আমার সম্বল সিদ্ধি-ঝুলি আর বাঘের ছালা।
এক ডম্বরু হাতে শিঙ্গা গলায় হাড়ের মালা ॥
আমি তৈল বিনে ভস্ম মাখি অন্নাভাবে সিদ্ধি।
বস্ত্রাভাবে বাঘ-ছাল কোমরেতে বান্ধি ॥
এঁড়ে বলদের দাম রে কাহন টেক কড়ি।
সে না বেচ্‌লে হবে গৌরীর একগাছি শঙ্খের কুটি।
গৌরী মেয়ে স্বতন্তরা কেবা শুণ্‌তে পারে।
আপনি পরগা শঙ্খ মানা নাইকো মোরে ॥
তখন ভোলানাথকে গৌরী দিচ্ছেন গাল।—
দেবতা হয়ে কেবা করে শ্মশান বসতি।
দেবতা হয়ে কেবা মাখে ভূষণ বিভূতি।
দেবতা হয়ে কেবা যায় কুচনীর পাড়া।
দেবতা হয়ে কেবা হয় পর-নারী-হরা।
থাক্ রে ধুচনীর পুত কুচনীর মাথা খেয়ে।
ক্রোধ করে যাব কাল দুটি বাছাকে লয়ে ॥

কোলে নেন কার্ত্তিক হাঁটনে নেবুদ্দর। ক্রোধমুখে যাচ্চেন গৌরী মা বাপের ঘর ॥
অষ্ট সখী মেনকা লয়ে বসেছেন আপনি। কোথা হতে এলেন মা ভবানী ॥
তখন বিশ্বেশ্বর করেন অনুমান। বিশাইকে ডাকে করান শঙ্খের নির্ম্মাণ ॥

মধুল মধুল চিড়ল দাঁত।
মহাদেব শাঁখারীর রূপ ধরিলেন আপনি।
শঙ্খের ঝুলি কান্ধে করে যান ধীরে ধীরে।
শঙ্খ নেবে শঙ্খ নেবে এ কথাটি বলে ॥

ও শাঁখারি আমি নেব শঙ্খ। এ শঙ্খের কত নেবে টঙ্ক ॥

এ শঙ্খ পরগা তুমি উচিত বলে মনে।
এ শঙ্খে আছে হীরা মুক্তা ঝালর গাঁথা।
শঙ্খের নাম শুনিয়ে মহামায়ার আকুল হল চিত্তি।
তৈল জলে হস্তে করে বের হলেন ভবানী।
তৈল জলে হস্ত মলেন ঠাকুর পশুপতি।

এক গাছি করে শাঁখা পরান, শাঁখারী মন্তরটি করেন সার।

মহামায়ার হাতের শঙ্খ না বের হয় আর ॥
গৌরীর হাতের শঙ্খ বজ্রের কিরণ।
এখন না হয় গৌরীর দানের আড়ম্বর।

ও শাঁখারি সাবধান হয়ো। এ সকল কথা মানুষ বুঝে বলো।

কোথা গেলি পদ্মা আমার কথা শুন্—
কিছু দশ পনর টাকা লয়ে শাঁখারীকে বাড়ীর বাহির কর্।
টাকা নাহি নিব পদ্মা কড়ি নাহি নিব।
এ শঙ্খের বদলে এক রাত্তি বাসরে বঞ্চিব ॥

ভাব, ভাষা, ছন্দ, মিল—সকলই প্রকাশ করিয়া দেয় রচনাটী প্রাচীন। এই উপাখ্যানই পরবর্ত্তী কবির হস্তে মার্জ্জিত হইয়া কি আকার ধারণ করিয়াছে—প্রথমাংশটুকু দেখাই; ইহা হইতে বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশও বুঝা যাইবে—

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য কিছু অনুপ্রাস-প্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার

ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। *—শিবায়ণে—শঙ্খ পরিধানের উপাখ্যান—

হৈমবতী হর-পাশে হাসে মন্দ মন্দ।
কান্ত সনে করিয়া কথার অনুবন্ধ ॥
প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে।
রঙ্গিনী সে রঙ্গনাথে শঙ্খ দিতে বলে ॥
গদ গদ স্বরে হরে করে কাকুবাদ।
পূর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাধ ॥
দুঃখিনীর হাতের শঙ্খ দেও দুটি বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাহি চাই ॥
লজ্জায় লোকের কাছে লুকাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই ॥
তুনাড়াটি পারা দুটি হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর ॥
পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে।
তখন তুলিয়া তাঁরে ত্রিলোচন বলে ॥
শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈল-সুতা।
অভাগার ঘরে ইহা অসম্ভব কথা ॥
গৃহস্থ গরীব যার সাত পেটে টানা।
সোহাগে মাগীর কাণে কাটি কড়ি সোণা ॥
ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
মিছে মরে জল খেটে মাগী মাগে শাখা ॥
তেমনি তোমার দেখি বিপরীত ধারা।
রহিতে আমারে ঘরে নাহি দিবে পারা।
অর্থ আছে আমার আপনি যদি জান।
স্বতন্তরা বট শঙ্খ পর নাই কেন ?
নিবারিতে নাহি কেহ নহ পরাধীন।
তাক্ত কেন কর মিছা কহ সারাদিন ॥
মহেশের মন জান মহত্তের ঝি।
আপনি ত অন্তর্যামি আমি কব কি ॥
বুড়া বৃষ বেচিলে বিপত্তি হবে ঘোর।
সেই বিনা সম্ভাবনা কিবা আছে মোর ॥
জানে নাই যে জন জানাতে হয় তাকে।
ভামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যদি থাকে ॥
ভিখারীর ভার্য্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সঙ্গে কর বিসম্বাদ ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥
সেই খানে শঙ্খ পরি সুখ পাবে মনে।
জানিয়া জনকঘরে যাও এই ক্ষণে ॥
এ কথা ঈশ্বরী শুনে ঈশ্বরের মুখে।
শূন্য হল সব যেন শেল পড়ে বুকে ॥
দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটী পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ করে কাত্যায়নী যায় ॥
কোলে করি কার্ত্তিকেয় হস্তে গজানন।
চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন ॥
গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু।
শিব ডাকে শশীমুখি শুনে নাই কিছু ॥
নিদান দারুণ দিব্য দিল দেবরাও।
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও ॥
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী।
লাগিল ভায়ের কিরা ভবানীর প্রতি ॥
ধাইয়া ধূর্জ্জটী গিয়া ধরে দুটী হাতে।
আড় হৈয়া পশুপতি পড়িলেন পথে ॥

---

* রামেশ্বরের ভাষা অনেক স্থলে মাণিক গাঙ্গুলীর "ধর্ম্মমঙ্গল" মনে পড়াইয়া দেয়।

যাও যাও যত ভাব জানা গেল বলি ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি ॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়। নিবারিতে নাবিয়া নারদ পাশে ধায় ॥
রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি। পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি ॥

আজ পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামে অনেক ভিক্ষুককে ডম্বরু বাজাইয়া ভগবতীর শঙ্খপরিধান বৃত্তান্ত গান করিয়া ভিক্ষা করিতে দেখা যায়, এই শিবায়ণই সে গানের মূল।

রামেশ্বরের এই "শিব সঙ্কীর্ত্তন" কাব্য হইতে আমরা শিবঠাকুরের ঘরকন্নার স্মিতস্নিগ্ধ চিত্র একখানি দেখাই—

পিতাপুত্রের ভোজন—

যোগ করে দুটি পুত্র লয়ে তার পর। পাতিত পুরট পীঠে বসে পুরহর ॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী দুটী সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি ॥
তিন জনে একুনে বদন হল বার। গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার।
তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়
দেখে দেখে পদ্মাবতী বসে এক পাশে। বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে ॥
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে ॥
গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরি খা ॥
মূষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখীধ্বজ কয় ॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে ॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারীর পরে ॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি। সূপ হল সাঙ্গ আন আর আছে কি ॥
দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজা দশ। খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ ॥
সিদ্ধি-দল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥
উত্তম চর্ব্বণে ফিরে ফুরাল ব্যঞ্জন। এককালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন ॥
চটপট পিশিত মিশ্রিত করি যূষে। বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আসে ॥
চঞ্চল চরণে বাজে নূপুর চমৎকার। রণ রণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝণৎকার ॥
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর। শ্রমে হল সজল কোমল কলেবর ॥
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাঝে ॥

থর বাদ্যে সুপদ্যে নর্ত্তকী যেন ফিরে। সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে॥
হরবধূ অন্নমধু দিতে আর বার। খসিল কাঁচলী হল পয়োধর ভার॥
নাটাপাটা হাতে বাটা আলুইল কেশ। গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হৈল শেষ॥
ভোক্তার শরীরে মূর্ত্তি ফিরে ভগবতী। ক্ষুধারূপ অস্তে কৈল শান্তিরূপে স্থিতি।
উদর হৈল পূর্ণ উঠিল উদ্গার। অতঃপর গণ্ডূষ করিতে নারে আর॥
হট করে হৈমবতী দিতে আইল ভাত। শার্দ্দূল ঝম্পনে সবে আগুলিল পাত॥

এই সকল শিব-মঙ্গলে শিব সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, অধিকাংশ স্থলেই তাহা কোন সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে গৃহীত নহে।

আমরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; আমরা দেখিয়াছি কবিগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধেও এমন অনেক বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, যাহা সংস্কৃত পুরাণাদিতে মিলে না।

অপরাপর দেবতার কথায় আসা যাক্।
লৌকিক দেবতাগণের পূজা প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেখানেই একটী দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়;—

শিশুদিগের জন্য চিন্তিতা জননীর নিমিত্ত ষষ্ঠি,
সাংসারিক বিপদনিবারণার্থ মঙ্গল-চণ্ডী,
আর্থিক অবস্থার উন্নতি কল্পে সত্যনারায়ণ,
গৃহে সর্প-ভয় নিবারণের জন্য মনসা (পদ্মা বা বিষহরী),
পল্লীগ্রাম জঙ্গলময়, তথায় ব্যাঘ্র-ভয় হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত দক্ষিণের রায়,

বিস্ফোটক জ্বরের দায় হইতে মুক্তির জন্য শীতলা দেবী—প্রভৃতি, নানা উদ্দেশ্যে নানা দেবদেবী বঙ্গীয় গৃহস্থ ঘরের আরাধ্য দেবতারূপে, বঙ্গীয় কবিকুলের বর্ণনীয় দেবদেবী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

প্রথমে থাকে সংক্ষিপ্ত ব্রত-কথা, ব্রতকথা ক্রমশ ক্ষমতাশালী প্রতি-

ভাস্থিত কবির হাতে পড়িয়া কুহকিনী কল্পনার বলে নানা শাখা-উপ-শাখায় শোভিত হইয়া সুবৃহৎ মঙ্গল-কাব্যে পরিণত হয়। এই সকলের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা-দেবীই বঙ্গীয় কবিগণের হস্তে পূজা পাইয়াছেন সব চেয়ে বেশী; বিশেষতঃ জগতের জননী-রূপা সর্ব্ব-বিপদ-হারিণী চণ্ডিকা।

মনসা-মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সংক্ষেপে কীর্ত্তিত আছে, সম্ভবতঃ মনসা-মঙ্গলের ইহাই ভিত্তি।

মনসাদেবীর গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে কাণা হরিদত্তের নাম প্রথম পাওয়া যায়; ইনি বোধ হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি। তারপর পঞ্চ-দশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গাধিপ হুসেন সাহার রাজত্বকালে বিজয়গুপ্ত পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। নারায়ণ দত্তও এই সময়ের কবি। ইঁহারা উভয়েই পূর্ব্ববঙ্গবাসী।

হরিদত্তের "মনসা-মঙ্গল" কাব্য হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা—(পদ্মার সর্পসজ্জা)—

দুই হাতের শঙ্খ হৈল গরল শঙ্খিনী। কেশের জাদ কৈল এ কালনাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলী। দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলী॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর। কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিঙ্কিনী। বেত নাগে দিয়া কৈল কাঁকালি কাঁচলি॥
কনক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি। বিষতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা। সর্ব্বাঙ্গে নিকলে যার অগ্নি ফণা কণা॥
অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়। চন্দ্র সূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥

বিজয় গুপ্তের "পদ্মাপুরাণ" হইতে এক পৃষ্ঠা—(শিবের অদর্শনে চণ্ডিকার কোপ)—

ভাল ভাঁড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূর।

এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চুর ॥
আঁচলে আঁচলে গিট বাঁধি এক ঠাঁই।
রাখিতে নারিনু তবু পাগল শিবাই।
কপট চরিত্র তোমার খলের সঙ্গে ঢঙ্গ।
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ্গ।
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান ব্যাঘ্র-ছাল।
প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বসে পাগল পাগল কত সইতে পারি।
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে।
আগুন লাগুক কাঁকের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ পাকড়ে খাউক যেমন ভাঙ্গার ঘোরে ॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা পড়ে ভাঙ্গুক লাঠি।
কপালের তিলক চন্দ্র তারে গিলুক রাহু ॥

বিজয়গুপ্তের কাব্যে এমন অনেক স্থল আছে, যাহা পরবর্ত্তী নামজাদা কবিগণ মাজিয়া ঘসিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন। বিজয়গুপ্তের হাস্য রসের পরিচয় একটু আমরা দিব। প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যে সুন্দর পুরুষ দেখিলে নারীগণের আপন আপন পতিনিন্দা একটী অবশ্য বর্ণনীয় বিষয়। পুরুষের “ব্যাখ্যানা” নারীগণ করিয়াছেন, আমাদের কবি তাহার শোধ তুলিয়াছেন কেমন দেখুন;—বিবাহ-আসরে অনেক এয়ো আসিয়াছেন, তার মধ্যে—

একজন এয়ো আইল তার নাম রাধা। ঘরে আছে স্বামী তার যেন পোষা গাধা ॥
আর এক এয়ো আইল তার নাম রুই। মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ দুই ॥
আর এক এয়ো আইল তার নাম সরু। গোয়াল ঘরে ধুঁয়া দিতে খোঁপা খাইল গরু ॥
আর এয়ো আইল তার নাম কুই। দুই গালে ধরে তার খুদ মণ দুই ॥
আর এক এয়ো আইল তার নাম আই। দুই গাল চওরা চওরা নাকের উদ্দেশ নাই ॥
আর এক এয়ো আইল তার নাম শশী। মুখে নাই দন্ত গোটা ওষ্ঠে দেছে মিশি ॥

আর এক এয়ো আইল তার নাম চুষা। সব হৈতে নাচিবিতে শিরে ঠেকে টুষা।।

নারায়ণ দেব ত্রিপুরা অঞ্চলের কবি; তাঁহার পদ্মাপুরাণের একটু দেখাই,—বেহুলা (বিপুলা) ও তাহার ভ্রাতার কথোপকথন—

নারায়ণি শুনি বোলে বিপুলা বচন। কি কারণে কৈলা ভাই অশক্য কথন।।
বিষম সাহস ভাই কৈলা কি কারণ। দেবতা মনিষ্যে বোলে হইছে মরণ।।
আত্মা দেহ ভাই মরা পুড়িবার। একেশ্বর কেমনে যাইবা দেবঘরে।।
কেমতে ছাড়িআ দিমু সাগর ভিতর। কথাতে পাইবা তুমি দেবের নগর।।
অগোরি চন্দন কাষ্ঠে লখাই পুড়িমু। লক্ষিন্দর কর্ম্ম ভাই এইখানে করিমু।।
লেউটিয়া চল ভাই আপনার ঘরে। একেশ্বর কেমতে যাইবা দেবঘরে।।
মৎস্য মাংস এড়ি ভাই যত উপহার। সদি লঙ্ঘ দিমু আমি তুমি খাইবার।।
শঙ্খ সিন্দুর মাত্র না পরিবা তুমি। নানা অলংকার তোমা দিমু আমি।।
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর। বিপুলা রাখিআ আইলা জলের উপর।।
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন। বিপুলাএ বোলে কিছু প্রবোধ বচন।।
ভাসাইতে আইল প্রভু যাইমু পলাইআ। কেমতে মুখেত হস্ত দিবাম তুলিআ।।
অসতী হইব মনিষ্য লোকেত প্রচার। কি কারণে এতেক যে রাখিমু খাখার।।
গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর। তারা কি বলিব আমি কি দিব উত্তর।।
বিপুলা শুনিআ বাক্য নিঠুর বচন। সকরুণ ভাষে সাধু করয়ে ক্রন্দন।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী। নারায়ণি কহনা শুন একটি লাচাড়ি।।

এই বিপুলা পরবর্ত্তী কবিগণের 'বেহুলা।'

প্রায় শতাবধি মনসা-গানের পালা পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের ক্ষুদ্র "মনসার ভাসান" খানি—কবিত্ব হিসাবে বড় কিছু না হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কাব্যখানি মোটে ২৬০০ শ্লোকে সমাপ্ত; ইহার পদ-সংখ্যা ৬৬; তাহার ভিতর ২৬টী পদ কেতকাদাসের ভণিতা-যুক্ত, ৪০টী ক্ষেমানন্দের নাম-সংযুক্ত। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ একই ব্যক্তি হইতেও পারেন, গ্রন্থ মধ্যে মনসাদেবীর নাম আছে "কেতকা";—হইতে পারে "কেতকাদাস" বিশেষণ?

এই কাব্যে বেহুলার পাতিব্রত্য কথা পড়িতে পড়িতে চিত্ত মুগ্ধ হয়। ইহাতে পতির নিমিত্ত সতীর স্বাবলম্বিত দুঃখের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে শ্রাবণ মাসে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্র ভাসান গান উপলক্ষে নৌকা লইয়া খেলা হইত, সেই সব গানের মূল লক্ষ্য ছিল বেহুলার চরিত্র কীর্ত্তন। সেই গীত নানা রাগ-রাগিণীতে মনোরম হইয়া পল্লীবধূগণের হৃদয়-পটে আদর্শ সতী বেহুলার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত।

কেতকাদাসের কাব্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্র খুব জীবন্ত। দেবীর নাম হইলেই পরম শৈব "চেঙ্মুড়ী কাণি" বলিয়া হেন্তালের বাড়ি লইয়া দেবীকে তাড়া করিত। কিন্তু পুত্রবধূর গুণে অত বড় অভক্তকে পরিশেষে দেবীর ভক্ত হইতে হইয়াছিল।

এই সকল কাব্যে দেবী-মনসা দারুণ প্রতিহিংসা পরায়ণা মিথ্যাবাদিনী রূপে চিত্রিত। দেবী মনুষ্যের নিকট মধ্যে মধ্যে প্রহার খাইতেন এবং প্রহারের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া বেড়াইতেন দেখা যায়।

"মনসার ভাসান" হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইব—

মৃত পতি কোলে লইয়া বেহুলা কলার মান্দাসে বসিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন—

গোদাঘাট পশ্চাত করিয়া সীমন্তিনী। জলেতে ভাসিয়া যায় দিবস রজনী
পথের পথিক যত পথ দিয়া যায়। বেহুলার দশা দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগৎমোহিনী কেন মড়া লৈয়া কোলে। কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোলে॥
গহন কাননে কোন সমাগম নাই। নিস্থল গম্ভীর জল কোলেতে লখাই॥
বেহুলা ভাসেন তাহে চাপিয়া মনসা। তোমার চরণ মাত্র কেবল ভরসা॥
মড়া মাংস জলে গলে বিপরীত ঘ্রাণ। চকিত চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ॥
ঘ্রাণেতে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে। মড়া অঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে
দিবসে দিবসে তাহে কীট গুলি বাছে। ঘন ঘন বৈসে ঘন মড়া অঙ্গ কাছে॥
বেহুলা তাড়ান যত নহে নিবারণ। পুলকে প্রবেশে তাহে মশক-নন্দন॥

অস্থি চর্ম্ম পচে তার কি কহিব কথা। মাচেশ্বর মড়া অঙ্গে পড়িল মেছেতা॥
বেহুলা ভাঙ্গন যত পুনরপি হয়। ঠাঁই ঠাঁই মেছেতা সকল অঙ্গময়॥
প্রভুর অঙ্গেতে মাছি করে ডিম বাসা। বেহুলা কান্দেন মনে জপিয়া মনসা॥
গলিয়া পড়িয়া গেল সে তনু সুন্দর। আর কি পাইব আমি প্রভু নখিন্দর॥
অবিরত মনে কত গণিল হতাশ। কুকুর ঘাটায় ভাসে কলার মান্দাস॥
কালিকা কুকুর সেটা লোটা দুই কান। শ্রমে বেগে আইসে করিতে জলপান॥
রসনা বাড়ায়ে জল খায় সেই ঘাটে। কলার মান্দাস আইল তাহার নিকটে॥
সহজে কুকুর জাতি পায় মড়া গন্ধ। তার মনে হইল সে সুধা মকরন্দ॥
পুলকিত হৈল অঙ্গ চারিদিকে চায়। ছো ছো করিয়া দূরে শুঁকিয়া বেড়ায়॥
দেখিয়া চমক হৈল বেহুলার প্রাণ। জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে পাইয়া মড়ার ঘ্রাণ॥
ছি ছি বলি বেহুলা ভাসিয়া যায় দূর। কুম্ভীরে খাউক তোরে দারুণ কুকুর॥
বেহুলার শাপ তার ব্যর্থ নাহি যায়। কুকুর অস্থির হৈল ঘুরিয়া বেড়ায়॥
সাঁতার জানয়ে তবু নাহি পায় তীর। হেন কালে তার পায়ে ধরিল কুম্ভীর॥
হাসিয়া কুকুর-ঘাটা ভাসিল নাচনী। ক্ষেমানন্দ বিরচিল সেবিয়া ব্রাহ্মণী॥

আর থাক্। জানি না আমাদের পাঠক পাঠিকারা কেহ ইতঃমধ্যে নাসাগ্রে এসেন্স সিক্ত বস্ত্রাঞ্চল লাগাইয়াছেন কি না। সময়ে সবই পরিবর্ত্তন হয়, এ আদর্শ এখন আর চলে না।

অপরাপর ভাসান-রচয়িতাদিগের মধ্যে কবি বর্দ্ধমান-দাসের কাব্যখানির রচনা স্থলে স্থলে বেশ সুন্দর। মনসা দেবী গোয়ালিনী-বেশে ধন্বন্তরীর নিকট বিষাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন, দেব-বৈদ্যের শিষ্যগণের সহিত দেবীর বাক্-কলহ কৌতুক-প্রদ। কিঞ্চিৎ দেখাই—

কেমনে তোমার স্বামী পাঠায় তোমায় একাকিনী গোয়ালা রহিল তোমার ঘরে।
দরিদ্রের মত নয় ধন আছে জ্ঞান হয় নানাবিধ আছে অলঙ্কার।
এত ধন যার আছে সে কেন বা দধি বেচে হাটে ঘাটে মাথায় পশার॥
দুষ্ট জনে লাগ পায় দধি ঘোল করে দেয় কথা কহিতে মুখে মারে।
তোমার নাহিক ভয় দুষ্ট জন যদি হয় কাড়ি লয় লণ্ড ভণ্ড করে॥

* * *

বলিয়া এ সব বোল   মূল্য কয়ে দধি খোল   শিষ্য সব বড়ই চতুর।
বৰ্দ্ধমান দাসে কয়   খেয়ে দেখ কেমন হয়   দধি মোর টক না মধুর॥
শিষ্যের বচন শুনি বলে গোয়ালিনী। এ দেশে এমন বিচার আমি নাহি জানি॥
রাজা চন্দ্রধর হয় দেশে অধিকার। এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার॥
ভিন্ন-দেশী আসিয়াছি দধি বেচিবারে। পথে একা পেয়ে কেন পরিহাস কর॥
আমার জাতির ধর্ম্ম মাথার পসার। যাহার প্রসাদে মোর ভুক্তি পরিবার॥
বিনা দুঃখে কাহার কড়ি হয় উৎপত্তি। আমার সকল এই দধির সম্পত্তি॥
খাইয়া বেড়াও তুমি কহিতে না দেও সুখ। পরেরে বলিতে কি পরের লাগে দুখ॥

*   *   *

বৰ্দ্ধমান দাসে কয় কীর্ত্তি মনসার। হাসা করে শিষ্যগণ বলে আর বার॥
তোমার জাতির বুঝি পুরাতন কড়ি। চুনা কড়ি লাগে দিব বেচ দধি হাঁড়ি॥
যত হাঁড়ি আছে তোমার সকল কিনিব। আগে দধি খেয়ে দেখি পাছে কড়ি দিব॥

*   *   *

পসার ভাঙ্গিয়া তোমার হাঁড়ি করি চূর। মোর ঠাই দেখাও তোমার হাব বেশুর।
বৰ্দ্ধমান দাসে কহে কীর্ত্তি মনসার। সনাইয়া গোয়ালিনী বলে আর বার॥

*   *   *

যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে। বিকাউক মোর ঠাঁই কিনিব তাহারে॥
শিষ্যগণ বলে মোরা সেই ধন চাই। সেই ধন পাই যদি তোমাকে বিকাই॥

এই অবধিই থাক্। ২৫০।৩০০ বৎসর পূর্ব্বেকার এই রসিকতা। মনসা দেবী হেতালের বাড়িও খাইতেন, বচনের বাড়িও খাইতেন কম না।

আর এক দেবীর কথা আমরা এইখানে কিঞ্চিৎ বলিয়া লই। স্কন্দ-পুরাণ ও পিচ্ছিলা-তন্ত্রে শীতলা দেবীর বিবরণ আছে। এই দুই শাস্ত্র কতদিনকার স্থির করিবার উপায় নাই। বৌদ্ধ-শাস্ত্রেও হারিতী দেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। শীতলা ও হারিতী উভয়েই ব্রণনাশিনী দেবী। আমাদের দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় ডোম পুরোহিতগণ হারিতী দেবীর পূজা করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও শীতলা দেবীর পুরোহিতগণ

অনেক স্থলেই ডোম-জাতীয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মিগণের ধর্ম্ম-ঠাকুরের মূর্ত্তির গাত্রে যেরূপ টোপ তোলা থাকে, সচরাচর-পূজিতা মুখমণ্ডল-মাত্রা-বশিষ্টা শীতলা মূর্ত্তির মুখেও সেইরূপ পিত্তলের বা শঙ্খের টোপ দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্রের রাসভারূঢ়া শূর্পমার্জ্জনী-শোভিতা প্রতিমা অপেক্ষা দেবীর পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিই অধিক প্রচলিত।* এই সকল কারণে অনেকে শীতলা দেবীকে বৌদ্ধ-সংস্রব-বিশিষ্টা মনে করেন। শীতলা দেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি পালা বঙ্গভাষায় রচিত আছে।

চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতির ন্যায় শীতলার গানও খোল মন্দিরা এবং নূপুরের তালে গীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ "শীতলা পণ্ডিত" নামক এক সম্প্রদায়ের লোক এই শীতলার গান গাহিয়া বেড়ায়। সাধু ভাষায় এই গানের নাম "শীতলা-মঙ্গল"।

আমরা দৈবকীনন্দন কবি-বল্লভের "শীতলা-মঙ্গল" হইতে একটু শুনাই—

ত্যজিয়া কৈলাস গিরি [illegible] মহেশ্বরী
নায়কেরে কহিতে কথা।

*　　*　　*　　*

চৌষট্টি বসন্ত সঙ্গে　চলিলে পরম রঙ্গে　নানা দেশ ভুবন ভ্রমিয়া।
বিষম প্রবন্ধ বল　ধুবড়িয়া চাম দল　লোকে দেহ বসন্ত সাজিয়া॥
মা, তুমি যারে কর বিড়ম্বনা।
কাষ্ঠ জিনি কলেবর　কর তারে জরজর　অঙ্গে কর উত্তর নাদনা॥
দেবতা অসুর নর　মৃগ পক্ষ জলচর　সর্ব্ব ঘটে তব অধিকার।
শীতলা চরণ তলে　শ্রীকবিবল্লভে বলে　সংসার-সাগরে কর পার॥

এই গানটিতে এক নূতন খবর আছে—

বিষম বসন্ত বল　বধিলে রাবণ দল
প্রথমে পূজে রঘুরাম।

---

* ভবিষ্য-পুরাণে শীতলা-ব্রত আছে—তাহাতে-শীতলা-ধ্যান—
"বন্দে হং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরাং। মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥"

রামচন্দ্রের পূজায় রাবণ-সৈন্য বসন্ত রোগে মারা পড়িয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন—"কলি-দুঃখ-বিমোচন তন্ত্র" নামে একখানি গুপ্ততন্ত্র আছে, তাহাতেই শীতলা-রহস্য বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বঙ্গদেশে বহুদিন এক রাজার অধীনে একত্র বাস-নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার পূজা তাহার নিদর্শন। আমাদের নিকট সত্যপীর সত্যনারায়ণ নামে পরিচিত। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বা ক্ষুদ্র পালা ছোট বড় বহু কবি নানা ছন্দে রচিয়া গিয়াছেন।* নারায়ণ হরি এই উপলক্ষে হিন্দু কবিগণের হস্তে মুসলমান ফকিরের আলখাল্লা পরিধান করিয়া সময়ে সময়ে উর্দ্দু জোবানে ছড়া কাটাইতেও কসুর করেন নাই। একটু নমুনা—

বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝায়ে বলে বাছা। দুনিয়ামে এদাভি আদমি রহে সাচা॥
ভালা খাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাহে। রাত দিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে॥
জানা গেও বাত খাওয়া জানা গেও বাত। কাপড়াত লেও তেরা আও মেরা সাথ॥
জাওত সত্যপীর মেরা জাওত সত্যপীর। তেরা দুঃখ দূর করতও হাম্ ফকির॥
এসা কুছ হুজুর বাত সে দেং তোয়। কিয়ে পিছে সিতাব ধনের সুখ হোয়॥
সত্যপীর পায়মে একিনা করো দিল্। সাহেব করেগা তেরা নিয়ত হাসিল॥

এ টুকু ২০০ বৎসরের প্রাচীন কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য রচিত পালা হইতে গৃহীত।

কবিগণ ভগবানের মুখে তাঁহার আত্ম পরিচয় বসাইয়াছেন—

"কংশ কেশী মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম॥"

একটী সংবাদ এই খানে দিয়া রাখা চলে। বঙ্গদেশে ষোল পালা সত্য-

---

* স্কন্দ-পুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণ কথা আছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়—

"নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বেষামীপ্সিতপ্রদঃ। ভবিষ্যতি কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ॥"

নারায়ণের কথা প্রচলিত নাই, কিন্তু ময়ুরভঞ্জ অঞ্চলে তিনশত বর্ষের পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবি শঙ্করের রচিত ১৬ পালা সত্যনারায়ণের গান শুনিতে পাওয়া যায়। শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, বাঙ্গালী কবি রচিত যে সকল প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য বঙ্গদেশে বিলুপ্ত-প্রচার, উৎকলের নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে সেই সকল কাব্য অদ্যাপিও শত শত কণ্ঠে গীত হইতেছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবু স্বয়ং শুনিয়া আসিয়া এই তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অন্যান্য মঙ্গল-কাব্য হিসাবে ষষ্ঠীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, সূর্য্যের পাঁচালী, শনির পাঁচালী প্রভৃতি নামে অনেক হিন্দু দেবদেবীর কথা অনেক কবি রচিয়াছেন। কাব্য বা পাঁচালী আকার ছাড়া প্রকৃত কবিত্ব এ সকলে সুলভ নহে। দক্ষিণরায়, কালুরায়, বাঁকুড়ারায় প্রভৃতির উপাখ্যান—বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষের নিদর্শন কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ সন্দর্ভও পাওয়া যায়, বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নহে। এই সকল গীতি-কাব্যের অধিক প্রাচীন নিদর্শন এখনও দেখা দেয় নাই; দুই তিন শত বৎসরের পুরাতন কবিগণের রচনা অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

("ভারতী-মঙ্গল" কাব্য সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত হইতেছে।)

এই শ্রেণীর একখানি কাব্যের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা উচিত।—প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গা মঙ্গল—"গঙ্গা ভক্তি-তরঙ্গিণী"। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থখানি অনেকের প্রিয় ছিল। বর্ষীয়সী গৃহস্থ-বধূগণ ইহার ছড়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ তপস্যা দ্বারা প্রসাদিত করিয়া স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন পূর্ব্বক কপিল-শাপ-দগ্ধ পূর্ব্বপুরুষ-দিগের উদ্ধার সাধন করেন—ইহাই গ্রন্থের মূল বিবরণ। অনুষঙ্গক্রমে অপরাপর অনেক বিষয়েরও বর্ণন আছে। কিঞ্চিৎ শুনাই;—গঙ্গার

ষষ্ঠিপূজায় নারীগণের আগমন—

প্রেম রসে অবশেষ রামাগণ যত। যাণী পুরে বসি বেশ করে নানা মত॥
চাঁচর চিকুর জাল চিরুণে আঁচড়ি। বিনাইয়া বাঁকা খোঁপা দিয়া কেশদড়ি॥
খোঁপায় সোনার ঝাঁপাবেণী কারো দোলে। কেহ বা পরিল সিঁথি মাঁও [illegible] লোকে॥
কিবা শোভা সিন্দূর চন্দনে অতিশয়। কপালে টীকা যেন ভানুর উদয়॥
কারো কারো ভুরু যেন কামধনু জিনি। কামের সম্পদ ধন করেছে কামিনী॥
চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জিয়া পাখী। ছল করে নাচে [illegible] মনো বাসি॥
চেঁড়ি চাঁপি মাকড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে [illegible] কমল নাহি ভুল॥
নাসিকাতে নথ কারো মুক্তা চুনী ভালো। নবরঙ্গ-বেশরে কারো মুখ করে আলো॥
কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকায় দোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥
কুন্দ-কলিকার মত কারো দন্তপাঁতি। দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো বা দন্ত ভাতি॥
মাজিত মঞ্জনে দন্ত মাঝে কাল রেখা। মনে লয় মদনের পত্রিকা লেখা॥
মুখ শোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥
পরিল গলায় কেহ তেনরী সোনার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥
ঘুনুধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোনার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে॥
পতির আয়তি চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরণে বাঁকানো লোহা সকলের হাতে॥
পাতা-মল পাশুলি আনট্ বিছা পায়। গুজরী পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥
আনন্দে বসিয়া যত রসিকা কামিনী। সুখের বাজারে যেন করে বিকি কিনি॥

আজকালকার এই নেকলেশ-ব্রেশলেট-ইয়ারিং-এর দিনে সেকেলে কতক গুলা গহনার নাম পরিচয় জানিয়া রাখা ভাল।—আর মিশি রঞ্জিত দাঁতের বাহার!*

মঙ্গল-কাব্যের মহিমোজ্জ্বল মুকুট চণ্ডীকাব্যের প্রতি এইবার আমরা মনোযোগ করি।

---

* প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি, শৈশবকালে পাঠশালায় "বন্দো মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি" আরম্ভ করিয়া একটী সুন্দর গঙ্গা-স্তব মুখস্থ করান হয়। কোন কোন স্থলে সেটীতে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের ভণিতা আছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে সেটি অযোধ্যারাম কবিচন্দ্রের রচিত।

আমরা জানি মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত-কথা বহুদিনকার পুরাতন কাহিনী। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে (মনসা ও) মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গাহিয়া গায়কগণ রাত্রি জাগরণ করিত। চৈতন্য-ভাগবত কাব্যে আমরা দেখিতে পাই—

মঙ্গল চণ্ডীর গীত গাহে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥

সেই গীত কিরূপ ছিল ঠিক জানা যায় না। দ্বিজ জনার্দ্দনের প্রাচীন "চণ্ডী" পাওয়া গিয়াছে, উহা একখানি ছোটখাট ব্রত-কথা। তন্মধ্যে চণ্ডীকাব্যের মূল উপাখ্যান-ভাগ সংক্ষেপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপ কোন চণ্ডীর গান অবলম্বন করতঃ কবি মাধবাচার্য্য তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মাধবের চণ্ডী রচনার সাল খৃঃ ১৫৭৯।

বলরাম কবিকঙ্কণ ও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ মাধবাচার্য্যের উপর তুলি ধরিয়া চিত্র অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছেন। বলরামের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে খুব চলিত।

মাণিক দত্ত কবির মঙ্গলচণ্ডী একখানি আছে; ভাষা দেখিলে সে খানিও যথেষ্ট প্রাচীন মনে হয়। মাণিক দত্তের পৌরাণিক বর্ণনা অদ্ভুত। উহাতে বর্ণিত আছে—ধর্ম্মঠাকুর হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির উদ্ভব।* এই চণ্ডীর গানে শূন্যবাদেরও উল্লেখ আছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, মাণিক দত্তের কাব্যের পৌরাণিক অংশ কোন বৌদ্ধ-শাস্ত্র (ধর্ম্ম-মঙ্গল) হইতে গৃহীত।

এই গ্রন্থ হইতে মূল আখ্যানের অতিরিক্ত অংশ একটু শুনাই—

অনাদ্যের উৎপত্তি জগত সংসারে। হস্তপদ নাহি ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে॥

---

* ধর্ম্মমঙ্গলের মতে—ধর্ম্মঠাকুর বা আদি নিরাকার বুদ্ধ হইতে আদ্যাশক্তির উদ্ভব, তাঁহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।

"ভরমিতে ভরমিতে পরভুর পড়ে গেল ঘাম। তাহাতে জনমিল আদ্যা দুর্গা জার নাম॥"
শূন্যপুরাণ।

আপনে ধর্ম্ম গোঁসাঞি গোলোক ধিয়াইল। গোলোক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড স্বজিল ॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি শূন্য ধিয়াইল। শূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের সরীর হইল ॥
আপনে ধর্ম্ম গোঁসাঞি যুহিত ধিয়াইল। যুহিত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হইল ॥
জন্ম হইল ধর্ম্ম গোঁসাঞি গুনে অনুপাম। পৃথিবী স্বজিয়া তেঁহো রাখিবে মহিমা ॥
ইন্দ্র জিনিয়া তবে সিন্ধু উথলিল। মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পড়িল ॥
হস্ত পদ পৃথিবীতে জল উপজিল। জলে ত আসন গোঁসাঞি জলেত বৈসল ॥
জল ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন। ভাসিতে ধর্ম্ম গোঁসাঞি পাইল বৈসন ॥
চৌদ্দ যুগ বহিয়া গেল ততক্ষণ। ... .।
ধর্ম্মের বৈসন হইতে উলুক জন্মিল। যোড় হস্ত করি উলুক সম্মুখে ডাঁড়াইল।
হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়। কহ কহ উলুক কত যুগ জায় ॥
জত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে। তখনে আছিলাও আমি মন্ত্র ধিয়ানে ॥

* * *

গান করে দেবীর ব্রত স্বখী সর্ব্বজয়া। যে ঘাটে অবতার করিবে মহামায়া ॥
দেবীর চরণে মাণিক দত্তে গায়। নায়কের তরে দুর্গা হবে বরদায় ॥

বৌদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম্মমঙ্গলও দেবলীলা-জ্ঞাপক হইয়া "মঙ্গলচণ্ডী" নাম ধরিয়া কেমন হিন্দুর মঙ্গলকাব্য মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহা তাহারই প্রমাণ।*

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে এরূপ স্তুতিও পাওয়া যায়—

শরণ লইনু জগত-জননী ও রাঙ্গা চরণে তোর।
ভব-জলধিতে অনুকূল হৈতে কে আর আছয়ে মোর ॥
দুগ্ধকণ্ঠ শিশু দোষ যদি করে রোষ না করয়ে মায়।
যদি মা রুষিবে পড়িয়া কান্দিব ধরিয়া ও রাঙ্গা পায় ॥

---

* কোন কোন সংস্করণ কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আদ্য ভাগে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণের" পূর্ব্বেই "দিগ্‌বন্দনা" নামে একটি সন্দর্ভ দেখা যায়। তন্মধ্যে ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে, পূর্ব্বকবি মাণিকদত্ত সম্বন্ধে, এমন কি দুর্গা ঠাকুরাণী সম্বন্ধে, যেরূপ ভাবে উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝা যায়, সন্দর্ভটি কোন "ধর্ম্মের পূজারী" কর্ত্তৃক মুকুন্দরাম-চণ্ডী মধ্যে প্রক্ষিপ্ত।

হরি হর ব্রহ্মা যে পদ পূজয়ে তাহে কি বলিব আমি!
বিপদ-সাগরে তনয় ফুকারে বুঝিয়া যা কর তুমি॥
(সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল)

ধর্ম্মমঙ্গলে চণ্ডী দেবীর কথা, চণ্ডীকাব্যেও ধর্ম্মঠাকুরের কথা। অদ্ভুৎ মিশ্রণ। এই শ্রেণীর 'চণ্ডী'র কথা লইয়া আর আমরা নাড়াচাড়া করিব না।

জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের চণ্ডী তুলনা করিলে কাব্যের ক্রমোৎকর্ষ বুঝিতে পারা যায়। জনার্দ্দনের শুধু কাঠামো। মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামে গল্পাংশে বিলক্ষণ মিল আছে। উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়া যায় ঠিক একরূপ। কিন্তু মাধবাচার্য্যের কালকেতু মুকুন্দরামের কালকেতু অপেক্ষা বীর। মাধবের ভাঁড়ুদত্ত কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু অপেক্ষা শঠতায় প্রবীণ দৃষ্ট হয়। তবে মোটের উপর মুকুন্দরামের কাব্যের প্রায় সকল অংশই মাধবের চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট।

মুকুন্দরামের চণ্ডীর পরিচয়ই আমরা গ্রহণ করিব।

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের "চণ্ডী" অনেক সমালোচকের মতে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।

যখন মোগল পাঠান বঙ্গের সিংহাসন লইয়া বিব্রত, যখন দেশে শ্রীচৈতন্য-শিষ্য বৈষ্ণব দল 'পাষণ্ড' দলনে প্রবৃত্ত এবং রাধা-ভাব প্রচারে উন্মত্ত, দেশের অন্য কথা উপকথা বৈষ্ণবীয় মাধুর্য্য স্রোতে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম, চণ্ডী কাব্য সেই সময়ে রচিত।

বঙ্গদেশ মোগলের হইল, রাজস্ব-সচীব দেশে পারশী ভাষার প্রচলনের প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেন। বঙ্গে যখন পারশী ভাষা বেশ চলিয়াছে, মুকুন্দরামের চণ্ডী সেই সময়ে লিখিত, ইহা তাঁহার কাব্য হইতে বুঝা যায়।

কবিকঙ্কণের সময়ে পারশী ভাষার সংস্রবে বাঙ্গালা ভাষা কি রূপ

ধারণ করিয়াছিল, তাহা গ্রন্থারম্ভে তাঁহার "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" হইতে সম্যক্ বোধগম্য হয়।

যে সময়ে মানসিংহ "গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ" সেই সময়ে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ডিহিদার মামুদ সরিপের উৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়া জন্মস্থান বাস্তু ভিটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃহৎ পরিবার সহ নিঃসম্বলে গৃহের বাহির হইয়া পড়েন, পথে দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল—"তৈল বিনা করি স্নান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে।" এই দুর্দ্দশার সময়ে তাঁহাকে—"চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।" চণ্ডীর আদেশে তিনি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে কোন সদাশয় ভূস্বামীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার দুঃখ দূর হয়, তিনি "কবিকঙ্কণ" উপাধি লাভ করেন।

কবি নিতান্ত নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন ; গ্রন্থ মধ্যে "পশুগণের গোহারি"তে জমীদারী অত্যাচারের ইঙ্গিত করিতে ভুলেন নাই।

ভালুক কাঁদিয়া বলিতেছে—

"নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।"

মুকুন্দরাম স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্র-জীবন তিনি সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। বড় দুঃখেই কবি লক্ষ্মী-বন্দনায় গাহিয়াছেন—

লক্ষ্মী থাকিলে মান সকল সংসারে।
লক্ষ্মী বাম হইলে ভাই কেহ না আদরে॥

কোন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—"কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়।" আমরা দেখিতে পাই, কবির বড়মানুষী বর্ণনার ভিতর হইতে গরীবয়ানী উঁকি মারে। অনেকের মতে স্বভাব বর্ণনায় বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে কবিকঙ্কণের ন্যায় নিপুণ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে দুইটা উপাখ্যান আছে।

প্রথম—কালকেতুর গল্প; দ্বিতীয়—ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী। উভয়েরই উদ্দেশ্য চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার।

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণে একটী শ্লোকে কালকেতু—গোধিকারূপে দেবীর ছলনা, এবং সপুত্র সদাগর, শালিবাহন রাজা ও সমুদ্রে হস্তীগ্রাস-উদ্গীরণের কথা আছে। শ্লোকটী এই—

ত্বং কালকেতু বরদাচ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ বণিজঃ সসূনো
রক্ষেহম্বুজে করিচয়ং গ্রসন্তী বমন্তী॥

এই উপপুরাণ খানি কতদিনকার স্থিরতা নাই।*

মুকুন্দরামের চণ্ডীর আদ্য ভাগে দৃষ্ট হয়—দেবীর প্রথম পূজা করেন এক রাজা, পরে পূজা করে বনের পশুগণ; তৎপরে দেবী পূজা করাইয়া লন এক নীচ ব্যাধ দ্বারা;—সকলেরই দেবীর কৃপায় মঙ্গল হইয়াছিল। রাজা প্রজা—নিকৃষ্ট প্রাণীই হউক, দেবীর ভক্ত হইলে শ্রেয়োলাভ হয়।

কালকেতু এক সামান্য চুয়াড় ব্যাধ—ব্যাধের বাল্য-পরিচয়—

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।

বুলে মাতঙ্গ গতি যেন নব রতিপতি সবার লোচন সুখ হেতু॥
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিরমাণ দুই বাহু লোহার সাবল!
গুণ শীল রূপ বাড়া বাড়ে যেন হাতি কড়া জিনি শ্যাম চামর কুন্তল॥
বিচিত্র গলায় তথি দোলায়ে শাখের কাঁঠি কর যুগে লোহার শিকলি।
উর শোভে বাঘনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাখে তনু মাঝে শোভিছে ত্রিবলী॥
কপাট বিশাল বুক নিন্দি ইন্দীবর মুখ আকর্ণ দীঘল বিলোচন।

---

* ভবিষ্যপুরাণে মঙ্গলচণ্ডিকা ব্রত-কথা আছে, তাহার সহিত আলোচ্য আখ্যানের সংশ্রব নাই।

গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ মতি-পাঁতি জিনিয়া দশন॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাটা কাণে শোভে ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান বীর-ধড়ি মাথায় জালের দড়ী শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল॥
লইয়া ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা তার হয় জীবন সংশয়।
যে জন আকড়ি করে ছাড়িলে ধরণী ধরে ভয়ে কেহ নিয়ড় না হয়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে তাড়িয়া শশারু মারে কালসারে তাড়াতাড়ি করে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে লতায় জড়িয়া বান্ধে কন্ধে ভার আইসে বীর ঘরে॥
ফোঁটা দিয়ে বিন্ধে রেঙ্গা ছাড়িতে শিখয়ে নেঙ্গা চামর চৌতুলী শোভে শিরে।

"সমর্থ বয়সে" বাপ মা বিবাহ দিলেন। (পাত্রী-নির্ণয় ও শুভবিবাহ স্পষ্ট নিখুঁৎ ছবি।—মুকুন্দরামের স্বভাবই এই, যাহা বর্ণনা করিবেন খুঁটিয়া চুটাইয়া বর্ণিত করেন।)* কালকেতুকে সংসারী দেখিয়া বুড়া বাপ মা কাশীবাসী হইলেন।

ফুল্লরা ব্যাধপুত্রের গৃহিণী—"হাঁড়ির মত সরা"।

বড় দুঃখের সংসার; যেদিন ব্যাধের শিকার জুটে সেইদিনই অন্ন মিলে, নহিলে মাথার উকুন দেখিবার ছলে গৃহিণীর অপরের নিকট হইতে কর্জ্জ—অপার্য্যমানে উপবাস। ব্যাধতনুর যে খোরাক, তাহাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উজাড় হইয়া যায়—

দূর হইতে ফুল্লরা বীরের পাইল সাড়া। সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া॥
মোকা নারিকেল ভরিয়া দিল জল। ঝাঁটি জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল॥
পাখালিল মহাবীর পদ পাণী মুখে। ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে॥
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা। ব্যঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা॥
মুচড়িয়া গোঁপ দুটা বান্ধে নিয়া ঘাড়ে। এক শ্বাসে সাত ঘড়া আমানি উজাড়ে॥

---

* কবি বিবাহকালীন আচার অনুষ্ঠানের প্রত্যেক পুঁটিনাটি বর্ণনা না করিয়া ছাড়েন নাই। কালকেতু-জননী নিদয়ার গর্ভ-কালে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মুখরোচক অন্নব্যঞ্জনাদি সম্বন্ধে কবির স্ত্রীজনোচিত অভিজ্ঞতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সূতিকাগার হইতে জাতকর্ম্ম বিবিধ আচার অনুষ্ঠান শুনিতে শুনিতে আমাদের জ্ঞান বাড়িয়া যায়।

চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় ক্ষুদ জাউ। দাল খাইল ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ ॥
ঝুড়ি দুই তিন খাইল আলু ওল পোড়া। বন পুঁই ভার দুই কলমী কাঁচড়া ॥
রন্ধন ফুল্লরা করে জ্বালি গোটা বাঁশ। ঝোল রান্ধি দিল দুই হরিণের মাস ॥
দশ গণ্ডা মহাবীর খায় নকুল পোড়া। নারিকলু কাঠ শীম মিশালে আমড়া ॥
অম্ল খাইয়া মহাবীর জায়ারে জিজ্ঞাসে। রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে ॥
এনেছি হরিণ দিয়া দধি এক জাড়ি। তাহা দিয়া খাও ভাত আর তিন হাঁড়ি ॥
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিকার। ছোট গ্রাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল ॥
ভোজন করিতে গলা ডাকে হুডহুড। কাপড় উসসাস করে যেন মরায়ের বড় ॥

ব্যাধের বীরত্বের প্রকোপে বনে পশুগণের মধ্যে মরাকান্না পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা প্রথমে দেবীর বাহন সিংহকে রাজা করিয়া ব্যাধের সহিত লড়িতে গেল।

সিংহ—মুখ মেলে যেন দরী নখর যেমত ছুরী গোঁফ দুটা লাগিছে শ্রবণে।
দশনের কড়মড়ি ঢাকে যেন পড়ে বাড়ি কেতু তারা লোহিত লোচনে ॥
কাঁপয়ে উন্মত্ত জটা ব্যোম ছাড়ি মেঘ ঘটা যেন ফিরে বিজুরী সঞ্চারে।
ধায় অতি শীঘ্র গতি নখে আঁচড়য়ে ক্ষিতি ক্ষণে ভূমে ক্ষণেক অম্বরে ॥
বীর—ঘন পাক দেয় গোঁফে ফেলিয়া পঞ্চাশ লোকে আগুলয়ে সিংহের সরণি।
ধায় বীর বীর-দাপে ভরে বসুমতী কাঁপে ধূলে লুকাইল দিনমণি ॥

সকল পশু একজোট হইয়াও কিছু করিতে পারিল না, সকলকেই হটিতে হইল—অমন যে দেবীর বাহন—

"সিংহ পলাইয়া যায় পাছু পানে ঘন চায় ত্রাসে সিংহ পান করে নীর।"

তখন তাহারা যুক্তি করিয়া দেবী মঙ্গলচণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। দেবী তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আশ্বাস দিলেন। তিনি ব্যাধবীরকে ছলিতে গোধিকা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মৃগয়া গমন কালে একদিন পথে অযাত্রিক গোধিকাকে দেখিয়া কালকেতু বনে শিকার পাইল না। রাগিয়া সেই গোধিকাকে ধনুকের হুলে বাঁধিয়া ঘরে আনিল; গৃহিণীকে সেই গোধিকা শিক-পোড়া করিবার

ফরমাইস দিয়া বাজারে গেল। ব্যাধের অপরিচ্ছন্ন কুটীরে গোধিকা আপন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মোহিনী মূর্ত্তি বটে;—তাঁহার কাঁচুলী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইয়া দিয়াছিলেন—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের কাণ্ড কারখানা সেই ক্ষুদ্র কাঁচুলীতে অঙ্কিত। সেই মূর্ত্তি, সেই রূপ--"যেন তিন দিবসের চাঁদ"—দেখিয়া দুঃখিনী ফুল্লরা ত ভয়েই আকুল—পাছে স্বামীর মন টলে! সুন্দরীর ব্যাজ-পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া ব্যাধিনী প্রথমটা লেক্‌চার দিতে গেল—

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি স্বামী বনিতার বিধাতা।
স্বামীই পরম ধন স্বামী বিনে অন্যজন কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা॥

নানা কথায় রূপসীকে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিল; কত ইতিহাস পুরাণ শুনাইল, কাজ হইল না। তখন আপনার দুঃখ কষ্টের কথা পাড়িল, যদি ভয় খাওয়াইতে পারে! গরীবের বারমাসী বিবরণ—

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখ বাণী। ভাঙ্গা কুঁড়িয়া তাল পাতার ছাওনি॥
ভেরাণ্ডার খাম্বা মোর আছে মধ্য ঘরে। প্রথম আষাঢ়ে ঘর নিত্য পড়ে ঝড়ে॥
কহিতে দুঃখের কথা চক্ষে আসে জল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী। সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পড়ে মাংস জল। কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল॥
শুন গো শুন গো রামা দুঃখের কাহিনী। কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥
ভাদ্র মাসেতে বড় দুরন্ত বাদল। সকলে দরিদ্র যার সমুলে বিফল॥
কিরাত নগরে বসি না মিলে উধার। হেন বন্ধু জন নাহি যেবা সহে ভার॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বান॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে। ছাগ মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
মাংস না লয় কেহ করিয়া আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিয়োজন কৈল বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥

মাস মধ্যে অগ্রহায়ণ আপনি ভগবান। হাটে মাঠে গোঠে গৃহে সবাকার ধান ॥
উদর ভরিয়া ভক্ষ্য দিল বিধি যদি। যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ ॥
পৌষে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন। তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ ॥
তৈল তুলা তনুনপাত তাম্বুল তপন। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। নড়িতে সকল অঙ্গ বরিষয়ে ধূলা।
ব্যর্থ মোর বনিতা জনম ব্যর্থ মোর বনিতা জনম। ধূলায় নিদ্রা নাহি হয় শয়নে মরণ ॥
মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝটি। আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটি ॥
ফুল্লরার আছয়ে কত কর্ম্মের বিপাক। মাঘ মাসে তুলিতে নাহি অরণ্যের শাক ॥
সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাস। পীড়িত রমণীগণ বসন্ত বাতাস ॥
রামা শুন মোরি বাণী রামা শুন মোর বাণী। কোন সুখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধিনী ॥
মধুমাসে মারুত মলয় মন্দ মন্দ। মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ ॥
বনিতা পুরুষে সদা পীড়িত মদনে। ফুল্লরার পোড়ে অঙ্গ উদর দহনে ॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥
অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা। চালু সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥
কারে নিবেদিব দুঃখ কারে নিবেদিব দুঃখ। রৌদ্রে পোড়য়ে অঙ্গ বিধাতা বিমুখ ॥
পাপীষ্ঠ জৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন। পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ ॥
পসার এড়িয়া জল খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি ॥

এত দুঃখের বর্ণনায়—আমানি খাইবার পাত্রটী পর্য্যন্ত জুটে না, গর্ত্তে ঢালিয়া খাইতে হয়—দেখাইয়াও ব্যাধ-নিতম্বিনী সেই অপরূপ রূপসীকে টলাইতে পারিল না; তিনি স্পষ্টই বলিয়া বসিলেন—

"তুমি যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।"

তখন অগত্যা ফুল্লরা স্বামীকে সংবাদ দিতে চলিল। ব্যাধবীর আসিয়া দেখিল—

ভাঙ্গা কুড়িয়া খান করে ঝলমল।
পূর্ণিমার চন্দ্রে যেন আকাশ মণ্ডল ॥

কালকেতুও সুন্দরীকে ভাল কথায় বুঝাইয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিল, তিনি ত চুপ। তখন নিষ্পাপহৃদয় ব্যাধ রাগিয়া ধনুকে বাণ জুড়িল, কিন্তু তীর ছুটিল না—

হাতে শর রহে বীর চিত্রের সমান।

আর দেবী আত্ম-গোপন করিলেন না; পরিচয় দিয়া কহিলেন—

মাণিক অঙ্গুরী লহ সাত রাজার ধন।
ভাঙ্গায়্যা বসাহ পুত্র গুজরাট বন॥"

নীচ ব্যাধজাতি, দেবীর কথা সহসা বিশ্বাস করিতে পারে নাই; আব্দার ধরিল—কই নিজমূর্ত্তি ধর ত দেখি। দেবী তখন মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার সংশয় অপনোদন করিলেন। তাহাকে আপন শত নাম শুনাইলেন। এখন ফুল্লরা হিসাবী গৃহিণী; সে বলে একটা আংটী বই ত নয়, ও মাণিক অঙ্গুরীতে কত কালই বা চলিবে, ধন দাও। তখন দেবী ব্যাধকে বনে লইয়া গিয়া সাত ঘড়া ধন দিলেন। কালকেতু দুই দুই ঘড়া লইয়া দুইবার বহিয়া আনিল; শেষবার দুই ঘড়া ভারে উঠাইয়া দেড়ি ভার লইতে আপনাকে অশক্য বুঝিয়া দেবীকে কহিল—ছোট লোকের আক্কেল—

"এক ঘড়া ধন মাতা আপনি কাঁখে কর।"

মাতা দয়াময়ী তাহাতেই রাজি।

আগু আগু মহাবীর করিল গমন।
পশ্চাতে চলিলা মাতা লয়্যা কালুর ধন॥
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।
ধন ঘড়া লয়্যা পাছে পলায় পার্ব্বতী॥

এমনই সন্দেহ! আমরা দেখিতে পাইতেছি যেন চুয়াড় ভার লইয়া চলিয়াছে, আর বারবার পিছুপানে সতর্ক দৃষ্টি ফিরাইতেছে। ঘরে

আনিয়া কালকেতু সাত ঘড়া ধন মাটিতে পুঁতিয়া রাখিল। দেবী আদেশ করিলেন—সেই ধনে বন কাটাইয়া নগর নির্ম্মাণ করিবে, নগরের মধ্যে দেবী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে, প্রতি মঙ্গলবারে নানা উপহারে পূজা দিবে।

পরদিন প্রাতে কালকেতু ব্যাধ বণিক-ঘরে সেই দেবী-দত্ত মাণিক অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে গেল—

বেণে বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল লেখা জোকা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বাড়া মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিকরাজ আছয়ে বিশেষ কাজ আমি আইলাম তার হেতু॥
বীরের বচন শুনি আসি বলে বেণেনী ঘরে নাহিক পোদ্দার।
সকাল তোমার খুড়া গেল খাতকের পাড়া কালি দিব মাংসের ধার॥
আজি কালকেতু যাও ঘর।
কাষ্ঠ আনিহ এক ভার একত্র শুধিব ধার মিষ্ট কিছু আনিহ বদর॥
শুন গো শুন গো খুড়ি কিছু কার্য্য আছে তড়ি অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা নিব কড়ি।
আমার যে ধার খুড়ি কালি দিহ বাকি কড়ি যাই অন্য বণিকের বাড়ী॥
কালু তুই দণ্ড করহ বিলম্বন।
সাহস করিয়া টানি আসি বলে বেণেনী দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥
ধনের পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ ধায় বেণে খড়কীর পথে।
মনে বড় কুতুহলী কাঙ্খেতে কড়ির ঝুলি হড়পী নিক্তি লয়্যা হাতে॥
করে বীর বেণেকে জোহার।
[illegible]লে ভাই পো এবে না দেখি যে তো তোমার কেমন ব্যবহার॥
[illegible]য়া প্রভাত কালে কাননে এড়িয়া জালে হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি।
ফুলরা না আইসে ঘরে হাটেতে পসার করে এই হেতু নাহি আসি আমি॥

খুড়া ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী।
হয়্যা মোরে অনুকূল উচিত করিবে মূল তবে সে বিপদে আমি তরি॥
বীর দেয় অঙ্গুরী বেণিয়া প্রণাম করি জোখে বেণে চড়ায়্যা পৈড়াণ।
কুঁচ দিয়া কৈল মান ষোল রতি দুই ধান শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

স্যাকরা জাত কি চিরকালই চোর? ওজনের পর জুয়াচোর ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে—

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর। দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি॥
একত্র হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি। চাল খুদ কিছু লহ কিছু লই কড়ি॥
অঙ্গুরীর মূল্য শুনি ব্যাধের নন্দন। ভাবে—অঙ্গুরী সমান মিথ্যা সপ্তঘড়া ধন॥
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি চাই। যে জন দিয়াছে বস্তু দিব তার ঠাই॥
বেণে বলে লহ বাপু বাড়ানু পঞ্চ বট। আমার সনে সওদা করিতে না পাবে কপট॥
ধর্ম্মকেতু দাদা সনে কৈনু লেনা দেনা। তাহা হৈতে ভাই পো বড়ই সিয়ানা॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লয়্যা যাই অন্য বণিকের পাড়া॥
হাত বদল করিতে বেণের হৈল মন। পদ্মাবতী সনে মাতা গগনে হাসেন॥

অবশেষে বণিক-পুত্রকে অঙ্গুরীর মূল্য স্বরূপে সাত কোটি টাকা দিতে হইয়াছিল। ব্যাধ-বীর বলদ শকটে বহিয়া সেই অগাধ ধন গৃহে আনিল। এখন হাতে পয়সা হইয়াছে।

অতঃপর গোলা-হাটে বীরের নানান্ সৌখীন দ্রব্য খরিদ—অস্ত্র শস্ত্র হীরা মুক্তা, জীব জন্তু, শস্যাদি, মায় খাট পালঙ্ক দাসী পর্য্যন্ত ক্রয় হইল। তারপর বেরুণিয়া ডাকাইয়া বন-কর্ত্তন।* ক্রমে কালকেতুর

---

* কবি এখান এক রাশ বৃক্ষ গাছগাছড়ার নাম দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে ইন্দ্র কর্ত্তৃক শিবপূজা কালে নানা ফুলের নাম করিয়াছেন। চণ্ডীর কাঁচুলি নির্ম্মাণকালে বহু জীব জন্তুর উল্লেখ আছে। মুকুন্দ কবির জ্ঞান সর্ব্বত্র প্রসারী। Botany, Zoology, কিছুই বাকি নাই।

গৃহ নির্ম্মাণ। দেবীর আজ্ঞায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ও মহাবীর হনুমান আসিয়া মন্দির-মসজিদ সমেত "অযোধ্যা সমান পুরী" নির্ম্মাইয়া দিলেন। পুরী ত হইল, কিন্তু পুরীর বাসিন্দা কই? কালকেতু দেবীর স্তব করিল, দেবী পার্শ্ববর্ত্তী কলিঙ্গ দেশ ভাসাইয়া লোক ভাঙ্গাইয়া আনিবার উদ্যোগে গঙ্গার সাহায্য চাহিলেন। ভগবতী গঙ্গা সম্মত হইলেন না; স্পষ্টই বলিলেন—

"হইয়া বিষ্ণুর অংশা কারো না করি যে হিংসা।"

তখন দুই সতীনে বাক্-কলহ বাধিয়া গেল, কাজ হইল না। অগত্যা দেবী মেঘবাহন ইন্দ্র ও সরিৎপতি সমুদ্রের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন; ইন্দ্র ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি লাগাইয়া, সমুদ্র বহু নদ-নদীতে বাণ ডাকাইয়া কলিঙ্গ দেশ হাজাইয়া দিলেন।† দেশ ভাসিয়া গেল, প্রজারা রাজার খাজনা দিতে পাবে না, কালকেতুর নগর পত্তনের সুবিধা ঘটিল। অনেকেই নূতন জমীদারের সহজ জমীদারী বন্দোবস্তে লোভে পড়িয়া নূতন সহরে ঘর বাড়ী বানাইতে আসিল।

জমীদারী বন্দোবস্তে প্রজা বিলির একটু নমুনা—(কবিও দরিদ্র প্রজা ছিলেন, তাঁহার প্রতি নির্যাতনের খোঁজ ইহা হইতে আমরা পাইব।)

আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর কাণে দিব সোনার কুণ্ডল।
আমার নগরে বৈস যত তুমি চাষ চষ তিন সন বহি দিহ কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা কারে না করিও শঙ্কা পাট্টায় নিশান মোর ধর॥

---

† কলিঙ্গ রাজার প্রতি এই দৌরাত্ম্য কিন্তু অকারণ—রাজার দেবীর প্রতি ভক্তির কোন ত্রুটি ত কবি উল্লেখ করেন নাই। কালকেতুও যে ভক্তির জোরে দেবীর আশ্রয় পাইয়াছিল, এমন কোন কথাও নাই। দেবীর 'মরজি' ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না।

দেবী আপন পূজা প্রচারার্থ স্বর্গের লোককেও ইচ্ছাপূর্ব্বক শাপগ্রস্ত করাইয়া মর্ত্ত্যে আনিয়াছিলেন।

নাহি দিব দাবড়ি   ঘরে বসে দিহ কড়ি   ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামি বাঁশগাড়ী   নানা বাবে যত কড়ি   না লইব গুজরাট বাসে॥
পার্ব্বনী পঞ্চক যত   গুয়া লোণ সানা ভাত   ধান কাটি কলম কসুরে।
যত বেচ তাল ধান   তার না লইব দান   অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥
যত প্রজা বৈসে ঘর   তার না লইব কর   চাষ ভূমি বাড়ি দিব ধান।
হৈয়া ব্রাহ্মণের দাস   পুরাব সবার আশ   জনে জনে সাধিব সম্মান॥

কলিঙ্গ নগর ছাড়িয়া দলে দলে প্রজা কালকেতুর গুজরাট সহরে আসিতে লাগিল। সবার আগে আসিল—

ভেট লয়্যা কাঁচকলা   পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা   আগু ভাঁড়ু দত্তের পয়ান।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ   ছিঁড়া যোড়া কোঁচা লম্ব   শ্রবণে কলম খরশান॥
প্রণাম করিয়া বীরে   ভাঁড়ু নিবেদন করে   সম্বন্ধ পাতায়্যা খুড়া খুড়া।
ছিঁড়া কম্বলে বসি   মুখে মন্দ মন্দ হাসি   ঘন ঘন দেয় বাহুনাড়া॥
আইলাম বড়ই আশে   বসিতে তোমার দেশে   আগে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ   ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ   কুলে শীলে বিচারে মহত্বে॥
কহি যে আপন তত্ব   আমি দত্ত বালির দত্ত   তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ বসুর কন্যা   দুই জায়া মোর ধন্যা   মিত্রে কৈনু কন্যা সমর্পণ॥
গঙ্গার দুকুল কাছে   যতেক কায়স্থ আছে   মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
পট্ট বস্ত্র অলঙ্কার   দিয়া কর ব্যবহার   কেহ নাহি করয়ে বন্ধন॥
বহু পরিচয় মেলা   দুই নারী চারি শ্যালা   চারি পুত্র বহিন খাশুড়ি।
ছয় জামাই ছয় চেড়ী   এই হেতু সাত বাড়ী   ধান্য দিয়া না লইবে কড়ি॥
ধান্য বলদ দিবে খুড়া   দিবে হে বিছন পুড়া   ভান্যা খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে।
আমি পাত্র তুমি রাজা   ইহা জানি কর পূজা   অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবে॥

লম্বাচৌড়া বচনে ভুলিয়া সরলচিত্ত কালকেতু বহুমান করতঃ ভাঁড়ু দত্তকে গ্রহণ করিল; পরে পস্তাইতে হইয়াছিল।

নানা জাতি নানা ব্যবসায়ী হিন্দু মুসলমান প্রজা আসিয়া কালকেতুর সহরে অধিষ্ঠিত হইল। পণ্ডিত মূর্খ ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ চণ্ডাল পর্য্যন্ত হেন জাত হেন ব্যবসায়ী নাই কবি যাহার নাম ও বিবরণ না দিয়াছেন।

সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব। সংক্ষেপে একটু একটু শুনাই—অন্ততঃ সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার খবর—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে   নগরে যাজন করে   শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে   দেব পূজে ঘরে ঘরে   চাউলের বোচ্‌কা বান্ধে টান॥
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড   গোপ ঘরে দধিভাণ্ড   তেলী ঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথাও মাসড়া কড়ি   কেহ দেয় দালি বড়ি   গ্রাম যাজী আনন্দে সাঁতরি॥
গুজরাট নগরে   নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে   গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয়   কাহন দক্ষিণা হয়   হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥
গালি দিয়া লণ্ড ভণ্ডে   ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে   কুল পাঁজি করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে   সভায় বিড়ম্বে তারে   যাবৎ না পায় পুরস্কার॥

কায়স্থ—

কোন জন সিদ্ধকুল   সাধ্য কেহ ধর্ম্মমূল   দোষহীন কায়স্থের সভা।
প্রসন্ন সবারে বাণী   লেখাপড়া সবে জানি   সর্ব্বজন নগরের শোভা॥

বৈদ্য—এ তত্ত্বে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব, কিঞ্চিৎ রহস্যভাব আছে—

বৈদ্য জনের তত্ত্ব   গুপ্ত সেন দাস দত্ত   কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ   কেহ প্রয়োগের বশ   নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে   উর্দ্ধ রেখা দেয় ভালে   বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি   কাঁধে করি নানা পুঁথি   গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
কার দেখি সাধ্য রোগ   ঔষধ করয়ে যোগ   বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ   পলাইতে করে যোগ   নানা ছলে হয় যে বিদায়॥
কর্পূর পাঁচন করি   তবে জীয়াইতে পারি   কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয় বলে   কর্পূর আনিতে ছলে   সেই পথে বৈদ্যের প্রয়াণ॥

আর এক জাতি চিকিৎসক—

একদিকে বসে মহারাটা।
ফিরে তারা গুজরাটে   শোলঙ্গে পিলীহা কাটে   ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা॥

এই চক্ষু-চিকিৎসক জাতি এ দেশে এখন আর কৈ? এখনকার এই

ম্যালেরিয়া-সমাচ্ছন্ন দেশে এই প্লীহা-ভেদক হাতুড়ে সম্প্রদায় থাকিলে উপকার হইত।

এক জাতি আশ্চর্য্য ব্যবসায়ী—

নিবসে পশ্যতোহর পুর মধ্যে যার ঘর নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে সভার ধন হাত বদলিতে ভাল জানে॥

ইহারা বুঝি ঐন্দ্রজালিক!

মুসলমান প্রজার একটু পরিচয়—

বীরের লইয়া পান বৈসে যত মুসলমান পশ্চিম দিক বীর দেয় তারে॥
আইসে চড়িয়া তাজী সৈয়দ মোল্লা কাজী খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।
পুরের পশ্চিম পটি বসাইল হাসন হাটী এক মুদনি গৃহ বাড়ী॥
ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটি পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পয়গম্বরে পীরের মোকামে দেয় সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে অনুদিন কিতাব কোরাণ।
বেসাইয়া কেহ হাটে পীরের শিরিনি বাঁটে সাঁঝে বাজে দগড নিশান॥
বড়ই দানিসবন্দ কাহাকে না কহে ছন্দ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে ইজার পরয়ে দৃঢ় নাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি॥
আপন টবর লৈয়া বসিলা গাঁয়ের মিঞা ভুঞ্জিয়া ত গায়ে মুছে হাত।
সুর লোহানি পানি কুড়ানি বটুনি হনি পাঠান বসিল নানা মত॥
বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায় নিকা দান পায় সিকা সিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরী কুকুড়া জবাই করি দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেয় মাথা দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবখান মখদম পড়ায় পঠনা॥

নগরে ত বসিল, কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত বড় জুলুম আরম্ভ করিয়া দিল; দোকান পাট লুঠ হইতে লাগিল, লোকের ঝি বউ লইয়া বাস করা দায়

হইয়া উঠিল। প্রজারা রাজা কালকেতুর কাছে নালিশ করিল; কালকেতু ভাঁড়ুর মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া সহর হইতে দূর করিয়া দিলেন। ইহার শোধ তুলিতে ভাঁড়ু যাহা ঘটাইয়াছিল, তাহার ফলে পরে ভাঁড়ুর আরও খোয়ার হইয়াছিল, সে কথাটা এই খানে বলিয়া লই—ভাঁড়ুকে চিনিতে আর বাকি নাই—

এবে সে জানিনু তুমি ঠগ ভাঁড়ু দত্ত। আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব॥
ইনাম বাড়ী তোলা ঘরে তুমি কর ঘর। ঋণ বাড়ি নাহি সাধ নাহি দেও কর॥
এখন বলিস্ বেটা রাজার নফর। গৌরব রাখিয়া দেও তিন সনের কর॥
যাবত না দেহ বেটা তিন সনের কড়ি। নগরিয়া মেলি তোরে মারিবে চাবাড়ি॥
হবিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখি ঠার। মনের সন্তোষে আনে খুর ভোঁতা ধার॥
দঢায়া হুকুম পায় নাপিতের সুত। ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার ——॥
চামটি রহিতে ঘসে পদতলে ক্ষুর। দেখিয়া ঠগের প্রাণ করে দুরদুর॥
দূর হইতে শুনি যে ক্ষুরের চড়চড়ি। নাক শুণ্ডে ধরি তার উপাড়য়ে দাড়ী॥
বসন ভিজিল তার শোনিতের ধার। ভাঁড়ু বলে খুড়া দোষ ক্ষম একবার॥
পাঁচ ঠাঁই ভাঁড়ুর মাথায় রাখে চুলি। নগরিয়া মিলি তারে দেয় চূনকালি॥
পুরের কোটাল ভাঁড়ুর শিরে ঢালে ঘোল। পাছু পাছু ভাঁড়ুর বাজায় কেহ ঢোল॥
মালাকার আনি দেয় গলে ওড মাল। হাত তালি দেয় যত নগর ছাওয়াল॥
পুরের বাহির কৈল মারিয়া চাবাড়ি। ছড়া হাঁড়ি ফেলি মারে কোণের বৌয়াড়ী॥

বেচারীর দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয়। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত সম্বন্ধে আর একটু কিছু আছে, শুনাইয়া রাখি;—গলাধাক্কা খাইয়া—

পথে পড়া ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল। হাসিতে হাসিতে ভাঁড়ু বাড়ীতে চলিল॥
বাড়ীর নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী। সত্বরে আনিয়া দেও এক ঘটি পানি॥
প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির। ভাঙ্গা ঘটীতে পুরি বাহির করে নীর॥
ভাঁড়ুরে দেখিয়া তার রমণী চিন্তয়। দেওয়ানেরে গেলা প্রভু ধূলি কেন গায়॥
ভাঁড়ু এ বোলয় প্রিয়া শুনহ কর্কশা। মহাবীর সনে আজি খেলিয়াছি পাশা॥
ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটি হারি। রসে অবশ হৈয়া করে হুড়াহুড়ি॥

ধূলা ঝাড়ি বহু মতে পাইয়াছি রস। বীরের গায়েতে দিছি তার দুই দশ॥
কি বলিতে পারি প্রিয়া বীরের মাহাত্ম্য। যাহার পিরিতে বশ হৈল ভাঁড়ুদত্ত॥

শুধু এই নয়, মাথাটি ত লুকাইবার জো নাই—অগত্যা—

"লোকের সাক্ষাতে ভাঁড়ু কহে মিথ্যা কথা। গঙ্গাসাগরে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা॥"

আমাদেরও বলিতে হয়—সাবাস্ ভাঁড়ু!

শঠ বজ্জাত লোক, ভাঁড়ু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। কালকেতুকে শাসাইয়া কলিঙ্গ রাজার নিকট উপস্থিত হইল। কালকেতুর পরিচয় দিয়া খবর জানাইল—সে ব্যক্তি ছিল ক্ষুদ্র চুয়াড় ব্যাধ, এখন রাজা হইয়া তোমার দেশ ভাঙ্গাইতেছে। শুনিয়া কলিঙ্গরাজ কোটালের উপর চোটপাট করিলেন; সকল তত্ত্ব পাইয়া যুদ্ধে আসিলেন—সঙ্গে শত শত মত্ত হাতী, নব লক্ষ ফরিকাল—

আশী গণ্ডা বাজে ঢোল, তের কাহন সাজে কোল,
সবে ধরে তিন তিন কাঠি। ইত্যাদি

কালকেতু ও প্রস্তুত—

বীরবর লম্ফে, বসুধা কম্পে, অষ্টকুলাচল ফিরে।

খুব লড়াই হইল, প্রথমটা রাজসেনাকে ভঙ্গ দিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভাঁড়ুদত্তের প্ররোচনায় কলিঙ্গরাজ আবার যুদ্ধে আসিলেন। এবার ফুল্লরা ধরিয়া বসিল আর যুদ্ধে যাওয়া হইবে না। বাঙ্গালী কবির বীর স্ত্রীর পরামর্শ শিরোধার্য্য করিলেন, গুটিগুটি ধান-ঘরে যাইয়া লুকাইলেন। ভাঁড়ুদত্ত আসিয়া ছলে কৌশলে খুঁজিয়া বাহির করিল; কালকেতু বন্দী হইলেন, ফুল্লরা কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিল। বন্দী হইয়া বীরের চণ্ডীকে মনে পড়িল, পূর্ব্ব-কথা স্মরণ হইল; ব্যাধ-রাজা ভগবতীর স্তব করিয়া স্পষ্টই বলিল—

"দেহ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
ধন লয়্যা চণ্ডী মোর কর পরিত্রাণ॥"

ব্যাধ ছিলাম, ছিলাম ভাল। মা তোমার ধন তুমি ফিরাইয়া লও, আমি রাজত্ব চাই না, আমার ব্যাধগিরিই দাও।

দেবী চণ্ডী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নাদেশ দিলেন। দুই রাজায় সন্ধি হইল, কালকেতু আপন রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সময় হইয়া আসিয়াছে। সকলে জানিতে পারিল ব্যাধ-বীর শাপভ্রষ্ট ইন্দ্র-পুত্র নীলাম্বর, ফুল্লরা তৎপত্নী ছায়া, দেবী আপন পূজা প্রচারার্থ ছলে তাহাদিগকে মর্ত্ত্যে আনিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের শাপ মোচন হইল, চণ্ডী দম্পতীকে স্বর্গে লইয়া গেলেন; মন্দাকিনীতে স্নানান্তর তাঁহারা পূর্ব্বরূপ লাভ করিলেন—"নর্ত্তকে ফিরায় যেন বেশ।"

নীলাম্বর হৈতে হৈল ব্রতের প্রকাশ।

ইতি আখেটি খণ্ড সম্পূর্ণ।

আমরা দীর্ঘ দীর্ঘ সন্দর্ভ তুলিয়া অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছি। মুকুন্দরামের অল্প কথায় চিত্রাঙ্কনী শক্তির পরিচয় দিতে পারি নাই। দু এক স্থল দেখাইয়া দিই—

শিবের ক্রোধ—

স্মরহর ভ্রূকুটি নিষ্ঠুর ভীম মুখে।
নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে॥

মায়ামৃগরূপী দেবী, পশ্চাতে ব্যাধ—

রহিয়া রহিয়া যান দীঘল তরঙ্গ।
তার পাছে ধায় ব্যাধ যেমন পতঙ্গ॥

গোধিকারূপী ভগবতী ব্যাধ-গৃহে স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—

দূর হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির কেটেছে যেন তপন তরাসে॥

আর থাক্, আমাদের স্থানাভাব; এখনও অনেক কথা বলিতে আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে—

স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে চণ্ডী কৈলা মতি।

দেবী ছল করিয়া স্বর্গের নর্ত্তকী রত্নমালাকে অভিশপ্ত করাইয়া মর্ত্ত্যে আনিলেন—সে হইল খুল্লনা।

উজানি (বা উজ্জয়িনী) নগরে বিক্রমকেশরী রাজা; ধনপতি সদাগর তাঁহার বন্ধু। ধনপতি একদিন পথে পায়রা উড়াইতেছিলেন—(কবি অনেক জাতি পারাবতের নাম দিয়াছেন) একটী পায়রা শয়চানের ভয়ে উড়িয়া গিয়া খুল্লনাদের বাড়ী ধূলাখেলানিরতা বালিকার অঞ্চলে পড়িল। ধনপতি সন্ধান করিয়া গিয়া খুল্লনার নিকট পারাবতটী চাহিলেন। সদাগরটী হইতেছেন খুল্লনার জ্যেঠার জামাতা, সুতরাং খুল্লনা তাঁহার শ্যালীকা। সময় পাইয়া শ্যালী ঠাকুরাণী বলিলেন—

"যদি লবে পারাবত দাঁতে কর কুটা।"

কোন মতে পায়রা ত আদায় হইল। বালিকার সহিত আলাপের পর

কামশরে সাধুর মরমে লাগে ব্যথা।

খুল্লনার বয়স তখন দ্বাদশ বর্ষ! চমৎকার!

ঘটক পাঠাইয়া সম্বন্ধ প্রস্তাব হইল। কিন্তু খুল্লনার মাতা আপত্তি করিয়া স্বামীকে গঞ্জনা দিলেন—

"পাড়ি শুনি হৈলে পঙ্গু ব্যয় করি নিজ বহু কন্যা দিবে দারুণ সতীনে।"

সদাগরের ঘরে স্ত্রী একটী বর্ত্তমান।

কথা কাটাকাটির পর বিবাহ স্থির হইয়া গেল। ঘরের চেড়ী গিয়া সই সাঙ্গাতি ডাকিয়া আনিল—

ত্বরা হেতু সবাকার বিপর্য্যয় বেশ।	এলান কবরী তার নাহি বান্ধে কেশ ॥
এক করে কঙ্কণ নূপুর এক পায়।	অর্দ্ধকেশ আঁচড়িছে লঘুগতি ধায় ॥
এক চক্ষু কোণে কেহ দিয়াছে অঞ্জন।	এক কর্ণে কর্ণপূর ত্বরায় গমন ॥
শিশু দুগ্ধ দিতে কেহ নাহি করে মায়া।	কোন কোন আয়ো আসে লঘুগতি ধায়্যা ॥
কুড়িয়া জাঙ্গালে আয়ো দিল বাহুনাড়া।	আঁখির নিমিখে ভেঙ্গে আসে বণিক পাড়া ॥

যেন শ্যামের বাঁশী বাজিয়াছে!

এয়োগণ আসিয়া জামাই দেখিয়া—তবু দোজবরে বর—মহা খুসী, নিজ নিজ পতি-নিন্দা আরম্ভ করিলেন (ইহা—আমাদের প্রাচীন কবি-গণের একটি বাঁধি গৎ)।

ধনপতির প্রথম পত্নীটির নাম লহনা; সে বেচারী স্বামীর আবার দ্বিতীয় পক্ষ শুনিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল।

চতুর স্বামী তাহাকে পাটের শাড়ী, ৫ পল সোণার চুড়ী উপহার দিয়া আশ্বাসিত করিলেন—'সংসারে খাটিয়া তোমার বড় কষ্ট, তোমার দাসী আনিতেছি।' যথাবিধি শুভ বিবাহ হইয়া গেল। খুল্লনার মাতা জামাই বশ করিবার "ঔষধ" করিলেন—নানাবিধ অনুষ্ঠান—একটির গুণ—

সাধুর কপালে যদি দিবে পুনর্ব্বসু।
খুল্লনার হবে সাধু নাক-বিন্ধা পশু ॥

সাধু ধনপতি বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর প্রাপ্য "ঢেলাফেলা" প্রভৃতি সারিয়া "শয্যাতোলানী" প্রভৃতি জমা দিয়া, নব বধূ সহ ঘরে আসিলেন। ঘরে প্রথমা পত্নী লহনাও স্বামী বশ করিবার "ঔষধ" বাটিতেছে।

এ দিকে উজানি নগরের দুই ব্যাধ একদিন বনে "সাতনলা আঠা জাল ফান্দে" পাখী শিকার করিতে গিয়াছে (কবি এখানে নানা পক্ষীর নাম দিয়াছেন)। তাহারা এক জোড়া আশ্চর্য্য শুকশারী ধরিল, পক্ষী-

মিথুন কথা কয়, শাস্ত্র-পুরাণ জানে, প্রহেলিকা আওড়ায়! ক্রমে পাখী ছুটী রাজার নিকট পঁহুছিল, গুণের পরিচয় দিল, রাজা ও পারিষদবর্গ দেখিয়া ত অবাক্। পাখী পাইয়া রাজা স্বর্ণ-পিঞ্জরে রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু শুনিলেন দেশে পিঞ্জরও নাই, পিঞ্জর গড়িবার কারীগর ও নাই। গৌড় পাটনে ঐরূপ পিঞ্জর পাওয়া যায়। ধনপতি সাধুকে রাজা স্বর্ণ প্রদান করিয়া পিঞ্জর গড়াইতে গৌড় নগরে পাঠাইলেন।

স্বামী প্রবাসে, ঘরে লহনা খুল্লনা দু সতীনে খুব ভাব, বড় সতীন ছোটকে প্রাণ ঢালিয়া যত্ন করে—

দু সতীনে প্রেম বন্ধ দেখিয়া লাগয়ে ধন্দ।
স্বর্ণ জড়িত যেন হীরা।

ঘরে দুর্ব্বলা নামে এক দাসী আছে, সে ত সপত্নীদ্বয়ে এত ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল, সে স্থির করিল—

একের করিতে নিন্দা যাব অন্য স্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥

যেখানে লহনা চিরুনী লইয়া কেশ বাঁধিতেছিলেন, দুর্ব্বলা সেখানে যাইয়া তাঁহার চোখ ফুটাইতে লাগিল—

"শুদ্ধমতি ঠাকুরাণি নাহি জান পাপ। দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥
সাপিনি বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে। অবশেষে ওই তোমার বধিবে পরাণে॥
নানা উপহার দিয়া পোষহ সতিনী। আপনার কর্ম্মনাশ করিলে আপনি॥
খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর। অই ছাড়াইবে তোমার স্বামীর কোল॥
কলাপী-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ। অর্দ্ধ পাকা কেশে তোমার কি করিবে বেশ॥
খুল্লনার মুখশশী করে টলমল। মাছিতা পড়িল তোমার এবে গণ্ডস্থল॥
কদম্ব-কলিকা জিনি খুল্লনার স্তন। তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন॥
ক্ষীণ-মধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী। যৌবন-বিহীনা তুমি হলে ঘটোদরী॥
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন। খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন॥

অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥
নেউটিয়া আসে ধন সুত বন্ধুজন। নাহি নেউটে পুনরপি জীবন যৌবন॥"

তাই ত ! কথা শুনিয়া লহনার চৈতন্য হইল। তিনি দুর্ব্বলাকে পুরস্কৃত করিয়া তাহাকে দিয়া সই লীলাবতী ব্রাহ্মণীকে ডাকাইয়া আনিলেন। লীলাবতী নানান্ "তুক্তাক্" জানে। সে আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে চাহিল।

লীলার নিজের ছয় সতীনের ঘর—ঘরের পরিচয় দিতে কহিল—

ঔষধের গুণে স্বামী বোল শুনে যেন পিঞ্জরের শুয়া।
নিদ্রা গেলে আমি চিয়াইয়া স্বামী মুখে তুলে দেই গুয়া॥
ঔষধের বশে প্রকার বিশেষে স্বামী ধূলা ঝাড়ে মুখে।
গেলে পিতৃবাস করে উপবাস যাবত মোরে না দেখে॥

তাহার ঔষধের গুণে কত বিখ্যাত মহা মহাপুরুষ বশ হইয়াছে—এমন ঔষধ তাহার জানা আছে—

পঞ্চপতি এক নারী দ্রুপদনন্দিনী।
ইহাতে বঞ্চিত কৈল সকল সতিনী॥*

কিন্তু শুধু ঔষধ নহে, খুল্লনার রূপযৌবনও নষ্ট করা চাই—আর এক চাল চালিতে হইবে। দুই সই মিলিয়া যুক্তি করিলেন, সদাগরের নাম জাল করিয়া এক কৃত্রিম পত্র প্রস্তুত হইল—তাহাতে লহনার প্রতি আদেশ—খুল্লনার অষ্ট আভরণ কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছাগল চরাইতে নিযুক্ত করিবা এবং—

"পরিবারে দিহ খুঞা উড়িতে খোশলা।
শয়নের স্থান তারে দিহ ঢেঁকিশালা॥"

---

* নানা গুণের তর-বেতর নানা ওষুধের দীর্ঘ তালিকা আছে, পড়িতে পড়িতে আমাদের Shakespere-র ডাকিনীদিগকে মনে পড়ে। তখনকার কালে সকল দেশেই তুকতাক্ তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস ছিল। উভয় কবি প্রায় সমসাময়িক।

কৃত্রিম দুঃখভরে গলদশ্রুলোচনে লহনা সপত্নীকে পত্র দিলেন; পত্র দেখিয়া খুল্লনা বুঝিতে পারিলেন—স্বামীর হস্তাক্ষর নহে; তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে গেলেন; তখন দুই সতীনে মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল; গালিগালাজ হইতে হইতে বাহু নাড়া, দৈবাৎ খুল্লনার হাত লহনার মুখে ঠেকিয়া গেল, আর পায় কে? তখন

ক্রমে—

"দোঁহে করে ধুম কিলের গুম্ গুম্ মেঘ যেন শিলা বরিষণ"

লহনার চড় ঠোক্‌না আরম্ভ হইল। দু সতীনে কেশাকেশি—শেষে লহনা, গহনাপত্র কাড়িয়া লইয়া

কেশ ধরি কিল লাথি মারে তার পিঠে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে গোয়ালা গোয়াল যেন পিটে॥

(আমাদের মনে রাখিতে হয়, ইহা বড়মানুষের ঘরের চিত্র—দরিদ্র কবির অঙ্কিত)।

খুল্লনা হারিয়া গেলেন, অগত্যা তাঁহাকে ছাগ-রক্ষণে স্বীকৃত হইতে হইল। কু-এর গোড়া দুর্ব্বলা দাসী তাহার মুখে চোখে জল দিয়া হাতে ধরিয়া তুলিল; থুঞা পবাইয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া চুল বাঁধিয়া দিল। ধনবান সওদাগরের সুয়া পত্নী—

ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল। ছাট হাতে পাত মাথে যেমন পাগল॥
নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি। দেখিয়া কৃষাণ সব দেয় গালাগালি॥
শিরিষ কুসুম তনু অতি অনুপম। বসন ভিজিয়া তার গায়ে বহে ঘাম॥
উজানির নিকটে অজয় নদীর ধার। কোলেতে করিয়া রামা ছেলি করে পার॥
প্রবেশ করিল ছেলি গহন কানন। কেওড়িয়া ডাঙ্গায় রামা দিল দরশন॥
চোর ছাগল সব চারিদিকে যায়। ভুকিল কুসুম কাঁটা রক্ত পড়ে পায়॥

বসন্তে খুল্লনার খেদ—

মাঘে মকরকেতু আইল বসন্ত ঋতু তরুলতাগণ পুলকিত।
অজয় নদীর কূলে অশোক তরুর মূলে কামশরে রামা চমকিত॥
লোহিত পল্লবগণ রামার হরয়ে মন দেখি মনে ভাবয়ে খুল্লনা।
বসন্ত আসিয়া কিবা অটবী করিল শোভা ভালে দিয়া সিন্দুর অর্চ্চনা॥
এক ফুলে মকরন্দ পান করি সানন্দ ধায় অলি অপর কুসুমে।
যেন- এক ঘরে পেয়ে মান গ্রামযাজী দ্বিজ যান অন্য ঘর চলেন সম্ভ্রমে॥
মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে পড়য়ে কুসুম বনে অঞ্জলি পাতিল খুল্লনা।
হইয়া কামের দাস প্রভু আসিবেন বাস ভাবি করে কামের অর্চ্চনা॥
কোকিল পঞ্চম গায় অলি মকরন্দ খায় মন্দ মন্দ সুগন্ধি পবনে।
তরু ডালে শারী শুকে আলিঙ্গন মুখে মুখে দেখি রামা আকুল মদনে॥

একদিন প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘামিয়া খুল্লনা তরুতলে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় দেবী চণ্ডী আকাশ-পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন ; সহচরীর নিকট হইতে তাহার পরিচয় শুনিয়া এক মায়া পাতিলেন ;—একটি ছাগল লুকাইয়া রাখিয়া খুল্লনাকে জাগাইয়া দিলেন। খুল্লনা বেচারী খুঁজিয়া খুঁজিয়া ত হায়রাণ। কাঁদিয়া মুখ মলিন, পথে হোঁচট খাইয়া পায়ে রক্ত ঝরিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে, একান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত, অকস্মাৎ যেন কোন সরোবরে হুলাহুলী শব্দ কাণে আসিল, সেইদিক পানে ছুটিতে হইল, অদূরে মায়ার দেবকন্যাগণ ছিলেন। অভাগিনী হাত যোড় করিয়া আপন পরিচয় দিয়া পলাতক ছাগলের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তাহাকে উপদেশ দিলেন—

বিপদ নাশিবে যদি ব্রত কর তুমি।
পূজিবে অম্বিকা প্রতি মঙ্গল বাসর।
বিপদ সাগরে চণ্ডী হইবে কাণ্ডার॥

তাঁহাদের নিকট হইতে খুল্লনা পূজোপকরণ পাইল, চণ্ডী-ব্রত ধরিয়া দেবীর পূজা করিল ; দেবী চণ্ডী আবির্ভূতা হইয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন—

"মূর্খ্যা গৃহিনী ঘরে, হবে পুত্রবতী।"

দেবী পূজা পাইয়া মহা সন্তুষ্ট; লহনাকে স্বপ্নে ভয় দেখাইলেন। ভয় খাইয়া লহনা খুল্লনাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার নিকট মাপ চাহিয়া ভাব করিল; আবার সপত্নী-সোহাগ চলিল—সংসারে সুখ আসিল—বোঁচা বিড়ালটিও মাছের কাঁটা পাইয়া বাঁচিল।*

দেবী চণ্ডী গৌড় দেশে ধনপতিকেও গৃহের চিত্র দেখাইয়া স্বপ্ন দিলেন; সদাগরের খেয়াল হইল, তিনি তাড়াতাড়ি গৌড়াধিপের নিকট বিদায় গ্রহণান্তর মনোহর সুবর্ণ পিঞ্জর সহ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তখন সে অদ্ভুৎ শুকশারী উড়িয়া গিয়াছে। ধনপতি গৃহাভিমুখে আসিতেছেন, লহনার আবার "ওষুধ" করিবার সখ চাগাইয়া উঠিল, আবার দুর্ব্বলার শরণাপন্ন হইতে হইল। দুর্ব্বলা বিপরীতগামী বায়ুচালিত পতাকার ন্যায় দুই মুখে ছুটিয়া একবার বড় মার কাছে একবার ছোট মার কাছে মনরাখা কথা কহিয়া পুরস্কার আদায় করিতে লাগিল।

সাধু গৃহে আসিয়া গৃহিনীকে ডাক দিলেন। খুল্লনা সুন্দরী ইন্দ্রের নাচনী, নাচনীর মত স্বামী-সকাশে অগ্রসর হইলেন, পতি রসিকতা করিতে লাগিলেন—

"বদন শারদ-ইন্দু তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু সুধাংশু মণ্ডলে যেন তারা।
রাহু তোর কেশপাশ আইসে করিতে গ্রাস পুণ্যের সময় হইল পারা॥

লহনার ঈর্ষ্যা দেখে কে? তিনিও নানা বেশ-ভুষায় সজ্জিত হইয়া মেঘডম্বরু সাটী পরিয়া গুয়ামুটী কবরী বাঁধিয়া পতিকে ভুলাইতে পারিবেন

---

* এই সময়ে ভগবতী চণ্ডী কাকরূপ ধরিয়া খুল্লনার দৌত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। খুল্লনা তাহাকে "হেম থালে পকাশ ব্যঞ্জনের" লোভ দেখাইয়া কহিয়াছিল—

আসিবেন মোর পতি উড়ি যাও শীঘ্রগতি পুনরপি বৈস মোর চালে"

—দরিদ্র কবির "চালা" ঘুচিবরা নহে।

কি না বুঝিবার জন্য দর্পণে আপনার মুখখানি দেখিতে গেলেন— (পোড়ামুখ না দেখিলেই ছিল ভাল)—

মাছিতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।

সদাগর সুরসিক, জ্যেষ্ঠা পত্নীর সহিতও নাগরালি করিতে ছাড়িলেন না। লহনা ত খুল্লনার প্রতি দুব্য ́বহারের কথা গোপন করিল, বরং বুঝাইয়া দিল—

নাহি রাঁধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফুঁ।
পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদ পারা মু॥

স্বামী মনস্তুষ্টি সাধিতে লাগিলেন। দুর্ব্বলা হাটে গেল, কত কি খরিদ করিল, সে হাটের হিসাব বর্ণনা চমৎকার। (এই বিবরণ বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর বেসাতির মূল)।

ধনপতি খুল্লনার উপর রন্ধনের ভার দিলেন। চণ্ডীর বরে খুল্লনা নানা অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া সাধুব পরিতোষ করিলেন। (পড়িতে পড়িতে আমাদের রসনা সরস হইয়া উঠে!) ভোজনকালে নানাবিধ রস আস্বাদনের সহিত রঙ্গরসও বাদ পড়ে নাই।

তারপর বিরাম-ঘর—ধনবান সওদাগরের বিলাস-গৃহ—শয্যাগার। সেখানে ছোট গৃহিণীকে ডাক পড়িয়াছে। বড় গৃহিণী নানা ভয় দেখাইয়া তাহাকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলেন, হইল না।

(কবিকঙ্কণেও বিহার বর্ণনা আছে—অনেকটা ভব্য আবরণে গুণ্ঠিত।) বিবিধ রসরঙ্গের পর খুল্লনা স্বামীর কাছে স্বীয় ছাগ-রক্ষণের ব্যাপার, আপনার দুঃখ কষ্টের কথা বলিয়া দিলেন; আবার এক বারমাস্যা। শুধু তাই নহে, সেই "খুঞা" বস্ত্রখানি এবং জালপত্র খানিও আনিয়া দেখাইলেন। দেখিয়া শুনিয়া সাধু ত রাগিয়া আগুন। লহনাকে "বাঁঝি" "দূর হ" "পাউড়ির বাড়ী খাইবি" প্রভৃতি বলিয়া বিস্তর গালি-

গালাজ করিলেন। কিন্তু মদন বড় বাঁকা দেবতা, শীঘ্রই লহনার সঙ্গে আবার ভাব হইয়া গেল। দুই স্ত্রী লইয়া ধনপতি সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। (মধ্যে কাদাজল মাখিয়া আর এক উৎসব হইয়া গেল।)

দেবীর পূজা প্রচারের বাঞ্ছা সম্যক্ পূর্ণ হয় নাই। ওদিকে স্বর্গে মহেশের শাপে—অবশ্য দেবীর ছলনায়—দেবনর্ত্তক মালাধরের তনু ত্যাগ হইয়াছে; তিনি খুল্লনা-জঠরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার দুই পত্নী সহ-মৃতা হইলেন—

শোকে উন্মত্ত বেশ মুক্ত মাথার কেশ আম্রপল্লব করে ধরি।
অবশেষ নৃত্য গায় অগোর চন্দন কায় দুই সতী করে চারু বেশ।
স্বর্গগঙ্গার নীরে স্নান করিয়া তীরে অনলে করিল প্রবেশ॥

দুই জনের একজন গিয়া সিংহলে শালবান রাজার কন্যারূপে, অন্যজন উজানির বিক্রমকেশরী রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

একদিন পুরুৎঠাকুর আসিয়া ধনপতিকে শুনাইলেন—বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি সমাগত—"পিতৃকার্য্যে ভায়া দেহ মন"; আর তুমি ধনবান "লক্ষের সদাগর"—দেদার ব্রাহ্মণ বিদায় কর এবং কুটুম্ব ভোজন করাও। ধনপতি দেশে নানাস্থানে কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন; নামজাদা বর্দ্ধিষ্ণু বহু কুটুম্ব বেণিয়ার দল উপস্থিত হইল। মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে—

চন্দন কুসুম মালা, পূরিয়া কনক থালা,
সাধু গেলা বান্ধব পূজনে।

তখন "মালা চন্দন" লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধিল। নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালীর সুন্দর একটি সামাজিক চিত্র—

মনে ভাবে সভাসির করি কার পূজা। সবার অধিক বটে চান্দ মহাতেজা॥
গোত্রে দুর্ব্বাসা বটে কুলের প্রধান। ইহার অগ্রেতে পূজা কেবা লবে আন॥
এমন বিচা সাধু করি সথা সনে। আগে জল দিল চান্দ বেণের চরণে॥

কপালে চন্দন দিল মাল্য দিল গলে। এমন সময়ে শংখ দত্ত কিছু বলে॥
বণিক সভায় আমি আগে পাই মান। ধুষ দত্ত জানে হরিশ্চন্দ্র বিদ্যমান॥
যে কালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধুষ দত্ত। তাহার সভায় বেণে আইল ষোল শত॥
ষোলশত মধ্যে শংখ দত্ত পাইল মান। সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥
ইহা শুনি ধনপতি দিলেন উত্তর। সে কালে না ছিল কিবা চান্দ সদাগর॥
ধনে জনে রূপে শীলে চান্দ নহে বাঁকা। বাহির মহলে যার সাত বাখারি টাকা॥
ইহা শুনি কিছু বলে নীলাম্বর দাস। ধন হইতে হয় কিবা কুলের প্রকাশ॥
ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়। ধন হৈতে সভা মাঝে চান্দ হৈল ষাঁড়॥
চান্দ বলে তোরে জানি নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু জানি ইতিহাস॥
হাটে বাটে তোমার বাপ বেচিত আমলা। যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা॥
অনুক্ষণ হাতাহাতি বারবধূ সনে। নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥
কড়ির পুঁটুলি সে বান্ধিত তিন ঠাই। সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই॥
নীলাম্বর দাস বলে শুন রাম (চান্দ ?) রায়। পসরা করিতে বাপা নাহি প্রত্যবায়॥
কড়ির পোঁটলি বান্ধি জাতি ব্যবহার। এঁটো চোপা খাইলে নাহি কুলের খাঁখার॥
নীলাম্বর দাস রাম রায়ের শ্বশুর। ধনপতি গঞ্জি কিছু বলয়ে প্রচুর॥
জাতি বাদ যদি হয় তবে এই বঙ্ক। বনে জায়া ছেলী রাখে তবে সে কলঙ্ক॥

সে সময় সভামধ্যে পুরাণ পাঠ হইতেছিল। হরিবংশে কংস-জননীর কথা, রামায়ণে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া খুল্লনার পরীক্ষা দিবার প্রস্তাব উঠিল। ধনপতি ক্ষোভে লজ্জায় লহনাকে আবার ভৎসনা করিতে লাগিলেন; খুল্লনাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—পরীক্ষা দিতে হইবে না—

"দূর কর শঙ্কা দিয়া লক্ষ তঙ্কা বান্ধবে করিব বশ।"

অভিমানিনী নারী তাহাতে সম্মত হইলেন না; বুদ্ধিমতীর মত বলিলেন, একবার ধন দিলে, বারবার দিতে হইবে, অথচ চিরকাল খোঁটা থাকিবে; পরীক্ষাই হউক। স্পষ্ট বলিলেন—

"পরীক্ষা দিতে প্রভু যদি কর আন। গরল ভক্ষিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥"

ধনপতি পত্নীকে শুদ্ধচরিত্রা জানিতেন, এখন বিশ্বাস আরও দৃঢ়

হইল; তিনি প্রস্তাব করিলেন—খুল্লনা রন্ধন করিবে, সমাগত কুটুম্বগণ ভোজন করিবেন। তখন সকলে ছুতা খুঁজিতে লাগিলেন; কেহ মাথা হেঁট করিলেন, কেহ দশমীর দিন আমিষ ভোজন করেন না, কাহারও ভিন্ন গোত্রে আহার নিষেধ, ইত্যাদি—কেহ বা—

ধনপতি কটাক্ষিয়া বলে কদুত্তর। রুষিয়া ত ধনপতি দিলেন উত্তর॥
বায়ান্ন পুরুষ যার লোণের ব্যাপার। সেই বেটা সভা মাঝে করে অহঙ্কার॥
হাটে লয়ে বেচে লোণ কিনে ডোম হাড়ী। বিয়াজের তরে ছুঁয়্যা করে কাড়াকাড়ি॥
পাঁচ পণ বেচিতে করে এক পণ চুরী। মধ্যখানে বসিয়া লুণের আড়ম্বরি॥
ধনপতি তারে যদি বলিল লুণ্যা ভণ্ড। সভার উকীল হয়ে বলে রাম কুণ্ড॥
নীলাম্বর দাস তাকে চাপিলেন অক্ষি। হাত পসারিয়া সভাস্থানে কৈল সাক্ষী॥
জাতিতে বণিক লোণ বেচে সর্ব্বকাল। কেহ লোণ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল॥
তুমি যারে বিয়া কৈলে রূপসী দেখিয়া। বনে বনে বেড়ায়েছে ছাগল রাখিয়া॥
শুথানের মৎস্য আর নারীর যৌবন। ত্রপান্তরে পায় যেবা রজত কাঞ্চন॥
অযত্নে পাইলে ইহা ছাড়ে কোন জন। বিশেষ ভুলয়ে ইথে মুনী জনার মন॥

পরীক্ষা দেওয়া ভিন্ন আর উপায় রহিল না। চণ্ডী দেবীর পূজা করিয়া খুল্লনা আগাইয়া আসিলেন; জল পরীক্ষা, সর্প পরীক্ষা, জ্বলন্ত লৌহ পরীক্ষা, ফুটন্ত ঘৃত পরীক্ষা, পণই পরীক্ষা, জৌঘর পরীক্ষা সকল পরীক্ষাই দিলেন; সতী সাধ্বী সব তাতেই জয়ী হইলেন।

তখন বেণের দল খুল্লনার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিয়া সম্পর্ক পাতাইয়া নিরস্ত হইল; খুল্লনার স্বহস্তের পাক সপরিতোষে সকলে ভোজন করিল এবং নানা উপহার লইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

জ্ঞাতি-ঝঞ্ঝাট মিটিল, সাধু রাজদর্শনে গমন করিলেন; তথায় আর এক নূতন আপদ। রাজা পুরাণ শ্রবণ করিতেছিলেন, শঙ্খ চন্দনের মহিমার কথা হইতেছিল। রাজা শঙ্খ চন্দন চাহিলেন, শুনিলেন ভাণ্ডারে নাই। ধনপতি প্রিয় সদাগর, তখন তাহার

উপর আদেশ হইল, দক্ষিণ পাটন হইতে আবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহ কর। ধনপতি এড়াইবার চেষ্টা করিলেন, সক্ষম হইলেন না। আবার প্রবাস যাইতে হইবে, শুনিয়া লহনার বড় হর্ষ হইল; খুল্লনা কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিলেন—তাঁহার তখন ছয়মাস গর্ভ। রাজার আদেশ, যাইতেই হইবে; গমনকালে সদাগর পত্নীকে "জয়পত্র" লিখিয়া দিয়া গেলেন;—গর্ভ স্বীকার করিয়া কন্যা হইলে "শশীকলা"ও পুত্র হইলে "শ্রীপতি" নাম রাখিবার আদেশ দিলেন।

পূর্ব্ব হইতে ভ্রমরা নদীর জলে ডিঙ্গা ডুবান ছিল; ডুবারু লইয়া সেই ডিঙ্গা—সাতখানা—তুলিয়া সাজন করাইলেন। তার পর বদলের দ্রব্য বোঝাই লইয়া শুভ দিনে শুভক্ষণে বাণিজ্যে যাত্রা।* বাড়ী ছাড়িবার সময় লহনা আসিয়া সাধুকে চুপে চুপে সংবাদ দিল—খুল্লনা ডাকিনী-দেবতা পূজা করিতেছে। সাধু যাইয়া দেখিলেন, খুল্লনা চণ্ডী পূজায় নিযুক্ত,—তখন—

লজ্জিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে।

(কবির সময়ে স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বটে)।

ভূমিতে দেবীর বারি গড়াগড়ি যায়।
শূন্য ঘট ঠেলিয়া ফেলিল বাম পায়॥

স্পষ্ট বলিলেন—

"স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।"

---

* বদল আশে নানা দ্রব্য নায়ে ভরা দিবার কথায়—"শুক্তির বদলে মুক্তা" "হরিতাল বদলে হীরা" প্রভৃতি পাইবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এমন বিনিময় সত্যসত্যই হইত না কি? ৩৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী কি এত বড় সেয়ানা বণিক ছিল? সম্ভবতঃ দ্রব্যের নাম গুলি কথার মাত্র।

খুল্লনা বুঝাইতে চেষ্টা করিল, পতি না বুঝিয়া চলিয়া গেলেন। যাত্রাকালে নানা অমঙ্গল লক্ষিত হইল। দেবী চণ্ডী মহা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

(দেখা যাইতেছে, তখনকার কালে বণিক সম্প্রদায় ঘোর শৈব ছিল, শক্তিদেবী মানিত না।)

সদাগর ধনপতি নানা দেশ নানা নদী বাহিয়া, দেবীর কোপের ফলে মগরায় দারুণ ঝড় বৃষ্টিতে ছয় ডিঙ্গা হারাইয়া, পথে কাঁকড়াদহ কুম্ভীরদহ প্রভৃতি উত্তরাইয়া বহুকষ্টে সেতুবন্ধের পর সিংহলের নিকট কালীদহে পঁহুছিলেন। তখন মায়াময়ী অভয়া সাধুকে ছলিবার জন্য এক মায়া পাতিলেন। নৌকার দাঁড়িমাঝি কেহ দেখিতে পাইল না, ধনপতির চক্ষে এক অদ্ভুত দৃশ্য উদ্ভাসিত হইল! দেখিতে দেখিতে তিনি আওড়াইতে লাগিলেন—

গভীর দেখি যে জল তাহে নানা উতপল মনোহর কমল-উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা কিবা করে শিবপূজা কিবা পূজে প্রভু ভগবান॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদল বিকসিত কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন মোর লয় জ্ঞান দেবতার উদ্যান দেখি যত কুসুম সম্পদ॥
নাহি জানি কিবা হেতু এক কালে ছয় ঋতু গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু বরিষা শরৎ ঋতু বিরহী জনের করে অন্ত॥
রাজহংস করে কেলি কৌতুকে মৃণাল তুলি প্রিয়া মুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বান্ধি মাছে সারস সারসী নাচে উঠে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥
বনে ডাহুকা ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে বদনে বদনে আলিঙ্গন।
সঙ্গে চারি পাঁচ যামী তাণ্ডব করয়ে কামী মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥
হেন মোর লয় মতি বিধাতার নহে কীর্ত্তি অপরূপ দেখি কালীদহে।
কমলে কুমুদ ফুটে কার কান্তি নাহি টুটে চিত্র গন্ধ ভাল বায়ু বহে॥
কি আশ্চর্য্য কালীদহে স্রোতে বৃক্ষ নাহি রহে দেখিয়া আমার বপু কম্পে।
গোঁ গজ বাহন অরি তার পৃষ্ঠে ভর করি শতদলে ফিরে লম্ফে লম্ফে॥
দেখিয়া কমল শোভা সাধুকে লাগিল লোভা শঙ্কর পূজিব শতদলে।

কমলে কামিনী দেখি সুখে সাধু মুদে আঁখি কুসুম নিকরোপরি পড়ে॥
পুন সাধু মিলে আঁখি শতদলে শশীমুখী উগারি গিলয়ে করিবরে।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে সাধু ত এই দৃশ্য দেখিতেছেন—দাঁড়ী মাঝিরা কেহই কিছু দেখিতে পাইতেছে না; বণিকবর কর্ণধারকে সাক্ষী করিতে চাহিলেন, সে খুলিয়া বলিল—"করী পদ্ম শশীমুখী আমি কিছু নাহি দেখি"—তখন ধনপতি আবার আরম্ভ করিলেন—

অপরূপ দেখ আর ওহে ভাই কর্ণধার কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে উগারিয়া করয়ে সংহার॥
কনক কমল রুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচী মদন-সুন্দরী কলাবতী।
স্বরস্বতী কিম্বা রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা সত্যভামা কিবা অরুন্ধতী॥
রাজহংসরব জিনি চরণে নূপুর ধ্বনি দশ নখে দশ ইন্দু ভাসে।
কোকনদ দর্প হর বেষ্টিত যাবকবর অঙ্গুলী চম্পক পরকাশে॥
অধর বন্ধুক বিন্দু বদন শারদ ইন্দু কুরঙ্গ খঞ্জন বিলোচন।
প্রভাত ভাস্কুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা তনুরুচি ভুবন মোহন॥
অতি ক্ষীণ কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি নিবিড় নিতম্বদেশ ভার।
বদন ঈষৎ মিলে কুঞ্জর উগারি গিলে জাগরণে স্বপন প্রকার॥
বামার ঈষৎ হাসে গগণ মণ্ডল ভাসে দন্তপাতি বিজিত বিজুলী।
বদন-কমল গন্ধে পরিহরি মকরন্দে কত কত শত ধায় অলি॥
দুই করে শোভে শঙ্খ ভুবনে উপমা বঙ্ক মণিময় মুকুট মণ্ডল।
হাসিতে বিজুলী খেলে শ্রবণে কুণ্ডল দোলে তনুরুচি ভুবন মোহন॥

ধনপতি বলেন সিংহলেশ্বরের নিকট সমস্ত নিবেদন করিতে হইবে, সকলে সাক্ষী হও; কর্ণধার বলে, আমরা কেহ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; তখন সাধু আবার দেখিতে দেখিতে দেখাইতে লাগিলেন—

প্রামাণিক যোজন গম্ভীর বহে জল। ইথে উপজিল ভাই কেমতে কমল॥
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভর। তরঙ্গ হিল্লোলে রামা করে থর থর॥
নিবসে পদ্মিনী তাহে ধরিয়া কুঞ্জর। হরি হরি নলিনী কেমতে সহে ভর॥
হেলে কমলিনী উগারয়ে যূথনাথে। পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥

পুনরপি বামা তারে করয়ে গরাস। দেখিয়া হৃদয়ে বড় লাগয়ে তরাস॥
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ। বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ॥
খদির তাম্বূল রাগ ওষ্ঠ নাহি ছাড়ে। গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে॥
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন। পঞ্চম গায়েত অলি নাচে পিকগণ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে নাচে মত্ত মধুকর। পরাগে ধূষর লতা চারু কলেবর॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী। দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে নানা জাতি॥
ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন। কুন্দ কুমুদ আছে বকুল রঙ্গন॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর। নেতের পতাকা উড়ে শ্বেত চামর॥
বিনান পাটের থোপ মুকুতার মালা। বিচিত্র বিনোদ তাতে সুরঙ্গ প্রবালা॥
তার মাঝে বিকশিত কমলকানন। কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ॥
উগারিয়া মত্ত করি ধরে অবহেলে। ঈষৎ হাসিয়া রামা চৌদিকে নিহালে॥
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে বাহু তুলি পঞ্চম গায়েত মত্ত অলি পাঁতি মিলি॥
রবাব খমক ডম্ফ করয়ে বাজন। রঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরী গণ॥
উষা উমা হয় কিবা রতি অরুন্ধতী। ভবানী ভৈরবী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী॥

ধনপতি সমুদয় ব্যাপার লিপিভুক্ত করিয়া লইয়া সিংহলে উপস্থিত হইলেন। রত্নমালার ঘাটে নামিয়া, নানা মূল্যবান রাজভেট (সঞ্চান পাখী, কেন্দো বাঘ, শিকারী কুকুর পর্য্যন্ত) গ্রহণান্তর ক্রমে রাজসভায় উপনীত। তথায় অন্যান্য কথোপকথনের পর কমলে কামিনীর কথা হইল, সভা-সদবর্গ হাসিয়া উঠিলেন। ধনপতি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহা বলিয়াছেন, দেখাইতে না পারিলে ডিঙ্গা শুদ্ধ মাল জরিমানা দিয়া দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকিবেন। সপারিষদ রাজা কমলেকামিনী সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। তখন কোথায় বা সমুদ্রে কমলকানন, কোথায় বা কমলে কামিনী—সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞানুসারে সদাগরকে বন্দী হইতে হইল। ডিঙ্গার মালপত্র লুণ্ঠিত হইল, ডিঙ্গার মাঝি-মাল্লা বাঙ্গাল, বাঙ্গাল ভাষায় বাফৈ বাফৈ করিয়া কান্দিয়া আকুল—

বাঙ্গাল কান্দেরে হড়র বাফৈ বাফৈ। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
গলায় বাঙ্গাল সব ফেলাইয়া সোলা। হেঁট মাথা করি রয় কাঁকতলি মালা॥

আর বাঙ্গাল বলে বাই গায় নাই বল। আমার জীবন ধন এড়রে হিন্দল॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই বৃথা কৈলে দন্দ। পুরুষ সাহেত মোর হারাল কাসন্দ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই হইনু অনাথ। হর্ব্ব ধন গেল মোর হুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই জীবনে হতাস। জীবনে কাতর বড় হারায়ে বাতাস॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ। অলদি গুড়ি বাস্যা গেল জীবনে কি কাজ॥
অলদি গুড়ি হুকৃত পাতা হিদোল হিক্কই। মজাইল হর্ব্বধন কেমনে কুলাই॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই এই হৈল গতি। দক্ষিণ পাটনে মৃত্যু বিধাতার লিখতি॥
যুবতী যৌবনবতী তেজিলাম রোষে। আর বাঙ্গাল বলে দুখ পাই গ্রহ দোষে॥
ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো। আর বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মাগু পো॥
কপর্দ্দক হেতু পরাধীন যেই জন। আর বাঙ্গাল বলে তার বৃথায় জীবন॥
কেন আজি রহিলাম থাইয়া আপনা। বিপাকে মজিল মোর হর্ব্ব হস্বাপনা॥
শিশুমতি সাধু নাহি বুঝে হিতাহিত। রাজার সভায় কেন কয় বিপরীত॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই যেই নাহি বুঝে। ক্ষিতিতলে মরণে প্রকৃতি নাই গুচে॥

এদিকে সাধুকে করিল রাজা নিগড় বন্ধন—

সওয়া ক্রোশ ঘর থান একটি দুয়ার। দিন দুই প্রহরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥

* * * * *

গলায় জিঞ্জির দিল চরণে নিগড়। বুকে তুলি দিল পাঁচ সাঙ্গির পাথর॥
জটে দড়ি দিয়া বান্ধে চালের উপরে। নড়িতে চড়িতে তারে পোতা মাঝি মারে॥

দেবী চণ্ডী স্বপনে ধনপতিকে জানাইলেন—সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, নষ্ট ধন ফিরিয়া পাইবে, যদি মহামায়াকে ভজ। কিন্তু সাধু স্থিরপ্রতিজ্ঞ—

"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণি।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥"

এমনই দৃঢ় শিব-ভক্ত। (আমাদের কবি শৈব ও শাক্তে ভেদ দেখাইয়াছেন)।

এদিকে দেশে উজানি নগরে খুল্লনা সুন্দরীর মহাসমারোহে শুভ

সাধভক্ষণ হইয়া গেল। (কবি সাধের সামগ্রীর এক দীর্ঘ ফর্দ্দ দিতে ভুলেন নাই—শাকই বিশ পঁচিশ রকম)। যথা সময়ে বণিক-পত্নী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। যথারীতি নিয়মকর্ম্ম ষষ্ঠি-পূজাদি হইল, দৈবজ্ঞ ঠাকুর আসিয়া ঠিকুজি কোষ্ঠি লিখিয়া পিতৃ-আদেশ অনুসারে শ্রীপতি নামকরণ করিয়া গেলেন। খুল্লনা পতির জন্য আপশোষে সারা; দুর্ব্বলা দাসী শিশুটিকে মানুষ করিতেছে—তাহার ডাক নাম হইয়াছে "শ্রীমন্ত" ও "ছিরা"।

কিছু দিন যায়, লহনা "কথা" দিয়াছেন; তাঁহার জন্য রোজ ভাগবত পাঠ হয়। ভাগবত শুনিয়া শুনিয়া শ্রীপতি সঙ্গী বালকগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা খেলা করে; মনোহর দুর্ল্লিত শিশু। পঞ্চম বর্ষে শ্রবণ-বেধ, তারপর গুরু মহাশয়ের পাঠশালে বিদ্যাশিক্ষার্থ দেওয়া হইল। আমরা দেখিতে পাই, অসাধারণ প্রতিভাবলে শিশু অল্পদিন মধ্যে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু গুরুমারা বিদ্যাও শিখিয়াছে। একদিন পাঠশালে শ্রীহরির ভক্তাভক্তের স্বর্গপ্রাপ্তি লইয়া তর্ক উঠিল, শাস্ত্রজ্ঞ শিশু গুরুমহাশয়কে গুরুতর প্রশ্ন করিয়া বসিল। মূর্খের স্বভাব যাহা, গুরুঠাকুর চটিয়া লাল; প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু কহিলেন—

"উচিত বলিতে তোর মাথা হবে হেঁট"।

বালক আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—এ কথার কারণ কি? গুরুমহাশয় কারণ জানাইলেন—

"পিতা দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম।
নাহি জান আপনার জাতির মরম॥"

শুধু তাহা নহে—

"মরি গেলা ধনপতি শুনি বহু দিশ।
মায়ের আয়তি হাতে ভোজন আমিষ"॥

শ্রীমন্ত কৈফিয়ৎ দিল—তাহার পিতা সিংহলদেশে রাজ-সন্নিধানে আছেন, সে জারজ নহে। পরস্পর অনেক রূঢ় কথা হইল, গুরু পাঠশাল হইতে পড়ুয়াকে তাড়াইয়া দিলেন। বালক অভিমান ভরে গৃহে গিয়া দুয়ারে খিল লাগাইয়া শুইয়া রহিল। ভোজনের সময় উতরাইয়া গিয়াছে, শ্রীপতির দেখা নাই, খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। খুল্লনা গুরুমহাশয়ের নিকট তত্ত্ব লইতে ছুটিলেন, গুরুজী তাহাকে দুর্ব্বাক্য শুনাইয়া দিলেন। লহনা সপত্নীর পুত্র-গৌরবে ঈর্ষান্বিতা ছিল, সেও অবসর পাইয়া অনেক কুকথা বলিয়া লইল;—সপত্নীর গঞ্জনা—

খুল্লনা চলিল যদি পুত্রের তল্লাসে। আঁখি ঠারে লহনা সই সঙ্গে হাসে॥
জানিতে না বলে বাঁঝি সতীনের বাদে। বাঁঝা চারি পাঁচ লয়ে মনের বিবাদে॥
আর শুনেছ খুল্লনা আছে ভাল নাটে। ঘরের পো ঘরে আছে ফিরে গোলা হাটে॥
যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিবার ব্যাজে। কুলবতী জলাঞ্জলি দিল ভয় লাজে॥
মদনে মোহিত ছুঁড়ী না মানে দোহাই। ষাঁড় চাহি বুলে যেন বাতানিয়া গাই॥
উহারি সে রাঙ্গা শাঁখা ঐ বরণে গৌরী। ঐ সে জানে রতিকলা মোহন চাতুরী॥
বাজারে দেখায় ধন যৌবন সম্পদ। দৃঢ় ভাতার হৈলে উহার নাকে দিত পদ॥
দুই সতীন বহিন বটি বসি এক বাসে। আঁখির তারা পুত্রহারা মোকে না জিজ্ঞাসে॥
নগরে চাতরে ফিরে কেহ নাহি সঙ্গে। পোয়ের বিয়াজে ছুঁড়ী আছে ভাল রঙ্গে॥
ওই সে যুবতী ওই প্রসবিয়াছে বেটা। বল্দ কোন্দলে মোরে মারে বাঁশের খোঁটা॥
ওই সে বড় আমি ছোট না মানে দমন। নাহি শুনে হিত কথা উপায় বচন॥
বসন না রাখে মাথে উদাম বুক কেশ। নগরের মধ্যে ফিরে বারবনিতার বেশ॥
বারেক ঘরে আসুক সাধু কহিব সন্ধান। পাড়াপড়সী সবে হৈও পরমান॥*

মাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া পুত্রের প্রাণে বাজিল; শ্রীপতি কপাট খুলিল। মাতা-পুত্রে কথা হইল, তেজস্বী পুত্র "কোট" করিয়া বসিল—

* ভাষার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখা উচিত;—কবিকঙ্কণে একদিকে যেমন "তৈল তুলা তনুনপাত," "জানু ভানু কৃশানু" প্রভৃতি শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ নীচ ব্যাধ-গৃহিণীর মুখেও শুনা যায়, অপরদিকে আবার সম্পন্ন গৃহস্থ-বধূর মুখে ও পাড়াগেঁয়ে কথিত ভাষার ব্যবহার যথেষ্ট দৃষ্ট হয়।

ত্যজিব মনের দুঃখ দেখিব পিতার মুখ নহে বা করিব বিষ পান।
বাপের উদ্দেশ আশে চলিব সিংহলদেশে—

খুল্লনা বুঝাইতে লাগিলেন, দুর্গম পথের বিস্তর ভয় দেখাইলেন, বালক নাছোড়বান্দা; অবশেষে অনুমতি দিতে হইল। গগণমণ্ডলে থাকিয়া দেবী চণ্ডী সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীমন্তের সমুদ্র-যাত্রার ডিঙ্গা গড়িবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমানকে পাঠাইয়া দিলেন। নরাকৃতি বৃদ্ধ-বেশে আসিয়া—

নিশি মধ্যে সাত তরী করি নিরমাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সহিতে চলিল হনুমান॥*

সমুদ্র-গমনোপযোগী ডিঙ্গার কিঞ্চিৎ পরিচয়—

দেবদারু বিশ্বকর্ম্মা তার সুত দারুব্রহ্মা শিরে ধরি চণ্ডিকার পান।
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া রত্নের বাতি সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ॥
হনুমান মহাবীর নখে করে দুই চীর কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল।
গাম্ভারী তমাল ডহু নখে চিরে দিল বহু দারুব্রহ্মা গড়য়ে গজাল॥
শিলে সানায়ে বাণী পাটি চাঁচে রাশি রাশি নানা ফুলে বিচিত্র কলস।
পিতা পুত্রে দুহে আঁটি গজালে পরায় পাটি গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস॥
প্রথমে করিল অম্ন দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ।
মকর আকার মাথা গজের অন্তরে লতা মাণিকে করিল চক্ষু দান॥
গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী নাম যার গুয়ারেখি আর ডিঙ্গা নামে রামজয়।
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মধ্যে তার ছৈ-ঘর পাশে গুড়া বসিতে কাণ্ডার॥
দুসার বসিতে পাট উপরে মালুম কাঠ পিছে গড়ে মালিক ভাণ্ডার।
অতি অপরূপ সীমা গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা গড়নী পঙ্কলি মহাকায়॥
গড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বধরা হীরামুখী চন্দ্রকারা আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা।
চাঁচিয়া কাঁঠাল শাল করে দণ্ড কেরোয়াল ডিঙ্গা শিরে বান্ধিল মৌড়লা॥

* প্রাচীনবঙ্গ-সাহিত্যে রাতারাতি কোন বৃহৎ কাজ কিম্বা অসাধ্য সাধনের বেলা বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমানকে চাইই চাই। বিশাই ঠাকুর যেন রাজমিস্ত্রী, পবননন্দন যেন মজুর।

সাত ডিঙ্গা হৈল সাঙ্গ আনিল ভ্রমরা গাঙ্গ কোলে কাঁখে করি হনুমান।

বদল আশে নানা দ্রব্য নায়ে ভরা দিয়া শ্রীমন্ত সদাগর দেশের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ পিতার উদ্দেশে সিংহলে যাইতেছে জানাইলে রাজা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন।* গৃহে আসিয়া পুত্র রোরুদ্যমানা জননীর নিকট বিদায় লইতে গেল। ভক্তিমতী খুল্লনা চণ্ডী পূজা করিয়া দেবীর হাতে পুত্রকে সঁপিয়া দিয়া অশ্রু মুছিলেন। পূজার অষ্টতণ্ডুল দূর্ব্বা মাথায় বাঁধিয়া দিয়া কহিয়া দিলেন—

"বিপদে অভয়া বাছা করিও স্মরণ।"

শ্রীপতি বিমাতার পদধূলি লইতে গেল, লহনার আশীর্ব্বাদ হইল—

"বাহুড়িয়া পুনঃ দেশে না আসিও আর।"

খুল্লনা চমকাইয়া উঠিলেন—এমনই বিমাতার স্নেহ! (কবি ধাত্রীমাতা দুর্ব্বলার নিকট বিদায় গ্রহণের কথা উত্থাপন করেন নাই)। যাহা হউক, সকলকে সম্ভাষণ করিয়া মাতৃচরণে প্রণতি পুরঃসর সদাগরপুত্র ডিঙ্গায় চড়িলেন; সেই পূর্ব্বকথিত পথে দূর সিংহল দেশে চলিয়াছেন। যাইতে যাইতে শ্রীপতি কর্ণধারকে গঙ্গার উৎপত্তি, সগর রাজার উপাখ্যান প্রভৃতি শুনাইতে লাগিলেন। নানা নগর দেশ গ্রাম নদী বাহিয়া ক্রমে—

বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। দুকূলের জপে তপে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান। বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান॥

---

*৩৫০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অবাধ বাণিজ্য চলিত, দেখা যায়। ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল গমন কালে সমুদ্রযাত্রার নিষিদ্ধতা লইয়া কোন আপত্তি উঠে নাই। খুল্লনা পুত্রকে জলপথের বিপদের কথা শুনাইয়া ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তখনকার সেই সামাজিক দলাদলির দিনেও "কালাপানি" পার হইলে জাতিনাশের আশঙ্কার উল্লেখ কিছু নাই।

রক্তের দীপে কেহ করয়ে তর্পণ। গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন ॥
শ্রাদ্ধ করয়ে কেহ জলের সমীপে। সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপদীপে ॥

তার পর সপ্তগ্রাম—

.. ..যত সদাগরে বৈসে। তরণী সাজায়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥
সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়। ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায় ॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপাম। সপ্তঋষির শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম ॥

তথা হইতে নৌকায় মিঠাপাণি তুলিয়া লইয়া, আরও নদ নদী বাহিয়া—

উপনীত হৈল গিয়া নিমাই তীর্থ ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফোটে ॥

(দৃষ্টি রাখিবেন—নিমগাছে জবাফুল !)

তার পর কত দেশ কত নদী উত্তরাইয়া ক্রমে ডিঙ্গা দুর্জ্জয় মগরায় প্রবেশ করিল, তখন দেবী শ্রীপতির পরীক্ষার্থ মায়া বিস্তার করিলেন—

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর। উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর ॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগণ মণ্ডল। চারি মেঘে বরিষে মুসল ধারে জল ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা। জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা ॥
ঘন ঘন বজ্রধ্বনি মেঘের গর্জ্জন। কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী। স্মরয়ে সকল লোক জনক জননী ॥
পূর্ব্বদিকে আইল বন্যা দেখিতে ধবল। সপ্ততাল হয়ে গেল মগরার জল ॥
ঝনঝনা পড়ে যেন কামান কৃপাণ। ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান ॥

ভয় খাইয়া শ্রীমন্ত দেবীর স্তব করিলেন। (ধনপতিও এইখানে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি পাইয়াছিলেন, তিনি দেবী মানিতেন না, দেবী তাঁহার ছয় ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিয়াছিলেন)। পুত্র পিতার মত দেবীর অভক্ত ছিলেন না; চণ্ডীর কৃপায় ঝড়বৃষ্টি দূর হইল; ডানি বামে কত কত দেশ ছাড়িয়া দ্রুতগতি তরী চলিল। ক্রমে দ্রাবিড় দেশ—তথায় জগন্নাথ-ক্ষেত্র; সদাগরপুত্র কর্ণধারকে জগন্নাথ-মাহাত্ম্য শুনাইয়া দিলেন;

প্রবল চপল ভঙ্গা স্নান কর শ্বেত গঙ্গা নীলমাধবে কর নতি।
ইথে বৈকুণ্ঠপুরী আমি কি বলিতে পারি ইথে সব দেবতার স্থিতি॥
নীল শৈলে অবতার চারি বর্ণ একাকার কিনি হাটে খায় ভাত পিঠা।
প্রসাদ গঙ্গার জল ভোজন সমান ফল এই অন্ন সুধা হৈতে মিঠা॥
যেবা যার অভিলাষী অন্তকালে বারাণসী লভে যেবা পায় দিব্যগতি।
এক দণ্ড বিশ্রামে সে গতি পুরুষোত্তমে বটমূলে যদি করে স্থিতি॥
কি আর বুঝাব তোমা যে অন্ন রান্ধেন রমা ভোজন করয়ে জগন্নাথে।
প্রসাদ গঙ্গার জল ভোজন সমান ফল দরশনে কলুষ নিপাতে॥
ধন্য ক্ষেত্র জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত কোথাও না শুনি হেন বোল।
ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে সুপ সট পুরি ঘটে আপুবড়া সুকুতার ঝোল॥

* * * * * *

প্রসাদ শুকান অন্ন ভেদ নাহি চারি বর্ণ দেশান্তরে লয়ে গিয়ে খায়।
ক্ষেত্রে বা অক্ষেত্রে খাই এই অন্ন সুধাময়ী ভুঞ্জিলে যমের নাহি দায়॥
কহি আমি শুন নিষ্ঠ কুকুর মুখের ভ্রষ্ট প্রসাদ না করে চিত্তে আন।
ত্যজ ভাই সব যুক্তি ভুঞ্জিয়া সাধহ মুক্তি নহে যজ্ঞ ভোজন সমান॥

জগন্নাথক্ষেত্র এড়াইয়া, চিল্‌কা পশ্চাৎ করিয়া, ফিরাঙ্গির দেশখান—

রাত্রে বাহিয়া আসে হরমাদের ডরে—

তারপর চিঙ্গড়ীদহ, কাঁকড়াদহ, সাপদহ, কুম্ভীরদহ, কড়িদহ, শঙ্খদহ, হাথিয়াদহ—

হাথিয়াদহের কিছু শুনহ কাহিনী।
যাহার লক্ষিত আছে লক্ষ যোজন পানি॥
তাহার উপরে পথ গরু মনুষ্য বুলে।
দহেতে ঠেকিয়া তবে নৌকা নাহি চলে॥

বুদ্ধি-বলে সে দহও উত্তরাইয়া ক্রমে সেতুবন্ধ—রামের জাঙ্গাল, তারপর চিত্রকূট পর্ব্বত—যক্ষ রাজার দেশ, তৎপরে কালীদহ, কালীদহে আবার সেই কমলে কামিনী। কমলে কামিনী দর্শনান্তর সিংহলে পৌছিয়া সবাদ্যকলরোলে শিবির সংস্থাপন। সিংহলের কোটাল আসিয়া বিবাদ বাধাইল; পঞ্চাশ কাহন "দিগরী" (ঘুষ?) চাহিয়া

বসিল। পরে ক্রমে নানা উপঢৌকন সহ রাজদর্শন, সমুদ্র যাত্রার বিবরণ কথন. কমলে কামিনীর কথা।*

আবার সেই পূর্ব্বেকার মত প্রতিজ্ঞা...মসীপত্রে লিখন ;

রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধ সিংহাসন॥
সুশীলা কন্যা করিব দান...

শ্রীপতির প্রতিজ্ঞা, তিনি কমলে কামিনী না দেখাইতে পারিলে—

লুট করি লইও মোর সাত তরী ধন।
দক্ষিণ মশানে মোর বধিও জীবন॥

রাজা সপরিবারে কালীদহে উপনীত হইলেন—কমলে কামিনী "অদর্শন"। শ্রীপতির দাঁড়ী মাঝিরা সাক্ষ্য দিল, তাহারা কেহ কিছু দেখে নাই, সর্ব্বনাশ! শ্রীপতির হার হইল, প্রতিজ্ঞা অনুসারে ডিঙ্গা বাজেয়াপ্ত হইল, বণিক-পুত্রকে বাঁধিয়া কোটাল দক্ষিণ মশানে লইয়া চলিলেন, নির্যাতন চলিতে লাগিল ;—

শ্রীমন্তের কিছু ধন ছিল নিজ কেশে।
তাহা দিয়া কোটালের কৈল পরিতোষে॥
ধন পেয়ে কালু দত্ত সবালে বন্ধন।

পুলিষ প্রভুরা চিরকাল সমান!

• মশানে যখন কোটালের দল খড়্গ লইয়া ছেদনে উদ্যত, শ্রীমন্ত কাতর-বাক্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলেন। তাহারা দয়া করিয়া তাঁহার আপন পাগড়ীটি পরিধান করিতে দিল। বণিকপুত্র পাগড়ী খুলিয়া বস্ত্ররূপে পরিধান করিলেন—বাটী হইতে বিদায় লইবার কালীন মাতৃ-প্রদত্ত চণ্ডী পূজার নির্মাল্য তাহাতে বাঁধা ছিল—

* মুকুলরামের চণ্ডীতে—বিশেষতঃ দ্বিতীয় ভাগে অনেক প্রবন্ধ আছে, একই ভাষায় একই ছন্দে একাধিক বার বর্ণিত।

আছিল তণ্ডুল দুর্ব্বা পাগের অঞ্চলে।
দৈবের কারণে তাহা পড়ে ভূমিতলে ॥

তখন জননীর উপদেশ-বাণী স্মরণ হইল। শ্রীপতি কোটালের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সময় ভিক্ষা করিয়া লইলেন—দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। আপন স্থানে চণ্ডী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন,—সখী পদ্মাবতী সমস্ত তথ্য নিবেদন করিল। তখন চণ্ডী আজ্ঞা দিলেন—ভয়ানক বিভীষণ দানা-সৈন্য সাজিল, স্বর্গে মর্ত্তে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইন্দ্রের পরামর্শে নারদ আসিয়া দেবীকে বুঝাইলেন—

"এতেক সাজন দেবী নরের কারণে।
গরুড়ের রণ কিবা মশকের সনে ॥
তোমার সমরে হর হরি দিলা ভঙ্গ"।

কোথাকার সামান্য সিংহলেশ্বরকে দমন করিতে তোমা হেন জনের রণসাজ! দেবী বুঝিলেন, কোপ সম্বরণ করিলেন—ছদ্মবেশ ধরিলেন—

জরতী ব্রাহ্মণী অস্থি-চর্ম্ম-বিলোলনা।
মায়া করি ভ্রমে যেন চঞ্চল-পরাণা ॥
বাতে হইল কাঁকালি বেঁকা যান হয়ে টেড়ী।
উছোটের ঘায়ে চণ্ডী যান গড়াগড়ি ॥
বাম করে নিল মাতা রঙ্গন চুপড়ী।
সবা করে নিল মাতা সিংহবেত নড়ী ॥
করে নিল কুসুম চন্দন দুর্ব্বা ধান।
বেদ মন্ত্রে শ্রীমন্তের করিতে কল্যাণ ॥*

লীলাময়ী কোটালের নিকট আসিয়া ব্যাজ পরিচয় দিয়া সবিনয়ে "নাতি" শ্রীমন্তের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন; কোটাল প্রভুর আজ্ঞাপালক নফর মাত্র, আপন অক্ষমতা জানাইল। বৃদ্ধা আরও মিনতি করিতে লাগি-

---

* ভারতচন্দ্রের "জরতীবেশে অন্নদার ব্যাসকে ছলনা" অনেকের মনে পড়িবে। সে চিত্র আরও স্পষ্ট।

লেন। কোটাল আর অপেক্ষা না করিয়া বন্দীকে যথার্থ সৈন্যদিগের প্রতি আদেশ দিল। ধানুকী তবকী রায়বাঁশধারী পদাতি সকলে মিলিয়া শ্রীমন্তের উপর শেল শূল শর খাণ্ডা সব অস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল, সকলই ব্যর্থ হইল, অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কোটালের আজ্ঞাক্রমে তখন বুড়ীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল—এইবার—

কোপে পদ্মা বাজাইল নিশানের ঘণ্টা—

অমনি দেবীর সেনা আসিয়া কোটালের মাথা কাটিয়া মহা যুদ্ধ লাগাইয়া দিল। রাজার নিকট সংবাদ গেল; রাজা সৈন্য সামন্ত সহ যুদ্ধার্থ আসিলেন। সে কালের—কাল্পনিক শ্রীমন্তের সময় না হউক—বোধ হয় মুকুন্দরামের সময়কার—অর্থাৎ ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের—যুদ্ধোদ্যোগের একটু পরিচয়—

সাজ সাজ বলি দামামায় পড়ে ঘা।

চলিলা যে যুবরাজ রাজার আরতি। লেখা জোখা নাহি যত চলে সেনাপতি॥
অস্ত্র ব্যস্ত করিয়া চৌদলী নিল কান্ধে। ধরণী কম্পিত হৈল রাজার নিনাদে॥
রায়বীণা গন্ধবীণা বাজে রুদ্রবীণা। দগড় দোগড়ী বাজায় শত শত জনা॥
হাতীর গলাতে ঘণ্টা বাজে ঠনঠনি। কাংস্য করতাল বাদ্য বিপরীত শুনি॥
জয়ঢাক বীরঢাক রাক্ষসী বাজনা। প্রলয় সময়ে যেন পড়ে ঝনঝনা॥
হাত দামা ঢাক ঢোল তবল বিশাল। দামা দড়মস বাদ্য বাজে সিঙ্গুয়াল॥
বিষম তবল আগে আরোপিয়া কাটি। বুরুজ কামান হতে শেল পাট ঝাটি॥
ঘবল্লিয়া পদাতিক যবন সোয়ার। ঘোর রূপ যবন সব বলে মার মার॥
পার্ব্বতীয়া অশ্ব সব সোনার বিথকী। কণ্ঠে ঝিলিমিলি হার করে ধিকিধিকি॥
ঢালী পাইক সাজে হাতে খাঁড়া ঢাল। ডানি বামে অস্ত্র আছে বিক্রমে বিশাল॥
ধানুকী পাইক সাজে হাতে ধনুঃশর। কটিদেশে তরবাল খুলিল সত্বর॥
চৌকনিয়া পাইক চৌকন হাতে করে। হাড়িয়া চামর বান্ধে বাঁশের উপরে॥
বিচিত্র পামরী আর পাগ্রিজড়ি মালা। বৈরি বেশে ধায় পাইক জানে যুদ্ধ কলা॥
ভীম অর্জ্জুন কর্ণ কোটাল জুর্ঝার। ভিড়নে চলিল চক্র বাইশ হাজার॥

রাজার বেটা যুবরাজ ঠাটে আগুয়ান। শকটে তুলিয়া নিল বিচিত্র কামান॥
লহ লহ করে যত হস্তীর শুণ্ড। পিপীলিকা সারি যেন পাইকের মুণ্ড॥
বারৈর বরজে যেন গোছায়া তোলে পান। পাথরিয়া ঘোড়া সাজে কাহনে কাহন॥
ডানি দিকে সাজিল কোটাল ভীম মল্ল। রাজার জামাতা সাজে নামে বীরশল্ল॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া। আগুদলে সাজে যত পাথরিয়া ঘোড়া॥
তবক বেলক সাজে কামান কৃপাণ। পৃষ্ঠদেশে পূর্ণিত তূণেতে যত বাণ॥
রণসিংহ রণভীম ধায় বনঝাটা। তিন ভাই তীর বিন্ধে দিয়া চূণের ফোঁটা।
পাইক প্রধান তিন ভাই আগুদল। বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল॥
পথে যাইতে বিভাগ করিয়া দিল ঠাট। আগুদলে সেনাপতি আগুলিল বাট॥
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিলা দরশন। মশান বেড়িয়া ধায় রাজসেনাগণ॥

শ্রীমন্ত বাঙ্গালীর ছেলে, যুদ্ধের উপক্রম—"পাইক আইসে পণে পণ"—দেখিয়া ডরাইয়া উঠিল ; স্পষ্টই দেবীকে বলিল—

"অভয়া ঝাট ছাড়ি চলহ সিংহলে।
তুমি গো অবলা জাতি আমি রণে নহি কৃতী
কেনে প্রাণ হারাবে বিফলে॥

অভয়া ভক্তকে অভয় দিলেন, পদ্মার আঁখি-ঠারে দানাগণের মহলা হইল,—দানাগণ—

কেহ—নরমুণ্ড চিবায় যেন সরস গুয়া,
কেহ—দন্তগুলা মেলে যেন পাটুয়া কোদাল,
কেহ—উপবাসী আছে খেয়ে সাত মহিষ পোড়া,

চণ্ডীর আজ্ঞায় মাতৃকাগণও যুদ্ধে আসিয়াছেন—আর—

মশানে ফিরয়ে দানা অতি সে প্রবীণ,
পুষ্করিণী শুকালে যেন মুড়াইল মীন।

কিন্তু সিংহলপতি শালবাহন রাজা হটিলেন না, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে—

রুধিরের নদীতে সাঁতারে ঘোড়া হাতী।

কোথাও বা—

শোণিতের নীরে ভাসিয়া ত ফিরে দানা সব তিমিঙ্গলা।

অবশ্য যুদ্ধে চণ্ডীই জিতিলেন—তখন

গজপৃষ্ঠে তুলিল শ্রীমন্ত সদাগরে।
ধবল চামর ছাতা ধরাইল শিরে॥

রণভূমে প্রেতের হাট বাজার বসিল—"চৌদিকে লম্বিত মুণ্ডমালা"।

ক্রমে রাজা বুঝিতে পারিলেন—কাহার সহিত যুদ্ধ,—তখন গলায় কুঠার বন্ধন পূর্ব্বক দক্ষিণ মশানে গিয়া চণ্ডীর স্তব জুড়িয়া আপনাকে বলিদান দিতে চাহিলেন। ভগবতী অট্ট অট্ট হাসিয়া রাজাকে শ্রীমন্তের হস্তে সুশীলা সম্প্রদান করিতে বলিলেন। কিন্তু সিংহলেশ্বর সহসা তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। প্রতিজ্ঞাব কথা উত্থাপন করিলেন, অধিকন্তু বলিলেন—

"আমি ক্ষত্র সেই বেণে বল কন্যা দিতে।
জাতি নষ্ট হয় মাতা লয় মোর চিতে"॥

চণ্ডী প্রতিজ্ঞার কথাটা মানিয়া লইলেন, কমলে কামিনী দেখাইতে চাহিলেন। পাত্রমিত্র সহ রাজা কালীদহে গিয়া এবার সত্যসত্যই সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন—চণ্ডীর কৃপা। সিংহলেশ্বরের পরাজয় হইল, একান্তই বেণের হাতে কন্যা দান করিতে হয়, তখন ছুতা ধরিলেন—যুদ্ধে অনেক জ্ঞাতি মরিয়াছে, এখন অশৌচ—এক বৎসর পরে বিবাহ-কার্য্য হইবে।

দেবী শ্রীপতিকে এক বৎসর সিংহলে থাকিয়া বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিবার প্রস্তাব করিলেন। বণিক-পুত্র বলিল—আগে ত আমায় মগরা পার করিয়া দাও—সে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ভুলে নাই।

তারপর চণ্ডীর কৃপায় বিশল্যকরণাদি ঔষধের গুণে মৃত সৈন্য-সামন্তের পুনর্জীবন লাভ; রাজার আত্মীয় স্বজন বাঁচিয়া উঠিল, সিংহল-

পতি চণ্ডিকা স্তব করিতে লাগিলেন। অশৌচ আর নাই, অগত্যা রাজাকে বিবাহে অনুমতি দিতে হইল। এবার শ্রীপতি কিন্তু বাঁকিয়া বসিল। সে বলে সে আসিয়াছে বাপের সন্ধানে, বাপের উদ্দেশ না হইলে শুভকর্ম্ম হইবে না। তখন দেবীর পূর্ব্ব-কথা সমস্ত মনে আসিল। তিনি রাজার নিকট হইতে তাঁহার বন্দীঘর মাঙ্গিয়া লইলেন। শ্রীপতিকে সাতঘর বন্দী দান করিয়া পিতার অন্বেষণার্থ অনুমতি করিলেন। বণিক-পুত্র একে একে সকল বন্দীর শৃঙ্খল কাটাইয়া নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতঃ মুক্ত করিতে লাগিল। সাত ঘর বন্দী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল, তাহাদের মধ্যে তাহার পিতা ত নাই। পিতা তখন ভয়ে মুষার মাটি গায়ে লেপিয়া আঁধার কোণে লুকাইয়াছেন। পুত্র ক্রন্দন জুড়িল। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানের পর ধুলা মাটির ভিতর হইতে চুল ধরিয়া টানিয়া এক ব্যক্তিকে বাহির করা হইল—এ কে?—দেখিয়া শ্রীমন্ত চমকাইয়া উঠিল, মাতৃদত্ত বিবরণের সহিত মিলাইতে মিলাইতে বড় সন্দেহ রহিল না। বন্দীর পরিচয় জিজ্ঞাসা হইলে, ধনপতি আগাগোড়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন—

"কনিষ্ঠা বনিতা মোর ছিল গর্ভবতী।
যখন তাহার গর্ভ হৈল ছয় মাস।
সেই কালে নৃপাদেশে দীর্ঘ পরবাস॥
পুত্র কন্যা হৈল রায় একই না জানি।"
কহিতে কহিতে বন্দীর চক্ষে বহে পানি॥

তখন শ্রীমন্ত সেই বন্দীর পরম সমাদর করিতে লাগিল। স্নানাহারের পর সুস্থ হইলে বণিকপুত্র ধনপতির হাতে সেই তাঁহার পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ কালে প্রদত্ত "জয়পত্র" অর্পণ করিল—

সাধু পত্র নিল করে।
হাব দূর করি পত্র পড়ে ধীরে ধীরে॥

(চিঠি খানা বোধ হয় শিল মোহর করা ছিল)।

পত্র পাঠান্তে ধনপতির শোক উথলাইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন; বাপের সঙ্গে কুমারও কাঁদিতে লাগিল। শ্রীপতি আপন পরিচয় দিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া জানাইল—

মাতা পূজে ভদ্রকালী তার ঘট পায়ে ঠেলি
সিংহলে আইলে লঘুগতি,
ঘট লঙ্ঘনের ফলে বন্দী হৈলা কারাগারে।

দেবীর প্রতিহিংসা। মহেশ-ভক্ত চুপ।

রাজকন্যার সহিত শ্রীপতির বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে শুনিয়া ধনপতি নিষেধ করিলেন। তিনি সিংহলপতি ও সিংহলবাসীর বিস্তর নিন্দা গাহিয়া বলিলেন—"দেশে করাইব সাত বিয়া"। কিন্তু পুত্র পিতার বারণ মানিতে পারিল না, চণ্ডীর আদেশ লঙ্ঘন হয়;

যুড়ি হাত আজ্ঞা লয় বাপের চরণে।

সুবোধ পুত্র বাপকে "থোড়াই কেয়ার" করিতে পারে নাই।

যথাবিহিত আচারে রাজকন্যা সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের শুভ বিবাহ হইয়া গেল। বণিক-পুত্র—গন্ধবণিক—ক্ষত্রিয়-কন্যা পত্নীরূপে লাভ করিল। (কবি একটা সামাজিক সমস্যা উত্থাপন করিয়া মিটাইয়া দিয়াছেন)।

শ্রীপতি রাজকন্যা কোলে লইয়া রাজভোগে দিনাতিপাত করিবে, দুঃখিনী জননীকে পাছে ভুলিয়া যায়—এই কারণে দেবী চণ্ডী খুল্লনার বেশ ধরিয়া তাহাকে স্বপ্ন দিলেন—

"ভূপে নিল ধন ঘর, আশ্রয় লইল পর দু সতীনে সুতা বেচি হাটে
শত ছিড়া কানি পরিধান।"

পুত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে তখনই দেশে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে

লাগিল, পত্নী রাজকুমারী কত লোভ দেখাইতে লাগিলেন, বারমাসী আনন্দ উপভোগের ছবি আঁকিলেন; সহচরীগণ, শ্যালক-বনিতা কত রঙ্গরহস্য করিয়া বুঝাইতে লাগিল, রাজা রাণী ধনপতিকে বলিয়া সময় লইতে চাহিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। (আমরা কবি-বর্ণিত বার মাসের দুঃখের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি—সুখের পরিচয় একটু গ্রহণ করিব)—

পত্নী পতিকে শুনাইতেছেন—

বৈশাখে গ্রীষ্ম সময় বৈশাখে গ্রীষ্ম সময়। প্রচণ্ড তপন তাপে তনু নাহি রয়॥
চন্দন তৈল দিব সুশীতল বারি। সাঙলি গামছা দিব ভূষিত কস্তুরী॥
কুসুম কাননে করি রতন মন্দিরে। সহচরী হয়ে নাথ ঢুলাব চামরে॥
পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস। দান দিয়ে দ্বিজের পুরিবে অভিলাষ॥
নিদাঘ জৈষ্ঠ্য মাসে প্রভু প্রচণ্ড তপন। পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥
শীতল চন্দন দিয়া করিব বাতাস। আমার মন্দিরে প্রভু করিবে আয়াস॥
চাঁদের উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া। হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়া॥
শুন প্রাণনাথ ওহে শুন প্রাণনাথ। নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত॥
আষাঢ়ে ডাকয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর। নব জল মদে মত্ত ডাকয়ে দাদুর॥
নবীন মেঘের রসে রসিক দাদুর। নবীন তরুণী ত্যজে কেন যাবে দূর॥
সব সখীগণ মিলি গাইব গীত। আষাঢ়ে বিবিধ সুখে নিবারিব চিত॥
সেই মাস সুখ হেতু সেই মাস সুখ হেতু নিদাঘ বরিষা হিম সুখ তিন ঋতু॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী। সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
বিদেশ ত্যজিয়া লোক আইসে বড় আসে। কামিনী কেমতে ছাড়ি যাবে নিজ দেশে॥
প্রভু ঘরে কর বাস প্রভু ঘরে কর বাস। আর না করিও প্রভু বাণিজ্যের আশ॥
শুন মোর নিবেদন শুন মোর নিবেদন। বিষাদ না কর প্রভু স্থির কর মন॥
ভাদ্রপদ মাসে নাথ শরত প্রবেশ। করিবে কতেক সুখ না যাইবে দেশ॥
নিরমল আকাশে শোভিত শশধর। তরুণী তরণী লয়ে যাবে সরোবর॥
সখীগণ মিলি মোরা খিয়াইব নায়। করিবে পরাণনাথ আরোহণ তায়॥
সুখে সরোবর জলে সুখে সরোবর জলে। কামিনী-কমলবনে রবে কুতুহলে॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে। ষোল উপচার দিয়া ছাগল মহিষে॥

নানা বেশ করিব সকল সহচরী। নাটা গীতে গোঙাইব দিন বিভাবরী॥
বহু ধন দিব আমি যত কর দান। সিংহলের লোক যত করিবে সম্মান॥
দ..মি বুঝাব রাজায় আমি বুঝাব রাজায়। আনাইব তোমার জননী সৎমায়॥
শরৎ টুটিয়া আইসে কার্ত্তিক মাসে। দিবসে দিবসে হয় হিমের প্রকাশে॥
তুলি পাড়ি পাছুড়ি করিব নিয়োজিত। তোমাতে আমাতে নাথ থাকিব মোদিত
প্রভু স্থির কর মন প্রভু স্থির কর মন। রাজাকে কহিয়া দিব অর্দ্ধ সিংহাসন॥
পুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য কার্ত্তিক মাস। দান দিয়া পূরিবে দ্বিজের অভিলাষ॥
সুখ অগ্রহায়ণ মাস সুখ অগ্রহায়ণ মাস। কামিনী পুরুষে ভোগ বড় অভিলাষ॥
প্রভু স্থির কর চিত প্রভু স্থির কর চিত। তরুণী তপন তাপে নিবারিবে শীত॥
মীন মাংস সঘৃত আদি করিয়া ভোজন। নানা সুখে গোঙাইবে মাস অগ্রহায়ন॥
শুন প্রাণনাথ হের শুন প্রাণনাথ। গোঙাবে তরুণ শীত তরুণীর সাথ॥
পৌষে পরম সুখ শুন গুণমনি। নব অন্ন নব রস নূতন কামিনী॥
রাজারে কহিয়া লব শতেক খামার। তার শস্য আনি নাথ রাখিব হামার॥
নাথ মোর আবদাস্ নাথ মোর আবদাস্। বৎসরেক থাক প্রভু না ছাড়হ বাস॥
মাঘ মাসে প্রভাতে করিয়া স্নান দান। সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥
পিষ্টক পায়স প্রভু খাবে প্রতিদিন। আনন্দে করিবে নাথ মাঘ নিরাদিন॥
কিছু না ভাবিহ মনে কিছু না ভাবিহ মনে। নানাবিধ দান নাথ দিবেক ব্রাহ্মণে॥
নাথ শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন। যতেক বিবিধ সুখ পাইবে ফাল্গুন॥
ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে। তথি দোলমঞ্চ নাথ করিব নির্ম্মাণে॥
সখীগণ আসিবে সুন্দর বেশ করি। হরিদ্রা কুঙ্কুমে নাথ দিবে পিচকারী॥
সখী সব মিলি আসি গাইব গীত। দোলাইব জগন্নাথ হইয়া মোদিত॥
মৃদঙ্গ পাখোয়াজ বীণা একত্র করিয়া। নাচিবে নর্ত্তকগণ সুবেশ ধরিয়া॥
মধুমাসে মালতী কুসুমে মধুকর। মধুমত্তে মাতোয়াল ভ্রমরী ভ্রমর॥
কুসুম কাননে কান্ত করিবে নিবাস। বিষম মদন তাপ হইবে বিনাশ॥
যেই মধুমাস যাইবে কুতুহলে। শীতল যোগাব আনি বিয়ান বিকালে॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছায়ে শয়নে। মধুমাস যাইবে মধুর আলাপনে॥
মোহন চৈত্র মাসে মোহন চৈত্র মাসে। মোহন মন্দিরে রবে মোহন আবেশে॥

পত্নীর এত সোহাগ শুনিয়াও সাধুপুত্র ভুলিলেন না, উত্তর করিলেন,

"সর্ব্বভোগ পর মোর মায়ের সেবন।"

রাজকন্যা গিয়া কাঁদিয়া মাতাকে সংবাদ দিলেন, মাতা এক শিয়ানা দাসীকে পাঠাইলেন, সে অনেক ছুতা ধরিয়া অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল, শেষ হার মানিয়া বলিয়া গেল—

"জানিনু নিশ্চয় এবে জানিনু নিশ্চয়।
জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয়॥

তখন শ্যালক-বনিতা আসরে নামিলেন—অন্তর-টীপ্‌ নিতে যদি কাজ হয়—

"শুন রাজার জামাতা শুন রাজার জামাতা।
পণ্ডিত হইয়া কহ অজ্ঞানের কথা॥
পুরুষ ভ্রমর মত্ত মধু প্রতি আশে।
কুসুম সন্ধানে ফিরে নাহি রহে বাসে॥
মালতি মল্লিকা চাঁপা এড়ি মধুকর।
ধুতুরা কুসুম আশে যায় বনান্তর॥"

রসিকার রঙ্গ-রহস্যে বেণের ছাওয়াল খুব এক হাত লইলেন—

"যদি থাকে পতিভক্তি যাবে আমা সনে।
নহিলে রাখিয়া যাব যুবরাজ স্থানে॥

মুখের মতন হইল, শালাজ ঠাকুরাণী পিছাইয়া গেলেন।

সকলের নিকট বিদায় লইয়া, পিতৃমোচন সাধনান্তর সপত্নীক শ্রীমন্ত সদাগর আবার সেই সমুদ্র পথ বাহিয়া, পথে মগরায় নষ্ট ধন—পিতার ছয় ডিঙ্গা—দেবীর কৃপায় উদ্ধার করতঃ দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

কোন কোন সংস্করণ কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কোন কোন কথা কিছু বেশী আছে; তাহার মধ্যে ২।১ টীর উল্লেখ করিয়া যাই; শ্রীপতি সিংহলে পদার্পণ করিবামাত্র নগর-কোটাল যখন "দস্তুরী" দাবী করিয়া বিবাদ বাধাইল, তখন সদাগরের অর্থ-সংস্থান বুঝিবার নিমিত্ত রোখ করিয়া

শ্রীমন্তের মাথার মহামূল্য টোপর ফেলাইয়া ধনবানত্বের পরীক্ষা চাহিয়াছিল, বণিকপুত্র অম্লান-বদনে সেই টোপর সমুদ্রের জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ভগবতী চণ্ডী সেই "লক্ষের টোপর" তুলিয়া লইয়া উজানীতে গিয়া পুত্র-বিরহ-কাতরা পরম ভক্তিমতী খুল্লনাকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন। আর একটী কথা; মশানে কোটাল যখন শ্রীমন্তকে কাটিতে উদ্যত—পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া, শেষ সময় ভাবিয়া বণিক-পুত্রের কাতরোক্তিটুকুও মর্ম্মস্পর্শী;—অন্তিম বিদায় গ্রহণ—

তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মশানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী॥
তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥
তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানি নগরে দেখা আর হবে নাই॥
তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিনী। তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী॥
তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানি নগরে আমি আর যাব না॥
তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যায় মাথা॥
সবাকারে সমর্পণ আপন জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥

সুশীল বালক "দুর্ব্বলা পুষিনী"কেও ভুলে নাই। বিমাতার আশীর্ব্বাদটুকুও ভুলিবার নহে। যাহা হউক, ভক্ত সাধক ভক্তবৎসলার অনুগ্রহে শুধু যে মাথা বাঁচাইতে পারিয়াছিল এমন নহে, রাজকন্যা বিবাহ করিয়া আপন উদ্দেশ্য—পিতৃ-উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক স্বদেশে মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল।

পুত্র পুত্রবধূ প্রাপ্ত হইয়া চিরদুঃখিনী খুল্লনার আনন্দের সীমা নাই। এয়ো ডাকিয়া বরণ করিয়া পুত্র পুত্রবধূকে কোলে লইলেন। কিন্তু একটু খুঁৎ এই অসীম আনন্দের ভিতর ছিল—কর্ত্তার সংবাদ কি? বার বৎসর কারাগার-ক্লেশে, রোগে শোকে তাপে ধনপতির আকৃতিতে এমন পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল যে দুই স্ত্রী পর্য্যন্ত "নিজপতি চিহ্নিতে না পারে।" ক্রমে চিনাচিনি হইল—আনন্দের ভরা পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিশ্রামের পর পিতাপুত্রে রাজসম্ভাষণে গমন করিলেন। এবার

স্বদেশের রাজা। সেখানে আবার কমলে কামিনীর প্রসঙ্গ উঠিল। সিংহলের মত এখানেও অবিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা—আবার কমলে কামিনীর অদর্শন; উজানির রাজাও শ্রীপতিকে উত্তর মশানে কাটিতে আজ্ঞা দিলেন। বণিকপুত্র কর্ত্তৃক পুনরায় চণ্ডীর স্তব, আবার দানাগণের আবির্ভাব, শ্রীমন্তের জয়—রাজার চণ্ডীস্তুতি—কমলে কামিনী দর্শন, রাজকন্যা জয়াবতীর সহিত শ্রীপতির বিবাহ—নানা উপহার সহ দ্বিতীয়া পত্নী সহ গৃহে প্রত্যাগমন। (পাঠকের স্বর্গে শাপগ্রস্থ মালাধর ও তাহার সহমৃতা পত্নীদ্বয়ের কথা মনে আছে, বোধ হয়। দুই দেশে দুই জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।)

ধনপতি পরম শৈব, তিনি প্রত্যহ মৃত্তিকা-শঙ্কর পূজা করিয়া থাকেন। একদিন মুদিত-নয়নে দেবদেবের ধ্যান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন—শিবের অর্দ্ধ-অঙ্গ পার্ব্বতী!

অর্দ্ধ নারী শিব-তনু না করে ধেয়ান।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমান॥
মাইয়া দেবতা বলি যারে করিনু হেলন।
অর্দ্ধ অঙ্গ করি তারে বলে ত্রিলোচন॥
দুই জনে এক তনু মহেশ পার্ব্বতী।

ধনপতির তখন চৈতন্য হইল; হর ও পার্ব্বতী অভেদ জানিয়া তিনি দেবী চণ্ডীর পূজা করিলেন। ভগবতীর জয়পতাকা উড়িল। শৈব শাক্তে ভেদ আর রহিল না।

এইখানেই গ্রন্থ শেষ হইবার কথা; কিন্তু আর একটু আছে।

শ্রীপতির দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহতে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সিংহল-রাজসুতা অভিমান করিয়াছিলেন, অবশ্য অল্পেই সে মান ভাঙ্গিল। তার পর দুই পাশে দুই জায়া লইয়া শ্রীপতি বসিলেন, সকলে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল; জরতী বেশে দেবী চণ্ডীও আসিয়া যৌতুক দান

করিয়া গেলেন। শ্রীমন্তের অনুরোধে ধনপতিকে দেবী নীরোগ করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গও ছাড়েন নাই—

"হইয়া পুরুষ রাজা করিলে মাইয়া পূজা
তোর ঘরে কেবা খাবে পানি।"

তার পর দেবী এই ব্রতকথার সমস্ত তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া উপদেশ দিলেন—

"হেমঝারি জলগর্ভা অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা
পূজ প্রতি মঙ্গল বাসরে।"

খুল্লনাকে মনে পড়াইয়া দিলেন—তিনি শাপভ্রষ্টা ইন্দ্রের নর্ত্তকী, কাজ শেষ হইয়াছে, এখন সুরপুরে যাইতে হইবে। এই বলিয়া "নারদী পুরাণ"মত কলির মাহাত্ম্য শুনাইয়া পরম বৈষ্ণবী সকলকে স্পষ্ট বুঝাইলেন—

কলিকাল-গরলে ঔষধ নারায়ণ।

দেবী হরিনামের মাহাত্ম্য গাহিতে গাহিতে "কৃত্তিবাস কথিত" নাম-মহিমার এক মনোমুগ্ধকর কাহিনী শুনাইলেন—

দেব ত্রিলোচন ভিক্ষা করিতে করিতে একদিন বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত, গোবিন্দ থালায় ভিক্ষা দিলেন, তন্মধ্যে একছড়া পারিজাত-মালা ছিল। কৈলাসে ফিরিয়া আসিলে সেই মালা লইবার জন্য কার্ত্তিক গণেশে বিবাদ বাধিল। মহেশ্বর অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন—যে একদিন মধ্যে সর্ব্বতীর্থ সারিয়া আসিতে পারিবে, তাহাকেই মালা দেওয়া যাইবে। শুনিয়াই কার্ত্তিক ময়ূরে চড়িয়া ছুট্—তাড়াতাড়ি কাশী গয়া বৃন্দাবন সব তীর্থ করিয়া ফিরিলেন। গজানন জ্ঞানী লোক তিনি সে পথে গেলেন না, তিনি দৃঢ়মন হইয়া হরিনাম করিয়া পিতার নিকট অগ্রেই উপস্থিত হইলেন; মহাদেব যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—এত শীঘ্র সব তীর্থ সারিলে কিরূপে, গণেশ উত্তর দিলেন—

"যেখানে করয়ে ভক্ত গোবিন্দের গান।
সেইখানে সর্ব্ব তীর্থ হয় অধিষ্ঠান॥
আমি ভক্তিভরে হরি-নাম গাহিয়াছি।" মালা অবশ্য গণপতিই পাইলেন।

আমরা কৃত্তিবাসে রাম-নাম মাহাত্ম্য শুনিয়াছি, কাশীদাসে হরি-নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়াছি; মুকুন্দরাম কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, ইঁহাতেও নাম-মাহাত্ম্য দেখিলাম। এই হরি-নাম-মাহাত্ম্য—বৈষ্ণব আখ্যানটুকু শাক্ত চণ্ডিকাব্যে প্রক্ষিপ্ত মনে হয়;—অথবা ইহা মাধুর্য্য-রস-নিষিক্ত দেশে হরি ভজিবার উপায়ান্তর প্রদর্শন?*

যাহা হউক, এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে খুল্লনা, শ্রীপতি ও তাহার পত্নীদ্বয়—স্বর্গবাসী যাহারা শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যে আসিয়াছিল—স্বর্গে ফিরিয়া গেল। ধনপতি কাঁদিয়া আকুল, দেবী চণ্ডিকা তাহাকে বর দিলেন—জ্যেষ্ঠা পত্নী লহনা পুত্রবতী হইবে,—"ধন পুত্র লয়ে সুখে করিবে সংসার।"

ইতিমধ্যে আবার আর একটা ঘটনা ঘটিল। ভগবতী চণ্ডী ত চারিজনকে লইয়া স্বর্গে চলিয়াছেন, পথে যমদূত আটক করিল; পদ্মার ইঙ্গিতে মাম্‌দো ভূত আসিয়া যমদূতকে খেদাইয়া দিল; যমরাজ সসৈন্যে আসিলেন, দেবী-সেনার সহিত যুদ্ধ বাধিল; শেষে যম কাহার সহিত যুদ্ধ যখন টের পাইলেন, ভগবতীর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইলেন। দেবীর নিকট যমের প্রতাপ খর্ব্ব।

খুল্লনা, শ্রীপতি ও পত্নীদ্বয় যে দেবতা সেই দেবতা হইলেন—

"মালাধর হৈতে হৈল ব্রতের প্রকাশ।"

ইতি সমাপ্ত।

---

* একটা বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। মুকুন্দ-রাম চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য গাহিয়াছেন, কবি শাক্ত-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কাছাকাছি সময়ের লোক, অহিংসা-প্রধান ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। কাব্যে "শ্রীচৈতন্য-বন্দনা"ত আছেই, তদ্ব্যতীত হিংসা-ধর্ম্মের পাতকত্ব প্রদর্শনও আছে—

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীর গান বুঝাইতে আমরা অনেকটা স্থান অধিকার করিলাম। কিন্তু যখন অনেকের মতে মুকুন্দরামের চণ্ডীই বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রধান কাব্য—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি (অধিকন্তু এত বড় গ্রন্থখানা আদ্যোপান্ত পাঠ অনেকেরই ধৈর্য্যে কুলায় কিনা সন্দেহ) তখন আমাদের এই সবিস্তার বর্ণনা, অনুমান করি, অমার্জ্জনীয় হইবে না। মুকুন্দরামের চণ্ডীই প্রথম সুবৃহৎ কাব্য যন্মধ্যে বাঙ্গালী কবির কল্পনাশক্তির প্রসারের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের সময়ে যে মঙ্গলচণ্ডীর গীতের উল্লেখ আছে তাহা ক্ষুদ্র একটি ব্রতকথা। সামান্য কয়েকটি ছড়া, যাহা পুরোহিত ঠাকুর এক নিশ্বাসে সাঙ্গ করিয়া যাইতেন, প্রতিভাবান কবির হাতে পড়িয়া তাহাই কেমন ষোল পালা এক সুদীর্ঘ পাঁচালীতে দাঁড়াইয়াছে, বুঝাইবার জন্য আমরা এত বকিয়াছি। ছোট চারা গাছ, ফলচ্ছায়া-সমন্বিত প্রকাণ্ড পাদপে পরিণত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবদেবী-বন্দনা, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, হরগৌরীসম্বাদ প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় বর্ণিত আছে; আমরা সে সকল কথা কিছু বলি নাই,

---

কালকেতু রণে পরাজিত হইয়া যখন কারাগারে কষ্ট পাইতেছে, দেবী চণ্ডী তাহাকে আশ্বাসিত করিতেছেন—

"শুন পুত্র কালকেতু　　পশু বধ পাপ হেতু　　আছিল তোমার গুরু পাপ।
নাশ গেল এতকালে　　রাজার বন্ধন শালে　　মনে না করিহ পরিতাপ॥"

প্রথম খণ্ডে এই, আবার দ্বিতীয় খণ্ডে—বনে যখন ব্যাধদ্বয় শুকশারী ধরিয়াছে, শুকপক্ষী ব্যাধকে নানা উপদেশ দিয়া শিবি রাজার উপাখ্যান শুনাইল; তখন ব্যাধ "মতিমান" হইয়া কহিতেছে—

"আজি হৈতে শুক তুমি হৈলা মোর গুরু।　　ধর্ম্ম অবতার শুক তুমি কল্পতরু॥
বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ।　　তোমা হতে ঘুচিল মোর পাপ বৃত্তি নিজ॥
আর না করিব কভু প্রাণীবধ পাপ।　　ঘুচাইলে পাপচিত্ত ধর্ম্মদাতা বাপ॥"

বুঝা যায় এ গুলি তিলক মাটীর ছাপ।

কেন না এ সমস্ত প্রাচীন লৌকিক উপাখ্যান ঘটিত কাব্যনিচয়ে বাঁধি গৎ। এই জাতীয় প্রায় সকল গ্রন্থেই এ সব বর্ণনা অল্প বিস্তর আছে।

হরগৌরীর কোন্দল পর্য্যন্ত দেবদেবীর কথা; এই ঘটনার সহিত কবি আপন কাব্যের চমৎকার গ্রন্থী বাঁধিয়াছেন। দেবী যখন পতির বাক্-পারুষ্যে চঞ্চলমনা, তখন সখী পদ্মাবতী "ভবিষ্যের কথা" কহিয়া তাঁহার চিত্তকে অন্য দিকে লইয়া গেলেন—সে কথা, এই কাব্যের আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন। ইহা শুনিয়াই দেবী আপন মাহাত্ম্য প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। গ্রন্থের উত্তরভাগ হইতে প্রমাণ হয়, দেশের লোক—বিশেষতঃ ধনবান বণিক সম্প্রদায় পূর্ব্বে ছিল শৈব, পরে শাক্ত হইয়া পড়ে। (পূর্ব্ব ভাগেও দরিদ্র নীচ জাতি ছিল শৈব—ক্রমে শাক্ত হইয়া দাঁড়ায়।) কৈলাসে হরগৌরীর কোন্দলে গৌরীই জয়ী হইয়াছিলেন; কবি দেখাইয়াছেন—মর্ত্ত্যেও শৈব অপেক্ষা শাক্ত বড়—শক্তির প্রতাপই সমধিক।*

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দুইটি উপাখ্যান আছে:—প্রথমটীতে দৃষ্ট হয়—নিরন্ন চুয়াড় নগণ্য নীচ জাতীয় লোক কেমন দেবীর কৃপায় রাজ্যেশ্বর হইতে পারে। দ্বিতীয়টীতে দেখা যায়—মহাঐশ্বর্য্যশালী সুপ্রতিষ্ঠ লোকও দেবী চণ্ডীকে অবহেলা করিলে অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি পরম শৈব হইলেও তাহার নিস্তার নাই।

পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাধান্য প্রচার—এক প্রকার আমরা বৈষ্ণবগণের রাধায় দেখিয়াছি, চণ্ডী বা দুর্গায় এই আর এক প্রকার।

লৌকিক উপাখ্যান বা কাল্পনিক গল্প লইয়া যেমন শক্তিদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারার্থ কাব্য রচিত হইয়াছে, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক

*চণ্ডীকাব্যের উদ্দেশ্য বোধ হয় কতকটা বুঝা যায়। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের উপা[illegible] হইতেও এইরূপ উপলব্ধি হয়। শীতলা-মঙ্গলে চন্দ্রকেতু রাজার কথা হইতেও এই তত্ত্বই পাওয়া যায়। শক্তি দেবীর নানা মূর্ত্তি। মনসা, শীতলাও শক্তি-বিশেষ।

আখ্যানের সহিত জড়িত করিয়াও সেইরূপ কোন কোন কবি শক্তি-বিষয়ক মঙ্গলকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা এক খানির ঈষৎ পরিচয় দিব—দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত "দুর্গামঙ্গল"।

প্রসিদ্ধ নলোপাখ্যান মহাভারতে যে রূপ আছে, মহাকবি শ্রীহর্ষ বিরাট কল্পনার সাহায্যে উহাকে তদপেক্ষা বিস্তৃত ও নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন; বাঙ্গালী কবি রামচন্দ্র উহার সহিত আর কিছু কল্পনা ও তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের চিত্র সম্বলিত করিয়া এই দুর্গামঙ্গল কাব্যের অবয়ব গঠিয়াছেন। এই কাব্যের নায়ক নায়িকা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মধ্যে দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমী ব্রতের কথা মিশাইয়া কবি কাব্যের নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। নৈষধকার সরস্বতীকে দেখাইয়া ছিলেন, আমাদের কবি ভগবতী দুর্গাকেই দময়ন্তীর সখীরূপে স্বয়ম্বর-সভায় টানিয়াছেন। কবির রচনার উৎকৃষ্ট অংশগুলি আদিরস-নিষিক্ত,—রচনা-কাল ভারতচন্দ্রীয় যুগের কাছাকাছি প্রকাশ করিয়া দেয়।

আমরা অন্যত্র হইতে একটু তুলি—

একদিন সখী সঙ্গে দময়ন্তী মন রঙ্গে পুষ্পবনে করিল প্রবেশ।
স্তবকে স্তবকে ফুল ভ্রমে গন্ধে অলিকুল গন্ধবহ গমন বিশেষ॥
পাতিয়া অঞ্চল পাঁতি তুলে পুষ্প নানা জাতি কেহ দিল খোঁপায় চম্পক।
বকুল কুসুমে মালা গাঁথে হার কোন বালা কোন সখী তুলিল অশোক॥
কোন সখী গিয়া তুলে মল্লিকা মালতী ফুলে হার গাঁথি পরিল গলায়।
কোন সখী হার নিল দময়ন্তী গলে দিল কোন সখী সখীরে সাজায়॥
বদ্ধ ছিল হংস সত্যে হেনকালে গেল মর্ত্যে উপনীত দময়ন্তী কাছে।
হংসে হেরি রাজকন্যা সঙ্গে কেহ নাহি অন্যা ধরিতে ধাইল পাছে পাছে॥

প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বেকার বাসর-ঘরের চিত্রটুকু দেখাই—

অন্তঃপুরে নারীগণ করয়ে কৌতুক। রাজার রমণী আসি দিলেন যৌতুক॥
ক্ষীরখণ্ড ভোজন করয়ে দোঁহে মিলি। বাসরে বসিয়া বর কন্যা করে কেলি॥
কুসুম শয্যায় নল জাগে বিভাবরী। কৌতুক করিছে আসি যত সহচরী॥

আপনি রসিক নল তাহে রসকূপ। রসিকা সহিত রসে ভাসে নলভূপ॥
রসিকা রমণী মেলি কেহ ধরে ঝুটি। কোন কোন সহচরী দিল কান-লুটি॥
কর্পূর লবঙ্গ সহ তাম্বুল পুরিয়া। কোন সখী নল করে দিলেক তুলিয়া॥
রমণী যুবতী যত রসিকা সাগর। নল রাজা রসে ভাসে বিবাহ বাসর॥
এই রূপ নল রাজা জাগিল রজনী। বিরচিল রামচন্দ্র ভাবিয়া ভবানী॥

প্রায় আমাদের এখনকারই মত। তবে এ রসিকতা কমিয়া আসিতেছে।

চণ্ডীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি অনেকগুলি মঙ্গলকাব্য এবং শুভচণ্ডী (বা সুবচনীর) পালা বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে আছে, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই এই সকল কবির উদ্দেশ্য—স্পষ্ট বুঝা যায়। কবিগণ দেখাইয়াছেন—

"সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দাও মা ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর অধোগামী॥"

কিন্তু দেবীর প্রতাপ প্রভাব দেখাইতে গিয়া কবিগণ সময়ে সময়ে মাহাত্ম্যের নাস্তানাবুদ করিয়াছেন মনে হয়। মায়াময়ী ভক্তবৎসলা—প্রকৃত ভক্তের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন, তাহাকে বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, অভক্তকে বিপদে ফেলিয়া নাকানিচোবানি খাওয়াইয়া পরিত্রাণ করতঃ তাহাকে ভক্ত করিয়া তুলিবেন—এ সকল লীলা, কবি-কাহিনী বুঝা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া দেবারাধ্যা মহাদেবী ভক্তের যে কোন কার্য্যে—ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, স্পষ্ট সামাজিক নীতির মূলে কুঠারাঘাত হইলেও—সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, এরূপ গল্প [illegible] জগজ্জননীর মাহাত্ম্যপ্রচারের জবরদস্তী পন্থা, এবং প্রকৃতি কবির শক্তির অপব্যবহারের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করাই উচিত।

শেষোক্ত এই জাতীয় চণ্ডীকাব্যের মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই শ্রেণীর কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্বপ্রধান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দরকাব্য অন্নদামঙ্গলের শাখা মাত্র।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বহু পূর্ব্বকাল হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিদ্যাসুন্দরান্তর্গত বিখ্যাত চোর-পঞ্চাশৎ—বিদ্যাপক্ষে কালীপক্ষে দ্ব্যর্থবাচক—শ্লোকমালা বররুচি-রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে। বররুচি রাজা বিক্রমাদিত্যের সমকালিক।

কেহ কেহ কহেন, চোর-পঞ্চাশৎ শ্লোক-মালা "চোব" নামক প্রায় ৮০০ বৎসরের প্রাচীন কোন কবির রচিত; ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল বিহ্লন।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর ২।৩ খানি পাওয়া গিয়াছে, বিশেষ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

বঙ্গীয় কবিগণ বিদ্যাসুন্দব উপাখ্যানকে কালী নামের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়া চণ্ডীকাব্যের ন্যায় উহাতেও দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে বিরচিত কায়স্থ-কবি গোবিন্দদাস প্রণীত একখানি "কালিকামঙ্গল" পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যেও বিদ্যাসুন্দরেব গল্প বিদ্যমান; তাহাতে ঘটনাস্থান ও চরিত্রবর্গের নাম লইয়া প্রভেদ আছে। সে কাব্যে বর্দ্ধমান নাই, রত্নপুর আছে; কাঞ্চীপুর নাই, কাঞ্চননগর দৃষ্ট হয়; হীরামালিনীর স্থলে রম্ভা মালিনী পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস চট্টগ্রামবাসী কবি, তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে শ্লীলতার অভাব আদৌ নাই। গ্রন্থখানি কালীমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক ও ধর্ম্মতত্ত্ব-পূর্ণ। এই কাব্যের একটি শিব স্তোত্র—গান—

জয় শিব শঙ্কর তহঁ গতি।
জয় দেবনাথ জগত-তারণ চরণ-সরোরুহে বহু মিনতি।

সুরনদী-চন্দ্রিম-মুকুট মাল ভূষণ ফণি-মাল-কুণ্ডল শোহে শ্রুতি।
টলমল ত্রিনয়ন জ্বাল আধ মিলন রজত-ধরাধর অঙ্গদ্যুতি॥
সুর-রিপু-ত্রিপুর-হর দাহন অবলেহন সীম বরণ শিব যোগ-পতি।
বিলসতি যোগ ভোগ ভব বাসন দীন-শরণ জয় গৌরী-পতি॥

রাগ—তুরি।

নৌমি নন্দিকেশ ঈশ কণ্ঠে কালকূট বিষ
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেবদেব বন্দনী।
অৰ্দ্ধ অঙ্গ গৌরী সঙ্গ মৌলী কেলি চতুরঙ্গ
অঙ্গ ভঙ্গ অতি রঙ্গ সোহে জহ্নু-নন্দিনী।
রঙ্গনাথ লোকপাল অৰ্দ্ধ অঙ্গ বাঘ-ছাল
ব্যোমকেশ শেষমাল ভালে ইন্দু মোহিনী॥

তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন এই গোবিন্দদাস-বিরচিত (কালিকা-মঙ্গল) বিদ্যাসুন্দরে স্থলে স্থলে কবিত্ব সুন্দর।

কোন কোন সমালোচকের মত,—মুসলমান যুগের শেষাশেষি, যখন দেশে হিন্দু-মুসলমানে খুব মেশামিশি হইয়াছে এবং হিন্দু কবিগণ মুসলমানী কাব্য-সাহিত্য-রসের রসিক হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তাঁহারা কেহ কেহ নামে মাত্র দেবসংস্রব রক্ষা করিয়া মুসলমানী কাব্যোপাখ্যান সমূহের ভাবের দ্বারা আপন আপন কাব্য শোভিত করিতে গিয়া বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ সেই সমালোচকগণ বিদ্যাসুন্দরের হীরা মালিনী, বিদু ব্রাহ্মণী প্রভৃতি চরিত্রের উল্লেখ করেন। এরূপ চরিত্র হিন্দু সাহিত্যে বিরল কিন্তু মুসলমান কাব্য-উপন্যাসে ভূরি ভূরি আছে।

গোবিন্দ দাসের পর আর এক খানি বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে—কবি কৃষ্ণরাম রচিত। ইহা বোধ হয় রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের রচিত কাব্যের ৪০।৫০ বৎসর পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী। ইহার মধ্যে অশ্লীলতা দোষ যথেষ্ট বিদ্যমান। এই সময় হইতে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অশ্লীলতা প্রবেশ লাভ

করিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরেও ঘটনা-স্থল বর্দ্ধমান নহে। কৃষ্ণরামে মালিনীর নাম বিমলা। এই কাব্যে মালিনীর বেসাতীতে আমরা দেখিতে পাই—

অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে। চক্ষু টিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে॥
জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। আনিয়াছি কিছু কিন্তু বলি আমি তাই॥

পাঠক বুঝিতে পারিবেন ভারতচন্দ্রের মালিনী কোথা হইতে হাটের হিসাব নিকাশ করিতে শিখিয়াছেন। সুন্দরের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বুঝিতে কৃষ্ণরামেও আছে—

"বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ। হেনকালে ময়ূর করিল কেকানাদ॥
সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পারিনী। সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে স্বজনি

ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরেও এখানটা ঠিক এমনই।

এ সকলও নবদ্বীপের রাজ-কবির ধার করা জিনিষ, কিন্তু তিনি জিতিয়া গিয়াছেন স্বীকার করিতেই হয়।

কৃষ্ণরামের দেখাদেখিই হউক আর যে কারণেই হউক, ইহার পরেই পরম সাধক কবি রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর—তাহার ভিতরও লজ্জাহীনতার চূড়ান্ত। এক এক স্থলে সাধক কবি এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন মনে হয়। বিদ্যার গর্ভ লইয়া মায়ে ঝিয়ে কথাকাটাকাটি কবিরঞ্জনের কাব্যে যেরূপ ভাবে আছে তাহা মেছো-হাটাতেই শোভা পায়। রামপ্রসাদের হীরা মালিনী জ্ঞান-পাপী।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে ঘটনা-স্থান বর্দ্ধমান। কেহ কেহ বলেন, বর্দ্ধমানরাজ কর্ত্তৃক ভারতচন্দ্র অল্পবয়সকালে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন; বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কবি বর্দ্ধমান নাম বসাইয়া তাহার শোধ তুলিয়াছেন। কথাটা ঠিক মনে হয় না। রামপ্রসাদ ত বর্দ্ধমান-রাজ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হন নাই, তিনি বর্দ্ধমান-রাজবাড়ীর উপর ঝাল ঝাড়ি-

লেন কেন? এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন—নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বর্দ্ধমান-রাজের সহিত বিষয়কর্ম্ম লইয়া মনোমালিন্য ছিল; তিনিই আপন সভা কবিদ্বয়ের দ্বারা এই আদি-রস-প্রধান কাব্যের ঘটনাস্থল বর্দ্ধমান করাইয়াছেন। এ অনুমান যথার্থ হইলে রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের ঘোরতর অপযশের কথা।

যাহাই হউক, ঘটনাস্থল যে কল্পিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এমনই কুৎসা-প্রিয় জাতি, এখনও অনেকের ধ্রুব ধারণা, বিদ্যা-সুন্দরের ঘটনা বাস্তবিকই বর্দ্ধমানে হইয়াছিল! শুনা যায়, গুণগ্রাহী প্রবীণ সমালোচক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মত লোকও "বিদ্যা, সুন্দরের ন্যায় অলৌকিক কাণ্ড কোথাও কখন বাস্তবিক কি ঘটে" লিখিয়াও সুন্দরের সুড়ঙ্গ ও মালিনীর বাসা খুঁজিতে বর্দ্ধমানময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন! অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন—লাভ হইয়াছে শুধু উইএর ঢিপি আর রাজপথের ধূলা।

ভারতের প্রায় সমসময়ে নিধিরাম নামে এক কবি এক খানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন—নামে "কালিকামঙ্গল"; এ কাব্যেও ঘটনাস্থল বর্দ্ধমান নহে—উজ্জয়িনী।

ভারতচন্দ্রের কিছু পরে আর এক খানি বিদ্যাসুন্দর কবি প্রাণারাম রচনা করেন। এই দুইখানি কাব্য নগণ্য বলিলেও চলে।*

নিধিরামের "কালিকামঙ্গল" নামক বিদ্যাসুন্দর হইতে কয়েক ছত্র উঠাইয়া দেখাই,—বিদ্যার আগারে সুন্দরের প্রথম আবির্ভাব—

দুই জনের চারি চক্ষু হইল দরশন।　　সাক্ষাতে দেখিলো যেন দ্বিতীয় মদন॥
লজ্জা পাইআ বৈদগধী রৈলো খাটের হেটে।　ইষদ হাসিআ বীর বৈসে স্বর্ণখাটে॥
হরিষে কুমারী করে লাস অভিলাস।　　কাহার ঘরের চোর আইলো মোর পাশ॥

---

* প্রাণারাম চক্রবর্ত্তীকে কেহ কেহ ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কোথায় নাগর চোর আইলো মোর ঘরে। গৃহস্থের না গণি বৈসে খাটের উপরে ॥
কি কারণে হাসে চোর কার কিবা দেখে। না করে এমত কাজ লজ্জা যার থাকে ॥
ওহে সখি কি আশ্চর্য্য দেখরে জাগিআ। চোরে উপদ্রব করে কিসের লাগিআ ॥

* * * *

উপেক্ষি মরণ ভয় কেনে হইলো সাধ। এরূপ যৌবন মোর চোরের প্রমাদ ॥.

সুন্দর এখানে "বীর" সুতরাং বিদ্যাকে খাটের নীচে লুকাইতে হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই পূর্ব্বের পরের এই নামধারী সকল কাব্যকে ডুবাইয়া দিয়াছে।

একই বিষয় দুই কবি যখন বর্ণনা করিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে এক জনের কাব্য যখন নিশ্চিতরূপে শ্রেষ্ঠ এবং তুলনায় সমালোচনা যখন আমাদের অভিপ্রায় নহে, তখন কবিতা-হিসাবে নিকৃষ্টের পরিচয় লইতে যাওয়া বৃথা। ইহা সত্য হইলেও রামপ্রসাদ যখন একজন প্রকৃত কবি এবং তাঁহার বিদ্যাসুন্দর যখন ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বগামী—আদর্শ বলিলেও চলে—তখন বয়োজ্যেষ্ঠের কিঞ্চিৎ সংবাদ লইতে দোষ নাই।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের প্রধান বিশেষত্ব—তাহার ভাষা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার যে বিশেষরূপ চর্চ্চা চলিতেছিল, তাহা এই কাব্য হইতে বেশ বুঝা যায়। কবি স্থলে স্থলে কাব্যের ভাষাকে সংস্কৃতের নৈকট্যযুক্ত করিয়া বোধ হয় তাঁহার কাব্যকে রাজসভার উপযোগী করিতে গিয়াছিলেন।

"সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।"

কিম্বা—

"ক্ষেপ করে দশ দিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে।"

প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলেও—

নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে। অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে ॥
জাবহারা তারাকারা ধারা শত শত। গো-যুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত ॥
বিগলিতকুন্তল জলদপুঞ্জ ছটা। নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা ॥

কিম্বা—

দয়িত দুর্গতি দেখি   দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী   দুঃখ-সিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে   ধীহারা ধূচর বাড়ে   ধড়ে প্রাণ নাহি মর্ম্ম ছুটে॥
নয়নে নির্গত নীর   নিশায় নিম্নগা তীর   নাথার্থে পদ্মিনী যেন জয়া।

বা—

কাঁদরে কেশর রূপা   কলতঃ কর গো কৃপা   ফিরিয়ে ফিরাও প্রাণনাথে॥

এ সকল কটমট বাক্য-বিন্যাস পাঠ করিয়া, যমক-রূপক-অনুপ্রাসের ঘটা দেখিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কবির নিজের বাক্যেই আমাদের বলিতে হয়—

কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী অক্ষর হৃদে যায়॥

অবশ্য সর্ব্ব স্থলেই ভাষা এইরূপ নহে; স্থলে স্থলে প্রসাদগুণও লক্ষিত হয়; কিন্তু কবির অলঙ্কার-শাস্ত্রের দিকে ঝোঁক সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। যথা—

ডুবিল কুরঙ্গ-শিশু মুখেন্দু-সুধায়।   লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥

কিম্বা—

"উথলে বিরহ-সিন্ধু ভাঙ্গে শান্তি-সেতু।   মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু॥"

অথবা—

"চন্দ্র মধ্যে চন্দ্র দীপ্ত সুচন্দন বিন্দু॥

কোথাও বা—

"জল-শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।   ক্ষণেক বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥"

আবার কোথাও—

ভূতলে আছাড়ে গা   কপালে কঙ্কণ ঘা   বিন্দু বিন্দু বহে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভে চমৎকার   অশোক কিংশুক হার   গাঁথা চাঁদে যেন দিল ভক্ত॥

মধ্যে মধ্যে ভাবের দারিদ্র্য স্পষ্ট, কষ্ট-কল্পিত ভাষা ও ছন্দই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

কোন ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম   পোড়ে মর্ম্ম গাত্র চর্ম্ম   দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ এই বেশ   পায় ক্লেশ কৃপা-লেশ   কর তাই অকাল মরণে।

কিম্বা—

জ্ঞানহারা গো-মধ্যা গো-যুগে জল ঝরে। ধূলায় ধূসর ধড় ধড়ফড় করে॥

কোন কোন স্থল একেবারে হেঁয়ালী—

যার বাটী যায় তার নাকে আনে দম। কয়েকেতে চুরচুর নদারদ গম॥

এ প্রকার ভাষা বা শব্দযোজনা হাস্যরসেরই উদ্রেক করে।

রামপ্রসাদ একজন প্রকৃত কবি, তাঁহার মত লোকের রচনা সকলের অবধান-যোগ্য, সেই কারণেই আমরা এত কথা তুলিয়াছি। কবির সঙ্গীতগুলির ভাষা কেমন সহজ সরল ভাবের উৎস, আবার সেই লেখনী-প্রসূত কাব্যের ভাষা কিরূপ বিসদৃশ দেখিতে পাইতেছেন। (বলিয়া রাখি, কবির "কালী-কীর্ত্তনের" দু একটি গানও সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া অপরূপ শুনায়।)

আমরা রামপ্রসাদ রচিত কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর হইতে সাময়িক চিত্র দু এক খানি উঠাইয়া কবির নিকট হইতে আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করি, পরে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

বিদ্যার ঘরে সুড়ঙ্গ, সেই পথে তল্লাস করিতে করিতে চোর ধরা পড়িয়াছে, সহরে সোরগোল কেমন—

সহরে গুজব উঠে একে শত শত। গল্প বাড়ে বড়ই আঠার মেসে যত॥
দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট। পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক সরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা। পোয়া দেড় গুড়াকু তামাক ঢেঁকি কুটা॥
হেঁসে কহে তোমার শুনেছ ভাই আর। শুনিলাম এমনি আশ্চর্য্য সমাচার॥
হাত-কাটা একটা মানুষ গেল করে। চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে॥

তাম্রকূট-সেবী কল্পনাপ্রিয় নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালীর যথাযথ চিত্র।

কবি ছিলেন ঘোর শাক্ত, বৈষ্ণব বৈরাগী তাঁহার চক্ষের বিষ; বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধঃপতনও বোধ হয় সে সময়ে বিলক্ষণরূপ হইয়াছিল। ভাল মন্দ একত্র করিয়া একখানি স্পষ্ট চিত্র—

দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসী বেশ। কত সব চুল কত মুড়াইল কেশ॥
কটিতে কোপীন মাত্র তাহাতে গিরস্ত। সদা করে কেবল ভক্ষণ নাম-রস॥

* * * *

খাসা চীরা বহির্বাস রাঙা চীরা মাথে। চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
মুণ্ড মুণ্ড ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি। দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে। বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥
সে রসে রসিক নবশাখ লোক যত। উঠে ছুটে পায়ে পড়ে করে দণ্ডবত॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। ভাল মতে সেবা চাই করে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্ঠি শুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে। মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে। শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্র শেষ টাটে॥
বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়। ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্রে জড়ায়॥
কেমন কলির ধর্ম্ম কব আর কি। মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝি॥

এই পর্য্যন্তই থাক্।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত বিদ্যার উৎসাহ-দাতা বড়লোক এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রামপ্রসাদকে কিছু জমী ও "কবিরঞ্জন" উপাধি দান করেন; রামপ্রসাদ প্রতিদান স্বরূপ কবিরঞ্জন নামক এই বিদ্যাসুন্দর কাব্য তাঁহাকে উপহার দেন।* এতদ্ভিন্ন "কালীকীর্ত্তন," "কৃষ্ণকীর্ত্তন" নামক আরও দুইখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রসাদ-কবির রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। "কালী কীর্ত্তনের" রচনাগুণেরও অনেকে সুখ্যাতি করিয়া থাকেন।

---

* রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরও সমাপ্তি কালে "অষ্টমঙ্গলা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কাব্যখানি উপস্থিত যে আকারে পাওয়া যায়, তাহাতে অষ্টমঙ্গলা দাঁড়ায় না। অতএব ইহার পূর্ব্বভাগ—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ন্যায় কতক ছিল ইদানীং লোপ পাইয়াছে, অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পরভাগে কিছু অতিরিক্ত বিষয় আছে।

এইবার আমরা সঙ্কটস্থলে আসিয়া পঁহুছিলাম—ভারতচন্দ্র।

কাহারও কাহারও মতে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি; কেহ কেহ বা তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে মুখ না বাঁকাইয়া থাকিতে পারেন না। ভারতচন্দ্রের দোষগুণের অনেক কথা আমরা ইতি-পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ভারতচন্দ্রের প্রতিভা অসাধারণ। তাঁহার শব্দ-মন্ত্রের গুণে তিনি পুরাতনস্য পুরাতনকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন। নিন্দনীয়, ভদ্রসমাজে প্রকাশ্যভাবে অবর্ণনীয় বিষয়কেও এমন ভাবে সাজাইয়া দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালী জাতি তাঁহার লেখনীর নিকট বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে অশ্লীল অংশ যে বড় বেশী তাহা নহে; কিন্তু যাহা আছে তাহা সাধারণের পক্ষে এমন চিত্তাকর্ষক রূপে বর্ণিত যে প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া দেশের কাব্য-সংসারে সে বর্ণন বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের পালা, হীরা মালিনীর অভিনয়—যাত্রায়, গানে, পাঁচালীতে, ছড়ায়, রঙ্গরহস্যে বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গবাসীকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল। সে এক দারুণ নেশার ঘোর; অনেকে এই মত্ততার মূল-কারণ বলিয়া ভারতচন্দ্রকেই নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি তাঁহার সমকালিক কবি, পরন্তু ভক্তিপ্রাণ সাধক রামপ্রসাদও এ বিষয়ে দোষী কম নহেন। ইঁহাদের পূর্ব্বেও এ নেশার আমেজ যে পাওয়া যায় না, এমন নহে।* ভারতচন্দ্র সময়ের শিশু, সাহিত্য সাময়িক সমাজের দর্পণ।

---

* বৈষ্ণব কবিগণের কথা অবশ্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, সে সব ঠাকুর দেবতার কথা। ভারতচন্দ্রের বহু পূর্ব্বের কাব্য মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও দেখা যায়—(বারুইপাড়া, হরিহার পালা, গণ্ডকাটা পালা দ্রষ্টব্য।)

"যুবক পুরুষ হয়ে যুবতীরে ডর। ভাল দেখে একটাকে শাপটিয়ে ধর॥"

অধুনা ইংরাজী সাহিত্য পাঠে, ইংরাজী কাব্য-রসাস্বাদনে আমাদের যে রুচি দাঁড়াইয়াছে, ভারতচন্দ্রের সময়ে তাহা আদৌ ছিল না। ভারতচন্দ্র কেন,বোধ হয় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ দেশেই ছিল না। আবার আমাদের একালের রুচিও সেকালের লোকদিগের হয়ত বিস্ময় উৎপাদন করে। আজ আমরা Venus de Mediciর নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া শিল্প-মাধুর্য্যে আত্মহারা হই, প্রাচীন লোকেরা দেখিলে হয় ত এক হাত জিহ্বা বাহির করিয়া বসেন। সময়ক্রমে রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়।

অশ্লীলতা দোষের জন্য ভারতচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিতে পাশ্চাত্য-সভ্যতা গর্ব্বে দৃপ্ত যে সকল সমাজ-সংস্কারকের কণ্ঠ-তালু শুষ্ক হয়, তাঁহাদের নৈতিক উন্নতির জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়, কিন্তু তাঁহাদের অবগতির জন্য একসময়কার ইংরাজী সাহিত্যের খবর কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতে পারে। একজন সমীচীন সমালোচক লিখিয়াছেন—

The wits of the Restoration from Dryden down to Durfey, are open to the same objection. The "Plain Dealer" and "The Country Wife" are of a more immoral tendency

---

অন্যত্র—

পুরের রমণী মোরা পিরিতকে মরি। রসিক পুরুষ পেলে হার করি পরি॥

কোথাও বা—

বুকের বসন তুলি খল খল হাসে।

তারপর "কণক মহেশের" বিশেষরূপ পরিচয় দিয়া—

"প্রত্যহ আমার পায়ে মাখাবেন তেল।"

অপরত্র—"দেখিয়া মদন বদন তোর। জাগিয়া জীবনে করিল জোর॥"—প্রভৃতি কবিত্ব-উদ্গারে বুঝা যায়, বঙ্গে পঙ্কিল আদিরসের স্রোতের আদি উৎস ভারতচন্দ্র নহেন। অবশ্য বলা চলে এ সব নটিনীদের কথা।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত করিয়াছেন।

than even Vidya Sundar............The male characters in Wycherley's plays are not libertines merely but inhuman libertines ; the women are not merely without modesty but are devoid of every gentle and virtuous quality.

(Calcutta Review, Vol. xvii.)

কিন্তু যাহাই বলা যাউক না কেন, অশ্লীলতা নিশ্চয়ই অমার্জ্জনীয়। আবার ক্ষমতাশালী প্রতিভাবান ব্যক্তির লেখনী হইতে সে অপরাধ অধিকতর নিন্দার যোগ্য সন্দেহ নাই ; কেন না সাধারণে তাঁহাদের রচনা আগ্রহের সহিত পাঠ করে এবং প্রতিভাশূন্য পুচ্ছগ্রাহীর দল তাঁহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের বিক্রমাদিত্য বিশেষ। বাঙ্গালার দুইজন প্রধান কবি তাঁহার সভা-কবি ছিলেন। সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ রাজসভার মনোমত ফরমাইস যোগাইতে অপটু বিধায় উদীয়মান নবীন কবি ভারতচন্দ্র আসর গ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রে মৌলিকতা অল্প, কিন্তু পরের সামগ্রী লইয়া, মাজিয়া ঘসিয়া, পদলালিত্যের রসান চড়াইয়া এমন চাকচিক্যময় মনোমোহন করিয়া তুলিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন যে সে মূল জিনিষটার কথা লোকের আর মনেই আসে না, তাঁহার কারিগরীতেই বাহবা দিতে হয়।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল মুকুন্দরামের (অভয়ামঙ্গল) চণ্ডীর অনুকরণ। প্রবাদ আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মুকুন্দরামের অনুকরণে কাব্য প্রণয়নে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র রাজ-সভার কবি, মুকুন্দরাম গ্রাম্য কুটিরবাসী কবি। দারিদ্র্য গৃহস্থালী বর্ণনায় মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ, ধনীর ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ বর্ণনায় ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্র যেখানে অনুকরণ করিয়াছেন, সেখানে মূলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। মুকুন্দরাম স্বভাবের অনুগামী অধিক

ভারতচন্দ্রে শিল্পকলা বেশী। মুকুন্দরাম সৃষ্টিকুশলী কিন্তু ভারতচন্দ্রও স্বভাব-কবি।

গ্রন্থের আদিতে দেবদেবী বন্দনা, সৃষ্টি-কথন, দক্ষ যজ্ঞ,শিব,নিন্দা,সতীর দেহত্যাগ, পার্ব্বতীর জন্ম ও তপস্যা,মদন-ভস্ম,রতি-বিলাপ, নারদের ঘটকালি, শিব-বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম হইতে লইয়াছেন; তবে ব্যাস-কাশীর বিবরণ প্রভৃতি অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ; মধ্যে মধ্যে কাশীখণ্ড হইতেও তত্ত্ব-সংগ্রহ আছে।

শাপভ্রষ্ট নায়ক নায়িকার জন্ম-পরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধা বেশ ধারণ, শব্দ-শ্লেষ সহকারে দেবীর আত্ম পরিচয় দান, মশানে রাজসেনার সহিত দেবীর অনুচর বর্গের যুদ্ধ, চৌত্রিশাক্ষরে দেবীর স্তুতি—এ সকলও মুকুন্দরামের অনুকরণ।

ঝড় বৃষ্টি দ্বারা দেশ-বিপ্লাবন, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট পত্নীর বারমাসী সুখ বর্ণন, সুপুরুষ দর্শনে নারীগণের নিজ নিজ পতি-নিন্দা, পরিচারিকার বেসাতী—বাজার করার পরিচয়—এ সকলও কবিকঙ্কণ হইতে গৃহীত। উভয় কাব্যের অষ্টমঙ্গলাও একই ধরণের।

হীরা মালিনীও রামপ্রসাদের, তবে ভারতচন্দ্রের হীরা আরও পাকা চরিত্র।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আগাগোড়াই রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের উপরই রঙ ফলানো—সংশোধিত সুমার্জ্জিত সংস্করণ বলিলেই চলে। ভাষা অনবদ্য, রস-সমাবেশ সমধিক।

(আমরা দেখাইয়াছি, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরও তাঁহার নিজস্ব নহে)।

ভারতচন্দ্রের প্রধান কাব্যের নাম অন্নদামঙ্গল ; বিদ্যাসুন্দর ও মান-

সিংহ তাহারই অন্তর্গত পালা বিশেষ। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের জন্যই ভারতের নাম। অন্নদামঙ্গলে—প্রধান আখ্যানে—স্থানে স্থানে বর্ণনা মনোরম হইলেও বিদ্যাসুন্দরের মনোহারীত্বে তাহা চাপা পড়িয়াছে।

কবির অন্নদামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর মানসিংহ লইয়া) একখানি দস্তুর মত অষ্টমঙ্গলা।

ভারতচন্দ্রের রচনাশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা গোড়াতেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনে পাই—

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়। কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে। কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল। কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥

শব্দযোজনা বিষয়ে ভারতের ক্ষমতা অসাধারণ ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। একটু নমুনা—শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা (ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দ)—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম্ ভভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফন্ন গাজে। দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে। ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা। কটি কট্ট সদ্যমরা-হস্তিছালা॥
পচা চর্ম্মঝুলী করে লোল ঝুলে। মহা ঘোর আভা পিণাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে। উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা। হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী। মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে। চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্ত কেশে॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে। কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে। অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে। সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

অপর রস কিঞ্চিৎ—

কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে ॥
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল, পবনে ঢলঢল উছলে কূলে ॥
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী, করিল রাজধানী অশোক মূলে ॥
কুসুমে পুনঃ পুনঃ ভ্রমর গুণ গুণ, মদন দিলা গুণ, ধনুক হুলে ॥
যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন, মধু মুদিত মন, ভারত ভুলে ॥
মধুমাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন। সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন ॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে। গুণ গুণ গুণ গুণ ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥
সুশোভিত তরুলতা নবদল পাতে। তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে ॥
অলি পীয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে। সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে ॥
ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান। সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান ॥
শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুঞ্জরে। মুঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে ॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুম ছলে হাসে। তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে ॥

ভারতের ভাষাব প্রসাদগুণ—শিব-বিবাহ কালে যেখানে—

ভবানীর ভাবে ভব ঢলিয়া ঢলিয়া

চলিয়াছেন, সে স্থলে স্পষ্ট প্রতীয়মান। কবির পরিহাস-রসিকতাও তন্মধ্যে ফুটিয়াছে ভাল। কৌতুকী কেশবের কৌতুক ও নারদের রহস্য—

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনী হাসে ॥

সেকেলে ধারণা অনুসারে বোধ হয় পহেলা নম্বর কবিত্ব।*

---

* ভারতের রতি-বিলাপে—

শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে আগুণের কপালে আগুণ ॥
অরে নিদারুণ প্রাণ কোন পথে পতি যান আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীব রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া ॥

অনেকে ভুলিতে পারিবেন না। ইহাতে ভাবের মনোহারিত্ব আছে নিশ্চয়, কিন্তু এখানে যে ভাবটি চাই, সেই শোক-ভাবের অভাব সমালোচকগণ অনুভব করিয়াছেন।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির আমরা সুখ্যাতি করিব কি নিন্দা করিব ভাবিয়া ঠিক পাই না—(ধরিয়া লইতে হইবে এটি স্ত্রীলোকের জোবান)—

আই আই অই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥

উমার কেশ চামর ছটা তামার শলা বুড়ার জটা
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী, দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া
ছার-কপালে ছাই-কপালে, দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার বুড়ার গলে হাড়ের ভার
কেমন করে ওমা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া ভাঙ্গড় পাগল অই না বুড়া
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥

আপামর সাধারণ বাঙ্গালী ভারতচন্দ্রে মুগ্ধ কেন, এই সব ছড়া হইতে বুঝা যায়। "ভুবনেশ্বর" বলুন আর যাহাই বলুন—কবির হাতে ঈশ্বরত্ব লোপ পাইয়াছে, আমাদের বুঝিতে বাকি থাকে না। কিন্তু এই পটের অপর দিক্—

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মণিময় কিঙ্কিনী বাজে আধ ফণী ফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা আধ মণীময় হাত উজালা
আধ গলে শোভে গরল কালা আধই সুধা মাধুরী রে॥
এক হাতে শোভে ফণীভূষণ এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ ধুতুরা ভক্ষণ আধই তাম্বুল পূরি রে॥
ভালে ঢুলুঢুলু এক লোচন কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন আধই সিন্দুর পরি রে।
কপাল লোচন আধই আধে মিলন হইল বড়ই সাধে
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে হইল প্রণয় করি রে।
দোঁহার আধ আধ আধশশী শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি

আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী আধই চারু কবরী রে।
এক কাণে শোভে ফণী-মণ্ডল এক কাণে শোভে মণি-কুণ্ডল
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল আধই গন্ধ কস্তুরী রে।

ভারতের অঙ্কিত একখানি চিত্র দেখাই—ব্যাসদেব—

দাঁড়াইলে জটাভার চরণে লুটায় তাঁর কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁফ পাকা দাড়ী পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি চলনে কতেক আঁটু বাঁটু॥
কপালে চন্দন ফোঁটা গলে উপবীত মোটা বাহুমূলে শঙ্খ-চক্র-রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলিযুগ বাঘ-থাবা সারি সারি হরি নাম লেখা॥
তুলসির কণ্ঠী গলে লম্বি মালা করতলে হাতে কাণে ধরে ধরে মালা
কোশাকুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন তাহে বৃষ্ণসার মৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কৌপীন পরি বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পীবারে জল হাতে আসা হিঙ্গুল বরণ॥

দিব্য একখানি বৈষ্ণব-বৈরাগীর চিত্র—আর একখানি জীবন্ত ছবি—অন্নদার জরতী বেশ—

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী। ডান করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি। হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেঁয়া কাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীকী করে ইলিমিলি। কোটি কোটী কাণকোটারির কিলিকিলি
কোটরে নয়ন দুটী মিটিমিটি করে। চিবুকে মিলিয়া নাশা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে। শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজ ভার। অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাঁটী ছিঁড়া টেনা করি পরিধান। ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝাঁপড়ী লড়ী আহা উহু করে। জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়। কুঁজ ভরে গিঠডাঁড়া ভূমেতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল। চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, মুকুন্দরামের জরতী-বেশ অপেক্ষা এ চিত্র কত ফুটন্ত।

ভারতচন্দ্রের অন্নদা কর্ত্তৃক পাটুনীর নিকট ব্যাজ পরিচয় ও দক্ষ কর্ত্তৃক দ্ব্যর্থবাচক শিবনিন্দা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ—কবির লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ; একটি দেখাই—

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী। বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষনে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশে জাত। পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি। জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে। না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই। যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥

ক্ষুদ্রবুদ্ধি পাটুনী ত সকলি বুঝিল ; সে ভাবে—

যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।

সে দর করিতে বসিল ;—

যার নামে পার করে ভব-পারাবার। ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ। কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥

গণ্ডমূর্খ ভাগ্যবান পাটুনী দেবীকে কুম্ভীরের ভয় দেখাইয়া সেঁউতি উপরে সেই রাঙ্গা চরণ রাখিতে অনুরোধ করিল ;—

বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়। হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি উপরে। তাঁর ইচ্ছা বিনে ইথে কি তপ সঞ্চরে॥

দেখিতে দেখিতে সেঁউতি সোনার হইয়া গেল !

আমাদের কবি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত লোক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে তিনি শাপভ্রষ্ট কুবের-পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই মজুমদার মহাশয় আকবর-সেনাপতি স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা

মানসিংহের কমিশরিয়েট-বাবু ছিলেন। বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যকে দমনার্থ গমন কালীন মানসিংহ যখন বর্দ্ধমানে উপনীত হন, কানুনগো ভবানন্দ মজুমদার তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ প্রসঙ্গতঃ "বিদ্যাসুন্দরের কথা" ব্যাখ্যান করিলেন। গল্পটী এই—

বর্দ্ধমানে কোন সময়ে বীরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন, বিদ্যা নামে তাঁর কন্যা—"রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী"। বিদুষী রাজকুমারী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি পতিরূপে বরণ করিবেন। অনেক অনেক রাজপুত্র আসিয়া হারিয়া গেলেন।

কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধু রায়, তাঁহার পুত্র একটি ছিল—বড় রূপ-গুণ-যুত—নামেও "সুন্দর"। বীরসিংহ রাজার ভাট দেশে দেশে সংবাদ প্রচার করিতেছিল, কাঞ্চীপুরেও বিদ্যার পরিচয় দেয়। রাজপুত্র শ্রীমান সুন্দর ভাটকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বিদ্যার তত্ত্ব লইলেন ; শুনিয়া—

কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট॥

তখন রাজকুমার—

মন্ত্রের সাধন কিবা শরীর পাতন—

প্রতিজ্ঞা করিয়া, গোপনে একা বর্দ্ধমানাভিমুখে অশ্বারোহণে ছুটিলেন—

অতসী কুসুম শ্যামা স্মরি সকৌতুক।
দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি অমনি চাবুক॥

সঙ্গে এক শুক পক্ষী মাত্র। শ্যামা মা সহায়, প্রেমিকের ব্রত, সুতরাং—

কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥

বর্দ্ধমানে পঁহুছিয়া, নগরদ্বারীগণের নিকট —

নীচ যদি উচ্চ ভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে—

রাণীর সার্থকতা দেখাইয়া, পুরীর গড় ফাটক উত্তরাইয়া, ক্রমে এক উপবন সমীপে রম্য সরোবরতীরে বকুলতলায় বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। সেই সরোবরে নগরের অনেক স্ত্রীলোক জল লইতে আসিত; আজ অকস্মাৎ—

সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কলসী খসিয়া।
ভারত কহিছে সাড়ী পর লো কসিয়া॥*

যাহা হউক, কামিনীগণ ত স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক নানাছলে ফিরিয়া ফিরিয়া সুন্দর পুরুষটীকে দেখিতে দেখিতে গৃহে যান; রাজপুত্র বকুলতলায় বসিয়া আপনার শুকপক্ষীটির সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন;—

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম। দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে। কানে কড়ী কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥
চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী। ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে। এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কত গুলি। চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়। পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া। তুলিতে বৈকালি ফুল আইসে সেই পাড়া॥

চোখাচোখী হইল, মালিনী ভাবিল—

কাহার বাছনি রে নিছনি লয়ে মরি।

* শিববিবাহের পর মহাদেবের মোহন রূপ দেখিয়া, বকুলতলায় সুন্দরমূর্ত্তি সুন্দরকে দৃষ্টি করিবামাত্র, ফলতঃ সুশ্রী কোন পুরুষ নয়নপথের পথিক হইলেই নারীগণ পঞ্চবাণের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়েন, ভারতচন্দ্র রমণীজাতিকে ত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; ইহা চাণক্যানুগামী কবি-কল্পনা না সাময়িক সমাজ-চিত্র অথবা বিকৃত রুচি?

হীরার বড় ইচ্ছা সুন্দরকে আপন বাসায় লইয়া যায় ;—

কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা ;—

আপন পরিচয় দিয়া জানাইয়া দিল ;—

বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী,—

এবং সে রাজবাড়ীতে ফুল যোগায়। সুচতুর সুন্দর ভাবটা বুঝিলেন, ভাবিলেন—

বাসায় সুসারে হবে আশায় সুসার।

সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিলেন—

কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্টরীত—

অতএব বুদ্ধিমানের মত মালিনীকে "মাসী" সম্বোধন করিয়া বলিলেন। তখন অগত্যা পাতানো মাসী ঠাকুরাণী—

তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর—

বলিয়া অপরিচিত সুন্দর পুরুষটীকে আপন বাসায় লইয়া গেল।

খুঙ্গী-পুঁথি-ধারী বিদেশী নাগর বাসা ত পাইলেন, দাস দাসী নাই, তাঁহার হাট বাজার করে কে? মালিনীই সেই কাজে সম্মত হইল। কিন্তু টাকা পয়সা ত চাই; মালিনী সবজান্তা, বুঝাইয়া দিল—

কড়ি ফট্‌কা চিঁড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥

হায় অর্থ!

সুন্দর তাহার হাতে টাকাকড়ি দিলেন; হীরা সে টাকা বাক্সে পুরিয়া রাঙ্গ-তামার মেকি টাকা বাহির করিয়া বাজারে গেল। দোকানী পসারী তাহাকে চিনিত, ভয়ে দোকান-পাট বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

(মুকুন্দরামের দুর্ব্বলার ছায়া এখানে স্পষ্ট)। মালিনী ছাড়িবার পাত্র নহে, নানা প্রকারে দোকানদারগণকে "ছকড়া নকড়া" করিয়া মালমশলা-সহ ঘরে আসিল; আসিয়া সুন্দরের কাছে হিসাব নিকাশ—সে কবির অপূর্ব্ব বাক্‌চাতুরী—

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে ॥

(আমরা কিছু পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, কবি কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরেও এই বেসাতীর বাক্‌চাতুর্য্যের আঁচ পাওয়া যায়; তাবপর রামপ্রসাদ তাহাই কিছু ফেনাইয়া তুলিয়াছেন, শেষে ভারতচন্দ্র সেটীকে শব্দবিদ্যার কারু-কলায় দাঁড় করাইয়াছেন।)

বেসাতি কড়ির লেখা [illegible]। মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি ॥
পাছে বল বুনপোরে মাসী দেয় খোঁটা। যটি টাকা দিয়াছিলে সব গুলি খোঁটা ॥
যে লাভ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায়। এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায় ॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি ॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ। আনিয়াছি আধসের পাইতে সন্দেশ ॥
আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ যায়ফল। সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল ॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা। যেটি কয় সেটি নয় নাহি লয় ফিরা ॥
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান। আমি সেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান ॥
অবাক্ হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক্। নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক্ ॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদী পারে। আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ॥
আট পণে আনিয়াছি কাঠ আট আঁটি। নষ্ট লোকে কাঠ বেচে তারে নাহি আঁটি ॥
খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে। শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে ॥
লেখা [illegible] বাছা ভুনে খড়ি পাতি। পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ি পাতি ॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর। যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর ॥
ভনি মরে মহাকবি ভারত ভারত। এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ॥

সুন্দর মালিনীর বাড়ী থাকেন, খান দান, হীরার নিকট হইতে রাজবাড়ীর সকল সংবাদ লন। ক্রমে আপনার প্রকৃত পরিচয়ও দিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে একদিন রাজকন্যা বিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন হীরামালিনী—সে বিদ্যার আয়ি—নাতিনী সম্পর্ক পাতানো ছিল—আহ্লাদে আটখানা হইয়া আদুরে রাজকন্যার রূপের পরিচয় প্রদান করিল—পাকা ঘটকীর ব্যাখ্যা—

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে
কেবা করে কাম-শরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥
কি কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার। ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্ত-পাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া। ভয়ে বিধি তার মুখে থুলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়ি ছিল। ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভি-কূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে। ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরী-মধ্যখান। হর গৌরী কর পদে আছয়ে পরিমান॥
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়। দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু। সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ। অনলে পুড়িছে করি তারে দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ। কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে। রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে। পড়ায় পঞ্চম স্বরে ভাবে কোকিলারে॥
কিঞ্চিৎ কহিনু রূপ দেখিনু যেমন। গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥

ইহাও "কিঞ্চিৎ"। পাঠকবর্গ বিদ্যাপতির রূপবর্ণনা মনে আনিবেন।

(এই অতিশয়োক্তি—কেহ কেহ বলেন, ইহার ভিতর পার্শী কাব্যীয় উপমা আমেজ আছে)। যাহা হউক, মালিনী সঙ্গে সঙ্গে খবর দিল—বয়স বছর পনর ষোল।

সুন্দর প্রস্তাব করিলেন, একদিন তাঁহার গাঁথা ফুলের মালা রাজনন্দিনীকে উপহার দিতে লইয়া যাইতে হইবে—মালার মধ্যে কৌশলক্রমে তাঁহার পত্র থাকিবে। সুন্দরও রাজপুত্র, উপযুক্ত পাত্র—হীরা রাজি হইল—ভাবিল—

গাঁথিনু বঁড়িশে মাছ আর কোথা যায়।

মালিনী ফুল আনিয়া দিল, সুন্দর বিচিত্র কারিগরী করিয়া এক মালা গাঁথিলেন—মালার মধ্যে ফুলের পাতায় ফুলের কৌটা—তার ভিতর নানা ফুলে রচিত রতিমদন—হাতে ফুলবাণ ফুলধনু—তাহাতেও কল—কৌটা খুলিতে গেলেই বুকে বাণ ছুটে—অবশ্য ফুলবাণ; শুধু তাই নহে, তার মধ্যে আবার সংস্কৃত শ্লোক—চিত্রকাব্যে নিজ পরিচয়। (মুকুন্দরামের বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত চণ্ডীর কাঁচুলীও ঝক্ মারিয়া যায়)।

যথাকালে সেই অপূর্ব্ব মালা বিদ্যার হাতে পঁহুছিল। এত কারিগরীর মালা—বানাইতে সময় লাগিয়াছে—আজ মালিনীর নিত্য-নিয়মিক ফুল যোগাইতে কিছু বিলম্ব হইল; রাজনন্দিনী ত রাগিয়া খুন, হীরাকে যৎপরোনাস্তি কটুকাটব্য করিলেন। হীরা কাঁদিয়া কাটিয়া কৈফিয়ৎ দিল—আজ যে চিকন মালা—এ ত চটপট হইবার নহে। মালা ছড়াটি ভাল করিয়া দেখিয়া বিদ্যা সুন্দরীর মাথা ঘুরিয়া গেল; তখন মালিনীর সহিত রহস্য আরম্ভ হইল; হীরাও অবসর পাইয়া দু'কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়ে নাই। কথোপকথনটা শুনানই ভাল—

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি। কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি। ক্ষুধায় তৃষায় জ্বলিয়া মরি॥
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। কালি শিখাইব মায়ের আগে॥

বুড়া হলি তব না গেল ঠাট। রাঁড় হৈয়ে যেন যাঁড়ের নাট॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম। এত ক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা। মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা॥
কি করিবে তোরে আমার গালি। বাপারে বলিয়া শিখাব কালি॥
হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে। ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি। ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা। তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ। করিনু ভালরে হইল মন্দ॥
ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম; শ্রম বৃথা হইল ঘটিল ভ্রম॥
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ। অস্ত গেল রোষ উদয় রস॥
বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার। এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥
পুনঃ কি যৌবন ফিরি আইল। কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল॥
হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে। যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর। কি দেখিয়া বঁধু আসিবে মোর॥
ছাড় আই বলা জানি সকল। গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল॥

সময় পাইয়া হুল ফুটাইতে ছাড়িল না—

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ॥

কৌটা খুলিয়া দেখিতে বলিল। কৌতুহল ভরে বিদ্যা কৌটা খুলিতে গিয়া ফুলবাণের আঘাত খাইলেন, কল দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, শ্লোক পড়িয়া বিকল হইয়া পড়িলেন—তখন

ডগমগ তনু রসের ভরে।

হীরার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, সে ছল করিয়া চলিয়া যাইতে চায়; রাজনন্দিনী মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে পাকড়াও করিলেন—কলনির্ম্মাতার পরিচয় দিতেই হইবে। হীরা অনেক সাধ্যসাধনার পর রাজকুমারের পরিচয় দিল;—রূপ বর্ণনায় আবার ঘটকালী; মুখখানি ত চাঁদের মতন—তায়

ঈষৎ গোঁফের রেখা—যেন বিকচ কমলে ভ্রমর-পংক্তি ; নাকটী যেন মদনের শুকপাখী, ইত্যাদি ইত্যাদি ; আপনিই মনের কথা কহিয়া ফেলিল—ভাগ্যে "স্বামী" সম্বোধন করিয়াছে !—ছি ছি !

বিদ্যা ত ব্যাকুল, হীরাকে "আই" "ঠানদিদি" বলিয়া ধরিয়া বসিলেন, একবার সে পুরুষ-রতনকে দেখাইতেই হইবে ; হীরকের হার মালিনীকে ঘুষ দেওয়াও হইল। বিদ্যাও বিদ্যাবতী—চিত্রকাব্যে পত্রের উত্তর দিলেন। মালিনী হুঁসিয়ার লোক, দূর হইতে নায়ক নায়িকার চোখে চোখে দেখাদেখির বন্দোবস্ত অবধি করিল—

আখিবীথী সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলি হেলায়ে হীরা দোঁহারে দেখায়॥

রাজকুমারী উপরতলায় জানালায়—রাজপুত্র নীচে বালাখানার কাছে—(অথবা ঠিক তাহা নহে, উপরতলা বুঝিবার কিছু নাই)। শুভদর্শন হইয়া গেল—

মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥

হীরা বিদ্যার নিকট প্রস্তাব করিল—রাজারাণীকে বল, পাত্র ত ভাল, শুভবিবাহ হইয়া যাক্। বিদ্যা বলে চুপ্ চুপ্—ওরূপ হইবে না, উনি রাজপুত্র কেহ বিশ্বাস করিবে না ; গোপন-বিবাহ চাই। মালিনী শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল—তাও কি হয় ; এ কর্ম্ম কি কখন ছাপা থাকে ? প্রকাশ হইবেই—আমি পড়িব মুস্কিলে—পরের বাছায় মজাইব ? বিদ্যা ত নাছোড়বান্দা—"পুরুষের আটগুণ মেয়ে"।—(তাহা চাণক্যিয়ানা) তিনি সুন্দরকেই মিলনের উপায় ঠাওরাইতে বলিয়া পাঠাইলেন।' সুন্দর কালীমাতার পূজায় বসিয়া গেলেন। মা কালী ভক্তকে আশ্বাসিত করিয়া তাম্র-পাত্রে সন্ধিমন্ত্র লিখিয়া শূন্য হইতে সিঁদকাটি শুদ্ধ ফেলিয়া দিলেন। "হাড়ী ঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজ্ঞার"—ইস্তক মালিনীর

বাসা—নাগাইদ বিদ্যার শয়নগৃহ—উর্দ্ধে পাঁচ হাত, আড়ে তাহার অর্দ্ধেক—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ কাটা হইয়া গেল।

অবসর বুঝিয়া, সাজিয়া গুজিয়া শ্রীমান্ রাজপুত্র সুন্দর সুড়ঙ্গ-পথে শ্রীমতী রাজকুমারী বিদ্যার মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে বিদ্যা তখন দারুণ বিরহ-আগুণে হা হুতাশ করিতেছেন। অকস্মাৎ শয্যাগৃহের তলদেশ ফুঁড়িয়া "ভূমিতে চাঁদ উদয়!" সসখীমণ্ডলী রাজকুমারী চকিত চমকিত—

হংসীর মণ্ডল, যেমন চঞ্চল, রাজহংস দেখি হয়।

বিদ্যাও কিন্তু প্রথমটা চিনিতে পারেন নাই;—আর সখীগণের ভাব—

এ কি লো একি লো, একি কি দেখি লো, এ চাহে উহার পানে।

পরিচয়ে বিলম্ব ঘটিল না। সখী-সম্বাদে পরস্পর রসিকতার পর বিদ্যা ও সুন্দরে বিদ্যার লড়াইও হইয়া গেল—একাত্মবাদ দ্বাত্মবাদ মীমাংসা বৈশেষিক পাতঞ্জল সাংখ্য স্মৃতি শ্রুতি কিছুই বাকী রহিল না। শেষে "মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য ঠাকুর" শ্রীল শ্রীযুক্ত মদন, সুন্দরীকে হারাইয়া দিলেন; বিদ্যার পণ পূর্ণ হইল, তিনি রাজপুত্রের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন। তারপর—

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥

তখন সখীগণ বিলাসের উপকরণ আগাইয়া দিল। গীত বাদ্য আরম্ভ হইল। ক্রমে গতিক দেখিয়া—

যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে।

এখানে আমাদের একটু ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে; বর্ণনার পরিচয় দেওয়া চলিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, কি করিয়া আমরা এই বর্ণনার মধ্য হইতে একটা বচন যখন তখন আওড়াই—

যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।

কিন্তু স্বীকার করিতে হয়, এই অবর্ণনীয় বর্ণনার ভিতর—

হাসি ঢলে পড়ে ধনী কি বলিলা গুণমণি—

প্রভৃতি কোন কোন ছত্র পড়িতে পড়িতে মনে হয়, ভাষা যেন ডাকিয়া কথা কয়।

রাজপুত্র রাজকন্যায় দেখাশুনা আনাগোনা চলিতেছে, মালিনী বেচারী কিছুই জানে না; দুজনেই তাহার কাছে ঠকামি করেন; সুন্দর টিটকারী দিয়া বলেন—

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
নারীর আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥

পাছে কোন দিন মালিনীর চোখে পড়ে, এই জন্য সাবধানী চোর-প্রেমিক আগে হইতে গাহিয়া রাখিলেন—তিনি কালী-সাধনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার ঘরে কুণ্ড কাটিয়াছেন, রাত্রিকালে গুপ্ত-সাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহার যেন সে সময়ে কোন খোঁজ খবর না লওয়া হয়। এই ছুতায় দুয়ারে খিল লাগাইয়া রসিকবর সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার মন্দিরে যাতায়াত করেন—

ভেকে ভুলাইয়া পাছে ভৃঙ্গ মধু খায়।

ভারতচন্দ্র না ছিলেন পরম শাক্ত; দেখাইয়াছেন ত কালীপূজার ছলে শাস্ত্রমত সর্ব্ববিধ মদনযাগ চলিতে লাগিল। কি ভক্তি! যাক্— মালিনীর চোখে ধূলা দিয়া রাত্রি ত এইরূপ আমোদে কাটিয়া যায়, কিন্তু দিনগুলা যাপন দায় হইয়া উঠিল। রসিক-চূড়ামণি এক রঙ্গ আরম্ভ করিলেন; সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া একদিন রাজসভায় গিয়া হাজির; প্রস্তাব করিলেন—রাজকন্যা নাকি বড় বিদ্যাবতী, তিনি নাকি এক বিষম পণ করিয়াছেন; এ এক কৌতুক; তিনি রাজকুমারীর সহিত বিচার করিতে আসিয়াছেন; হারিলে তাঁহাকে গুরু মানিয়া জটাভার মুড়াইবেন; রাজকন্যা হারিলে তাঁহাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া দেশ দেশা-

স্বয়ে তীর্থ করাইয়া বেড়াইবেন—আর কোন নারী এমন প্রতিজ্ঞা না করে। রাজা ও সভাসদবর্গ ত মহা ফাঁপরে পড়িলেন; আজ নয় কাল করিয়া সময় লইতে লাগিলেন।

রাত্রে বিদ্যার মন্দিরে, দিবায় রাজসভায়, এই করিয়া সুন্দর দিন কাটাইতেছেন, রাজকুমারী একদিন রাত্রিকালে নাগরকে সন্ন্যাসীর কথা বলিয়া ফেলিলেন;—কেহই ত জানে না সন্ন্যাসীঠাকুরটী কে! সুন্দর 'ন্যাকা' সাজিলেন—ভয় পাইয়া যেন বলিলেন—

যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।

সন্ন্যাসীর আগমন-বার্ত্তা ক্রমে হীরা মালিনীর কাণেও পঁহুছিল; তখন সে বিদ্যাকে—রাজপুত্রের সহিত বিবাহে অগ্রসর না হওয়ার দরুণ—ভয় দেখাইতে লাগিল, দুঃখও করিল—

ময়ুর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥

সুন্দরকেও ভয় দেখাইল—এইবার তাঁর ভাগ্যে ফাঁকি, বিদ্যাকে সন্ন্যাসী লুটিয়া লইবে। দুজনেই হীরাকে দুষিলেন, চোখের দেখা দেখান হইয়াছে, জোটপাটের জোগাড় ত করিয়া দিতে পারে নাই।

সুন্দরের শুক পাখী ছিল, বিদ্যারও একটি সারী ছিল; ইতিমধ্যে পাখী দুইটীর মিলন হইয়া গিয়াছে। (এই পক্ষীযুগল ভারতচন্দ্রের নিজস্ব)।

লোকে বলে পাপ কাজ ক দিন লুকায়।

গাছে ফুল ধরিয়াছিল, ফলও ফলিবার উপক্রম হইল। সখীগণের বুঝিতে বাকি রহিল না, বিদ্যা ঠাকুরাণী গর্ভবতী। তখন সকলে ভয়ে আকুল। অগত্যা রাজ্ঞীকে সংবাদ দিতে হইল। রাজরাণী আসিয়া দেখিলেন, বুঝিলেন, যথেষ্ট গালিগালাজ করিলেন,—

না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ করিলি খাইয়া মোরে ॥

মনের কথা খুলিয়া বলিলেন—

রাজার ঘরণী রাজার জননী রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ অপবাদ কত সব ॥

দুহিতা পরিচয় দিলেন—ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেব কি কিন্নর কে তাঁহাকে আলিঙ্গন করে, জাগিয়া কাহাকেও দেখিতে পান না, ইত্যাদি। কিন্তু—

মিছা কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয় ?

জননী আর করিবেন কি, আপন কপালকে ধিক্কার দিয়া, গুণধরী কন্যার গুণের কথা পিতাকে বলিয়া দিতে চলিলেন ;—কবির এক জীবন্ত চিত্র—

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায় পড়ে আলুথালু কবরী বন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাত নাড়া ঘন ডাক চমকে সকল পুরজন ॥
শয়ন-মন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায় সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইল ক্রোধ মনে নূপুরের ঝন ঝনে উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ॥
রাণীর দেখিয়া হাল জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ কি কব কহিতে লাজ কলঙ্কে পূরিল সব দেশ ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ এড়াইলে বিবাহের দায় ॥
কি কহিব হায় হায় জলন্ত আগুন প্রায় আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে লোকধর্ম্ম কিসে রবে বারেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥
উচ্চ মাথা হৈল হেঁট বিদ্যার হয়েছে পেট কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমন আছিল গর্ব্ব তেমনি হইল খর্ব্ব অহঙ্কারে গেলে ছারখারে ॥
বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কত বা সহিবে বালা কথায় রাখিব কত ঠেলে ॥
সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাহি লাগে উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল॥

খাঁপায় শুনিয়া রাজা ত রাগিয়া আগুণ, কোটালকে ডাক পড়িল। বিস্তর তিরস্কার মারপিট খাইয়া কোটাল সাত দিনের কড়ারে চোর ধরিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিল। তদারক চলিয়াছে, রাজকন্যার ঘর খানাতল্লাসী হইলে পালঙ্কের তলে সুড়ঙ্গের মুখ প্রকাশ হইয়া পড়িল। গর্ত্ত দেখিয়া প্রথমটা সকলে ভয় খাইয়াছিল—সাপ বাঘের বিবরও হইতে পারে, নাগযোনি কাহারও পথই বা হয়! কিন্তু কোটালদিগের ডিটেক্‌টিভ-বুদ্ধিও থাকে, সে বলিল—

লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র-মন্ত্র-ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহ-ফাঁদে পড়ে কাঁদে॥

অতএব ফাঁদ পাতাই যুক্তিসঙ্গত। বিদ্যা যেমন সখীবৃন্দ লইয়া থাকিতেন, প্রহরীদল সেইরূপ নারীবেশে থাকিয়া চোর ধরিবার চেষ্টা করা যাক্। তাহাই হইল।

এদিকে সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে; কোটালের অনুচরবর্গ চোরের সন্ধানে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে ধুম লাগাইয়া দিল; উদাসীন বেপারী বিদেশী—বিশেষতঃ খুঙ্গী-পুঁথি ধারী পোড়ো পাইলেই ফাটকে আটক করিতে লাগিল। ফাটক ক্রমে জরাসন্ধ-কারাগার হইয়া উঠিল।

"সুন্দর কিছুই সংবাদ" পান নাই, বিদ্যার ঘরে যেমন আসিতেন আসিলেন, নারীমূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিলেন, ফাঁদে পা দিয়া ধরা পড়িলেন।*

* রামপ্রসাদ বিদ্যার গৃহে ও শয্যায় সিন্দুর লেপিয়া পরদিন ধোপার বাড়ী সিন্দুর মাখানো কাপড়ের সন্ধান করিয়া চোর ধরিবার উপায় করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের সুন্দর বিদ্যার পরামর্শে আত্ম-গোপনার্থ নারী-বেশ ধরিয়াছিলেন, তাহাকে এমনি মানাইয়াছিল যে অত বড় রূপসী যে বিদ্যা তাঁহারও—

"সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান। সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভাণ॥"

এই কবিগণের মতে মেয়েলী ধাঁজের সুন্দর ফুট্‌ফুটে ছোক্‌রা চেহারাই সুন্দর পুরুষের আদর্শ।

কোটাল তখন সাহস করিয়া দলবল সহ সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিল। সেই পথ ধরিয়া ক্রমশ যেখানে উপস্থিত হইল—দেখিল হীরা মালিনীর গৃহ ; হীরা তখন ঘুমাইতেছিল ; সোরগোলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রহরীবর্গ সহসা তাহার ঝুঁটি ধরিয়া নানা কটুকাটব্য সহকারে বহুবিধ লাঞ্ছনা—কিল চড় লাথি আরম্ভ করিল। হীরা বস্তুত নির্দোষী, পরন্তু এই "চৌরী পিরিত" গুপ্ত তত্ত্ব অবগত নহে ; প্রথমটা সে থামকা জুলুম মনে করিয়া খুব তকরার জুড়িয়া দিল ; কিন্তু কোটাল যখন তাহাকে হিঁচড়িয়া টানিয়া আনিয়া সুড়ঙ্গ-পথ দেখাইল, তখন তাহার চক্ষু স্থির। মালিনীর ঘর লুঠ হইল, তৎসঙ্গে সুন্দরেব মালপত্রও বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। চোর ত ধরা পড়িয়াছে। মালিনীর আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না, তখন পাতানো বোন-পোকে গালি পাড়িতে লাগিল।

চোর ধরা পড়িয়াছে—

কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া।
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া॥

চোরকে দেখিয়া—

রাণী বলে কাহার বাছনি।
মরে যাই লইয়া নিছনি॥

চোরকে—

দেখিতে সকল লোক ধায়।
বালক যুবক জরা কানা খোঁড়া করে ত্বরা
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায়॥

আর—

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি॥
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কাণ।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ॥

তাহারা স্পষ্টই বলাবলি করিতে লাগিল—

বিদ্যারে করিয়া চুরী এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরী করি মোরা॥

তখন সকলে দস্তুরমত আপনআপন পতিনিন্দা আরম্ভ করিয়া দিল। হেন জাতি হেন ব্যবসায়ী হেন চাকুরে নাই যাহার পত্নী না নিজ পতির দোষ দেখাইয়াছে; আপন স্বামী লইয়া কেহই সন্তুষ্ট নহে। নারী-জাতির এই রূপমোহ ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রদর্শনই কবি ভারতচন্দ্রের দোষ-বিশেষত্ব।

এদিকে রাজা বীরসিংহ সপাত্রমিত্র সভায় আসীন; জাঁকজমকের দরবার; কোটাল বন্দী করিয়া চোর লইয়া হাজীর—

সারী শুক খুঙ্গি পুঁথি মালিনী সহিত।

চোরের চেহারা দেখিয়া রাজারও মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে; সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়। অন্তরের ভাব গোপন করতঃ চক্ষু পাকল করিয়া রাজা হীরা মালিনীকে চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হীরা আপনার সাফাই গাহিল। রাজা তাহার মাথা মুড়াইয়া গালে চুণ কালি লাগাইয়া গঙ্গা পার করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। কোটালের ভাই তাহাকে ধাক্কা দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে পথে ঘুষ খাইয়া ছাড়িয়া দিল, মালিনী পলাইল।

রাজা সভাসদবর্গকে চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন; সুন্দর বাক্‌ছলে একে একে সবার কথা উড়াইয়া দিতে লাগিলেন; তখন ভূপতি স্বয়ং পরিচয় লইতে গেলেন, বন্দী চোর উত্তর দিলেন—

বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম।
শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥

কন্যার পিতার প্রতি কন্যাপহারীর এই রসিকতা—বা অশিষ্টতা (?) নিঃসঙ্কোচে বলিয়া বসিলেন—

আমি যে হই সে হই আমি যে হই সে হই
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই।

আরও জানাইলেন, তিনিই সেই সন্ন্যাসী — রাজসভাতে আনাগোনা করিতেন, বিদ্যার পরীক্ষা রাজাই লইতে দেন নাই। কোটাল চোরকে কাটিবার অনুমতি চাহিল, রাজা নয়নেঙ্গিতে বারণ করিলেন। তখন সুন্দর চোর-পঞ্চাশৎ শ্লোক আওড়াইতে সুরু করিয়া দিলেন —বিদ্যা-পক্ষে আদিরসের নির্ঝর, কালী-পক্ষে ভক্তিরসের উৎস। রাজা এবং সভাসদ-বর্গ অবশ্য তখন বিদ্যাপক্ষের অর্থই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এক এক শ্লোক উচ্চারিত হয় আর নির্লজ্জ চোরের গর্দ্দান লইবার হুকুম হয়। এক আধটি নয়, এমন পঞ্চাশটী শ্লোক বাহির হইয়া গেল!

পরিচয় ত মিলিল না, শিরশ্ছেদনার্থ চোরকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল। পরম শাক্ত সুন্দর সেখানে কালী-স্তুতি জুড়িয়া দিলেন —

মা কালিকে!

কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।
চণ্ড মণ্ডি মুণ্ড খণ্ডি খণ্ড মুণ্ড মালিকে॥

লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুণ্ড কেশ জালিকে। ধক ধক তক তক অগ্নি চন্দ্র ভালিকে॥
লীহ লীহ লোল জীহ লক লক সাজিকে। হক চক ভক্ক ভক রক্তারাজি রাজিকে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিকে। মার মার ঘোর যার ছিন্দি ভিন্ধি ভাষিকে॥
চক চক হক হক পীত রক্ত হাসিকে। থেই থেই থেই থেই নৃত্য গীত তালিকে॥
ভীতি চূর্ণ কাম পূর্ণ কাতি মুণ্ড ধারিকে। শম্ভু বক্ষ পাদ লক্ষ পাদপদ্ম চারিকে॥
খর্ব্ব খর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কারিকে। সিংহ ভাব ঘোর রাব ফেরু পাল পালিকে॥
এহি এহি দেহি দেহি দেবী রক্তমর্দ্দিকে। ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণ ভক্তি মণ্ডিকে॥

স্তব শুনিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রে আমাদের জ্ঞান বাড়িয়া যায়! ইহার উপর আবার মত্তরমত চৌতিশা স্তুতিও আছে। আর কি মা কালী স্থির থাকিতে পারেন; দেবী শুক্ল-যানে আবির্ভূতা হইয়া শুনাইলেন —

মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ বেটা তোরে বা বধিবে কেটা
তবে আজি করিব প্রলয় ॥

তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহাব নদী বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।
তোরে পুনঃ বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া ভয় কি রে বিদ্যা-বিনোদিয়া ॥

এমনই দেবীর দয়া! দেবী অভয় দিলেন। (অনেক কালীভক্ত কুকর্ম্মী বোধ হয় আশ্বাস পাইবেন)।

সভায় ছিল সুন্দরের মাল-পত্র এবং তৎসহ সেই শাস্ত্রবিদ শুক ও বিদ্যার সারী। সুন্দরকে বধার্থ লইয়া যাওয়ায় শুক স্ত্রী-জাতিকে নিন্দিয়া বিদ্যার উদ্দেশে বাক্য-বাণ প্রয়োগ করিতে লাগিল; ক্রমে রাজার কাণে পঁহুছিল — চোর যে সে লোক নহে, কাঞ্চীপুরের রাজকুমার। তখন কোন্ ভাট কাঞ্চীপুরে বিদ্যার সংবাদ দিতে গিয়াছিল, তাহাকে তলব হইল। ভাট আসিয়া লম্বা-চৌড়া হিন্দি-জোবানে সকল তত্ত্ব নিবেদন করতঃ সুন্দরের পরিচয় দিল। সর্ব্বনাশ!—(ধন্য রে শুক পক্ষী)!

তৎক্ষণাৎ রাজা বীরসিংহ গলদেশে কুঠার বান্ধিয়া সপাত্রমিত্র মশানে আসিলেন; আসিয়া দেখেন, বিদ্যাবিনোদিয়া কালিকা ধ্যান করিতেছেন আর সসৈন্য কোটাল বান্ধা — শূন্যে দেবীর অনুচরবর্গের হুঙ্কার। দায়ে পড়িয়া শ্বশুর-মহাশয় জামাতা-বাবাজীর স্তব করিতে লাগিলেন; সমাদর পূর্ব্বক চোরকে ঘরে লইয়া আসিলেন; কন্যার সহিত সুন্দরের যথাবিধি বিবাহ হইয়া গেল।

গর্ভ ত ছিলই, দশম মাসে বিদ্যাসুন্দরী একটি নবকুমার লাভ করিলেন। নিয়ম মত শুভ ষষ্ঠিপুজা অন্নপ্রাশন প্রভৃতি কিছুই ফাঁক যায় নাই।

এইবার কাঞ্চীপুর-রাজকুমার স্বদেশে ফিরিতে চাহিলেন; রাজকন্যা স্পষ্ট অমত প্রকাশ করিলেন না, একটু খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিলেন —

"শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥"

সঙ্গে সঙ্গে টুকিলেন —

"বরমিহ গঙ্গা-তীরে শরট করট।
ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥*

কিন্তু সুন্দর জানাইলেন —

"জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী"।

আর রাখা গেল না।

সুন্দর সন্ন্যাসী-বেশ ধরিয়াছিলেন, সুন্দরী আদর করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়া, সখের সন্ন্যাসীর পণ পূরণ করতঃ সাধ মিটাইয়া লইলেন। সোহাগিনী রাজকুমারী বারমাসী গাহিয়া পতিকে একটি বৎসর মাত্র শ্বশুরালয়ের বার মাসের রকম বেরকম সুখ ভোগ করাইতে চাহিলেন। সুখের নমুনা —

বৈশাখে এদেশে বড় সুখের সময়।	নানা ফুল-গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥
বসাইয়া রাখিব হৃদয়-সরোবরে।	কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এদেশে বিস্তর।	সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥
মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।	নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন।	বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥
ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পিঠ দিয়া থাকে।	জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥
শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।	কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনি বিদ্যুৎ চকমকি।	দেখিবে শিখীর নাচ ভেক মকমকি॥
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।	কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর থরথরি।	শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥
আশ্বিনে এদেশে দুর্গা-প্রতিমা প্রচার।	কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥

* এই পংক্তি দুইটি নিতান্তই কবিরঞ্জনী; রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ ভাষার বহুল প্রচার।

মদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড় আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড় শুনাইব॥
কার্ত্তিকে এদেশে হয় কালীর প্রতিমা। দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ। সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার। শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার॥
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্ল্লভ। সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥
পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়। দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়॥
সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে। এবার করহ ভোগ যে সুখ এদেশে॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী। ঘরের বাহির নয় যেই যুবজানি॥
শিশিরে কমল বনে বধয়ে পরাণে। মূলা ফুলে ফুলধনু কামীজনে হানে॥
বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাল্গুন। মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুণ॥
কোকিল হুঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার। শুষ্কতরু মুঞ্জরিবে কত কব আর॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস। জানাইব নানামত মদন বিলাস॥

বুদ্ধিমতী পত্নী বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—

অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর॥

কিছুতেই কিছু হইল না। কথার ফেরে পতিসহ অগত্যা রাজকুমারীকেই শ্বশুরালয় যাইতে হইল। রাজাশ্বশুর বহু সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া কন্যা-জামাতা বিদায় করিলেন। যাত্রাকালে দম্পতী দুঃখিনী মালিনী মাসীকে ভুলেন নাই—তাহাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া গিয়াছিলেন।

সুন্দরের পূজা পাইয়া দেবী কালীমাতা আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন—

"তোরা মোর দাস দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।"

স্বর্গের লোক স্বর্গে চলিয়া গেল ; বিদ্যাসুন্দরের কথা ফুরাইল।

বিদ্যাসুন্দরের গল্প বলিতেও অনেকটা স্থান লইয়াছি। এখনকার দিনে এ নামেই অনেকে ধিক্কার দিয়া থাকেন, গ্রন্থস্পর্শে বোধ হয় নারাজ ; তাঁহাদের জন্যই এই সাহসিকতার উদ্যম। বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রাচীন

লোক অনেকের মতে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অথবা সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম কাব্য। ইহার ভিতর অকথা কুকথা অনেক আছে, তবু কেন অনেকে ইহাকে এত আদর করেন, কতকটা আঁচ দিবার উদ্দেশে একটু বেশী বকিয়াছি। পাঠককে যদি কবির কথার বাঁধুনীর ক্ষমতা-পরিচয় কিঞ্চিৎ দিতে পারিয়া থাকি, তাহাহইলে এই দীর্ঘসূত্রতা বিশেষ দোষের হইবে না। বিদ্যাসুন্দর এবং হীরামালিনীর নানা অনুকরণ ও হনুকরণ অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালী-জাতিকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল। ইহার দোষগুণ জানিয়া রাখা ভাল। কবি-বর্ণিত বিদ্যার প্রেম অপবিত্র নহে, কাব্যের বিষয়-ঘটিত দোষ নাই; বর্ণনায় শালীনতার সীমা উল্লঙ্ঘনই নিন্দনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।* তাহার উপর প্রতিভাশূন্য অনুকরণকারীদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক স্থলেই বিদ্যা-সুন্দর নামটাই কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি, বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের এক শাখা—আর একটি শাখা আছে—মানসিংহ। তাহাতেই রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়, প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ-হরণ বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে বিজয়ী বীরের সহিত—ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, পাতসাহ-সাক্ষাৎ

---

* এইখানে একটা উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে "বিদ্যাসুন্দর" পড়াইতে হইত। "বিদ্যাসুন্দরের" খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ভাব প্রকাশ করিতেন; তাহাকে এক এক জন ইয়োরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন "কেন তুমি কাচুমাচু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis Rape of Lucrece এবং পোপের January and May, এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদরের সহিত পড়ি না—শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?"—এই কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন। (কিন্তু ইংরাজী ঐ সকল কাব্যে এত বোধ হয় বাড়াবাড়ি নাই।)

হিন্দু দেবতার প্রাধান্য প্রদর্শনার্থ পাৎশাহের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা, দেবীর মায়াপ্রপঞ্চ, ভূতের উৎপাত প্রভৃতি বর্ণিত আছে। প্রসঙ্গক্রমে জগন্নাথপুরী, বারাণসী, অযোধ্যা, রামচন্দ্র প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঝড়বৃষ্টি, যুদ্ধ, দাস্য-দাসুর খেদ প্রভৃতিও আছে। বিশেষ কবিত্ব এ সকলের মধ্যে কিছুই নাই, আমরা আর বৃথা কালক্ষেপ করিব না। ভবানন্দ মজুমদার দেশে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহাকেও দুই সংসার লইয়া কেমন বিব্রত হইতে হইয়াছিল, মাধী সাধী দাসী-দ্বয়ের দলাদলী, ধনবান বাঙ্গালীর ভোগৈশ্বর্য্য, অন্নব্যঞ্জনের তালিকা প্রভৃতি, সেই মুকুন্দরামের কাব্যেরই পুনরভিনয়; সময় ভেদের দরুণ যা বর্ণনার তারতম্য; অবশ্য ভারতচন্দ্রীয় ভাষার মাধুরী মধ্যে মধ্যে যে না আছে, এমন নহে। পারসী বুলীও দেদার ছড়ানো। তারপর অষ্টমঙ্গলা, দেবী কর্ত্তৃক ভবানন্দের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন, তাঁহার স্বর্গযাত্রা, তদীয় বংশ কীর্ত্তন প্রভৃতি, এই সকল কথা। রাজশ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সেই দেবীর অনুগৃহীত ভবানন্দ মজুমদারেরই সুযোগ্য বংশধর; ভারতচন্দ্রের মুরুব্বী এই রাজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ইতি গ্রন্থ শেষ।

অন্নদামঙ্গলই ভারতচন্দ্রের প্রধান গ্রন্থ। কবির রচিত আরও কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য আছে—নগণ্য বলিলেই চলে। ইহার মধ্যে সত্যনারায়ণের পালা দুই খানি পাওয়া যায়; এক খানি ত্রিপদী, অপর খানি চতুষ্পদী। কথিত আছে ইহা ভারতের মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সকালের রচনা। দুই পূর্ণিমায় এই দুই পালা বালক কবি রচিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভারতচন্দ্র অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাখণ্ড দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। এই সময়ে তিনি নবদ্বীপাধিপতি কর্ত্তৃক "গুণাকর" উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ গ্রন্থ "চণ্ডী নাটক"—সংস্কৃত-বাঙ্গালা-হিন্দী-পারসী বুক্‌নি মিশ্রিত এক "ছ্যাঁচড়া ঘণ্ট" বিশেষ; কবি এখানি সম্পূর্ণ

করিয়া যাইতে পারেন নাই,—ভালই হইয়াছে। "ধেড়ে ভেড়ের গল্প" ও "কর্ম্মেরিফত" এ ভাষায় মানায়, "চণ্ডী" নহে।

ভারতচন্দ্রের আর একখানি কাব্য রসমঞ্জরী। এ খানি অলঙ্কার-শাস্ত্রে এই নামীয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ—ভাবসঙ্কলন। কাব্যে স্ত্রী পুরুষ নায়ক-নায়িকাগণের ভেদ লক্ষণ উদাহরণাদি প্রদর্শিত। * কাব্যখানি এখনকার হিসাবে অশ্লীল বলিতে হয়। অনেক কথা সংস্কৃতে বলিলে তত দোষাবহ মনে হয় না, ভাষায় বলিতে গেলে নিন্দার্হ হইয়া পড়ে। বিদ্যাসুন্দরেও ইহার নিদর্শন আমরা পাইয়াছি;—বিদ্যার বিবাহ, গর্ভ—আর সংস্কৃত নাটকে শকুন্তলার বিবাহ ও গর্ভ তুলনা করিলেই হইবে। রসমঞ্জরীতে স্থলে স্থলে পদলালিত্য চমৎকার। একটা স্থল দেখাই—

(স্বীয়া নায়িকা।)

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নান হেতু যেও না লো যেও না।
যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমল-কানন পানে চেও না লো চেও না॥
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পেও না লো পেও না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায়ে পাছে ভাঙ্গে কটি ধেও না লো ধেও না॥

কিন্তু বোধ হয় এমন তরল ভাব অনেকের পক্ষে অগ্রাহ্য। যিনি যাহাই বলুন, স্বীকার করিতেই হয়—বাক্যের চাতুর্য্য, রচনার মাধুর্য্য, পদের

* রসমঞ্জরীর অনুবাদ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আরও কয়েকখানি আছে; তন্মধ্যে ভারত-চন্দ্রের শতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী পীতাম্বর দাসের কাব্য খানি বহু খ্যাতনামা কবিগণের রচনা হইতে উদাহরণ-সংযুক্ত হইয়া উপাদেয় হইয়াছে। এ খানি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভারত গুণে গুণাকর সকলকে হারাইয়া দিয়াছেন।

লালিত্য ও ছন্দের সুমেল পরিপাট্য, ভারতচন্দ্রের রচনায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছি—কবি ভারতচন্দ্রে বা তৎসময়কার কাব্যাদির যে ভাব—বিশেষতঃ রামপ্রসাদের বিদ্যু বামনী ও ভারতের হীরা মালিনী চরিত্র—তাহারও কাহারও মতে মুসলমানী সাহিত্য হইতে আমদানী। মতটার কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক।

আলিবর্দ্দী-সিরাজুদ্দৌলার আমলে বা তাহার কিছু পূর্ব্বসময় হইতে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ যে মুসলমানী আদব-কায়দায় অভ্যস্ত এবং পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়াও সুশিক্ষিত বা কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচয় দিবার অঙ্গ মনে করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পারসী কাব্য-নাটকের রসাস্বাদন-সুখ সামাজিকগণ যে অনেকটা লভিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোলেবকাওয়ালী, লয়না-মজনু, হাফেজের বয়েৎ, গুলেস্তাঁ প্রভৃতি অনেকেই জানিতেন। পন্দনামা, বোস্তাঁ, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক ছিল। আমরা জানি, সম্ভ্রান্ত-ঘরে পণ্ডিত মহাশয়, মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে মৌলভী সাহেবও পাঠ শিখাইতেন।

ভারতচন্দ্র প্রভৃতির রচনায় হিন্দীর সহিত উর্দ্দু বা ফারসী বুলীর মিশ্রণ বিস্তর দেখা যায়।

দু একখানি ফারসি কাব্য নাটকের অনুবাদ হইতে একটু ভাবের পরিচয় দিয়া আমাদের বক্তব্যটা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করি ;—

"জেলেখা" কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়—জেলেখার দাসী বলিতেছে,

"কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বল, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষয় পাইতেছ কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছ; বল সে কে? যদি সে আসমানের চাঁদ হয়, তবে তাহাকে জমীনে ফেলিয়া তোমার নিকট বন্দী করিব। সে যদি পাহাড়-বাসী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিশিতে পুরিয়া তোমার নিকট হাজির করিব। যদি সে মনুষ্য হয়, তবে তুমি যাহার দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে"।

"লয়লা-মজনু"তে আছে—

" কুটনী আছিল এক সেই সহরেতে। তেমন কুটনী কেহ না ছিল দেশেতে॥
মন ভুলাইত সেই কথায় কথায়। জমীনেতে চন্দ্র সূর্য্য করিত উদয়॥"

(হীরা ও বিদু স্পষ্ট ছায়া মনে হয়।)

ঐ কাব্যে আর এক স্থলে রহিয়াছে—

"গোস্বা মনে লাল আঁখি কহে লায়লীকে ডাকি কালামুখী হায় কি করিলি।
এই কি বাসনা তোর জাত কুল গেল মোর দেশ মাঝে কলঙ্ক রাখিলি॥
কি পড়া পড়িতে গেলি প্রেমে মন মজাইলি কে শিখাল এমন ব্যাভার।
লাজ ভয় গেল তোর অখ্যাতি হইল মোর কুলে কালি দিলি সবাকার॥

(ভারতচন্দ্রের রাণীকে কাহার না মনে আসে ?)

হাফেজের একটি কবিতার অর্থ এই :—

"যদি সেই সিরাজের প্রণয়িনী আমার উপহার-দত্ত চিত্ত তাঁহার হস্তে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখের একটিমাত্র কৃষ্ণবর্ণ তিলের জন্য আমি সমরকন্দ ও বোখারা নগরদ্বয় প্রদান করিতে পারি।"

(ভারতচন্দ্রী রূপবর্ণনা এই ধাতুর না ?)

শুধু ফারসী গ্রন্থ পাঠের ফল নহে। বঙ্গবাসী অনেক মুসলমান বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য উপন্যাসাদি রচনা করিতেছিলেন ; * তন্মধ্যে স্থলে স্থলে যে ভাব আমরা ভারতচন্দ্রে দেখিয়া শিহরিয়া উঠি, সে ভাব প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। দৌলতকাজী ও আলোয়ালের রচিত "লোর চন্দ্রাণী"

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বাঙ্গালা কবিতা-রচয়িতা ৮৫ জন মুসলমান কবির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক। এই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে কত মুসলমান-কবির আবির্ভাব হইয়াছে, কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইঁহাদিগের ভিতর ৪০ জনেরও অধিক বৈষ্ণব পদাবলী-রচয়িতা। এই সমস্ত কবি ১৫০ হইতে ১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক। আমরা প্রাচীন সাহিত্যের কথাই এখন বলিতেছি।

কাব্যে দৃষ্ট হয়,—ধনীপুত্র ছাতন রাণী ময়নাবতীকে হস্তগত করিবার জন্য রতন মালিনীকে দূতী নিযুক্ত করিয়াছেন। আরও দৃষ্টান্ত উঠাইতে পারা যায়।

প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামবাসী কবি আলোয়াল "পদ্মাবতী" নামক একখানি কাব্য রচনা করেন। ইনি ভারতচন্দ্রের প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বগামী। এই মুসলমান-কবি সংস্কৃত কাব্য-নাটকে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার কতদূর জ্ঞান ছিল, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিঞ্চিৎ পরিচয় ; বয়ঃসন্ধি বর্ণনা—

আড় আঁখি বক্র দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়। ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়। বিরহ-বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়॥
অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে। আমোদিত পদ্ম-গন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে॥

* * * *

অভেদ আছয়ে দুই কমলের কলি। না জানি পরশে কোন ভাগ্যবন্ত অলি॥

রূপ বর্ণনা—

কুটিল কবরী কুসুম মাঝে। তারকা মণ্ডলে জলদ সাজে॥
শশীকলা প্রায় সিন্দুর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলক জালে॥
সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে। খঞ্জন-গঞ্জন নয়নে চাহে॥
মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ তরঙ্গে॥
নাসা খগপতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর বাঁধুলী ফুল॥
দশন মুকুতা বিজলি হাসি। অমিয় বরিষে আঁধার নাশি॥
উরজ কঠিন হেম কটোর। হেরি মুনীজন মন বিভোর॥
হরি করিকুম্ভ কটি নিতম্ব। রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব॥
কবি আলোয়াল মধু গায়। মাগন অরতি রহুক সদায়॥

স্থলে স্থলে বর্ণনা জয়দেবের প্রতিধ্বনি মত শুনায়—

বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে।
বর বালা দুই ইন্দু, স্রবে যেন সুধাবিন্দু, মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে॥
প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত, হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রত রাসে॥

মলয় সমীর, সুসৌরভ সুশীতল, বিলোলিত পতি অতি রসভাবে॥
প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমালদ্রুম, মুকুলিত চূতলতা কোরক জালে॥
যুবজন হৃদয়, আনন্দে পরিপূরিত, রঙ্গ মল্লিকা মালতী মালে॥

মহাদেব বর্ণনা—

শিরে গঙ্গাধারা ঘটা গলে অস্থিমালা। অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাঘ্র ছালা॥
কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রমা সুচারু। কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করে ত ডমরু॥
শঙ্খের কুণ্ডলী কর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল। ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল॥

ঋতু বর্ণনা—(কালিদাসের "ঋতুসংহার" মনে আসে।)

নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন। রৌদ্র ত্রাসে রহে ছায়া চরণে শরণ॥
চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন। সতত দম্পতী পাশে ব্যাপৃত মদন॥

বর্ষা—

ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়। দর্দ্দুরী শিখিনী রব অতি মনে ভায়॥
স্বামী সঙ্গে নানা রঙ্গে নিশি বসি জাগে। চমকিলে বিদ্যুৎ চমকি কণ্ঠে লাগে॥
বজ্রপাতে কমলিনী ত্রাসিত হইয়া। ধরয় পতির গীম অধিক চাপিয়া॥
কীটকুল-কলরব কঙ্কণ ঝঙ্কার। শুনিয়া যুবক চিত্তে চমকিত মার॥

শরৎ—

আসিল শরৎ ঋতু নির্ম্মল আকাশে। দোলয়ে চামর কেশ কুসুম বিকাশে॥
নবীন খঞ্জন দেখি বড়ই কৌতুক। উপস্থিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ॥
কুসুমিত শ্বেতশয্যা অতি মনোহর। চন্দনে লেপিয়া কুঙ্কুম কলেবর॥
নানা আভরণ পটাম্বর পরিধান। যুবকের মরমে জাগয়ে পঞ্চবাণ॥

শিশির—

সহজে দম্পতী মজে শীতের সোহাগে। হেমকান্তি দুই অঙ্গ এক হৈয়া লাগে॥

হেমন্ত—

শীতলিত বাসে রবি ঝরিতে লুকায়। অতি দীর্ঘ সুখনিশি পলকে পোহায়॥
পুষ্প শয্যা মৃদুখেলা বিচিত্র বসন। বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ॥

কবির বারমাস্যা বিরহ বর্ণনাটিও সুন্দর, কিন্তু বোধ হয় যথেষ্ট হইয়াছে,

আর তুলিবার প্রয়োজন নাই। মনে রাখিবেন ইহা মুসলমান কবির রচনা। পদ্মাবতী কাব্যে মুসলমানী ভাবও যে না আছে এমন নহে। আলোয়ালের "পদ্মাবতী কাব্য" মীর মালিক মহম্মদ রচিত"পদ্মাবৎ"নামক হিন্দী কাব্যের অনুবাদ। অবিকল অনুবাদ নহে, রচনায় মৌলিকতা প্রচুর।

আলোয়াল কবি পদ্মাবতী ব্যতীত আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা কাব্য রচনা করিয়াছেন—তন্মধ্যে পারসী কাব্যের অনুবাদও আছে। দৌলত কাজীর "লোর চন্দ্রানী ও সতী ময়না"র উত্তরাংশ তাঁহার রচিত।*

সম্ভবতঃ পদ্মাবতী কাব্য পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের নয়নগোচর হয় নাই। তখনকার কালে দূর চট্টগ্রামের সাহিত্যিক সংস্রব নবদ্বীপ পর্য্যন্ত পঁহুছান সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু দেশের কাব্য-সাহিত্য ভারতচন্দ্রের কিছু পূর্ব্ব সময় হইতে কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িতেছিল, এই সকল রচনা দেখিলে কতকটা আভাস পাওয়া

---

* এই মুসলমান কবির রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদও কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। একটি এই—

ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি। ধ্রু

ঘরের ঘরণী জগত মোহিনী প্রত্যুষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ কিসে বিলম্ব করিলি॥
প্রত্যুষ বেহানে কমল দেখিয়া পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে কমল মুদনে ভ্রমর দংশনে মৈলুম॥
কমল কণ্টকে বিষম সঙ্কটে করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে দিন অবশেষ ভেল॥
সিঁথের সিন্দুর নয়ন কাজল সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর দারুণি পদ্মের নালে॥
কুলের কামিনী ফুলের নিছনি কুলে নাহি তার সীমা।
আরতি মাগনে আলোয়াল ভণে জগৎ-মোহিনী বামা॥

যায়। বৈষ্ণব কবিগণের ব্যাপার স্বতন্ত্র, সে কথা বুঝাইবার আর বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

ভারতচন্দ্র যে শ্রেণীর কবির শীর্ষস্থানীয়, সেই শ্রেণীর পরিচয়ই এখন আমরা দিতেছি। আলোয়াল পূর্ব্ববর্ত্তী কবি হইলেও পরে পরিচয় দেওয়া হইল। ভারতের পরবর্ত্তী কাব্য-সাহিত্য কিছু কাল ধরিয়া তাঁহার ভাবেই ভোর ছিল, এ কথা বলা হইয়াছে। অনেক কবি ভারতের প্রতিভার আঁচটুকুও পান নাই কিন্তু তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া বঙ্গ-কাব্য-সাহিত্যকে ভূমে লুটাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রী আদর্শে যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল—তন্মধ্যে "চন্দ্র কান্ত," কালীকৃষ্ণদাসের "কামিনী কুমার" এবং রসিকচন্দ্র রায়ের "জীবন-তারা" লোক-রুচির উপর বহুদিন দৌরাত্ম্য করিয়াছিল। এই কাব্য-গুলির ভাষা খুব মার্জ্জিত কিন্তু বর্ণনা স্থলে স্থলে এত অশ্লীল যে উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও বোধ হয় লজ্জিত হইতেন। তিনখানি কাব্যেই কালীনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। হিন্দু-ধর্ম্ম বেওয়ারিশ মাল, পরমেশ্বর হরিকে লইয়া, জগজ্জননী মহামায়াকে লইয়া, সাহিত্যমন্দিরে কি কাণ্ডই না হইয়াছে! ভগবান মহাদেব ত ভাঙ্গড় ভোলা।

আমরা আবর্জ্জনার ভিতর হইতেও সুসামগ্রী বাছিয়া লইতে পশ্চাৎ-পদ হইব না। কালীকৃষ্ণদাসের "কামিনীকুমার" হইতে একটু নমুনা দেখাই ;—বসন্ত আগমন—

হিমান্ত হইল পরে বসন্ত রাজন। দলবল লৈয়া আইল করিতে শাসন॥
প্রথমে সংবাদ দিতে পাঠাইল দূত। আগুয়ান চলিলেক মলয়া মারুত॥
বায়ুমুখে শুনি বসন্তের আগমন। সুসজ্জা করিল যত পুষ্প-সেনাগণ॥
কেতকী করাত করে করিয়া ধারণ। দম্ভে দাঁড়াইল হৈয়া প্রফুল্ল বদন॥
শূল অস্ত্র করি শীঘ্র সাজিল চম্পক॥ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ধরি ধাইলেক বক॥
গোলাপ সেঁউতি পুষ্প সেনার প্রধান। প্রস্ফুটিত হৈয়া দোঁহে হৈল আগুয়ান॥
গন্ধরাজ ধাইলেক পরি শ্বেতবস্ত্র। ওড় জবা ধাইলেক ধরি তীক্ষ্ণ অস্ত্র॥

মল্লিকা মালতী জাতি কামিনী বকুল। কুন্দ আদি সাজে তারা যুদ্ধেতে অতুল॥
পলাশ ধনুক হস্তে ধরিয়া দাঁড়ায়। রঙ্গন তাহার বাণ হেন অভিপ্রায়॥
সরোরুহ ঢাল হয়ে ভাসিল জীবনে। এইরূপ সজ্জা কৈল পুষ্প-সেনাগণে॥
মলয়ার মুখে শুনি রাজ আগমন। অগ্রগণ্য সেনাপতি সাজিল মদন॥
শরাসনে সন্ধান করিয়া পঞ্চশর। বিরহী নাশিতে বীর চলিল সত্বর॥
কোকিল ভ্রমরে ডাকি কহিল মদন। দেখ রাজ্যে বিরহিনী আছে কোন জন॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেহ সমাচার। শীঘ্রগতি কর দিতে বসন্ত রাজার॥
বিশেষ রাজার আজ্ঞা কর অবধান। যে না দেয় কর তার বধহ পরাণ॥
আজ্ঞা পেয়ে দুই সেনা করিল গমন। রমণী মণ্ডলে আসি দল দরশন॥
প্রথমে কোকিল গিয়া বসি বৃক্ষোপরে। রাজ আজ্ঞা জানাইল নিজ কুহুস্বরে॥
পতি সঙ্গে রঙ্গে ছিল যতেক যুবতী। শব্দ শুনি কর তারা দিল শীঘ্রগতি।
প্রথমে চুম্বন দিল প্রণামি রাজার। হাস্য পরিহাস দিল বাজে জমা আর॥

মধ্যে মধ্যে অংশ অতি সুন্দর কিন্তু ঘোর অশ্লীলতার সহিত জড়িত, উদ্ধৃত করিবার জো নাই।

বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে—ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী কিন্তু তাঁহার বাতাস বড় বেশী পান নাই এমন কবিগণের মধ্যে দু'একজনের সামান্য পরিচয় দিয়া লৌকিক কাব্য-শাখা প্রসঙ্গ আমরা শেষ করি। এই সময় হইতে কাব্যে ভাব অপেক্ষা ভাষার দিকে নজরের প্রাধান্য চোখে পড়ে। কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিরচিত "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী"র পরিচয় গঙ্গামঙ্গল-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে; রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়ণের পরিচয়ও আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি।—একখানির কিঞ্চিৎ উল্লেখ আমরা এইখানে করিয়া যাই—

চৈত্র মাসে গাজনের উপলক্ষে এখনও হিন্দু-রমণীগণ নীলা বা লীলাবতী নাম্নী কোন মহিলার উদ্দেশে উপবাস করিয়া থাকেন। "নীলার বারমাস" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বর্ণনীয় বিষয়টি কবিত্ব-পূর্ণ। নীলা নাম্নী কোন মহিলার স্বামী

গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন নীলার বয়স দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। এই অল্প বয়সে উৎকট কৃচ্ছ্র সাধন পূর্ব্বক নীলা বনে বনে স্বামীকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল এবং বহুদিনের পর স্বামীকে পাইয়া যে সকাতর মিনতি করিয়াছিল,গ্রাম্য-কবি অমার্জ্জিত ভাষায় এই পুঁথিতে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। কবির ভাষা স্থলে স্থলে আবেগময়ী। চৈত্রমাসের গাজনে পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে নীলার বারমাস গীত হইয়া থাকে। নীলা মাথার কেশ এলাইয়া স্বামীর কণ্টক-ক্ষত ধূলিপূর্ণ পদ-যুগল মুছাইয়া দিয়াছিল। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি—

কি কর রে বিন্ধু মা বাপ কি কর বসিআ। কার খাইলা পান গুআ কারে দিলা বিহা॥
বার না বছরের নিলা তের বছর নহে। না জানি আপদ নিলা কারে স্বামী কহে॥
হাতে লইল লাউআ লাঠি কান্ধে আলক ছাতি। ধীরে ধীরে চলিল বুঢা জামাই চাইত বুলি॥
কড়েতুন্ আইসস্ রে বেটা কড়ে তোমার ঘর। কি নাম তোর বাপের মায়ের কিনাম সদাগর
মুলুক আমার মুলুক বাপু নন্দা পাটনে ঘর। মায়ের নাম কলাবতী বাপ গঙ্গাধর॥
সন্তির কন্যা বিহা কৈলাম মাণিক বিদ্যাধর। * * *

বুঝিলাম বুঝিলাম নিলা তোর নিজ পতি। আউলাইয়া মাথার কেশ করহ মিনতি॥
তুমি আমার শিরের কামিল আমি তোমার দাস। নিরঞ্জনে আনি দিল পুরাইল মনের আশ॥

এই সময়কার পূর্ব্ব-বঙ্গের দুই তিন খানি কাব্য উল্লেখ-যোগ্য ;—(১) রামগতি সেন প্রণীত মায়াতিমির-চন্দ্রিকা, (২) জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডীকাব্য, (৩) জয়নারায়ণ ও তাঁহার বিদূষী ভ্রাতুষ্পুত্রী রচিত "হরিলীলা" নামক মঙ্গল-কাব্য। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রায় বিশ বৎসর পরে—এই শেষোক্ত কাব্যখানি রচিত হয়।

"মায়াতিমির-চন্দ্রিকা"—নামেতেও উপলব্ধি হয়—ধর্ম্মের রূপক ; সংস্কৃত "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটক জাতীয়। এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ মনুষ্যের অবস্থা অতি বিষম, একদা সুপ্রভাতে মনের মায়াপাশ কাটিয়া গেল, তখন নিজের অবস্থাটি সম্পূর্ণ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে মনের শক্তি

জন্মিল, কবি রূপক-ছলে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—একটু দেখাই—

কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়। যথা বসে নানা রসে সদা জীব ধায়॥
তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী। হৃদি তারি রমাপুরী তথায় আপনি॥
অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটি। দম্ভ পাটে বৈসে ঠাটে করি পরিপাটি॥
পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ আনিবার। দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার॥
শান্তি ধৃতি ক্ষমা নীতি শুভশীলা নারী। মান করি রাজপুরী নাহি যায় চারি॥
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী। পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী॥
নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে। এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে॥

যে সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ আদিরসের স্রোতে প্লাবিত, সে সময়ে এরূপ এক আধখানি কাব্য তরঙ্গ-মধ্যে ভেলা মনে হয়।

জয়নারায়ণের চণ্ডী কাব্য বা চণ্ডিকামঙ্গল হইতে একটু নমুনা; —মহাদেবের যোগভঙ্গ।

মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। দামামা ভ্রমর রব সঘনে বাজিল॥
নব কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে। উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে॥
ত্রিগুণ পবন হয় যোগ গতি বেগেতে। ফুলধনু পিঠে ফুলশর কর পরেতে॥
ভ্রমাইয়া ভাঙ্গে আড় হেরি আঁখি কোণেতে। কুসুমের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে
বাম বাহু রতি-গলে রতি-বাহু গলেতে। ভুবন মোহন কর হর-মন মোহিতে॥
বায়ুবেগে সকলে উত্তরে হিম গিরিতে। আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে॥
কুসুমে প্রকাশ গিরি বন উপবনেতে। নানা ফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে॥
ছুটিল মানিনী মান লাগিল ধ্বনি কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে॥
থরথর কেতকী কাঁপিছে মৃদু বাতেতে। অকালে অশোক ফোটে সেফালিকা দিনেতে॥
ললিত মালতী ফোটে যূথিকার ডালেতে। বকুল কদম্ব নাগকেশরের পরেতে॥
মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে। কুহরিছে কোকিল সমূহ পাঁচ শরেতে॥
নবলতা মাধবীর নত শির ভূমেতে। পলাশ টগর বেল নত ফুল ভরেতে॥

ইহার পর পশু-পক্ষীর ক্রীড়ায় কিঞ্চিৎ অশ্লীলতার আমেজ আসিয়া পড়িয়াছে,—সেটা সাময়িক গুণ—বা অগুণ। এক এক স্থলে কালিদাসের ছায়া স্পষ্ট;—আমরা মদনভস্মটুকু উদ্ধৃত করি—

একবার নাহি পারে পুনশ্চ সন্ধান করে স্মর নিজ শরে চুম্ব দিয়া।
ছোঁয়ায়ে রতির বুকে ধনুকে পুনশ্চ তাকে যুড়িলেক সাবধান হৈয়া॥
নিরখে শঙ্কর পানে করিয়া জন-লোকনে বেশে যেন রজত অচল।
তেজ শত সূর্য্য প্রায় শত চন্দ্র সম তায় রত্নবেদী পরে ঝলমল॥
বিমুদ্রিত ত্রিলোচন ব্রহ্মেতে অর্পিত মন স্পন্দহীন সকল শরীর।
স্থির বায়ু পরে যেন শুভ্র জলধর তেন জলশূন্য না পড়িছে নীর॥
জটাতে মণ্ডিত শির ভালে আধ শশধর বিভূতি রাজিত সর্ব্ব গায়।
গলে নাগরাজ মালে কালকূট কণ্ঠে জ্বলে নিত্যানন্দ ঢঢঢঢ কায়॥
দেখি হেন ত্রিপুরারি মার বলে মরি মরি ব্যস্ত ভাবে দু হস্ত কাঁপিল।
হাত হতে ছুটি শর মহাদেব হৃদি পর স্পর্শ মাত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
ছিল মন ব্রহ্মযোগে সে মনে মদন জাগে প্রভু মনে বিচার করিল।
কেন হেন হল মন অকস্মাৎ কি কারণ পাষাণেতে কর্দ্দম হইল॥
সকলি জানিল ধ্যানে আপনি আপন জ্ঞানে দেবচক্রে যা কৈল মদন।
অন্তরে জন্মিল রোষ জানিয়া মদন দোষ মেলিলেক ললাট-লোচন॥
কামাগ্নি বিদ্যুত হৈল হুঙ্কারে পবন বৈল পৈল যেয়ে মদনের অঙ্গে।
পরশে পুড়িল তেন অগ্নিতে আওতি যেন দাবানলে যেমন পতঙ্গে॥
দহনে পতঙ্গ হৈল হুতাশনে হবি পাইল হল বাদ দীপে ঝঞ্ঝাবাতে।
গরুড় অহীতে রণ সিংহ মৃগে হনাহন মুষিক যুঝিল করী সাথে॥
নিরখিতে দেবগণ ডাকে শুন ত্রিলোচন রক্ষ রক্ষ দয়াল দিনেশ।
যাবৎ এ দেব-বাণী শিব কর্ণে হৈল ধ্বনি তাবৎ মদন ভস্মশেষ॥

এই কাব্যের রতি-বিলাপটি বড় সুন্দর—

অন্য নায়িকার ঘরে নিশীথে বঞ্চিয়া ভোরে মোর কাছে এসেছিলা তুমি।
খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া মন-রাগ না সহিয়া মন্দ কাজ করেছিনু আমি॥
রঙ্গনের মালা নিয়া দুহাতে বন্ধন দিয়া কর্ণ-উৎপলে তাড়িছিলে।
সেই অভিমান মনে করিয়া আমার সনে রস-রঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥
আর দুঃখ মনে জ্বলে একদিন নৃত্যকালে পায়ের ঘুঙুর খসেছিল।
ত্বরা তুমি দিতে পার বিলম্ব হইল তার দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল॥

তাতে আমি মান করি নৃত্যগীত পরিহরি বসিয়া রহিনু মৌনী হয়ে।
যত সাধ কৈলা তুমি পুনঃ না নাচিনু আমি তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে ॥

পণ্ডিতগণ বুঝিবেন, এই রতি-বিলাপ অলঙ্কার-শাস্ত্র হইতে গৃহীত।

"হরি-লীলা"—সত্যনারায়ণের ব্রতকথা ;—সুকবির হাতে পড়িয়া নানা রসসমন্বিত সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার মধ্যে কবি জয়নারায়ণের রচনার একটু নমুনা ;—রাজসভা বর্ণন—

সভা মধ্যে রত্নসিংহাসনে নরপতি। শিরে শ্বেতছত্র ইন্দু কুন্দ জিনি ভাতি ॥
ফক্ ফক্ জ্বলে ভস্ম ত্রিপল্লব ভালে। মিস্ মিস্ যজ্ঞ-ভস্ম ভ্রূমধ্যে জ্বলে ॥

* * *

টল্ টল্ মুকুতা-কুণ্ডল কাণে দোলে। ঢল ঢল গজমতি মালা দোলে গলে ॥
কস্ কস্ কসাতা সটুকা কটিতে। ঝল্ ঝল্ ঝকমকে স্বর্ণ ঝালরেতে ॥
ডগমগ সপ্ত কন্যা চামর লইয়া। ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া ॥
ঝন্‌ঝন্ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি। ঝক্‌মক্ চামর দণ্ডেতে জ্বলে মণি ॥

এই কাব্যে আনন্দময়ী দেবীর রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা—

হের চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে ॥
কতি প্রৌঢ়রূপা ওরূপে মজন্তি। হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি ॥
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা। সুনাশা সুহাসা সুবাসা সুভাষা ॥
কত ক্ষীণমধ্যা সুভাঙ্গা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা বশীজ্ঞা মনোজ্ঞা মদজ্ঞা ॥
দেখি চন্দ্রভাণে কত চিত্তহারা। নিকারা বিকারা বিহারা বিভোরা ॥
করে দৌড়াদৌড়া মদমত্ত প্রৌঢ়া। অমূঢ়া বিমূঢ়া নবোঢ়া নিগূঢ়া ॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা। প্রহৃষ্টা সচেষ্টা কেহ ওষ্ঠদষ্টা ॥
অনঙ্গাস্ত্র ভিন্না কত স্বর্ণবর্ণা। বিকীর্ণা বিশীর্ণা বিদীর্ণা বিবর্ণা ॥
কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে। কারো হার কুর্পাস বিত্রস্ত কক্ষে ॥
গলদ্ভূষণা কেহ নাহি বাস অঙ্গে। গলদ্দর্পরাগিণী কেহ মাতিয়া অনঙ্গে ॥

(চন্দ্রভাণ ও সুনেত্রার বাসি বিবাহ)।

ভাবার অসাধারণত্ব দেখাইতে এ টুকু তুলিয়াছি। বিদুষী রমণীর রচনা সম্যক্ বুঝিবার জন্য অভিধানের সাহায্য আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু সর্ব্বত্রই এইরূপ নহে, ইঁহার সহজ সরল রচনাও আছে। এক স্থল দেখাই—

…আসি দেখহ নয়নে। হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে॥
হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড রুক্ষ কেশ অতি। ঘরে আসি দেখ নাথ এ সব দুর্গতি॥
রহিয়াছি চির বিরহিনী দীন মনে। অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ পানে॥

* * *

ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী। না সহে এ দারুণ বিরহ আগুণি॥
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে। সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বেঁধেছ আপনি। তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥
শীত ভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ। বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্টমনে। সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষাপাত্র করি। মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী॥
আর তব স্বাপ্যধন বিষম যৌবন। লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন॥

(বিলাপটি সহস্র বৎসর পূর্ব্বতন রচনা "গোবিন্দচন্দ্রের গীতে" রাণী উদুনা সুন্দরীর শোকোচ্ছাস মনে পড়াইয়া দেয়।) আনন্দময়ী দেবী প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার স্ত্রী-কবি।*

---

* বিক্রমপুর অঞ্চলের এই সেন-পরিবার স্ত্রীপুরুষে কবি। রামগতি, জয়নারায়ণ ও রাজনারায়ণ তিন ভ্রাতারই রচিত কাব্য পাওয়া যায়; লালা জয়নারায়ণই শ্রেষ্ঠ কবি, আনন্দময়ী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী। গঙ্গামণি নামে তাঁহার এক ভাগিনেয়ী ছিলেন, তিনিও কবি; তাঁহার রচিত অনেক গান আছে; তাহার কতকগুলি এখনও পূর্ব্বদেশে বিবাহোপলক্ষে গীত হইয়া থাকে।

বিদুষী আনন্দময়ী দেবীর আর একটু পরিচয় এখানে দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। খ্যাতনামা রাজা রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; যে সময়ে রাজবল্লভ এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন,তৎকালে উহা বাঙ্গালা দেশে অতিশয়

"হরিলীলা" প্রাচীন কাব্য সকলের অনুরূপ একখানি পাঁচালী; সাবেক পাঁচালীর শেষ তানের অন্যতম।

আমার হরি-স্মরণের কথা তুলিয়া কাব্য-প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলাম, "হরিলীলা"র কথায় (কাব্য-ভাগ) শেষ করি।

অভিনব ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিম্বদন্তী এইরূপ—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রাজবল্লভ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফলসা গ্রামে লালা রামগতির নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন; তৎকালে রামগতি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি কন্যা আনন্দময়ীকে ঐ প্রমাণ ও প্রতিলিপি লিখিয়া দিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করেন। আনন্দময়ী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিলিপি লিখিয়া দিলে, তদনুসারে রাজা রাজবল্লভের যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

শত বৎসর পূর্ব্বেকার ফরিদপুর-নিবাসিনী সুন্দরী দেবীর পাণ্ডিত্যের কথা পাদরী Long সাহেব পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; ইনি নাকি ন্যায়-শাস্ত্রেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

হটী বিদ্যালঙ্কারের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইঁহার টোল ছিল।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বেকার ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়া গ্রামের কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমের পত্নী বৈজয়ন্তী দেবী এবং শিবরাম সার্ব্বভৌমের কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীর পাণ্ডিত্যের গৌরবও প্রচার আছে, ইঁহারা কবি এবং সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্না ছিলেন। *

বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে মাধবী দেবী, রসময়ী দেবী, অপর দুই তিন জন এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রামীর পদ পাওয়া যায়। ৪০০।৫০০ বৎসরের কথা। সরস্বতীর শ্রীচরণে বাঙ্গালিনীর প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি নূতন নহে।

আমরা এইবার বঙ্গের প্রাচীন-সাহিত্য কল্পপাদপের আর এক শাখার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব—গীতি ভাগ।

ইহার প্রধান অংশের পরিচয় সর্ব্বপ্রথমে দেওয়া হইয়াছে; বৈষ্ণব কবিকুলের হর্ষ-বিষাদ-অশ্রু-মিশ্রিত ভক্তি-নির্ম্মাল্য—প্রেম-পূত হৃদয়-উচ্ছ্বাসই এই শাখাব প্রাণ।

কি সভ্য কি অসভ্য সকল দেশে সকল ভাষাতেই গান কোন না কোন আকারে বরাবরই থাকে; গ্রাম্যগীতিরূপেই হউক, ছেলে ভুলানো ছড়া রূপেই হউক, ব্রতকথা বা প্রবাদ-বচন রূপেই হউক, অথবা ভাটগণের গাথা রূপেই হউক, ভাষার জন্ম হইতে গীত গান চিরকালই বিরাজ করে।

গীত গান কবিতারই অঙ্গ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে বা গৌড়মণ্ডলে এখনকার এই বঙ্গ-ভাষার পরিচয় খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দী হইতে পাওয়া যায় আমরা বলিয়াছি। বঙ্গ-ভাষার আদিযুগের রচনার নিদর্শন "মাণিক চাঁদের গান," "গোবিন্দ চন্দ্রের গীত" প্রভৃতি;—এ কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সেই গীত গান—এখনকার কালে গীত গান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা হইতে কিছু ভিন্ন; একটু নমুনা দেখাই;—মাণিক চাঁদের গান—

> ধুইয়া রায়ের গুণ সিদ্ধায় গুণ গাই।
> যাকে বন্দিলেই সিদ্ধি পাই॥
> মাণিকচাঁদ রাজা বঙ্গে বড় সত্তি।
> হাল খানায় খাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি॥
> দেড় বুড়ি কড়ি লোকে খাজানা যোগায়।

তার বদলি ছঁয় মাস পাল খায়॥
এত মাণিকচন্দ রাজা সরয়া নলের বেড়া।
একতন যেকতন করি যে খাইছে তার দুয়ার ত ঘোড়া॥
বিনে বান্দি নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া॥

এ টুকু সেই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার গানে একটু সাংসারিক খবর। আমরা কবিত্বের নমুনা কিঞ্চিৎ দেখাই—

গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হইতে উদ্যত, পত্নী তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন—

না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কারে লাগিআ বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর॥
বান্দিলাম বাঙ্গালা ঘর নাহি পাড় কালী।
এমন বয়েসে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিশণ।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দস গিরির মাও বইন রবে স্যামী লইবে কোলে।
আমি নারি রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে॥
খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাটির ঘা।
বয়সকালে যুবতী রাঁড়ী নিতে কলঙ্ক রাও।
আমাক সঙ্গে করি লইআ যাও॥
জীয়ব জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥
আইল পাতার দেখিলে কথা কহিআ যামু।
গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু স্যাম বলিমু॥
সিতল পাটি বিছাইআ দিমু বালীসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও॥
হাত খানি দুঃখ হইলে পাও খানি যাতিমু।

এ রঙ্গর কৌতুরক বেলা স্তুতি ভুঞ্জিমু এ স্তুতি ভুঞ্জাইমু॥
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ডপাথার বাও।
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও॥

বঙ্গদেশে এককালে মাণিকচাঁদ নামে এক "সতি" অর্থাৎ ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তাঁহার "নও বুড়ি" রাণী ছিল। এই মাণিক চন্দ্রের এক রাণীর নাম ময়নামতী, তিনি সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ও তন্ত্র-মন্ত্র-সিদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র (বা গোপীচাঁদ); ইহাঁর আবার অদুনা ও পদুনা নামে দুই মহিষী এবং ছয় কুড়ি রাণী ছিল।

"ময়নামতীব গান" উত্তর বঙ্গে—রঙ্গপুর দিনাজপুর অঞ্চলে—অনেক পাওয়া যায়। রঙ্গপুরেব কাণফোঁড়া যোগীগণ ইহা অভ্যাস করে এবং গোপী-যন্ত্র বাজাইয়া গান কবিয়া বেড়ায়।*

এই সকল গানে এক একটি উপমা আছে—অভিনব; বুঝা যায় সংস্কৃত কাব্যাদির আদর্শ-সংস্পর্শ-শূন্য। পত্নীব দশন-পংক্তি অতি শুভ্র, গোপীচাঁদ সোলাব সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। একটি রূপ বর্ণনা—

"যেমন রূপ আছে রাজার চরণের উপর।
তেমন রূপ নাই তোমার মুখের উপর॥"

এই ময়নামতীর গানে সেই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার বঙ্গ-গাথায় স্থলে স্থলে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতাব বীভৎস চিত্র দেখিয়া আমাদের শিহরিয়া উঠিতে হয়। জননীর সতীত্ব পরীক্ষার্থ গোপীচন্দ্র রাজা "বাইশ মোনী কড়াই" "ন্নাণী-মোন" তৈলে পূর্ণ করিয়া "সাত দিন নও রাত" অগ্নি-সংযোগে উত্তপ্ত করতঃ মাতাকে তাহার উপর চড়াইয়া দিয়াছিলেন! তন্ত্রসিদ্ধার তাঁহাতে

* "গোপীযন্ত্র" নামে যে বাদ্য যন্ত্র আমরা এখন দেখিতে পাই, হয় ত এই সময় হইতে এই গোপীচাঁদ রাজার নাম হইতেই তাহার উৎপত্তি

কোন অনিষ্ট হয় নাই ; তিনি ছয় দিন তন্মধ্যে থাকিয়া সর্প রূপ ধরিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন !

ইদানীং আমরা "গোবিন্দচন্দ্রের গীত" বলিয়া যাহা দেখিতে পাই, তাহা দুর্লভ মল্লিক নামক ১৫০।২০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রাম্য কবির রচিত। উহা সেই প্রাচীন গানের সংশোধিত সংস্করণ বিশেষ। প্রাচীন গীত ভাঙ্গিয়া নূতন ভাষায় গ্রথিত। রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্পষ্ট বুঝা যায়। একটু নমুনা—

পাটিকা নগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ। জলন্দরি হাড়ি পা হইল হাড়িরূপ ॥
* * * পাইশালে খাটে হাড়ি রাজার আওয়াসে ॥
রাজপুরে গেল হাড়ি ঝুড়িয়ে কোদাল। * * *
সপ্তমে দেখিল গড় নানা জাতি ফল। আম্র কাঁঠাল গুবাক নারিকেল ॥
হরিতকী জায়ফল এলাচ লবঙ্গ। মধুর কুকিল নাদ করয়ে সুরঙ্গ ॥
নানা জাতি পক্ষ গাছে করে কোলাহল। পক্ষা রব শুনি চিত্ত হইল চঞ্চল ॥
চারিদিকে চাহি যোগী ধ্যান আরম্ভিল। হুঙ্কারে বৃক্ষ সব ভূমেতে ঠেকিল ॥
হেট মুণ্ড হইল গাছ লোটে ভূমিতল। ছিণ্ডিয়া পুত্রের হাতে দিল নানা ফল ॥
হুহুঙ্কার দিয়া পুন চারি পানে চায়। ততক্ষণে বৃক্ষ ডাল উঠিয়া দাণ্ডায় ॥
বালাখানায় বসিয়া দেখিল রাজার মা। হাড়ি নয় জানিলাম এই হাড়ি পা ॥
গুপ্ত বেশে বাউলরূপে আছে এই ঠাঁই। ইহার চেলা করিবা রাজা গোবিন্দাই ॥
বসিয়াছে গোবিন্দচন্দ্র আপনার পুরী। ছয় কুড়ি রাণী কাছে উদুনা সুন্দরী ॥
উদুনা পুদুনা লয়্যা করিছে বিলাস। শ্বেত চামরে কেহ করিছে বাতাস ॥

গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণ কালে পত্নী তাঁহাকে সঙ্গিনী করিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিয়াছিলেন, আমরা "মাণিকচাঁদের গানে" দেখিয়াছি ; "গোবিন্দচন্দ্রের গীতে"ও দেখা যায়, সন্ন্যাসী গোবিন্দচন্দ্রের রাণী সেই চেষ্টা করিতেছেন। প্রেমের কাঁহুনী বঙ্গদেশে চিরকালই হৃদয়-স্পর্শী—

অভাগী উদুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ। দেশান্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ ॥

তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী। রান্ধিয়া বিদেশে যোগাইব অন্ন পানী॥
বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে। আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে॥

* * *

নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন। তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন॥
বনে বনে কাঁটা ভাঙ্গি জ্বালিব আগুনি। সুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়া যোগিনী॥
সর্ব্ব দুঃখ পাশরয়ে নারী যার পাশে। আমারে করিয়া সঙ্গে চল দেশে দেশে॥

* * *

না ছাড়্য না ছাড়্য মোরে বঙ্গের গোঁসাঞি। তোমা বিনা উদুনা থাকিবে কেন ঠাঞি॥
নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ। শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ॥

* * *

রাজা বলে উদুনা আমার হইল কাল। যাইব গুরুর সঙ্গে না কর জঞ্জাল॥

* * *

হায় হায় কর্য্যা রাণী ধূলায়ে লুটায়। উদুনার রোদনে পাষাণ গল্যা যায়॥
কান্দয়ে নগরবাসী রাজা পানে চায়্যা। বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে আর শিশু মায়্যা।
রাণীর ক্রন্দনে নদী উথলে সাগর। পাটশালে কান্দে অশ্ব যতেক কুঞ্জর॥
সারী শুয়া পক্ষী কান্দে না করে আহার। দাসীগণ কান্দে রাজার করি হাহাকার॥

* * *

খসাইয়া পেলে হার কেয়ূর কঙ্কণ। অভিমানে দূর করে যত আভরণ॥
পুঁছিয়া ফেলিল সব সিঁথার সিন্দুর। নাকের বেশর পেলে পায়ের নূপুর॥
রাজার চরণে পড়ে জড়ায়্যা কুন্তল। মোরা সঙ্গে যাব রাজা দেশান্তরে চল॥

প্রজাবৎসল রাজার ছবিটি ফুটিয়াছে সুন্দর।

দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র ও যোগী-সম্প্রদায়ের গোপীচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। অনেকের মতে এই রাজা গোবিন্দচন্দ্রই ক্রমে গোপীচাঁদ, পরে গোপীপালে দাঁড়াইয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবতে আছে—

"যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥"

এই পালগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি; বঙ্গের বৌদ্ধ পাল-রাজগণের আত্মীয়। কেহ কেহ বলেন, মাণিকচাঁদ রাজা গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের ভ্রাতা; এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

এ সময়ে বঙ্গে বিকৃত বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব। এই সকল গানে সেই বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার নিদর্শন যথেষ্ট মিলে।

বঙ্গ ভাষার আদিযুগের গীত, দশম একাদশ শতাব্দীর গানের নমুনা এই। ডাক ও খনার বচন বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন রচনা, কিন্তু সে সকল গীতি-শ্রেণী-ভুক্ত হইবার নহে, সুতরাং আমরা এখানে উল্লেখ করিব না।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে জয়দেব কবির আবির্ভাব। তাঁহার রচিত গানসমূহ ঠিক বাঙ্গালা ভাষা নহে; কিন্তু সেই 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী' আমাদের এই মাতৃ-ভাষার অগ্রদূত। সেই টুকু দীর্ঘ মরু-কান্তারে উর্ব্বরা ভূমি।

ইহার পর বঙ্গদেশ মুসলমানের হইল; ২৫০।৩০০ বৎসর দেশের গান গল্প লোপ পাইয়াছে বোধ হয়। পুঁথিপত্র কিছুই মিলে না।*

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী বৈষ্ণবকবিগণের যুগ—সে গীতি-গানের এক অনন্ত উৎস, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হাল্‌কা গীতগান অপেক্ষা স্থূল কিছু—মঙ্গলকাব্য—শাস্ত্রানুবাদ ও লৌকিকধর্ম্ম প্রচারের নিদর্শনই প্রচুর পরিমাণে মিলে। কিন্তু তৎসমস্তও পাঁচালী—তাহারও "গায়ন" "বায়ন" ছিল।

---

* প্রবাদ আছে—বেহার-বিজয় কালে বক্তিয়ার খিলিজির কৃপায় রাজধানী ওদন্ত-পুরীর রাজ-গ্রন্থাগার একাক্রমে অষ্টাদশ দিন পুড়িয়াছিল; ইহাই কারণ—না বৌদ্ধভাব-প্লাবিত দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ-সংস্থাপন-প্রয়াসী ব্রাহ্মণ-ঠাকুরগণের হাতও আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের অভ্যুদয়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর রচনা শেষ হয়, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর অভিনয়; বঙ্গের ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গেল! বঙ্গদেশ ইংরাজের হইল। আমাদের পুরাতন জীর্ণ শৃঙ্খল ঘুচিয়া নূতন সুদৃঢ় শৃঙ্খল লাভ হইল। এই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিবর্ত্তনে বঙ্গবাসীর প্রাণে আঁচড়টি লাগে নাই। বাঙ্গালী তখন গীত গান তোটক-ছন্দ লইয়া উন্মত্ত।

ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিনীর তরঙ্গে চালিতা তরণীর ন্যায় এই গীত গানের ভাব তখন দুলিতেছিল; একবার উপরে উঠে, সে সময়ে ধ্বনিত হইতেছিল—

বাসনায় দাও আগুন জ্বেলে ক্ষার হবে তার পরিপাটি।
কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই মনের ময়লা ফেল কাটি॥

আবার তখনই নামিয়া আসে,—কাণে বাজিতেছিল—

যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পর ফুল্ল ফুলে কর পান মধু॥

তলগামী হইবারই উপক্রম দাঁড়াইয়াছিল, ভাগ্যক্রমে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে পাকা মাঝির হাতে হাল পড়িল, তরী বাঁচিয়া গেল।

গুণী, গুণগ্রাহী সমালোচকগণ বলেন, ভারতচন্দ্রের পর পঞ্চাশ বৎসর বঙ্গ-ভাষাতে উন্নতি অবনতি প্রায় কিছুই হয় নাই; ভাষা মুখবদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থির ভাবে ছিল।

আমরা এই পঞ্চাশ বৎসর এবং ইহার পরের পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাচীন ভাগ ধরিয়াছি; কেন না এই পর্য্যন্তই খাঁটি বাঙ্গালা ভাব। ইহার পর হইতে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব এবং সেই প্রভাবে নবশক্তি সঞ্চারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এই শত বৎসর মধ্যে বঙ্গে তেমন গণনীয় কাব্য বা কাব্য-রচয়িতা কবি মিলে না। কিন্তু "কবি" পাওয়া যায়। চলিত কথায় ইঁহারা

"কবিওয়ালা" নামেই পরিচিত। ইহাঁদের ভিতর কেহ কেহ কবি নামের সকল অর্থেরই উপযুক্ত পাত্র। ইহাঁদের রচনার মধ্যে কোন-কোন স্থল এত মধুর, এমন মর্ম্মস্পর্শী যে বরং দু একখানা বড় সড় কাব্যের লোপ হয় বাঙ্গালী তাহাও সহিতে পারে, কিন্তু সেই কবি-গানিগুলি নষ্ট হইতে দিতে পাবে না।

ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী গীত-রচয়িতাগণের নাম গ্রহণ করিবার আগে এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের নাম এবং তাঁহার সমকালিক কবি—কাব্যক্ষেত্রে তাঁহার নিকট পরাজিত প্রতিদ্বন্দী, গীতি-ক্ষেত্রে সম্যক্ বিজয়ী—সাধক-চূড়ামণি রামপ্রসাদের উল্লেখ করিতে হয়।

ভারতচন্দ্র রচিত গানের পরিচয় ইতঃপূর্ব্বেই আমরা দিয়াছি; আর একটি শুনাই ;শাক্ত কবির বৈষ্ণব ভাব—

ওহে বিনোদ রায় ধীরি যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নব জলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্র-ধনু
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন-চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ-সুধাকর হাসি- সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে॥

কিন্তু গীত-রচনায় ভারতকে থর্ব্ব হইতে হইয়াছে। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত করে, অন্তরের অন্তর-স্থলে পঁহুছায়,—এমন ভাবের মাধুরী, সহজ সরল ভাষায় ভক্তের প্রাণের কাহিনী, প্রকাশ করিতে রামপ্রসাদ যেরূপ পারিয়াছেন, এমন বোধ হয় বাঙ্গালী কোন কবিই পারেন নাই।

আমরা বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা রামপ্রসাদকে ভুলিয়া গিয়াছি, ভালই হইয়াছে; তাঁহার "কালী-কীর্ত্তন" "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের" খোঁজ বড় একটা কেহ রাখে না, দরকারও নাই; রামপ্রসাদের নাম তাঁহার সাধক-সঙ্গীতে, সে সঙ্গীত আমাদের বুকের ধন।

ভাষার কারীগরী নাই, অলঙ্কার-শাস্ত্রের শ্রাদ্ধ নাই, সুরও একঘেয়ে, কথিত আছে রামপ্রসাদ নিজেও সুকণ্ঠ ছিলেন না; ইহা সত্ত্বেও তিনি যে গান গুলি রচিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় গীতি-সাহিত্যে তুলনা-রহিত। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে রামপ্রসাদের স্থান এই গীত গুলির জন্যই খুব উচ্চে। গান গুলি ভক্তির প্রস্রবণ। নিশীথে বিজন প্রদেশে রামপ্রসাদী আলাপ যখন কাণে আসে, প্রাণ যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় উদাস ভাবে ভোর হইয়া উঠে! শুনা যায়, কোন সময়ে গঙ্গা-বক্ষে নৌকা হইতে রামপ্রসাদের গান শুনিয়া দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজুদ্দৌলাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমরা গুটিকতক গান উদ্ধৃত করিব। প্রবাদ এই, রামপ্রসাদের প্রথম গান—যাহা হইতে তাঁহার জীবনস্রোত আপন পথ খুঁজিয়া পায়—

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমখ্ হারাম্ নই শঙ্করী॥

পদ-রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যাঁর মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জাইগীর, তবু শিবের মাইনে ভারী॥
আমি বিনে মাইনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী॥

আদুরে ছেলের মায়ের কাছে আব্দার—

বসন পরো মা বসন পরো তুমি।
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়া জবা পদে দিব আমি।

খড়্গা হস্তে রুধির-ধারা, এ মা মুণ্ডমালা গলে,
একবার হেঁট নয়নে চেয়ে দেখ মা, পতি পদতলে গো মা।
সবে বলে পাগল পাগল, ও মা আরো পাগল আছে,
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে॥

অবুঝ্ ছেলের প্রাণের কাঁদুনি—

মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ' টা কলুর অনুগত?
মা শব্দ মমতা-যুত কাঁদলে কোলে করে সুত
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি, দেখি তোর পদ জন্মের মত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥

সাধকের মুখে সার তত্ত্ব—

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃদ্‌কমলে ধ্যান কালে আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা মাথা নাই তার মাথা ব্যথা
ওরে অনলে দাহন যথা হয় রে তুলা রাশি।
গয়ায় করে পিণ্ড দান বলে পিতৃ-ঋণে পাবে ত্রাণ
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তরি গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে ম'লেই মুক্তি এ বটে শিবের উক্তি
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

কৌতুকে প্রসাদ বলে করুণানিধির বলে
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী ॥

ভক্তের প্রাণের কামনা—

এমন দিন কি হবে তারা ?
যবে তারা তারা তারা বলে দুনয়নে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে মনের আঁধার যাবে টুটে
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ
ওরে শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদে রটে মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে
ওরে আঁখি মেলি দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা ॥

সাধকের প্রকৃত সাধনা—আবেগময় উপদেশ—

মন তোর এত ভাবনা কেনে ?
একবার কালী বলে বস্ রে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা জানবে না রে জগজ্জনে ॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি-পদ্মাসনে ॥
আলো চাল আর পাকা কলা কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে ॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কি রে তোর সে রোসনাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে দেও না জ্বলুক নিশি দিনে ॥
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি 'জয় কালি' 'জয় কালি' বলে, বলি দেও ষড় রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
তুমি 'জয় কালি' বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥

কৃষকের আসল ফসল—

মন রে কৃষি-কাজ জান না।

এমন মানব-জনম রৈল পতিত, আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে বাজেআপ্ত হবে জান না।
এখন আপন এক্তারে (মন রে এই বেলা) চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরু-দত্ত বীজ রোপন করে ভক্তি-বারি সেঁচে দে না।
একা যদি না পারিস্ মন রামপ্রসাদকে ডেকে নে না॥

তাপিত সন্তানের প্রাণেব উচ্ছাস—দুনিয়ার তামাসা—

ভবে আসার আশা, কেবল আশা, আসা মাত্র সার হইল।
চিত্রের পদ্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলি রইল॥
নিম খাওয়ালি মা চিনি বলে কেবল কথার করি ছল।
মিঠার আশে তেতো মুখে সারা দিনটা গেল॥
খেল্‌বি বলে আশা দিয়ে মা এনেছিলি এ ভূতল।
যে খেলা খেলিলি শ্যামা আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলা যা হল তা হল।
সন্ধ্যা হল, এবার কোলের ছেলে মা কোলে নিয়ে চল॥

এক একটি গান—সংসার-মরু-তপ্ত পান্থের প্রাণের যেন ব্যথা-নিঃসারণ, বলিয়া ফেলিলে ব্যথিত হৃদয়ে যেন শান্তি-বারি সেচিত হয়;—

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে হাট করে বসেছি ঘাটে
ও মা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে নায়ে লবে গো।
দশের ভরা ভরে নায় দুঃখী জনে ফেলে যায়
ও মা তার ঠাঁই যে কড়ি চায় সে কোথা পাবে গো॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে আসান দে মা ফিরে চেয়ে
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে গো॥

প্রবাদ আছে—এ গানটি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া কবিকর্তৃক অন্তিম সময়ে রচিত।

শুনা যায়, দোলযাত্রার সময় শোভাবাজারের প্রখ্যাতনামা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুরোধে এই গানটি রামপ্রসাদ রচনা করিয়াছিলেন—

হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী (শ্যামা)।
মন-পবনে দোলাইছে দিবস রজনী (ও মা)॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে বাঁধা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী (উমা)।
আবির রুধির তায় কি শোভা হয়েছে পায়
কাম আদি মোহ যায় হেরিলে অমনি (ও মা)॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল
শ্রীরামপ্রসাদের এই ঢোল-মারা বাণী (ও মা)॥

রামপ্রসাদের আগমনী গানও কয়টি আছে—প্রাণের কাণে বাজে; একটি—

গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কার কথা শুন্‌ব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌ব ঝগড়া জামাই বলে মান্‌ব না।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয় এ দুঃখ কি প্রাণে সয়
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

মা উমা ত আমাদের ঘরেরই মেয়ে!

রামপ্রসাদের অঙ্কিত একখানি গার্হস্থ্য চিত্র—(কালী-কীর্তন)—

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্যপান নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।

অতি অবশেষ নিশি	গগনে উদয় শশী	বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি	মলিন ও মুখ দেখি	মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আয় আয় মা মা বলি	ধরিয়ে কর-অঙ্গুলী	যেতে চায় না জানি কোথারে॥
আমি কহিলাম তায়	চাঁদ কি রে ধরা যায়	ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥
উঠে বসি গিরিবর	করি বহু সমাদর	গৌরীরে লইয়া কোলে করে॥
আনন্দে কহিছে হাসি	ধর মা এই লও শশী	মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ	উপজিল মহাসুখ	বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

শ্রীরামপ্রসাদে কয়	কত পুণ্যপুঞ্জচয়	জগতজননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা	সুনিদ্রিতা জগন্মাতা	শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥

দুধের মেয়ের কি মনোরম জীবন্ত ছবি!

আমরা রামপ্রসাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। পৃথিবীতে নর আছে, নরাকার অপর জীবও আছে; সে হিংসায় মরে, সে ভাবে মানুষে আর আমাতে প্রভেদ কি? আমি বরং ভেঙ্চাইতে পারি ভাল; এই ভাবিয়া সে "দন্তরুচিকৌমুদী" বাহির করিবার চেষ্টা করে। রামপ্রসাদের মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়-উচ্ছ্বাসকে একজন ভেঙ্গচাইয়াছেন। রবি-শশীর উদয়ে রাহুর মুখব্যাদান আজ নহে, চিরকালই আছে। ভক্ত সাধকের প্রাণের কাহিনীর উত্তরে দন্তবিকাশের নমুনা কিঞ্চিৎ দেখাই;—

রামপ্রসাদ—

আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥

আজু গোঁসাঞি—

পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখ্‌বি রে তোর মেসো আর মাসী॥

রামপ্রসাদ—

মুক্ত কর মা মায়া জালে।

গোঁসাঞিজীর উত্তর—

বন্ধ কর মা থ্যাপ্‌না জালে।

যাতে চুণো পুঁটি এড়াবে না মজা মারবো ঝোলে ঝালে॥

কিন্তু এই "প্রভু" টির রচনা-শক্তি ছিল, তা নহিলে আমরা এই হীন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতাম না।

রামপ্রসাদের গান—

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটি॥

আজু গোস্বামী উত্তরে গাহিয়াছেন—

এই সংসার রসের কুটি।
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি॥

যার যেমন মন,	তার তেমনি মন কর রে পরিপাটি।*
ওহে সেন. অল্পজ্ঞান,	বুঝ কেবল মোটামুটি॥
ওরে, শিবের ভাবে ভাব না কেন,	শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।
ওরে. ভাই বন্ধু দারা সুত.	পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি॥
জনক রাজা ঋষি ছিল,	কিছুতে ছিল না ত্রুটি।
সে যে এ দিক ও দিক দুদিক রেখে,	খেতে পেত দুধের বাটি॥
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া,	ভাবছ মায়ার বেড়ী কাটি।
তবে অভেদ জেন শ্যামের পদ,	শ্যামা মায়ের চরণ দুটি॥

ইহা হইতে চৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তরকালীন শিষ্য-প্রভুগণ ক্রমে কেমন "ঝোল ঝাল" "খাই দাই আর মজা লুটি" এবং "দুধের বাটী"র ভক্ত

* এই গানটিতে কোথাও কোথাও আর একটি লাইন পাওয়া যায়—

"যদি ধোঁকাই জান তবে কেন তিনবার কৈচেছ খুঁটি!"

পুত্র না হওয়াতে রামপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন—তাই এই শ্লেষ।

হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহার পরিচয়ও আমরা পাই।

কালী-কীর্ত্তনে গৌরীর গোচারণ বর্ণনে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

গিরিশ-গৃহিনী গৌরী গোপবধূ বেশ।

গোঁসাইজীর উত্তরটুকুতে একটু বেশ কবিত্ব আছে—

না জানে পরম তত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে?
তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে!

থাক্ আর আমাদের এই তুচ্ছ বিষয়ে কালযাপন করিয়া কাজ নাই। জনরব—রাজশ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সার্বক কবির সঙ্গে গোঁসাই-ঠাকুরের দ্বন্দ লাগাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন।

কিন্তু প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত সাধক—প্রকৃত কবি—অনন্ত জ্ঞানী হইয়া থাকেন; তাঁহাদের বচন-সুধা অনেক সময়ে ভবিষ্যদ্-বাণী বলিয়া প্রমাণ হয়। আজু গোঁসাঞির শ্লেষ-ব্যক্তির পূর্ব্ব হইতে রামপ্রসাদ তাহার জবাব মজুত রাখিয়াছিলেন—

মন, কর না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবি রে, কৈলাসবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ-তলাসী।
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥
শিব রূপে ধরে শিঙ্গা, কৃষ্ণ রূপে ধরে বাঁশী।
ওমা, রাম রূপে ধরে ধনু কালী রূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চির-বিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী অযোধ্যা-গোকুল-নিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
এ মা, অনুজ ধানুকী সঙ্গে জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

রামপ্রসাদের রচনায় পদ-লালিত্যের ঈষৎ নমুনা দেখাইয়া আমরা অন্যত্র যাই ;—

মা কত নাচ গো রণে।

নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ, বিবসনা হর-হৃদে নাচ গো রণে।
সদ্য-হত দীতি-তনয়-মস্তক হার লম্বিত সুজঘনে।
কত রাজিত কটিতটে. নর কর-নিকর কুণপ-শিশু শ্রবণে ॥
অধর সুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকশিত সুদশনে ॥
শ্রীমুখ মণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্ট হাস সঘনে ।।
সজল জলধর কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥

রামপ্রসাদের পর তাহার একতারা তুলিয়া লইয়া যাঁহারা সুর চড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দু চারিজনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে আমরা প্রয়াস পাইব। দেখা যায়, কাহারও কাহারও দু একটি ঝঙ্কার প্রায় তাঁহার কাছাকাছি পঁহুছিয়াছে।

এখানে আমরা শ্যামা-সঙ্গীতই শুনাইব।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের রচিত একটি গান—

পড়িয়ে ভব-সাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী ॥
একে মন-মাঝি আনাড়ি তাতে ছ জন গোঁয়ার দাঁড়ী
কু বাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল ছিঁড়ে গেল শ্রদ্ধার পাল
তরী হল বানচাল্ বল কি করি।
উপায় না দেখি আর অকিঞ্চন ভেবে সার
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গানামের ভেলা ধরি ॥

মহারাজ নন্দকুমারের রচিত বলিয়া সচরাচর খ্যাত, * কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের আর একটি গান—

ভুবন ভুলাইলি গো ভুবনমোহিনী।

মূলাধারে মহোৎপলে 'বীণা-বাদ্য-বিনোদিনী ॥
শরীরে শারীরী যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিনী।
আধারে ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃৎ প্রকাশিনী ॥
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে কর্ণাটিক আজ্ঞাপুরে
তাল মান লয় সুরে ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনী ॥
মহামায়া-মোহ পাশে বদ্ধ কর অনায়াসে
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমার কয় তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়
তব তত্ত্বগুণ ত্রয় কাঁকি মুখে আচ্ছাদিনী ॥

আমরা ইচ্ছা করিয়া একটি শক্ত গান তুলিয়াছি ; গানেও তান্ত্রিক সাধনার ব্যাখ্যা কেমন হইতে পারে এবং বঙ্গে তখন কোন ধর্ম্ম প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল, আভাঁস দিবার জন্য এটি উদ্ধৃত করিলাম। ইহার পাশে দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর একটি শ্যামা-গীত শুনাই, দেখিবেন ভাব কেমন উঠিতে পড়িতেছিল—

ওগো, জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।
যে তোমায় যেমনি ভাবে তাতেই তুমি হও মা রাজি ॥
মগে বলে ফরাতরা লার্ড বলে ফিরিঙ্গি যারা
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি
শাক্তে তোমায় বলে শক্তি শিব তুমি শৈবের উক্তি

* দেওয়ানজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামও নন্দকুমার ছিল, ভণিতায় "নন্দকুমার" আছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন এ গানটি ইঁহারই রচিত।

সৌর বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকাজী॥
গাণপত্য বলে গণেশ যক্ষ বলে তুমি ধনেশ
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে বাজি নয় এ জেনো ফলে
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি॥

কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদের আরও কাছাকাছি পঁহুছিয়াছেন আর একজন—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। কমলাকান্তের একটি গান—

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি দেখে হলাম সাহস-ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা সুখের সময় সবাই তারা
বিপদ কালে কেউ কোথা নাই ঘর বাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখ করুণা-নয়নে দেখ
নৈলে জপে তপে তোমায় পাওয়া সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা॥
কমলাকান্তের কথা মাকে বলি মনের ব্যথা
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর একটি—

জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু বাঁধে ধরা কভু বাঁধে চূড়া ময়ুরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী কখন শ্রীমতী কখন রামের জানকী হয়॥
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দানবচয়ে করে সভয়।
(কভু) ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়॥
যেরূপে যে জন করয়ে ভজন সেইরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে কমল মাঝে কমল উদয় হয়॥

কমলাকান্তের স্পষ্ট রামপ্রসাদী একটি—

তাই কালরূপ ভালবাসি।
কালী জগন্মনমোহিনী এলোকেশী।

মা'কে সবাই বলে কালো কালো, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥
বিষম বিষয়ানলে দহে তনু দিবানিশি।
যখন শ্যামা-রূপ অন্তরে জাগে, আনন্দ-সাগরে ভাসি॥
মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অসি।
মায়ের বদন-শশী মধুর হাসি সুধা ক্ষরে রাশি রাশি।
কমলাকান্তের মন নহে অন্য অভিলাষী॥

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শব্দ-যোজনা বিষয়ে কৃতীত্ব দেখাইবার জন্য একটি মল্লার শুনাই—

সমর আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায় দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস
অট্টহাসে দানব নাশে রণ প্রকাশে রঙ্গিনী।
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু ঘন তনু ঘেরে কুমুদ-বন্ধু
অমিয়া সিন্ধু হেরিয়া ইন্দু মলিন, এ কোন মোহিনী॥
একি অসম্ভব, ভব পরাভব পদতলে শব সদৃশ নীরব
কমলাকান্ত করে অনুভব হইবে জগত-জননী॥

নবদ্বীপাধিপতি "রাজেন্দ্র বাহাদুর" কৃষ্ণচন্দ্র ঘোর (তান্ত্রিক) শাক্ত ছিলেন। তাঁহার আমল হইতেই শ্যামা-সঙ্গীতের বিমল (?) নির্ঝর বেগে প্রবহমান, অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন। রাজা বাহাদুরের স্বরচিত এবং তাঁহার বংশধরগণের ও আত্মীয়বর্গের মধ্যে অনেকের রচিত মনোহর শ্যামা-বিষয়ক গীত অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে কুমার নরচন্দ্রের রচিত গান দু একটি আমরা শুনাইব; একটি—

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর (মা), লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর অধোগামী॥
যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি
তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র তন্ত্রসারের সার তুমি॥

আর একটি—

যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীনা না হলে কি নাথি মারে নাথের বুকে॥
দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ নাই তোমাতে
গলে পর মুণ্ড মালা পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা বলে যত ডাক শুনে ত মা শোন না ক
নরা এমনি নাথি-খেকো তবু দুর্গা বলে ডাকে॥

এই সকল ভক্ত সাধকের কাছে শ্যামা মা নিতান্ত আপনার জন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

নরচন্দ্রের আর একটি কাতর নালিশ—

যে ভাল করেছ কালি আর ভাল তে কাজ নাই।
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা. আলোয় আলোয় চলে যাই॥
মা তোমার করুণা যত বুঝিলাম অবিরত
জানিলাম শত শত কপাল ছাড়া পথ নাই।
জঠরে দিয়াছ স্থান করো না মা অপমান
কিসে হবে পরিত্রাণ নরচন্দ্র ভাবে তাই॥

নাটোরাধিপতি মহারাজা রামকৃষ্ণ, কুচবেহারাধিপতি মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ বাহাদুর প্রভৃতির রচিত সুন্দর সুন্দর শ্যামা-গীত আছে। শেষোক্ত মহারাজের এবং অন্যান্য কোন কোন রাজা মহারাজার রচিত বৈষ্ণব-গীতও পাওয়া যায়।. ইহা হইতে বুঝা যায়, এ হতভাগ্য দেশে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের মধ্যেও অনেকে—কি একালে, কি সেকালে—ভারতীর চরণ সেবায় বিলক্ষণ রত। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ প্রবাদটা সব সময়ে সত্য মনে হয় না।

সাধক-সঙ্গীত রচয়িতাগণের মধ্যে মুসলমান কবির নামও মিলে।

কৃষ্ণ-লীলা-ঘটিত গানে মুসলমান কবির উল্লেখ আমরা যথাস্থানে করিয়াছি। শক্তি-বিষয়ক গানেও জনকতক মুসলমান ভক্তি-ভরে হস্তক্ষেপ করিয়া হিন্দুভ্রাতার নিকট যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। মৃজা হুসেন আলি ও দরাব আলি খাঁ রচিত গীত পাওয়া গিয়াছে। একটি গান শুনাই—

যা রে শমন এবার ফিরি।
এস না মোর আঙ্গিনাতে, দোহাই লাগে ত্রিপুরারি॥
যদি কর জোরজবরি সাম্‌নে আছে জজ-কাছারি।
আইনের মত রশীদ দিব. জামিন দিব ত্রিপুরারি॥
আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি।
বলে মৃজা হুসেন আলি যা করে মা জয়কালী
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি॥

ইনি প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বেকার কবি। এই সময়ে দেশ কবির গানে, যাত্রার পালায়, পাঁচালীর ছড়ায় ভোরপুর। এই সকলের মধ্যেও এক একটি ভক্তিপূর্ণ শ্যামা-বিষয়ক গীত পাওয়া যায়, যথার্থই হৃদয়গ্রাহী।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাঁচালিকার রসিক চন্দ্র রায়ের একটী শক্তি-বিষয়ক গান কুরুচি-দুষ্ট প্যাঁচালী গানের সঙ্গে না গাঁথিয়া আমরা এই খানে উল্লেখ করিয়া সাধক-সঙ্গীতের কথা শেষ করি—

আয় মা সাধন-সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ করি পুণ্য মহারথে ভজন পূজন দুটি অশ্ব জুড়ি তাতে
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান নিয়ে ভক্তি ব্রহ্মবাণ
বসে আছি ধরে।
এ মা দেখবো আজি রণে শঙ্কা কি মরণে
ডঙ্কা মেরে নিব মুক্তি-ধন—

বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী;
দ্বিজ রসিকচন্দ্রে বলে মা তোমারই বলে
জিনিব তোমায় সমরে॥

আর একটি এই জাতীয় গান—কতদিনকার, কাহার রচিত, জানি না—বড় সুন্দর, এইখানে শুনাইয়া রাখি;—

হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
একবার হয়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥
নর-কর কটি বেড়া খুলে পর মা পীত ধরা
মাথায় দে মা মোহন চূড়া চরণে চরণ থুয়ে॥
ত্যজি নর-শির মালা পর গলে বনমালা
একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা, ওগো ও পাষাণের মেয়ে॥
হৃদ-কমলে কালশশী আমি দেখতে বড় ভালবাসি
একবার ত্যজে অসি ধর মা বাঁশী ভক্ত-বাঞ্ছা পুরাইয়ে॥

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি হইতে বাছিয়া তুলিয়া দুই চারিটির সৌন্দর্য্য প্রদর্শিত হইল; আরও অনেক ভক্ত-হৃদয়ের পূত নির্ম্মাল্য আছে, সকলের পরিচয় দিবার আমাদের স্থান ও অবকাশ নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে গানের যুগ বলা যাইতে পারে।

এইবার আমরা আর এক জাতীয় গানের পরিচয় দিব। বাঙ্গালী বহুকাল ধরিয়া মাণিকপীর, সত্যপীর, জারীগান, গাজীর গীত, হাবু গীত, নলে গীত, ঘেঁটু গান, সারি গান, তরজা গান প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান রচিত খাঁটি দেশীয় গীতগানে অনন্দানুভব করিয়া আসিতেছিলেন। মুসলমান রাজত্বের শেষাশেষি সময়ে বঙ্গবাসী বেয়াড়া সৌখীন হইয়া উঠিলেন, তখন কবি-গান আসব গ্রহণ করিল।

কবি-গানের সূত্রপাতের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ঘেঁটুগান ও সারিগানই অধিক প্রচলিত ছিল। বোধ হয় সারি গানই প্রথম উদ্ভাবিত হয়।

একটি ঘেঁটু গান—

কি হেরিলাম অপরূপ যাইতে জলে।
ভুবনমোহন কালোরূপ দাঁড়ায়েছে ঐ কদমতলে ॥
গলে মণিমুক্তা দোলে পদচিহ্ন বক্ষস্থলে
যমুনার দুইকূলে আলো কইরে—
মোহন চূড়া হেলেছে বামে রে, মন মোহিয়ে।
(দাঁড়ায়েছে ঐ কদম তলে।)

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর সময়কার একটি সারিগান এই—

আরে ও মাঝি বসে ভাবিস্ কি।
ধান দুর্ব্বা লয়ে হাতে দাঁড়ায়ে আছে ঝি।
ভাল দুধে চিনি দিয়ে রামসাগরের ধারে।
তারা দেবী রাণীর মেয়ে দাঁড়ায়ে পথের ধারে ॥
দশভূজা করে পূজা প্রসাদ লয়ে হাতে।
দশমীর আরতি দিতে দাঁড়ায়ে আছে পথে ॥

সারি-গান নদীবক্ষে নৌকা হইতে গীত হইত। এখনকার দিনে মাঝি মাল্লারাও থিয়েটার সঙ্গীত গায়, তখনকার কালে সারিগণের রেওয়াজ ছিল। আমরা এই শ্রেণীর আর একটি গান শুনাইব—

কেমনে বাঁচিবে তোর মা।
আরে ও নিমাই সন্ন্যাসেতে যেও না ॥
যখন জন্মিলে নিমাই নিমতরু তলে।
আমি বাছিয়া রাখিলাম নাম নিমাইচাঁদ তোমারে ॥
সন্ন্যাসী না হইও নিমাই বৈরাগী না হইও।
ওরে ঘরে বসে কৃষ্ণ নাম আমারে শুনাইও ॥
সোনার নদীয়া ছেড়ে যাবে গোরা রায়।
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার বল কি হবে উপায় ॥
কাঁচা সোনার বরণ অঙ্গে ছাই যে মাখিবে।
শচী মায়ের বুকে তাহা কেমনে সহিবে ॥

ভাটিয়াল স্বরে নিরাশ-হৃদয়ে এই অপূর্ব্ব ভক্তি-বাৎসল্যের গাথা শুনিতে শুনিতে তখনকার কালে লোকে মুগ্ধ হইত, এখন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরও নিধুর টপ্পা না হইলে মন উঠে না।

গ্রাম্য-গীতে "লালন সাই" স্বরও এক সময়ে নাম কিনিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর রচিত বাঙ্গালার ইতিহাস ছিল না; নিরক্ষর গ্রাম্য-কবির পল্লীগানে অনেক সময়ে সাময়িক ঐতিহাসিক তত্ত্বও মিলিয়া যায়। একটি গান—

কি হল রে জান—
পলাসীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক গুলি পড়ে রয়ে।
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে॥
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তি গায়।
হাঁটু গেড়ে মারে তীর মীরমদনের গায়॥
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী।
কলকেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি॥
দুধে ধোয়া কোম্পানীর উড়িল নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজীতে গেল নবাবের প্রাণ॥
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি।
চান্দোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি॥

কয় ছত্রের ভিতর এক রাশ ঐতিহাসিক তত্ত্ব, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, অপিচ কবিত্ব (?) একাধারে বিরাজমান।

তিতুমীরের গানও এই শ্রেণীর,—খানিকটা শুনাই—

নারিকেলবেড়ের তিতুমীর বুজরুগি করিল।
যত সব মিঞা মোল্লা বানায়ে বাঁশের কেল্লা
ফিরিঙ্গি বাদসার সনে লড়াই জুড়িল।
মরি হায় হায়, হায় মরি হায় রে হায়।

অবশ্য চাবাভূষার মুখেও

শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই
ওগো মরমেতে মরে রই—

কিম্বা,—দাঁড় বাহিতে বাহিতে দাঁড়ী-মাঝির কণ্ঠে—

যহন কল্লাম পেরেম বাঐ—শান বাঁধান ঘাটে।
আহাশের চন্দর যেন বাঐ—তুলে দিলে হাতে রে—
বাঐ রে॥

এ জাতীয় গানও যে শুনা যাইত না, এমন নহে।

পল্লী সাহিত্যে “রূপকথা” (উপকথা) আছে, তাহার ভিতর গানও থাকে; মধ্যে মধ্যে কোন কোন গান মনোহর। এই শ্রেণীর একটি—মধুমালার গান—পল্লীবাসিনী গ্রাম্যবধূগণের বড় প্রিয়; কয়েক ছত্র শুনাই—

বঁধু তোমায় করবো রাজা বসে তরুতলে।
চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে॥
বনফুলের মালা গেঁথে দেবো তোর গলে।
সিংহাসনে বসাইতে দিব এই হৃদয় পেতে
পিরিতি মরম মধু দিব তোরে খেতে—
বিচ্ছেদেরে বেন্ধে এনে ফেলবো পায়ের তলে।
মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুটবে কেওয়ার ডালে॥*

এইরূপ কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালার গান আছে—এক একটি মনোরম। এই গ্রাম্য পল্লীগীতির ভিতর স্ত্রীলোক-রচিত গানেরও অসদ্ভাব নাই। আমরা “কবেল কামিনী”র গানের একটু অংশ শুনাই—

* পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১২ প্রথম সংখ্যায় এই গানটি বাহির হইয়াছে। আমরা জানি না বর্ত্তমান কবি-চূড়ামণি তাঁহার এই ভাবের গানটি কোথাও হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন কি না। তাঁহার আপন রচনা হইলে ভাষার মিল বিস্ময়জনক।

হাত ঝুমঝুম পায়ে পাইজোর কোমর দুলে যায়।
যৌবন জোয়ার ছুটলে পরে কূল ছাপিয়ে ধায়॥
পাতার আড়ে ফড়িং ওড়ে দেখ্‌তে চমৎকার।
বাসি ফুলের মধু খেতে ভোমরা ঝনৎকার॥

এই নীচজাতীয়া রমণীর রচিত অনেক গান ও ছড়া পাওয়া যায়।

এ সকল গান অবশ্য নিরক্ষর কবি-রচিত গ্রাম্য-গীতির মধ্যেই স্থান পাইবে। কত কৃষাণ-কবি—পল্লী-কবির মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়োচ্ছ্বাস পল্লী-বাতাসেই লয় হইয়া যায়।

মুসলমান নবাবগণের আমলে "তর্জ্জা" গীতের বড় কদর ছিল। তর্জ্জা শব্দটা পারসী—ইহা সঙ্গীতসংগ্রাম বিশেষ। একদল গানে প্রশ্ন করে, অপর একদল গান গাহিয়া তাহার উত্তর দেয়; যে দল ভাল উত্তর দিতে পারে, তাহারই জয় হয়। কালক্রমে তর্জ্জা গানের অবনতি ঘটিয়াছে নিশ্চয়। এখন অসভ্য ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণই প্রায়শঃ এই গীতগানে মাতিয়া থাকে। এখনকার তর্জ্জা অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ; তবে গান-বাঁধুনী হইতে উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কি মজা বাধ্‌লো রে ভাই এইখানে।
কিছুতে নাই ছাড়াছাড়ি মজা উড়্‌চে দুজনে।

অধিকাংশ গানই এই ধাতুর—আমরা নমুনা তুলিব না।*

তর্জ্জা বহুদিনকার প্রাচীন সামগ্রী। চৈতন্য মহাপ্রভুকে নীলাচলে অদ্বৈত আচার্য্য এক "তর্জ্জা" পাঠাইয়াছিলেন, আমরা বৈষ্ণব কাব্য-শাখায় শুনাইয়াছি; সেটুকু অবশ্য সঙ্গীত-লড়াইয়ের অংশ বলিয়া মনে হয় না।

* মুরশীদাবাদের বিখ্যাত তর্জ্জাদার হোসেন খাঁর সহিত কবিওয়ালা ভোলা ময়রার লড়াই হইত, ভোলা উর্দ্দু ফারসীতে গান বাঁধিয়া লড়িত। ইদানীন্তন তর্জ্জাওয়ালার মধ্যে স্বরূপ হাজরা, জগৎমিত্র, নয়ন রায় এবং শ্রীনিবাস নাম কিনিয়াছিলেন।

শস্ত্র-সংগ্রামে পশ্চাতপদ হইলেও বঙ্গবাসী কণ্ঠ-সংগ্রামে কোন কালেই হীন নহে।

তরজার অনুকরণে হওক বা না হউক, দেড় শত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ভদ্রলোকের মজলিসে একজাতীয় গীত মাথা তুলিতেছিল। এই সময়ে আমাদের দেশে—বিশেষতঃ কলিকাতার, ধনীসম্প্রদায়ের ভবনে কবি-গাহনা প্রচলিত হয়। প্রথমটা ওস্তাদী আখড়াই গাহনা রূপে ছিল, ক্রমে কবি-গীতি-রচয়িতাগণ দুইটি দল সাজাইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন এবং সদ্য-প্রস্তুত গীত দ্বারা পরস্পর প্রশ্নোত্তর প্রদান পূর্ব্বক রসভাবজ্ঞ সামাজিকগণের মনোরঞ্জন করিয়া সঙ্গীত-সমরে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া যশঃ লাভ করিতেন।

এই সকল কবিগণের অনুপম রসভাব, সুললিত শব্দবিন্যাস-চাতুরী এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বাস্তবিক অনেক স্থলেই প্রশংসার্হ।

বাদ্যের কেরামতিও কবিগাহনার অঙ্গ ছিল; সঙ্গৎ না হইলে কবি-গাহনা চলিত না। প্রথমে ছিল ঢোল আর কাঁশী; * এখন আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়—ঢোল কাঁশীর সঙ্গতে উচ্চ অঙ্গের গাহনা কিরূপে সকলের মনোরঞ্জন করিত! প্রথম প্রথম মাদলের তালও না কি পড়িত। কিন্তু উন্নতি হইতেছিল; আখড়াই গাহনার "সাজবাদ্য" প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁশী গেল, ঢোলের সঙ্গে তানপুরা, বেহালা, মন্দিরা, মোচঙ্গ, খরতাল, সিটি প্রভৃতি দেখা দিল; ক্রমে জলতরঙ্গ, সপ্তস্বরা, বীণা, বেণু, সেতারা প্রভৃতি যোগ দিয়াছিল। চুঁচুড়ার দলে না কি হাঁড়ী কলসীও বাজিত!

অনেকের মতে কবির গানও বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি-কল্পে সাহায্য করিয়াছে।

---

* তখন ঢুলিরও আদর ছিল; কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা হরু ঠাকুর একদিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন—"যদি আমি গান ধরি আর খীমে ঢুলী ঢোল বাজায়, তাহা হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ মাৎ করিয়া ফেলিতে পারি"।

কবি-সঙ্গীতের মাদকতা প্রধানতঃ বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সহরেই প্রবল ছিল; ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে আখড়াই গাহনার নাম বাজিয়া উঠে। কবির দল সঙ্গীত-সংগ্রাম জন্য বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত!

প্রবাদ আছে, স্বনামধন্য বঙ্গাধিপ সীতারাম রায়ের আমলেও কবি-গান প্রচলিত ছিল; কিন্তু অদ্যাবধি সে সময়কার কোন 'কবি'র নাম অথবা কবি-গানের নমুনা—কিছুই পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সার্দ্ধ শতাধিক কিম্বা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরের ভদ্রসন্তান-গণই আখড়াই গানের প্রথম সূত্রপাত করেন। শান্তিপুরের দেখাদেখি চুঁচুড়ায় এবং পরে কলিকাতায় আখড়াই সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত হয়। বহু রসজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন—মফস্বলের এই গাহনা আর কলিকাতার আখড়াইয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল।

ভারতচন্দ্রের পরেই হুগলী জেলায় একজন গীত-রচয়িতার আবির্ভাব হয়, তিনি ঠিক কবিওয়ালা নহেন কিন্তু অনেক কবিওয়ালার গুরু। তাঁহার রচিত প্রণয়সঙ্গীত বঙ্গীয় গীতি-সাহিত্যে বিলক্ষণ উচ্চ স্থান অধিকার করে। আমরা প্রথিতনামা নিধু বাবুর কথা বলিতেছি। ইঁহার গীতিমালা "নিধুর টপ্পা" নামে পরিচিত। প্রণয়-গানকে গীতি-ভাষায় টপ্পা বলে। নিধু বাবু "বঙ্গের সরিমিঞা" আখ্যা পাইয়াছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম—রামনিধি গুপ্ত। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম—প্রায় ১৭০ বৎসর হইল। নিধুর টপ্পা আদিরস-ঘটিত প্রেমগীতি—অথচ তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গ নাই। কবির—

যেও যেও প্রাণনাথ প্রেম-নিমন্ত্রণ।
নয়নজলে স্নান করাব কেশেতে মুছাব চরণ॥

কিম্বা—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে। ✓
আমি এই মাত্র চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থাক, এ দেহে সকলই সবে॥

গান গুলি প্রাচীন চণ্ডিদাসকে মনে পড়াইয়া দেয়।

নিধু বাবুর গানে রচনার কারিগরি তেমন নাই, ভাবের মাধুরী আছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও আছে সুর-লয়-তালের বৈচিত্র্য বাহাদুরী। সুর ও বাদ্য গীতের বেশভূষা; গানের প্রধান সৌন্দর্য্য সুরে, প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা বুঝাইবার উপায় নাই; আমরা ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্যই দেখাইতে পারি। দুই চারিটি গান উঠাই—

একটী উপমা—

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে গরবে কে তব তুলনা হবে
আপনি আপন সম্ভবে যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥

চারি শত বৎসর পরে আবার পিরিতির ব্যাখ্যা—

পিরীতি পরম সুখ সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে॥
থাকিতে বাসনা যার চন্দন বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই করে কি কখনে?

একটি দীর্ঘশ্বাস—

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, তা কভু মনে ছিল না।
এ চিত নিশ্চিত ছিল, এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না॥
ভেবেছিলাম নিরন্তর হয়ে রব একান্তর
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না॥

এখন হলো অন্তর পিরিতি হলো অন্তর
আঁখি ঝরে নিরন্তর, প্রাণান্তর তাঁয় হলো না।

একটি হৃদয়োচ্ছ্বাস—

তারে ভুলিব কেমনে ?
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে॥
আর কি সে রূপ ভুলি প্রেম-তুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে, ভুল তারে
সে দিনে ভুলিবে তারে যে দিনে লবে শমনে॥

একটি রোগের ঔষধ—

নয়ন নীরে কি নিভে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে অন্য বারি নাহি হেরে
ধারা জল বিনে তার সকলই বিফল।
যবে তারে হেরি সখি হরিসে বরিষে আঁখি
সেই নীরে নিভে জানি অনল প্রবল॥

প্রেমিকের এক নূতন আশ্বাস—

তবে প্রেমে কি সুখ হতো,
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে কেতকী কণ্টক হীনে
ফুল ফুটিত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত ?
প্রেম-সাগরের জল তবে হইত শীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত।*

* এ গানটি কাহারও কাহারও মতে শ্রীধর কথকের রচিত। এইরূপ আরও [illegible] মধুর প্রণয়-গীত আছে, কেহ বলেন নিধু বাবুর কেহ বলেন শ্রীধর [illegible]কের রচনা; উভয়েই সুকবি।

প্রেমের তন্ময়ত্ব—

দুঃখ দিবে বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ জ্ঞান করি যতনে তায় তুষিব॥
না থাকে তাহার মন করিবে না আলাপন
তবু সে বিধু-বদন দূরে থেকে দেখিব॥

প্রেম-স্নিগ্ধ এ সকল গানের মাধুর্য্য শুধু পাঠে উপলব্ধি করা যায় না, সঙ্গীতজ্ঞগণ পাঠকের অপেক্ষা উপভোগ করিবেন অধিক।

প্রেমিক-কবি প্রণয়-গানই গাহিয়াছেন আগাগোড়া, মধ্যে মধ্যে এক আধটী অন্য ধাতুর গান বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমরা একটী নমুনা দেখাইব—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী কবির মাতৃ-ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা কেমন! শুনিলেও প্রাণ জুড়ায়।

নিধু বাবুর পর রাম বসুর নাম আসিয়া পড়ে। রাম বসুর বিরহ গান প্রসিদ্ধ। রাম বসু কবিওয়ালা ছিলেন। রাম বসুর পূর্ব্বে 'কবি' গণের আখড়াই গাহনাই ছিল; কবির লড়াই—অর্থাৎ আসরে বসিয়া গাহনায় উত্তর প্রত্যুত্তর দিবার প্রথা ইনিই প্রবর্ত্তিত করেন। রাম বসুর এক একটী গান বাস্তবিকই চিত্তমুগ্ধকর। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত"।

আমরা কবির একটি আগমনী গান হইতে কিয়দংশ শুনাই—

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
যে দুর্গা নামেতে দুর্গতি খণ্ডে, সে দুর্গার দুর্গতি একি প্রাণে সয়॥
তুমি যে কয়েছ আমার গিরিরাজ, কত দিন কত কথা।
সে কথা আছে শেল সম, মম হৃদয়ে গাঁথা॥
আমার লম্বোদর না কি উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোনার কার্ত্তিক, ধূলায় পড়ে লুটাতো॥

আর এক স্থল —

যদি কেহ বলে, ওগো উমার মা, উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধাইয়া যাই, আনন্দে হয়ে বিভোর॥

প্রাণের কথা কবি বাণীর মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন—

আছে কন্যা যার, সেই শুধু জানে, অন্যে কি জানিবে তার?

কিন্তু যে জন্য রাম বসুর নাম, এখন সেই গান আমরা একটি দেখাই :—
বাঙ্গালা ভাষায় অতীব হৃদয়গ্রাহী একটি গীত—
কুলবধূর মর্ম্মকাতরতা—ব্রীড়া-সঙ্কুচিত মাধুরী—

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে;
নির্লজ্জ রমণী বলে হাসিত লোকে;
সখি, ধিক ধিক আমারে ধিক সে বিধাতারে,
নারী-জনম আর যেন করে না।
একে আমার এ যৌবন কাল তাহে কাল বসন্ত এল
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল,
হাসি হাসি যখন সে "আসি" বলে
সে "আসি" শুনিয়া ভাসি নয়ন-জলে;

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে মন চায় ফিরাইতে
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁয়ো না॥
তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম সজনি,
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি॥

মর্ম্মাহতার কবিত্ব-মাখা, কারুণ্য-মাখা একটি শ্লেষ—

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই চোকের দেখা দেখতে চাই
কিছু কাল থাক থাক—বোলে ধরে রাখবো না।
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যেতে ভাল থাক সেই ভাল
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল ;
তোমার পরের প্রতি নির্ভর আমি ত ভাবিনে পর
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।
দৈব যোগে যদি প্রাণনাথ হলো এ পথে আগমন,
কও কথা একবার কও কথা, তোল ও বিধুবদন, ;
পিরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তার লজ্জা কি,
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি :
আমার কপালে নাই সুখ বিধাতা হলো বিমুখ
আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক পেলেম না॥

প্রেমের দুয়ারে আত্মবিসর্জ্জন আর কাহাকে বলে ?

আমরা সখী-সম্বাদের একটি গান শুনাইব ; এ সকল গানের যোড়া মেলা কঠিন।

(এ গানটি কেহ কেহ হরু ঠাকুরের রচিত বলিয়া অনুমান করেন।)

জলে জলে কি গো সখি।
অপরূপ রূপ দেখি, দেখো সই নিরখি॥
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়,

মায়া করে ছায়ারূপে সে কালা এসেছে কি ?
আচম্বিতে আলো কেন যমুনারই জল,
দেখো সখী কূলে থাকি কে করে কি ছল ;
তীরের ছায়া নীরে লেগে হলো বা এমন—
ঝকিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটি আঁখি।
নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে
ওগো জলিতে,
না দেখি এমন রূপ বারি মাঝেতে !
আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম হায়,
নীরের মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায় ;
ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে—বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী।
বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই ত নই, ওগো প্রাণসই,
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই ;
কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে,
শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে ?
আবার ভাবি—সে যে শশী কুমুদ-বান্ধব—
হৃদয়-কমল কেন তা দেখে হবে সুখী ?

স্থির জলে প্রতিবিম্ব পড়ে, দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতেছে ; জল নাড়া পাইলেই ছায়া-ছবি মিলাইয়া যাইবে—আবার বিরহ ! এই ছায়া-মিলন-টুকুর সাথে বাদ সাধিলে পাতক হয় বই কি।

আমরা রাম বসুর আর একটি গান শুনাই, পাঠকের বৈষ্ণব কবি-কুলকে—বিশেষতঃ জয়দেব বিদ্যাপতিকে মনে পড়িবে ;—

হয় নই হে আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি ?
করো না আমার দুর্গতি।

বিচ্ছেদে লাবণ্য, হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি।
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার,
হর-ভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ বার বার ?
ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো, চেন না পুরুষো প্রকৃতি।
হায়, শুন শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি, বৈরী হয়োনা আমার,
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত-কেশা, নহে এ ত জটাভার;
বয়সে নবীনা, প্রাণপতি বিনা, যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি।
কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীল রতন,
অরুণো হল নয়ন, করে পতি-বিরহে রোদন,
এ অঙ্গ আমারো, ধূলায় ধূসরো, মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি।

বসুজ কবির কালাচাঁদের কালোর ব্যাখ্যা শুনাইয়া আমরা অন্যত্র যাই—

ওহে এ কালো উজলো বরণো, তুমি কোথা পেলে ?
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে।
যে বলে সে বলে বলুক কালো,
আমার নয়নে লেগেছে ভালো,
বামা হলে শ্যামা বলিতাম তোমায়, পুজিতাম জবা বিল্বদলে।
আরো ত আছে হে অনেক কালো,
এ কালো নহে তেমন, জগতের মনোরঞ্জন;
না মেনে গোকুলে কুলেরো বাধা
সাধে কি শরণ লয়েছে রাধা—
জনমের মত ও কাঁলো চরণে বিকায়েছি যে বিনি মূলে।
ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিতো
আমার এই ত জ্ঞান ছিলো,
সে কালোর কালোত্ব গেলো হে কৃষ্ণ তোমারে হেরে কালো;
এখনো বুঝিলাম কালোরো বাড়া সুন্দর নাহিকো আর,
কালো রূপ জগতের সার;

ত্রিলোকে এমনো আর নাহিক হেরি,
ও রূপে তুলনা কি দিব হরি,
কালো রূপে আলো করে হে সদা, মোহিত হয়েছে সকলে।
একো কালো জানি কোকিলো, আরো ভ্রমরার কালো বরণ,
আর কালো আছে জল কালিন্দীর, কালো ত তমাল বন;
আরো কালো দেখো নবীন নীরদ, ছিলো হে দৃষ্টান্ত স্থল,
কালো ও নীলকমল;
সে কালোর কালোত্ব দেখেছে সবে,
প্রেমোদ্দ, অশ্রু হয় কারে বা ভেবে?
তোমারো মতো চিক্কণো কালো না দেখি ভুবন-মণ্ডলে।

গুজব এইরূপ,—রাম বসুর গান শুনিয়া জনৈক সমজ্‌দার ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "আমার যদি টাকা থাকতো, বসুজাকে লাখ টাকা দিতাম"।

রাম বসুর গানে মধ্যে মধ্যে এক আধটি উপমা পাওয়া যায়—তুলনা-রহিত। একটি—

ও তার নামটি মদন, গঠন কেমন, দেখতে পাইনা চোখে।
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যেমন, বাণ মারে কোথা থেকে। *

আর একটি—

এ ত ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে।
গুণ গুণ স্বরে কেন অলি শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে।

এই সকল দেখিলে বুঝা যায় রাম বসু এত যশস্বী হইয়াছেন কেন।

---

* নাম প্রেম তার, সাকার নহে, ' বস্তুটি সে নিরাকার।
জীবন যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ বশীভূত তার।
(হরঠাকুর।)

অনঙ্গ মত্ত মাতঙ্গ মনোবন ভঙ্গ করে।
বিধির অসাধ্য সে, কার সাধ্য বাধে তারে।
(শ্রীধর কথক।)

অনেকের মতে কবিওয়ালাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা হরু ঠাকুর। ইনি "কবির গুরু হরু ঠাকুর" নাম পাইয়াছেন। ইহাঁর পুরা নাম হরেকৃষ্ণ দীঘাড়ী (দীর্ঘাঙ্গী)। কবি প্রায় ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন, ইনি রাম বসুর পূর্ব্ববর্ত্তী। হরু ঠাকুর প্রথমতঃ একটি সখের দল করিয়া মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে গাহনা করিতেন। শুনা যায়, একদিন গাহনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজা তাঁহাকে এক জোড়া মূল্যবান শাল পারিতোষিক দেন, তেজস্বী কবি সেটি ঢুলীর গায়ে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তত্রাচ কবি মহারাজার বিশেষ অনুগ্রহ-পাত্র ছিলেন। রাজকোষ হইতে তাঁহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। মহারাজারই পরামর্শ অনুসারে ইনি পরে বৈতনিক দল করিয়া লোকরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে, নবকৃষ্ণ বাহাদুরের উপর ইঁহার এতদূর প্রীতিভাব ছিল যে তাঁহার লোকান্তর গমনে একান্ত ব্যথিত হইয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি চিরকালের জন্য গাহনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হরু ঠাকুরের গুটিকতক গান শুনাই। হরু ঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাসের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন;—সেই দলের একটি গান—

(তখনকার প্রথা অনুসারে ভণিতায় দলপতির নামই প্রচলিত।)

কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়।
এত দিনো আসি যমুনা-জলে
আমি এমন মোহন মূরতি কখনো দেখিনি এসে হেথায়॥
অঙ্গ অগৌর চন্দন চর্চ্চিত, বনমালা গলায়।
(আ মরি এ রূপ ধরে না ধরায়।)
গুঞ্জ বকুলের মাজে বাঁধিয়াছে চূড়া, ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥
সই, সজল নব জলদ বরণ, ধরি নটবর বেশ,
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ, এই কি রসিক-শেষ?
চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ-নখরের ছটায়।
(অনঙ্গ এ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।)

আমার হেন মনে লয়, মন, জীবন, যৌবন সঁপিব ও রাঙ্গা পায়॥

হায়, অনুপম রূপ মাধুরী সখি, হেরিলাম কি ক্ষণে,

প্রাণ নিল হরে ঈষৎ হেসে বঙ্কিম নয়নে ;

মন্দ মধুর মুচকি হাসি চপলা চমকায়।

কুলবতীর কুলশীলো গেলো গেলো, মন মজিল হেরে উহায়॥

সই, অলকা আবৃত বদন, তাহে মৃগমদ তিলক,

মনোহর সাজ, নাশাগ্রেতে গজমুকুতার ঝলক,

বিম্ব অধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়।

কিবে সুন্দর সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, রূপে ভুবন ভুলায়॥

সই, বেষ্টিত ব্রজবালক সবে, কি শোভা আ-মরি হায়।

গগনেতে তারাগণ মাঝে চাঁদ যেন শোভা পায়॥

সই, কেন বা আপনা খেয়ে, আইলাম যমুনায়।

হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি, রঘু কহে একি দায়॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা বঙ্গভাষায় যেখানে যাহা আছে, এ চিত্রখানি বোধ হয় কাহারও কাছে হটিবার নহে। এরূপ পদলালিত্য, ভাবময় মনোহর রচনা দেখিলে কে অস্বীকার করিতে পারে যে কবিওয়ালাদের গানে বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্টি ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়াছে ?

বহির্জগৎ বর্ণনায় নৈপুণ্য দেখিলেন, অন্তর্জগৎ বর্ণনায় কবির ক্ষমতা আর একটি গানে দেখাই ;—মাথুর—

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, ব্রজকুলনারী বধিলে।

বল না কি বাদ সাধিলে ?

নবীন পিরীত, না হইতে নাথ অঙ্কুরে আঘাত করিলে॥

একি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত, কে আনিল রথ গোকুলে।

(রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে।)

[illegible]তে, তুমি কেন রথে, বুঝি মথুরাতে চলিলে॥

(রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ, কি দোষ রাধার পাইলে ?)

শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী,
নাহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব, তোমারি প্রেমের প্রয়াসী ;
শ্যাম, নিশি ভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী, তথা আসি গোপী সকলে।
(দিয়ে বিসর্জ্জন কুলশীলে)
কিসে হলাম দোষী, তা তোমায় জিজ্ঞাসি, কি দোষে এ দাসী ত্যজিলে।
যদি চলিলে মুরারি, ত্যজে ব্রজপুরী, ব্রজনারী কোথা রেখে যাও,
জীবন উপায় বলে দাও।
হে মধুসূদন, করি নিবেদন, বদন তুলিয়ে কথা কও।
শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি, থাক হরি যথা সুখ পাও,
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে, ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ;
জনমের মত, শ্রীচরণ দুটি, হেরি হে নয়নে শ্রীহরি।
(আর হেরিব আশা না করি।)
হৃদয়ের ধন তুমি গোপীকার, হৃদে বজ্র হানি চলিলে।

হরু ঠাকুরের গান কেন লোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে, তাহার কারণ বোধ হয় পাঠকবর্গ বুঝিয়াছেন। হরেকৃষ্ণের আর একটি গান শুনাইব—

ওগো চিনেছি চিনেছি চরণ দেখে অই বটে সেই কালিয়ে।
চরণে চাঁদ ছাঁদ আছে দীপ্ত হয়ে ॥
যে চরণ ভজে ব্রজেতে আমায় ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে।
ভুবন মোহন না দেখি এমনো অই বই,
রূপ কি অপরূপ, রসকূপ, আ-মরি সই ;
কুলে শীলে কালি দিয়েছি আমি, কাল-রূপ নয়নে হেরিয়ে ॥

হরুঠাকুর একজন ভক্ত সাধক কবি ছিলেন—

হরিনাম লইতে অলস হয়ো না রসনা, যা হবার তাই হবে।
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে ॥

এইরূপ পারমার্থিক ভাবপূর্ণ রচনাও তাঁহার গানে দুষ্প্রাপ্য নহে।

কলকণ্ঠ কবি শ্রুতিসুখকর রচনায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কতক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আর একটি গানের একটু অংশ তুলিয়া দেখাই, দেখিবেন ভাষা যেন তাঁহার দাসী—

সুধীর ধীর বহিছে এই ঘোরতরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণসখি রে কোথায় গুণমণি।
ঘন গরজে ঘন শুনি—
ঐ ময়ুর ময়ুরী হরষিত. হেরি চাতক চাতকিনী;
এ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি সেঁউতি সেফালিকে
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জনমায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে,
বিদ্যুত খদ্যোত দিবা জ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি,
প্রিয়-মুখে মুখ দিয়ে শারী শুক থাকে দিবস রজনী।

ভাষার এই ঝঙ্কার, ইহার উপর সুরের ঝঙ্কারে কি অমৃতবর্ষণ হয়, অ-রসজ্ঞেরও বুঝিতে বাকি থাকে না। কবিওয়ালাদিগের ভিতর হরুঠাকুরের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন।

কিন্তু এ হেন কবিকেও প্রতিপক্ষ দলের নিকট হইতে নীচ ভাষায় গালি খাইতে হইয়াছে। আমরা একটি "উতোর" গান শুনাই; ভোলা ময়রার দলে গানে হরুঠাকুরের সুখ্যাতি হইয়াছিল,—বোধ হয় ঠাকুর হরি বলা হইয়াছিল—তাই হিংসা—

সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর, তুই পাষণ্ড নচ্ছার।
ভজিস্ ঢেঁকি, বলিস্ কি না গোর অবতার॥
কিসে করিস্ দ্বেষ নাই ঘটে বুদ্ধি-লেশ?
বুঝিস্ না পশু, ও মূর্খ, দিস্ কোন ঠাকুরের ঠেস্?
তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে, মিছে করিস্ পূজা ভুর,
সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর?
যিনি বাম করেতে গিরি ধরে রক্ষা কল্লেন ব্রজপুর,
যাঁর অভয় চরণ শিরে ধরে জীব তরাচ্ছেন গয়াসুর,

যে রজক ছেদন করে করো ধ্বংস কল্লে কংসাসুর,
সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর?

শুনা যায়, প্রতিপক্ষ দল গতিক দেখিয়া উত্তর দেন নাই; কিন্তু এই ঈর্ষ্যাপরায়ণ বাঁধনদার (গীত-রচয়িতা) তাহাতেও ক্ষান্ত হয় নাই; ইহার পরও পালটা উত্তরে তীব্র বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিল—

এখন বুঝ্‌লি ত এই হরু নয় সেই হরি সারাৎসার।
পূর্ণব্রহ্ম সেই হরি, ইনি প্রকাণ্ড অসার॥
শুন রে বলি মূঢ় এঁর খুঁজে পাই না কুঁড়,
তোর ঠাকুরকে বল্‌তে বল্ ভেঙ্গে এর নিগূঢ়;
হরির সকল ভক্তে সমান দয়া
এঁর সে বিষয়ে অনেক খাম,
বুঝ্‌ব রহিম কি ইনিই রাম।
ইনি তোমার বেলা সিন্নির গোঁসাই
আমার প্রতি কেন বাম।
ইনি হিন্দুর দেবতা স্থির কি মুসলমানের পীর,
তাই বল দেখি জিগির—
পূজা পঞ্চ উপচারে খান কি এক পিঁড়িতে পাঁচ মোকাম।
হরু দৈবকীর নন্দন কি ফতমা বিবির হন এনাম॥

গানটি নীলু ঠাকুরের দলে গীত হয়; জনরব, রাম বসুর রচিত। সম্ভব বোধ হয় না। রাম বসুও এক জন প্রকৃত কবি, অবশ্যই গুণগ্রাহী ও রসজ্ঞ ভাবুক ছিলেন; তিনি যে তাঁহার গুরুস্থানীয় হরু ঠাকুরকে এমন ইতর ভাষায় গালি দিবেন, সম্ভব মনে হয় না। এতদ্ব্যতীত, হরু ঠাকুরের জন্মসাল ১৭৩৮ খৃঃ, রাম বসুর জন্ম ১৭৮৮ খৃঃ; উভয়ের বয়সে পঞ্চাশ বৎসর ফারাক্। যদিও হরু ঠাকুর ৭০ বৎসর বয়স পাইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি শেষাশেষি কয়েক বৎসর তিনি গাহনা-সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; হরু ঠাকুরের

মৃত্যু-কালে রাম বসুর বয়স ছিল বিশ বৎসর মাত্র। সে বয়সে—হরু ঠাকুরের জীবদ্দশায় এই প্রহার ধরিলে আরও অল্প বয়সে—রাম বসু যে অত বড় একজন প্রবীণ কবিকে এমন সব দুর্ব্বাক্য বলিবেন, মন ত মানিতে চায় না। অথবা ইহা কি মৃত রথীর উপর খড়্গাঘাত? গানের একটি চরণ "তোমার বেলা (সিন্নির) সিদ্ধির গোঁসাই আমার প্রতি কেন বাম" প্রকাশ করিয়া দিতেছে, ইহা হরু ঠাকুরের সমকালিক আশাভঙ্গ কোন দুর্জ্জনের রচনা। যশস্বী কবি রাম বসুর নাম খামকা জড়িত বলিয়া আমরা অপ্রাসঙ্গিক কথায় খানিকটা সময় নষ্ট করিলাম।

কেহ কেহ বলেন, কবি-গীতির সৃষ্টিকর্ত্তা রাসু-নৃসিংহ, লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস (মুচি) ও গোঁজলা গুই। কাহারও কাহারও মতে রঘু, মতে ও নন্দ। রঘুর নাম পরে পাওয়া যায়; গোঁজলা গুই রচিত গানও আমরা পরে শুনাইব, কিন্তু এই মতে বা মতিলাল ও নন্দলাল সম্বন্ধে কোন খবরই এখন আর মিলে না।

কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনেই প্রকৃত ওস্তাদী কবি-গাহনার প্রথম আবির্ভাব। মহারাজা অতিশয় সঙ্গীত-গুণগ্রাহী ও বিলক্ষণ উদারচেতা ছিলেন; কবি-গান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অনেকে বলিয়া গিয়াছেন, একমাত্র তাঁহার উৎসাহে তৎকালে কবি-গানের প্রচুর সমাদর হইয়াছিল। মহারাজার নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্যবংশীয় গুণী থাকিতেন, তিনি আখড়াই গাহনা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই সেনজা মহাশয় টপ্পাবাজ নিধু বাবুর নিকট-আত্মীয়।

মহারাজা নব কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর আখড়াই আমোদে আমোদী হন। তখন শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর ও নসীরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েক জন গায়ক সর্ব্বদাই আখড়াই সঙ্গীতের গাহনা করিত।

এই সময়ে নিত্যানন্দ বৈরাগী (নিতাই দাস), ভবানী চরণ বণিক (ভবানী বেণে), ভীমদাস মালাকার (ভীমে মালী) প্রভৃতি কতিপয় কবি-গান-গায়কেরা হরু ঠাকুরের প্রতিপক্ষে দল করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ আসরে বসিয়া এক দলের কৃত প্রশ্নে অন্য দলের উত্তর (ধর্‌তা) দিবার পদ্ধতি ছিল না। প্রতিপক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্ব হইতে উত্তর প্রস্তুত থাকিত ; গাহনায় যে দল শ্রোতৃবর্গের অধিক মনোরঞ্জন করিতে পারিত, সেই দলই জয়ী হইত। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি আসরে বসিয়া সদ্য সদ্য প্রশ্ন-উত্তর রচনা করতঃ গাহনার প্রথা রাম বসু প্রবর্ত্তিত করেন।

মহারাজা নব কৃষ্ণ বাহাদুরের বিয়োগে হরু ঠাকুর কবির আসর একেবারে পরিত্যাগ করিলে, তাঁহারই আদেশানুসারে ও উপদেশ-ক্রমে তাঁহার শিষ্য নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও ভোলা ময়রা কবির দল গঠিত করেন।

ইহার পরেই মোহন সরকার, লক্ষী নারায়ণ যোগী, নীলমনি পাটুনী, রামসুন্দর স্বর্ণকার, আণ্টনী সাহেব, গুরো দুম্বো, সৃষ্টিধর ছুতার, প্রভৃতি অনেকে কবিওয়ালার দল গঠন করিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বলরাম বৈষ্ণব (বলাই সরকার), চিন্তামণি ময়রা, গোর কবিরাজ, হরিবোলা দাস, নবাই পণ্ডিত, গোরক্ষনাথ ও ঠাকুরদাস সিংহের উল্লেখ এই সঙ্গে করিতে হয়। রঘুনাথ তন্তুবায় ও কৃষ্ণকান্ত চামারের নামও শুনা যায়। ইহারা কেহ বা দলকর্ত্তা কেহ বা গীত-রচয়িতা (বাঁধনদার)।

পূর্ব্ববঙ্গের কবিওয়ালা রামরূপ ঠাকুরও একজন উৎকৃষ্ট বাঁধনদার ছিলেন। শেষাশেষি সময়ে ঢাকা জেলার মহেশ চক্রবর্ত্তী ও হুগলী জেলার সীতানাথ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বাঞ্চলে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই সকল দলের ওস্তাদগণ অন্তর্দ্ধান করিলে পর আখড়াই গান ও ওস্তাদী কবির গৌরব ক্রমশ হ্রাস হইতে লাগিল।

কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী মোহন চাঁদ বসু সাবেক পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া প্রথমতঃ সখের দাঁড়া-কবি ও পরে হাফ-আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন। মোহনচাঁদী সুর মনোমুগ্ধকর; গুণগ্রাহীগণ বলেন 'মধুময়'। যোড়াসাঁকো নিবাসী সঙ্গীতরসজ্ঞ রামলোচন বসাক বসুজের প্রতিপক্ষে (হাফ-আখড়াই) দল করেন। গদাধর মুখোপাধ্যায় ও রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় এই দলের গান বাঁধিয়া দিতেন। কি হাফ-আখড়াই কি সখের দাঁড়া-কবি সকলই এই সময় হইতে মোহনচাঁদী সুরে গীত হইত। পূর্ব্বেকার আখ্‌ড়াই (ফুল্‌) ভাঙ্গিয়া হাফ্‌-আখ্‌ড়াই দল গঠিত হয়। কথিত আছে, কলাবিদ্‌ নিধুবাবু এই ভাঙ্গা আখ্‌ডাইয়ের সংবাদ পাইয়া কুপিত হইয়াছিলেন, পরে স্বয়ং গাহনা শুনিয়া পরিতুষ্ট হন।

কবির দলের দলপতি বা গীত-রচয়িতা (বাঁধনদার) যাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, দেখা যায়, তন্মধ্যে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক অনেক; কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে এই সকল গাহনা ছোট লোকের ভিতর আবদ্ধ ছিল। বড় লোকের আলয়ে গণ্যমান্য ভদ্রলোকের মজলিসে আখ্‌ড়াই গাহনা—কবির লড়াই চলিত।

মালসী (ভবানী-বিষয়—আগমনী প্রভৃতি), সখীসম্বাদ (ব্রজলীলা-বিষয়—মান বিরহ মাথুর প্রভাস গোষ্ঠ প্রভৃতি), প্রভাতী—ই[illegible] কতকগুলি বাঁধাবাঁধি বিষয়ে গান হইত; খেউড় নামক [illegible] কবিওয়ালাদের গাহনার অঙ্গ ছিল; গানে কুচ্ছকথা এবং [illegible]গালাজ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত না; বরং শ্রোতৃবর্গ—কি ভদ্র কি ইতর—সকলেই তাহাতে যথেষ্ট আমোদ পাইতেন। কত ধনকুবের এই গাহনার দল প্রস্তুত করণে পরস্পরের টক্করাটক্করীতে বিপুল অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শুভকার্য্যে, দোল-দুর্গোৎসবে, বাটীতে হাফ্-আখ্ড়াই, কবির লড়াই গাহনা বসাইবার জন্য বর্দ্ধিষ্ণু লোকে মাতিয়া উঠিতেন, বাটী লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। পল্লীগ্রামে আশপাশের গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত।

আমরা কবিওয়ালাদের গুটিকতক উৎকৃষ্ট গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাই।

গোঁজলা গুই কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের আদিগুরুর অন্যতম, তাঁহার একটি গান—

এস এস চাঁদবদনি।
এ রস নীরস করো না ধনি॥

তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ
অনুমানে বুঝি আমি ভুজঙ্গ তুমি আমার তায় রতন মণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥

প্রথম লাইনটায় এখানকার রুচিবাগীশগণ হয়ত চটিয়া উঠিবেন, তাঁহাদিগকে এই গীতি রচনার সময়টা খেয়াল রাখিতে অনুরোধ করি। এই গুই মহাশয় প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বেকার কবি।

রাসু-নৃসিংহও (কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা দুই ভাই)—প্রাচীন কবিওয়ালা; তাঁহাদের একটি গান—

ইহাই ভাবিহে গোবিন্দ সঘনে আঁখি হাসে পরাণ পোড়ে আগুণে।
কি দোষ বুঝিলে রাধারে ত্যজিলে কুঁজীরে পুজিলে কি গুণে।
জগত সংসারো ভুলাইতে পারো তোমারো বঙ্কিম নয়নে।
ওহে, কুঁজী অবহেলে বসিয়ে বিরলে তোমারে ভুলালে কি গুণে।
শ্যাম, রূপে গুণে পূর্ণ সকলি সুধন্য অতুল লাবণ্য রাধারো।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজা-বিহারী কি সুখে হয়েছো নাগরো॥
শ্যাম, রূপেরো বিচারো যদি মনে করো মজেছো যাহারো কারণে।

ওহে, লক্ষ কুবুজারো রূপেরো ভাণ্ডারো শ্রীমতী রাধারো চরণে ॥
শ্যাম, গুণেরো গরিমে কি কহিব সীমে আগমে যাহারো প্রমাণো।
যার গুণ গেয়ে মুরলী বাজায়ে নাম ধরো বংশীবদনো ॥
শ্যাম, যার গুণাগুণো করিতে সাধনো সনাতনো গেল কাননে।
ওহে, এ বড় বেদনো ত্যজিয়ে সে ধনো অধনে রেখেছো যতনে ॥
শ্যাম, আপনারো অঙ্গ যেমন ত্রিভঙ্গ কালীয় ভুজঙ্গ কুটিলে।
কুবুজারো অঙ্গ রসেরো তরঙ্গ তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে ॥
শ্যাম, এই ভূমণ্ডলে আধো গঙ্গাজলে রাধাকৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন, কুঁজীকৃষ্ণ বলে ডাকিবে সকলে ভুবনো তরাবে দুজনে ॥
শ্যাম, ত্যজিলে শ্রীমতী তাহাতে কি ক্ষতি যুবতী সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গ-মানিকো হরে নিল ভেকো মরমে এ দুখ রহিলো ॥
শ্যাম, প্রদীপের আলো প্রকাশো পাইলো চন্দ্রমা লুকালো গগনে
ওহে, গোখুরের জলো জগত ব্যাপিলো সাগরো শুখালো তপনে।

মধুর রসের রসিক যাঁহারা নহেন, তাঁহারা এ গানের মাধুরী সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ; যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য বুঝেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন—

"এখন কুঁজীকৃষ্ণ বলে ডাকিবে সকলে ভুবনো তরাবে দুজনে।

এ ছত্রটি অননুকরণীয়।

ভ্রাতৃযুগলের আর একটি গানের অংশ—

শ্যাম, তোমার চরিত পথিক যেমত হোয়ে শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে
শ্রান্তি দূর হলে যায় সেই চলে পুন নাহি চায় ফিরে

শুনিতে শুনিতে মিলন-কাতরা, ভগ্নহৃদয়া রাধার জন্য আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

রাম-নৃসিংহের আর একটি গান আমরা শুনাইব—

প্রাণনাথো মোরো সেজেছেন পীতরো দেখসিয়ে প্রিয়ে, ললিতে।
অপরূপ দরশনো আজু প্রভাতে।

বুঝি কারো কাছে রজনী জেগেছে নয়নো লেগেছে ঢুলিতে ॥
পার্ব্বতী-নাথেরো অর্দ্ধ শশধরো সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমারো নাগরো সেজেছেন সুন্দরো চন্দনো সিন্দুরো ভালেতে ॥
হায়, মথনের বিষো ভখিয়ে মহেশো নীলকণ্ঠ দেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম অতি অনুপাম জগতে রয়েছে ঘোষণা ॥
আমারো নাগরো গিয়াছিলেন কারো কলঙ্ক-সাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো এনেছেন নিশানো আঁখির অঞ্জনো গলাতে ॥
হায়, সে যেমন ভোলা তাহাতে উজ্জ্বলা গলে অস্থিমালা-ছড়াতে।
মুখে কৃষ্ণ নাম শিঙ্গায় বলে রাম বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে ॥
পোহায়ে রজনী এই গুণমণি এসেছেন মনো তুষিতে।
গুঞ্জ ছড়া গলে মুখে সুধা ঢালে রাধা রাধা বলে বাঁশীতে।
হায়, ত্রিলোচন হরো জগতো প্রচারো এক চক্ষু যারো কপালে।
কৃষ্ণ প্রেমে ভোরা পাগলের পারা ধুতুরা শ্রবণ যুগলে ॥
ইহারো সেই মতো সপত্র সহিতো কদম্ব শ্রবণ যুগেতে।
ত্রিলোচন চিহ্ন দেখো দীপ্যমান কপালে কঙ্কণ আঘাতে ॥

বুঝিতে পারিতেছি, নব্য সভ্য-ভব্য কাহারও কাহারও রুচির দুয়ারে আঘাত লাগিতেছে ; তাঁহারা এই কবিরই প্রেমের ব্যাখ্যা শুনুন—

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা ॥

করিলে শ্রবণো হয় দিব্য জ্ঞানো হেন প্রেমধনো উপজে কোথা ।*
আমি, এসেছি বিবাগে মনেরো বিরাগে প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াবো মাথা ॥
আমি, রসিকেরো স্থানো পেয়েছি সন্ধানো তুমি নাকি জানো প্রেম-বারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে কহ বিবরিয়ে ইহারো লাগিয়ে এসেছি হেথা ॥
হায়, কোন প্রেম লাগি প্রহ্লাদো বৈরাগী মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে ভাগীরথী আনে ভারত ভূমে ॥
কোন প্রেমে হরি বধে ব্রজনারী গেল মধুপুরী করে অনাথা।
কোন প্রেম-ফলে কালিন্দীর কূলে কৃষ্ণ-পদ পেলে মাধবীলতা ॥

* "প্রেম কি যাচ্‌লে মিলে, খুঁজ্‌লে মিলে ?
সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে।"—হরু ঠাকুর।

নিত্যানন্দ বৈরাগী ওরফে নিতাই দাসও একজন প্রাচীন কবি-ওয়ালা ;— নিধু বাবু ও হরু ঠাকুরের সমসাময়িক ; ইঁহার সহিত ভবানী বেণের সঙ্গীত-যুদ্ধ ভাল হইত। একদিবস দুই দিবসের পথ হইতেও লোক দলে দলে নিতে-ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত। কথিত আছে, ভাটপাড়ার ঠাকুরমহাশয়েরা নিত্যানন্দকে নাকি "নিত্যানন্দ প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইঁহার একটি গান উদ্ধৃত করি—

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥

সই কেন অঙ্গ অবশ হইলো সুধা বরষিলো শ্রবণে।
বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত জড়বৎ কোন কারণে ?
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ তরু হেলে বিনে পবনে ॥
একি একি সখি একি গো নিরখি দেখ দেখি সব গো-ধনে।
তুলিয়ে বদন নাহি খায় তৃণ আছে যেন হীন চেতনে ॥
হায়, কিসের লাগিয়ে বিদরে এ হিয়ে উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ একি প্রেম উপজিল সলিল বহিল নয়নে ॥
আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী বেজেছিল সই কাননে।
কুল লাজ ভয় হরিলো তাহাতে মরিতেছি গুরু-গঞ্জনে ॥

অধিক উঠাইবার আমাদের স্থান নাই। এই সকল গীতের জন্যই একদিন বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন "রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমন সুন্দর আছে যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই।"

অবশ্য এই সব কবিওয়ালাগণের সকল গীতই যে এত সুন্দর এমত নহে।

[illegible]পতি ঠাকুর একজন উৎকৃষ্ট বাঁধনদার ছিলেন। ইঁহার নিজের [illegible] না, সুকবি অপরের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। ইঁহার রচিত [illegible] একটি—

সখি, শ্যাম না এলো!

অবশ অঙ্গ, শিথিল কবরী বুঝি বিভাবরী, আজি অমনি পোহালো॥
ঐ দেখ সখি শশাঙ্ক-কিরণ উষার প্রভায় হল সঙ্কীরণ
পাতায় পাতায় বহে প্রাতঃ-সমীরণ কুমুদিনী হাস্ত-বদন লুকালো।
শর্ব্বরী-ভূষণ খাদ্যোতিক তারা দেখ সখি সবে প্রভাহীন তারা
নীলকান্তমণি হল জ্যোতি-হারা তাম্বুলের রাগ অধরে মিশালো॥

সখি, শ্যাম না এলো!

তাপিত-হৃদয় রমাপতি কয় এ বিরহ ধনি তোমা বলে নয়
বৃক্ষচয় হল অশ্রুধারাময় রজনীর সুখ-বিলাস ফুরালো।

সখি, শ্যাম না এলো!

পূর্ব্ববঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবিওয়ালা রামরূপ ঠাকুরের রচিত একটি সখীসম্বাদ শুনাই—

শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী।
যেমন চাতকিনী পিপাসায় তৃষিত জল আশায়

কুঞ্জ সাজায় তেম্‌নি কমলিনী॥

তুলে জাতি যুথী কুটরাজ বেলি গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকেলি
নব কলি অর্দ্ধ-বিকশিত যাতে বনমালী হরষিত—
সাজাল রাই ফুলের বাসর আস্‌বে বলে রসিক নাগর,
আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত,—
ফুলের শয্যা সব বিফল হল, অসময়ে চিকণ কালা বাঁশী বাজায়!—

রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে,

ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে,—
ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে—

ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে;—
বঁধু, তারে কেন নিরাশ করে, নিশিশেষে এলে রসময়,—
বঁধু প্রেমের এমন ধর্ম্ম নয়;

তুমি জান্‌তে পার সব প্রত্যক্ষে দুইয়ের মন কি রক্ষা হয়?
প্যারী ভাগের প্রেম কর্‌বে না রাগেতে প্রাণ রাখ্‌বে না
এখন মর্‌তে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে॥

সীতানাথ ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গের ওস্তাদী কবির শেষ সময়ের একজন;—তাঁহার একটি গান—

হারায়েছি নীলকান্তমণি, অনাথিনীর বেশ সাজিয়ে দে গো বৃন্দে সখি।
গেছেন যে পথে আমার বনমালী দূতি, এনে দে গো সেই পথের ধূলি
অঙ্গে মাখিয়ে দে প্রাণ জুড়াই তার বিচ্ছেদে
নয়ন মুদে হৃদ-পদ্মে কালরূপ নিরখি॥

গানটি সুন্দর, কিন্তু কৃষ্ণকমলের "রাই উন্মাদিনী" যাত্রার পালায় আমরা ঠিক এই ধরণের প্রাণভুলানো গান পাই।

এই কবির আর একটি গান—মাথুর—

কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধূলাতে লুটায়।
গোপাল-হারা ব্রজের গো-পাল তৃণ নাহি খায়।
ব্রজাঙ্গনা কেঁদে অন্ধ ব্রজেতে নাই সে আনন্দ
তোমার প্রেমাধিনী কমলিনী উন্মাদিনী প্রায়॥

আমরা ঠিক এই ভাবের একটি গান গোবিন্দ অধিকারীর একটি পালায় প্রাপ্ত হই; যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী, যশোমাল্য তাঁহারই প্রাপ্য।

আমরা সখীসম্বাদের গানই প্রধানতঃ তুলিয়াছি, কিন্তু কবি-গাহনা বা আখড়াই হাফ-আখড়াই গাহনার অঙ্গ শুধুমাত্র সখীসম্বাদ নহে, "ঠাকরুণ-বিষয়" ও ইহার মধ্যে আছে। শক্তিদেবীর স্তুতি প্রভৃতি এই গাহনার মুখপাত—আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখিয়াছি। কোথাও কোথাও ইহার নাম—মালসী।* এই "ঠাকরুণ বিষয়" হইতে একটি

* ইহা কি "মালশ্রী" রাগিণীর অপভ্রংশ? অনেকের মতে রামপ্রসাদী সুরও এই রাগিণী।

আগমনী গান আমরা শুনাইব। রাম বসু রচিত একটি গান হইতে কিয়দংশ শুনাইয়াছি, আর একটি শুনুন। অপর একজন কবিওয়ালা—গদাধর মুখোপাধ্যায়। তাঁহার একটি—

পুরবাসী বলে উমার মা, তোর হারা তারা এল ওই।
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়, কই উমা বলি কই॥
কেঁদে রাণী বলে আমার উমা এলে ?
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে; (একবার আয় মা)
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি, অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে,
কই মেয়ে বলে আন্‌তে গিয়েছিলে ?
তোমার পাষাণ প্রাণ আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হতে, গেলে নাক নিতে,
রব না দু দিন গেলে॥

বালিকা উমার এই চিত্রে ভক্তের প্রাণ স্নেহ-রসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে! আমরা সাধকের গানে কচি মেয়েটির ফুটন্ত চিত্র দেখিয়াছি, মায়ের প্রাণের কাঁদুনী শুনিয়াছি। পরে—

"উমা আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো"—*

শুনিতে পাই। দুখের মেয়ে অভাবের সংসার হইতে বহুকাল পরে তিনটি দিনের জন্য মায়ের কোল জুড়াইতে আসিতেছে, স্নেহময়ী পাগলিনী জননীর ভাব—

"আমার উমা এল বলে রাণী এলো কেশে ধায়"—

এ গানও আমরা অশ্রুসিক্ত হইয়া শুনিয়াছি;

আবার কবির আসরে সহস্র সহস্র শ্রোতার মধ্যে সদ্‌গায়কের সমবেত সুকণ্ঠে ঐক্যতান সহ সুরলয়ে যখন—

"একবার আয় মা, একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে"—

* সমগ্র গানটি এই—

ধ্বনিত হইত, তখন পাষাণও বিগলিত হইত, আমরা বুঝিতে পারি। হায় এ সব গাহনা কোথায় গেল।

নীলমণি পাটুনীর দলের একটি গান শুনাই—ভবানী বিষয়—

এবার বেঁধেছি মন আঁটাআঁটি করেছি মন খুব খাঁটি
তারা গো মা, এবার ধরেছি পাষাণের বেটি
আর পালাতে পার্‌বি নে।

তারা গো, আজ তারা-ধরা ফাঁদ পেতেছি মা হৃদয়-কাননে।
আমায় বলেছে সেই মহাকাল আছে গুরু-মহামন্ত্র জাল
সাধন-পথে সেই জাল পেতে থাক্‌বো কিছু কাল ;—
এখন ভক্তি-ডোর করেছি হাতে তারা যদি যাস্ সে পথে
ধর্‌বো মা তোর হাতে নেতে বাঁধবো ছুটি চরণে।
মন-কারাগারে, তোমায় রাখবো মা অতি যতনে॥
তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা—ষোড়শোপচারে পূজা,
তেমন পূজা কোথা পাব বল্ ?

তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি করে, মানসে নৈবিদ্য কোরে
দিব মা তোর চরণ ধরে, নির্ম্মল গঙ্গাজল ;—
আমি কোথা পাব অন্য বলি মহিষাদি অজ বলি
দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বলি বদনে।
মা, এবার পালাবার পথ তোমার নাই, উপায় নাই; সন্ধান নাই—
তারা, ধরবো বলে তারা, মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাই॥

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করায়ে, চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকালো ?
কহিছে শিখরী কি করি অচল নাহি চলাচল, হলাম হে অচল।
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল অকরের নিধি পেয়ে হারাল।
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার পিতৃ-দোষে মেয়ে পাষাণী হল॥

এটি শারদীয়া পূজা উপলক্ষে একটি "কবির গান"। দুর্গোৎসবের দিনে, মা দুর্গার সম্মুখে, ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে এই গান গীত হইবার কালে শ্রোতৃবর্গের প্রাণে কি ভাব উথলিত, হিন্দু মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন।

কবিওয়ালাগণের গুণের পরিচয়ই এতক্ষণ আমরা দিলাম। কবির গানে এত ভাল জিনিষ আছে বলিয়াই পরবর্ত্তী কবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং মহাকবি মধুসূদন দত্ত ইহার যথেষ্ট পক্ষপাতী ছিলেন। কথিত আছে, ঈশ্বর গুপ্ত নৌকা-যোগে বঙ্গদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বহু কষ্টে লুপ্ত কবির গান উদ্ধার করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এগারটি সখীসম্বাদ গান শুনিয়া ব্যারিষ্টার কবি মধুসূদন এক ব্রাহ্মণের মোকদ্দমাতে "ফি" না লইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই "কবির গানে" কু ও ছিল; সেটা প্রধানতঃ সেই সময়কার সমাজের লোকের রুচির দোষ। আমরা কবির গানের কথাই এতক্ষণ বলিলাম, কবির লড়াইএর কথা এখনও বলি নাই। এই বাক্‌যুদ্ধ বা গান-যুদ্ধ এক বিচিত্র ব্যাপার। ইহার রহস্য-অংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই;—

প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের ভিতর ভোলা ময়রা একজন খ্যাতনামা লোক ছিল। যে দিন ভোলার "কবি" দল আসর জাঁকাইয়া বসিত, সে দিন আর পিপীলিকা চলিবার স্থান থাকিত না। সমুদয় আসর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অসংখ্য লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। ভোলার একটা নিয়ম ছিল যে আসরে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে একছড়া কদলী একগাছা দড়িতে বাঁধিয়া আসরের এক পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখিত, এবং একটা টাকা একখানা গামছায় বাঁধিয়া আর এক পার্শ্বে টাঙ্গাইয়া দিত। গান আরম্ভ হইলেই ভোলানাথ মাথায় সাদাধুতির পাগড়ি বাঁধিয়া আসরের কর্ত্তাকে কহিত—"হুজুর, যে হারবে তার ভাগ্যে ঐ

কদলী ছড়া ; আর যে জিত্‌বে তার কপালে ঐ টাকা।" কর্ত্তা সম্মত হইলে এবং আসরের সমস্ত লোকের অনুমতি পাইলে, ভোলা দুই হাত তুলিয়া আকাশের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করতঃ ভগবানকে প্রণাম পূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে একটি স্তোত্র আওড়াইত ; ঐ স্তোত্র আবৃত্তি করিবার পর আসরের কার্য্য আরম্ভ হইত।

এই ভোলানাথ আপনার জাতি-ব্যবসায়ী প্রকৃত ময়রাই ছিল ; মোদকের পো নিজেই গানে পরিচয় দিত—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা বাগবাজারে রই।
আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা ময়রাই বার মাস।
জাতি পাতি নাহি মানি (ও গো৹) কৃষ্ণ-পদে আশ॥

একবার প্রতিদ্বন্দ্বীদল ব্যঙ্গ করিয়া তাহার ভোলানাথ নামে শিবত্ব আরোপ করতঃ গান ধরাতে, ভোলা উত্তরে গাহিয়াছিল—

আমি সে ভোলানাথ নই আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তোরা সবাই বিল্বদলে আমায় পূজ্‌লি কই ?

একবার আণ্টুনী ফিরিঙ্গির দলের সঙ্গে কবির লড়াই হইতেছিল; রাত্রি—নয়টা হইতে পর দিবস বেলা এগারটা পর্য্যন্ত গাহনা চলিয়াছে, কেহ কাহাকেও হারাইতে পারে না; সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত ; শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া—আসরে একছড়া মালা ছিল,—আণ্টুনি সাহেব সেটি ভোলার গলায় পরাইয়া দিল। ভোলার প্রকারান্তরে জিৎ সাব্যস্ত হইল, কিন্তু সমজদার ভোলা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, সে গান ধরিল—

ওরে শালা, কি জ্বালা, এ মালা দিল রে আমায়!
চক্ষে বহে জল, অবিরল, বিফল করিল কায়!

কি জ্বালা এ মালা দিল রে আমায়।
ওরে হেন্সুম, মালার কুসুম, (পুষ্প নয়) ফুলধনু প্রায়!
ওরে শালা, কি জ্বালা, এ মালা দিল রে আমায়!

আণ্টুনি ফিরিঙ্গির পুরা নাম ছিল Hensman Anthony। ভোলা তাহাকে "হেন্সুম" বলিত। আসরে প্রকাশ্যভাবে গীতে "শালা" সম্বোধন—ইহাও ছিল রসিকতা!

মেদিনীপুর জেলায় জাড়ার নিকট মাণিককুণ্ড গ্রামে ভোলা একবার গাহনা করিতে গিয়াছিল। এই গ্রামে প্রকাণ্ড মূলা জন্মায়। গ্রামের জমীদার ব্রাহ্মণবংশীয়, তাঁহার বাটীতে "কবি" দিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষ দল—(দলপতির নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর বা জগা ধোপা)—গৃহস্বামীকে বাড়াইবার উদ্দেশে গানে জাড়াকে গোলক বৃন্দাবন বলিয়াছিল; ভোলা উত্তরে গাহিল—

কেমন করে বল্‌লি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন?
এখানে যে বামুন রাজা, চাষা প্রজা, চৌদিকে তার বাঁশের বন।
কেমন করে বল্‌লি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
জগা! কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড, কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড
ঐ সাম্‌নে আছে মাণিককুণ্ড, কর্ গে মূলো দরশন।
কেমন করে বল্‌লি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা চৌদিকে তার বাঁশের বন।
ওরে বেটা কবি গাবি, পয়সা লবি, খোসামুদি কি কারণ?
কেমন করে বল্‌লি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন!

এখানেও প্রতিপক্ষকে "বেটা" সম্ভাষণ! শুধু তাই নহে, এই গানটির শেষাংশে গৃহস্বামীকেও বিশেষরূপে আক্রমণ আছে—"পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়," "বেগুণ পোড়ায় নুন দেয় না," পরিশেষে "এ বেটারা ত হাড়ী।" মোদক-পোলাকে রীতিমত প্রহার খাইয়া আসর ছাড়িতে হইয়াছিল কি না সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

একবার কবিওয়ালা আণ্টুনী ফিরিঙ্গি এক মজলিসে গাহিতেছিল—

ভজন পূজন জানি না মা জেতেতে ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গি॥

গান শুনিয়াই ভোলা ময়রা ভগবতী সাজিল এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আণ্টনী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া গান জুড়িল—

তুই জাত ফিরিঙ্গি জবড়জঙ্গি—
আমি পারবো না রে তরাতে, আমি পারবো না রে তরাতে।
বিশু খ্রীষ্ট ভজ্‌গা তুই, শ্রীরামপুরের গির্জ্জাতে॥

আণ্টুনীর পাল্টা উত্তরটুকু বড় মধুর—

সত্য বটে বটি আমি জাতিতে ফিরিঙ্গি।
(তবে) ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন, অন্তিমে সব একাঙ্গি॥

কোন সময়ে শ্রীরামপুরের গোস্বামী মহাশয়দের বাটীতে গাহিতে গিয়া আণ্টুনী খুব এক হাত লইয়াছিলেন—

তোমরা পয়সা পেলে, হেঁসে খেলে, সাদায় করো কালো।
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে, (আমি বলি), কসাই তবু ভালো॥

এই আণ্টুনী সাহেব পর্ত্তুগীজ ছিলেন। আণ্টুনী একটি ব্রাহ্মণ-রমণীর প্রেমে পড়িয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন।* তিনি হিন্দুর দোল দুর্গোৎসবে সাগ্রহে যোগ দিতেন এবং অবশেষে কবির দল বাঁধিয়া নিজে আসরে নামিয়াছিলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য! বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গি টুপী কুর্ত্তি ছাড়িয়া বাঙ্গালী সাজিয়া বাঙ্গালীর মজলিসে বাঙ্গালা কবি-গানে তান ধরিতেন!

একবার প্রতিপক্ষ দলের নেতা ঠাকুর সিংহ সাহেবকে আক্রমণ করিয়া গাহিয়াছিল—

---

* জনরব—কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটে এক মন্দিরে 'ফিরিঙ্গি কালী" নামে বিখ্যাত যে কালীমূর্ত্তি আছে, সেটি এই ব্রাহ্মণ-বধূর আব্দার অনুসারে ফিরিঙ্গি আণ্টনী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

বল হে এণ্টুনী আমি একটি কথা জান্‌তে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই॥

এণ্টুনী তখন পূরা কবিওয়ালা, কবিওয়ালার ভাষাতেই উত্তর দিল—

এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকরে সিংএর বাপের জামাই কুর্ত্তি টুপী ছেড়েছি॥

ভোলা ময়রার Unparliamentary language স্পষ্ট "শালা" অপেক্ষা এই "বাপের জামাই" বরং ভাল। কিন্তু রসিকতার কি দৌড়! রাম বসু আসরে দাঁড়াইয়া সাহেবকে গালি দিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিলেন—

সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্‌রী সাহেব শুন্‌তে পেলে, গালে দেবে চুণকালি॥

সাহেবের ধর্‌তা—

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে—
আমার মানব-জনম সফল হবে যদি রাঙা চরণ পাই॥

আমোদের জন্য এই মুক্তপ্রাণ বিধর্ম্মী হিন্দুর সহিত প্রাণ ঢালিয়া মিশিয়াছিলেন; তখনকার উদারহৃদয় হিন্দুও আনন্দভরে তাঁহাকে কোল পাতিয়া দিয়াছিলেন।

এণ্টুনী সাহেবের ভবানী-বিষয়ক গান কয়টি পাওয়া গিয়াছে, অনেকেই বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন। একটি গানের এক অংশ—

জয়া, যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া, মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যে ডাকে মা তোমায়—
তুমি কর তার ভব-সিন্ধু পার॥
মা তাই শুনে এ ভবের কূলে দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে
বিপদ কালে, ডাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা;

তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা, আমায় দয়া কর্‌লে না মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা ?
অতি কুমতি কুপুত্র বলে আপনিও কুমাতা হলে
আমার কপালে!
তোমার জন্ম যেমন পাষাণ-কুলে, ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ।

মনে রাখিবেন, এটি একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর রচিত গান।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ হইতে ময়রা, তাঁতী, তেলী, তাম্বুলী, ছুতার, কামার, চামার পর্য্যন্ত কবিওয়ালার দল গঠিত করিয়া কবি-গানে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, আমরা যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই জাতীয় গীত রচনায় স্ত্রীলোকও অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হয় নাই। আমরা যজ্ঞেশ্বরী রচিত গান দেখিতে পাই। ইনি প্রথিতনামা কবি রাম বসুর বিশেষ অনুগৃহীতা কোন রমণী বলিয়া প্রকাশ। নীলু ঠাকুরের দলে ইঁহার রচিত গান গীত হইত। ইঁহার একটি সখীসম্বাদের বিরহ শুনাই—

কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান।
হেরে মুখ, গেল দুঃখ, দুটো কথায় কথা বলি প্রাণ॥
আমায় বন্দী করে প্রেমে এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে ;
আমি কুলবতী-নারী পতি বই আর জানি নে,
এখন অধিনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও।
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও॥
নাহি চেন ঘর বাসা কি বসন্ত কি বরষা
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পূরাও।
রাজ্যে থেকে ভার্য্যের প্রতি কার্য্যে না কুলাও॥

গানটিতে তেমন কিছুই নাই ; স্ত্রীলোকেরও কবির গানে মাতিয়া উঠিবার নিদর্শন বলিয়া (শত বর্ষ পূর্ব্বেকার মনে রাখিবেন) আমরা

উদ্ধৃত করিলাম। ইহাঁর রচিত আরও কয়েকটি গান পাওয়া যায়। (কবিওয়ালা-শ্রেণীতে মোহিনী দাসী বলিয়া আর এক স্ত্রী-নাম দৃষ্ট হয়।)

ভোলা ময়রার সময়ে বাঙ্গালা দেশে পুরুষ-কবিওয়ালা এবং মেয়ে-কবিওয়ালা—উভয় প্রকার কবির দল প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকের দলেও পুরুষ থাকিত এবং কখনও কখনও পুরুষের দলেও স্ত্রীলোক থাকিত; তবে কবিওয়ালার দলে কবিওয়ালী কদাচিত দেখা যাইত। দুইটা মেয়ে-কবিওয়ালীর দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া যখন আসর মধ্যে ছড়া কাটিত—শুনা যায়, তাহা দেখিতে অপিচ শুনিতে ভদ্র-ইতর দর্শক-শ্রোতাগণ আমোদে মাতোয়ারা হইয়া বসিয়া থাকিতেন! মেয়ে-কবিওয়ালীদের ছড়া-কাটাকাটি কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা;—এক পক্ষ প্রশ্ন করিল—

হৈ হৈ বল দেখি লো—
যোগী নয় ঋষি নয় ছাই মাথে গায়।
মাচার উপরে পড়ে তিনি গড়াগড়ি যায়॥

প্রতিপক্ষ সেয়ানা হইলে উত্তর দেয়—কুষ্মাণ্ড—(অবশ্য দেশী কুম্‌ড়া)। ঠিক বলিতে পারিলে হার জিৎ হইল না।

প্রতিপক্ষ দলের পালায় প্রশ্ন হইল—

তিন বীর যার শির বেয়াল্লিশ লোচন।
চার জাতি সৈনা যোরে ছেয়ানব্বই ভবন।
কহ কহ মাধবীলতা হেঁয়ালীর ছন্দ।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে লাগে ধন্দ॥ (বল ?)

ঠিক উত্তর দিতে না পারিলেই হার হইল।

(আমাদের পাঠকগণের কেহ পাছে হার মানিয়া বসেন, এই ভয়ে কানে কানে উত্তরটা জানাইয়া রাখি—পাশা খেলা)

রাম বসু, হরু ঠাকুরের সেই বৈজ্ঞানিক কবি-গাহনা পরে এইরূপ "কবি" তে পরিণত হইয়াছিল!

কবিওয়ালা নামের স্ত্রী-বাচক শব্দে পরিচিত ছিল বলিয়াই এ তুচ্ছ প্রসঙ্গেরও উত্থাপন করিলাম। কথিত আছে, ভোলা ময়রা প্রভৃতি নামজাদা কবিওয়ালারাও কবিওয়ালীগণের সহিত এইরূপ বাক্য-লড়াইএ অগ্রসর হইতে বিমুখ হইতেন না।

আমরা বলিয়াছি, "খেউড় গান"ও কবি-গাহনার অঙ্গ ছিল। অনেক সময়ে সে সকল এতদূর অশ্লীল যে এখনকার কালে হইলে পুলিস আসিয়া চালান দিত। ব্যক্তিগত গালিগালাজ হইতে শূর্পনখা, মালিনীমাসীকে টান ত পড়িতই; সময়ে সময়ে ঠাকুর-দেবতারাও বাদ যাইতেন না। বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে দেবদেবতা বেওয়ারিশ মাল; বাজারের বেশ্যাকে দেবতা সাজাইয়া আমরা ভক্তিতে দিশেহারা হই, গোঁপকামানো বুড়া মিন্সেকে সাড়ী ঘুমুর পরাইয়া, তাহার ঠাকুরাণী-বেশে আমরা 'আহা-মরি' করি; খেউড় গানে বাঙ্গালী কবি ঠাকুর-দেবতাকে টান দিবেন, ইহা ত আশ্চর্য্য নহে। ঠাকুরদের উপর পড়িলে কাহারও গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা এই জাতীয়—কতকটা সভ্য ভব্য—একটি "কবি-গান" শুনাই—

আমি মগধপতি জরাসন্ধ বটি হে কংসেরি শ্বশুর।
ওহে কংসের ভাগ্নে কৃষ্ণ তুমি, নাতি আমার হও,
উভয়ে সম্বন্ধ মধুর॥
তোমার সঙ্গী দুটি পরিপাটি নামে ভীমার্জ্জুন—
কৃষ্ণ ভাল করে আজ আমারে দাও উহাদের পরিচয়,
উহার কোন্‌টি তোমার পিস্‌তুতো ভাই, কোন্‌টি ভগ্নিপতি হয়;
ভদ্রঘরের মেয়ে বটে, সুভদ্রার বুদ্ধি ভাল নয়,
ওহে ভাইকে পতি করতে গেলে তোমার মত কে আর হয়?

এ সকল গানকে কেহ বলিতেন "টপ্পা" কেহ বলিতেন "লহর"। এ সকল গান শুনিতে লোকের আমোদের সীমা থাকিত না। আমরা এ প্রসঙ্গের এইখানেই খতম্ করি।

কবির দলের গাহনার কথায় পরবর্ত্তী সময়ের জনৈক প্রবীণ "বাঁধনদার" বলিয়াছেন— "সেই মূর্ত্তিমান রাগ-পূরিত চমৎকার স্বর ও অপূর্ব্ব গাহনায়, বাহবার চোটে বাড়ীর থাম যেন কাঁপিয়া উঠিত, বাড়ী যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত!"

শ্রীমান "হুতোম্ প্যাঁচা" আস্মান্ হইতে শুনিয়া নক্সা কাটিয়াছেন—"দোয়ারগণ নতুন সুরের গান ধল্লেন, ধোপাপুকুর রণ্ রণ্ কর্ত্তে লাগলো; ঘুমন্ত ছেলেরা মা'র কোলে চম্‌কে উঠ্‌লো; কুকুর গুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠ্‌লো; বোধ হতে লাগ্‌লো যেন হাড়ীরে গোটাকতক শূওর ঠেঙ্গিয়ে মাচ্চে। গাওনার সুর শুনে সকলেই বড় খুসী হয়ে সাবাস বাহবা ও শোভান্তরীর বৃষ্টি কর্ত্তে লাগ্‌লেন।"

এই গাহনা সম্বন্ধে এতই মতভেদ।

অপর একটি দলের কথা এইখানে উল্লেখ করিয়া যাইঃ— কলিকাতা বটতলায় একখানা প্রসিদ্ধ আট্‌চালা ছিল, কলাবিদ্ নিধু বাবু প্রতি রজনীতে তথায় সঙ্গীতালাপ করিতেন। ঐ স্থানে নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোক "বাঙ্গালী সরিমিঞা"র টপ্পা শুনিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য সমবেত হইতেন। এমন কি মফঃস্বলের সঙ্গীতামোদী জমীদারবর্গ সহরে আসিলে ঐ আট্‌চালায় অধিষ্ঠিত না হইয়া যাইতেন না। নিমতলা-নিবাসী বাবু শ্রীনারায়ণ মিত্র "পক্ষীর দল" গঠিত করিয়া উক্ত আট্‌চালায় সর্ব্বদা উল্লাস করিতেন। "পক্ষীর দলের" পক্ষীসকল ভদ্রসন্তান, উপস্থিত-বক্তা, উপস্থিত-কবি, বাবু এবং সৌখীন নামধারী 'সুখী' ছিলেন। নিধু বাবুর উপর পক্ষীর দলের প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। পক্ষীগণ আপনাপন

গুণানুসারে নাম পাইতেন; এবং সেই নাম প্রায়শঃ স্বয়ং নিধু বাবুর নিকট হইতে লাভ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। এই পক্ষীর দলের বিস্তর রহস্যজনক গীত ও ইতিহাস আছে। কেহ কেহ বলেন—বাগবাজার-নিবাসী শিবচন্দ্র ঠাকুর পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বাগবাজারের রূপচাঁদ পক্ষীর নাম বিখ্যাত। শুনা যায় পক্ষীরা নাকি বিশেষরূপ গাঢ়-ধূম-সেবক ছিলেন; তাহাতেই বুঝি উড়িবার সুবিধা হইত!

রূপচাঁদের একটু কূজন শুনাই—

ভাঙ্‌লো না তোর মায়ার ঘুম।
বিষয়-মদে চক্ষু মুদে শুয়ে আছ বেমালুম্॥
ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্যে তুমি মনে কর বাদ্‌সা রুম্।
এ প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ ঠিক যেন ভাই হাথুন্ থুম্॥
তোর সঙ্গের ছ'টা বড় ঠেঁটা, ওদের চটা বেমালুন্।
জ্ঞান-অনলে দে না জেলে করে হরি-পূজার হুম্॥
(গোলা) পায়রার বাচ্ছা পুষে বাছা শুক ভেবে তায় খাচ্চ চুম্।
ও না বল্‌বে কৃষ্ণ, শুনবি স্পষ্ট, ডাক্‌বে বলে বাকুম্ কুম্॥
(এখন) দারা পুত্র জ্ঞাতি গোত্র সকলেই শুন্‌চে হুকুম্।
শিবনেত্র হবানাত্র আপনি হবি রে নিঝ্‌ঝুম॥
রবি-সুতের দূতে ধর্‌লে হবে রে মজা মালুম্।
ক্রিমি-হ্রদে দেবে গেদে দ্বিপদে দিয়ে তুড়ুম্॥
স্বর ব্রহ্ম না জেনে মর্ম্ম সাধ বসে তাম্বুন্ তুম্।
রাগেতে তোর নাই অনুরাগ কে শোনে তোর ঝিঁঝিঁট লুম্॥
কপট ভক্তির বিষম জৌলুস্ বাহ্যাড়ম্বর বড়ই ধূম।
খগ ভণে সাধন বিনে দেহ গেহ শ্মশান-ভূম্॥

এই খগ বা পক্ষীর দল ভদ্রসন্তান;—নূতন ইংরাজের আমল

হইয়াছে, ইংরাজী বুক্‌নি শিখিতেছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রভাতে পক্ষীর প্রকৃত কপ্‌চানো একটু শুনাই—

আমারে ফ্রড্‌ করে কালিয়া ড্যাম্‌ তুই কোথা গেলি।
আই অ্যাম্‌ ফর্‌ ইউ ভেরি সরি, গোল্‌ডেন্‌ বডি হল কালি॥
হো মাইডিয়ার ডিয়ারেষ্ট মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ট
ও মাইডিয়ার হাউ টু রেষ্ট হিয়ার ডিয়ার বনমালী।
(শুন রে শ্যাম তোরে বলি)—
পূওর্‌ ক্রিচার্‌ মিল্ক গেরল্‌ তাদের ব্রেষ্টে মার্‌লি শেল
নন্‌সেন্‌স্‌ তোর নাইকো আক্কেল ব্রিচ্‌ অফ্‌ কন্‌ট্রাক্‌ট্‌ কর্‌লি॥
(ফিমেল গণে ফেল কর্‌লি)।
লম্পট শঠের ফর্‌চুণ খুল্‌লো মথুরাতে কিং হলো—
আক্কেলের প্রাণ নাশিলো কুব্জার কুঁজ পেলে ডালি।
(নিলে দাসীরে মহিষী বলি)।
শ্রীনন্দের বয় ইয়ং ল্যাড্‌ ক্রুকেড্‌ মাইণ্ড হার্ড
কহে আর সি ডি বার্ড এ পেলাকার্ড কৃষ্ণকেলী॥
(হাপ্‌ ইংলিশ হাপ্‌ বাঙ্গালী)।

আর সি ডি বার্ড=R. C. D. Bird—রূপচাঁদ পক্ষীর Initial বা সাঙ্কেতিক নাম, অনেকেই বুঝিয়াছেন।*

---

* রাজনারায়ণ বাবু সেকালের "ঘোষাণো" অর্থাৎ ইংরাজী পড়া মুখস্থ করিবার প্রথার চমৎকার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন—

পাম্‌কিন্‌ (pumpkin) লাউকুমড়া, কোকোম্বর্‌ (cucumber) সঁসা।
ব্রিঞ্জেল্‌ (brinjal) বার্ত্তাকু, প্লোমেন্‌ (ploughman) চাষা॥

"নাম্‌তা" পড়ার ন্যায় লোকে অভ্যাস করিত।

শালগ্রাম শিলা উপোষের ইংরাজী Black stone die এবং রথ তাহা বুঝাইতে হইলে Wooden church three stories high, pull pull pull কেহই ভুলিতে পারিবেন না। এ ত গেল ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানের দৌড়; আবার কৌতুক করিয়া দোআঁশলা ছড়া—

মুসলমান রাজত্বের অবসান হইলে বঙ্গদেশে আজ্‌গুবি ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত, মজ্জাগত মুসলমানী কেতায় দোরস্ত, নব পরিচিত বিদেশীগণের গুণ ছাড়িয়া কুদৃষ্টান্তনিচয় অনুকরণে ব্যতিব্যস্ত, বাঙ্গালী-সমাজ "বাবু" নামক এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, পরিচয় দিতে সঙ্কোচ হয়। শ্রদ্ধেয় কোন পণ্ডিত এই সময়কার এই "বাবু" দিগের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি;—"ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা-রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিণ্‌ফিণে কালা পেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন্ বা কেম্‌ব্রিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপ চুনট্‌করা উড়াণি ও পায়ে পুরু বগ্‌লস্ সমন্বিত চীনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলীর লড়াই দেখিয়া, সেতার এস্‌রাজ বীণ্ প্রভৃতি বাজাইয়া,—কবি, হাপ্ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করিয়া কাটাইত; এবং খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনা-দিগকে লইয়া দলে দলে নৌকা-যোগে আমোদ করিতে যাইত।"*

"শ্যাম going মথুরায় গোপীগণ পশ্চাত ধায়
বলে your Okroor uncle is a great rascal"

ইহাও লোকে বানাইত।

দেখা যাইতেছে, আমাদের এখনকার শ্রেষ্ঠ রহস্য-কবি এ জাতীয় রচনার উদ্ভাবক নহেন।

* ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একখানি গ্রন্থ বাহির হয়—"নব্য বাবু বিলাস"; তন্মধ্যে এই বাবু-চরিত্র আরও "কজ্জলোজ্জ্বল" বর্ণে চিহ্নিত আছে। Long সাহেব সমালোচনায় লিখিয়াছেন—"One of the ablest satires on the Calcutta Babu." এই বাবুর দল এমন সৌখীন ছিলেন যে উৎকৃষ্ট ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া পরিধান করিতেন—কোমল কটি পাছে ব্যথা পায়।

এই ত দেশের অবস্থা। এ সময়ে আদিরসাত্মক ভিন্ন কোন সঙ্গীতই খই পাইত না। এই সময়ের কবিদিগের রচনায় প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় থাকিলেও কাল-মাহাত্ম্য কেহই এড়াইতে পারেন নাই। টপ্পাই হউক, কবিওয়ালাগণের প্রেম-সঙ্গীতই হউক, পাঁচালীই হউক, যাত্রার পালাই হউক—সর্ব্বত্রই কেমন একটা উন্মুক্ত নির্লজ্জ বিলাসিতার ভাব বিদ্যমান। এই বিকৃত রুচির জন্য কবিগণ নিজে ত দায়ী বটেই, কিন্তু সময়েব সমাজ অধিকতর দায়ী। এ সময়ে লোকের বোধ হয় ধারণা ছিল—আপন স্ত্রীকে ভালবাসা স্ত্রৈণের লক্ষণ, "পরকীয়া"কে ভালবাসাই প্রকৃত প্রেম। তখন বাঙ্গালী জানিত, বাবু হইতে হইলেই দু একটি বারবিলাসিনীর সহিত আলাপ রাখা চাই; আরও কি কি চাই সকল কথা বলিয়া কাজ নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, আমরা যে যুগের রচনার পরিচয় দিতেছি, সে যুগে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই অবস্থায় এই সকল সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। তাই অনেকে বলিয়া থাকেন, এই সময়ের গীত গানে কলঙ্ক যাহা আছে, তাহার ভাগী শুধু রচয়িতাগণ নহেন, অনেকটা অংশ সমাজের প্রাপ্য। এই সমাজের সামাজিকগণ "বৃন্দাবনের কেচ্ছা," দাশুরায়ের ছড়া, রসের পাঁচালী, বিদ্যাসুন্দরের টপ্পার ভক্ত হইয়া উঠিবেন,—ইহা ত বিস্ময়ের বিষয় নহে। ওস্তাদী গান চুটকি রাগীণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাইজীর কণ্ঠের "গজল" ও "পিয়ালা মুঝে ভরি দে রে" বড় "পেয়ারের চিজ" হইয়া পড়িয়াছিল।

কবিওয়ালা ব্যতীত—আখড়াই, হাফ্-আখড়াই, দাঁড়া-কবির কবি ভিন্ন আরও কতকগুলি সুমধুর গীত-রচয়িতা প্রাচীন যুগের শেষাশেষি—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন; ইহাদের গানের এক আধটি নমুনা দেখাইব।

শ্রীধর কবিরত্ন কথক-ঠাকুরের কতকগুলি প্রণয়-সঙ্গীত আছে, তাহার কোন কোনটি নিধু বাবুর টপ্পা মনে পড়াইয়া দেয়। একটি—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥

একটি বিরহ—

বিচ্ছেদ যাতনা হতে মরণ যন্ত্রণা ভাল।
সে যে অনন্ত যাতনা, এ যাতনা অল্পকাল॥
বিচ্ছেদের হুতাশন করে প্রাণের দাহন
মরণ যন্ত্রণা লঘু ম'লে ত ফুরায়ে গেল॥

আর একটি—

বিচ্ছেদ নাহি থাকিলে প্রেমে কি যতন হ'ত।
দুঃখ সম্ভাবনা হেতু সুখের আদর এত॥
উত্তরের বাদী উত্তরে পরস্পর ভয়ে ভয়ে
কত সুখোদয় সতত্রে সাধন যেমন,
অন্তরে না হয় ক্ষত॥

আরও একটি,—অভিমান—

যাবত জীবন রবে কারে ভালবাসিব না।
ভালবেসে এই হলো ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
আমি ভালবাসি যারে সে কভু ভাবে না মোরে
তবে কেন তারি তরে নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা।
ভালবাসা ভুলে যাব মনেরে বুঝাইব
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালবাসে না॥

বিদায়।—একখানি মর্ম্মস্পৃক চিত্র—

ঐ যায়—যায়। চায় ফিরে—সজল নয়নে।
ফিরাও গো। ফিরাও গো ওরে আমার জীবনে॥

হেরি ওর অভিমান　　দূরে গেল মোর মান—
অস্থির হতেছে প্রাণ প্রতি পদার্পণে।

শ্রীধর ঠাকুরের শ্যামা-বিষয়ক, কৃষ্ণ-বিষয়ক ভাবময় গানও আছে। তাঁহার—

সখি, আমায় ধর ধর!
উরু-নিতম্ব-হৃদি-পয়োধর ভারে—ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি।

কিম্বা—

ঘোরা তিমিরা রজনী সজনি।
কোথায় না জানি শ্যাম গুণমণি।

প্রভৃতিও সুন্দর, কিন্তু তাঁহার টপ্পাই সব চেয়ে সুন্দর।

আর একজন গীত-রচয়িতা—কালী মির্জ্জা। ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান চট্টোপাধ্যায়-বংশোদ্ভব। পারসী ভাষায় "লায়েক" ছিলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলের বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত থাকিতে ভাল বাসিতেন বলিয়া সৌখীন মহলে "মীর্জ্জা" খেতাব পাইয়াছিলেন। ইঁহার একটি গীত—

আর ত যাবনা আমি যমুনারি কূলে।
যে হেরেছি রূপ তার　　কূলে থাকা হল ভার
নাম যে জানি না তার সে থাকে গোকুলে॥
যখন সে চায় ফিরে　　আসিতে না পারি ফিরে
নিয়ে নাহি দেয় ফিরে মন যে হরিয়ে নিলে।
গুরুজন ছিল সাথে　　মরেছিলাম মরমেতে
পুরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নেরি জলে॥*

আর একটি—

চাহিয়ে চাঁদের পানে ভোরে হয় মনে।
ভুল না হইলে দোঁহে দেখা হবে কেমনে॥

---

* আর ত যাব না লো সই যমুনারি কাল জলে।
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে॥—পাঠান্তর।

যদি সমতুল করি নয়নে নয়নে।
মৃগাঙ্ক হইয়ে শশী লুকায় তব বদনে॥
যমুনা পুলিনে বসি কাঁদে রাধা বিনোদিনী।

এবং

"শবোপরে নাচে শ্যামা নগনা হয়ে।
লাজেরে দিয়াছে লাজ এ কেমন মেয়ে।"

সুন্দর গান দুইটি বোধ হয় ইহারই রচনা।

এ সব গেল বৈঠকী গান, সহর অঞ্চলেই বেশী চলিত ছিল; পল্লী গ্রামের আঙ্গনায় বোধ হয় ভিন্নরূপ গীত-গান আসর জমাইত।

মধুসূদন কিন্নরের ঢপ সঙ্গীত এক সময়ে লোকের পছন্দসই ছিল। গীতগুলি "মধু কানের ঢপ" বলিয়া পরিচিত। ঢপ-সঙ্গীত কীর্ত্তন জাতীয়, ইহাতে মৃদঙ্গের সঙ্গত আবশ্যক হয়। একটি নমুনা—

শ্যাম-শুক নামে প্রিয় পাখী।
এদেশে এসেছে উড়ে—শ্রীরাধারে দিয়ে ফাঁকি।
এসেছি তার অন্বেষণে দেখা হলে বাঁচি প্রাণে
জানে না সে রাই নাম বিনে, রাই নামেতে সদা সুখী।
পাখা যদি দিত বিধি, পাখী হয়ে উড়ে যেতাম,
যে বনে প্রাণপাখী আছে, সে বনে তায় খুঁজে নিতাম;
পেয়ে থাকিস্ দেখা দেখা পাখীর মাথায় পাখীর পাখা—
আছে রাধার নামটি লেখা, দেখা নাই তায় ঝোরে আঁখি।

আর একটি—

মোহন চূড়া লাগে পায় আমাদের প্রাণে ব্যাথা পায়।
রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী যা করিস্ তাই শোভা পায়।
যে শ্রীহরি ধরে ত্রিপায় তাঁর চূড়া ভেঙ্গেছিস্ বাঁ পায়।
তবু তায় চাইলে না কৃপায় যাঁর পায়ে ধরে কেউ পা না পায়।
না হইতে তুই নারীর চূড়া ভাঙ্গিলে গো তাঁর মাথার চূড়া।
শুনেছিস্ যে ভেঙ্গে চূড়া কে কোথায় হয়েছে চূড়া?

যে চূড়ায় তুই দিয়েছিস্ পায় | ত্রিজগৎ তাঁর পায় পিণ্ড পায়,
শ্রীকৃষ্ণধনে যে পায় সে পায় | তা তুমি জান ত প্রায়
পায় ধরে তার ধয়ালি পায়॥
যাঁর সনে পুতনা দিল পায় | বকাসুর সমাজ পায়
সুদন বলে ধরি দু পায় | তায় আর ঠেল না দু পায়।

গানটিতে যে বিশেষ কবিত্ব আছে বলিয়া আমরা তুলিয়াছি, তাহা নহে; শব্দ-চাতুর্য্যই এখানে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। ভাব অপেক্ষা বাক্য-কৌশলই কবিত্বের পরিচায়ক বলিয়া এক সময়ে গৃহীত হইত। স্থলে স্থলে এইরূপ কৃত্রিমতা অসহ্য।

রূপ অধিকারীর ঢপ, পরমানন্দ অধিকারীর তুক্ক, এককালে অনেকের প্রিয় ছিল। তখনকার যাত্রাদির গীত-গানে কীর্ত্তনাঙ্গ সুরের লীলাতরঙ্গই অধিক দেখা যাইত।

এইবার আমরা পাঁচালীর কথা পাড়ি। কবি-গানের যখন যৌবন উত্তীর্ণ হয়, কবি গীতির তেজ যখন কেবলমাত্র শব্দ-যুদ্ধে পর্য্যবসিত হইয়া আসিয়াছে, তখন হইতে বঙ্গদেশে আধুনিক পাঁচালী গানের সূত্রপাত। এই পাঁচালী গান অধিকাংশ এমন অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট যে ইহার সহিত কবি-গানের অশ্লীলতা তুলনাই হইতে পারে না। আমরা বাছিয়া ভাল গানই দু চারিটা শুনাইব।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, বঙ্গের কাব্য-সাহিত্য প্রাচীন ভাগ আগাগোড়াই পাঁচালী। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, সকলের কাব্যই পাঁচালী। কিন্তু সেই নির্ম্মল পাঁচালী গান ক্রমে বঙ্গবাসীর রুচির বিপাকে পড়িয়া কেবল অনুপ্রাসিক বাক্যবিন্যাস, ঘৃণ্য অশ্লীলতা ও ছড়া-কাটাকাটির পালায় পরিণত হইয়াছিল। এই আবিলতার জন্য সে সময়কার সমাজ দায়ী—এ কথা বলা হইয়াছে; উৎসাহ ও প্রশ্রয় পাইত বলিয়াই ত অশ্লীলতা চাগাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পঙ্ক হইতে পদ্ম উঠে!

মধ্যে মধ্যে এতদূর মন্দ যে অপাঠ্য বলিলে রাগ যায় না। অজস্র ছড়া ও গানে কবিত্ব পরিচায়ক কোন কোন স্থল আছে, কিন্তু স্থলে স্থলে ইতরজনোচিত নিতান্ত অশ্লীল কথাবার্ত্তার সমাবেশে দাশুরায় শিক্ষিত সমাজের নিকট ইদানীং অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন।

বিধির নাই বিবেচনা।
থাকিলে আর এমন হতো না॥
স্বর্ণভূমি ফেলে রেখে বেনা বনে মুক্ত বোনা।
ধার্ম্মিকের খাদি কাচা অধার্ম্মিকের উড়ে কোঁচা
সতীদের অন্ন জোটে না, বেশ্যাদের জড়াও গহনা॥
রাবণের স্বর্ণপুরী শ্রীরামচন্দ্র বনচারী
পদ্মফুল ত্যজ্য করি যত্ন করে ঘুসীপানা।
সৃষ্টি সব সৃষ্টিছাড়া বাজিয়ে পায় শালের জোড়া—
পণ্ডিতে চণ্ডী পড়ে দক্ষিণা পান চারিটি আনা॥

সমসাময়িক রচনার দোষ—শব্দের কারচুপী—দাশরথীতেও যথেষ্ট আছে। একটি গানের নমুনা—

ননদিনি বলো নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে॥
কাজ কি গো কুল, কাজ কি গোকুল ব্রজকুল সব হোক্ প্রতিকূল
আমি ত সঁপেছি গো কুল অকুল-কাণ্ডারীর করে।
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে কাজ কেবল সেই পীতবাসে
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে সে কি বাসে বাস করে

কিন্তু শব্দ-সংঘাতের সৌন্দর্য্য দেখাইবার ক্ষমতা তাঁহার যে ছিল না—এমন নহে। দাশুর একটি গান—

* লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দন্তিতা ধনীমুখ করাল
স্তম্ভিত পদে মহাকাল কম্পিতা ভয়ে মেদিনী।*

দিক্‌বসনী চন্দ্র-ভাল আলুয়ে পড়ে কেশ-জাল
শোভিত করে অসি-কপাল প্রখরা শিখর-নন্দিনী॥
চারিদিকে যত দিক্‌পাল ভৈরবী শিবা তাল বেতাল
একি অপরূপ রূপ বিশাল কালী কলুষখণ্ডিনী॥

গম্ভীর ভাষায় গম্ভীর চিত্র!

যেমন ফুলের সঙ্গে কীটও দেবতার চরণে স্থান পায়, সেইরূপ দাশুরায়ের উৎকৃষ্ট রচনাগুলি কণ্ঠস্থ করিতে করিতে লোকে অপকৃষ্ট গুলিকেও মাথায় তুলিয়াছিল। দাশরথীর কোন কোন গান বাঙ্গালী ছাড়িতে পারিবে না; তাঁহার আগমনীর—

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকালো॥*

কিম্বা—

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণি তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কই আমার বলে
ডাক্‌চে মা তোর শশধর-বদনী—

হিন্দু ভুলিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এমন গান যে লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, সেই লেখনী "শিব-বিবাহে" আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে—

তোরা কেউ ধর্‌তে কুলো যাইস্‌নে ওলো কুলবালা।
মহেশের ভূতের হাটে এ সব ঠাটে সন্ধ্যাবেলা॥
যে রূপ ধরেছিস্‌ তোরা চিত্ত উন্মত্তকরা
চাঁদ যেন ধরায় ধরা, খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা॥

এ ত কতক রক্ষা, ঘৃণায় চক্ষু কর্ণ মুদিতে হয়—এমন গানও আছে। দাশুরায়ের কথায় আর কাজ নাই!

---

* কাহারও কাহারও মতে এ গানটি দাশরথীর রচিত নহে। অপ্রকাশিত-নামা কোন প্রাচীন কবির রচিত।

পাঁচালীর দুইটি ভাগ, গান ও ছড়া। আমরা গানের পরিচয়ই এখানে দিতেছি, ছড়ার পরিচয় অন্যত্র হইবে।

আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাঁচালী-রচয়িতা—রসিক চন্দ্র রায়। সাধক-সঙ্গীতে ইঁহার রচিত একটি সাধনার গান শুনাইয়াছি, পাঁচালীর গান একটি শুনাই—

কে রে নবীন-নীরদ-বরণী, কার ঘরণী।

জ্যোতির ঝলকে, চপলা চমকে, পলকে পলকে তিমির-নাশিনী॥
দিনকর-কর-নিকর চরণে সুধাকর-কর নখর-বরণে
নিবিড় নিতম্বে নিন্দে নীল স্তম্ভে শিখর কদম্বে তরাসদায়িনী।
পীনোন্নত কিবা যুগ্ম পয়োধর করি-কর-শুক উরু মনোহর
কটিতট করী-অরি-নিন্দাকর তাহে নর-কর কিঙ্কিনী॥
নর-শির মালে শোভে ভয়ঙ্কর চিবুকে রুধির দর দর দর
গভীর হুঙ্কারে গর গর গর থর থর থর কাঁপায় মেদিনী।
অর্ক-কোটি তেজে যেন তেজঃপুঞ্জ ধক্ ধক্ জ্বলে রক্তবর্ণ লঞ্জ
লক্ লক্ জিহ্বা এলাইত কঞ্জ বুঝি শম্ভু-মোহিনী॥
সিংহ-নিনাদিনী বিবাদিনী কে রে ধর ধর ধর ধর এ বামারে
রসিক বলে ধর, ধরিয়া সত্বরে কর এ হৃদয়-বাসিনী॥

গানে বাক্যাড়ম্বরও লক্ষিতব্য। ভাবের গাম্ভীর্য্যও আছে নিশ্চয়।

ঠাকুরদাস দত্ত একজন খ্যাতনামা পাঁচালীওয়ালা। উপাধিটায় কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা-ভাব আসিতে পারে, কিন্তু পাঠক মহাশয়েরা দেখিবেন, আমরা যে কয়জনের পরিচয় দিতেছি, সে পাঁচালীওয়ালাগণের পাঁচালীর গানে কবিত্ব প্রচুর। কবিওয়ালাদিগের ন্যায় পাঁচালী-দলেও সঙ্গীত-সংগ্রাম চলিত; প্রতিদ্বন্দ্বী দল থাকিত। শুনা যায়, ঠাকুদাসের দল গাওনায় কখনও কোথাও পরাজিত হয় নাই।

ছড়া থাক, আমরা গানই শুনাইব। কবির "শ্রীমন্তের মশান" হইতে একটি গান—

এই যে ছিল কোথায় গেল কমল-দল-বাসিনী।
লোকলাজ-ভয়ে বুঝি লুকাল শশীবদনী ॥
কোথায় গেল সে সুন্দরী কোথায় লুকাল সে করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, সে নারী কার কামিনী।
যে দেখেছি কালীদহে জাগিছে রূপ হৃদয়ে,
অপরূপ এমন মেয়ে দেখি নে কোথায়—
এখন সে কালীদয় হেরি সব শূন্যময়,
কেবল জলে জলময়, কোথায় সে করীধারিণী?

কমলেকামিনীর উপাখ্যান যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারা এ গানের মাধুর্য্য সম্যক্ বুঝিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গানটি অনেকের মুখস্থ ছিল। ঠাকুরদাসের রচনা বেশ প্রাঞ্জল; তাঁহার "কলঙ্ক ভঞ্জন" হইতে কিঞ্চিৎ বর্ণনা-পারিপাট্য দেখাই—

যা জানো তাই করো নাথ. আমি ত চলিলাম জলে।
বড লজ্জা পাবে হরি, দাসী তোমার লজ্জা পেলে ॥
চল্‌লাম লয়ে ছিদ্র ঘটে যদি কোন ছিদ্র ঘটে
গলেতে ঘট বেঁধে ঘাটে ত্যজিব প্রাণ 'কৃষ্ণ' বলে।
একে বুদ্ধি শূন্য ঘটে অঘটন ঘটনা ঘটে
যদি পড়ি হে সঙ্কটে, রেখো হে সে সময়—
কমলিনীর হৃদ-কমলে দাঁড়াও একবার বামে হেলে
দেখে যাই যমুনার জলে, দেখি কি ঘটে কপালে ॥

কবির "মানলীলা"র একটি গানে দুইটি ছত্র—

কোথা ছিলে হে নিশীথে এলে সুপ্রভাতে সু-প্রভাতে।
আধ আধ কালশশী, তোমার বাসি হাসি শ্রীমুখেতে ॥

এই "বাসি হাসি" বড়ই দুর্লভ একটা ভাব-প্রকাশ, কখনও বাসি হইবে না।

আমরা পাঁচালীকে গোড়ায় গাল দিয়াছি, এমন সব গান শুনিলে পাঁচালীওয়ালাগণ নিন্দার ভাজন মনে হয় কি? কিন্তু পাঁচালীতে

নিন্দা করিবার বিষয় অনেক আছে; ঈষৎ পরিচয় দিই।—কিছুকাল পূর্ব্বে তারকেশ্বরের এক মোহন্ত কুৎসিত মোকদ্দমায় হারিয়া কারাগার-বাসী হইলে রঙ্গের একটা গান উঠিয়াছিল—

মোহন্তের তেল নিবি যদি আয়।
এ তেল এক ফোঁটা দিলে, টাক ধরে না চুলে
কাণার চোখে দেখ্‌তে পায়॥
বিলাতী ঘানি নূতন আমদানী—
শিবের ষাঁড় জুড়েছে, তেলে তোলে কামিনী—
হয়েছে ল্যাজে গোবরে সৃষ্ট, কখন কি দায় ঘটায়।

গানের অন্তরাটি জুড়িয়াছেন ঠাকুরদাস!

কাহারও কাহারও মতে ইহা রসিকতা, আমরা বলি ইতরামী। প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন হইয়াও আমাদের অনেক কবি কি করিয়া যে এমন সব অভদ্রোচিত বেলেল্লাগিরি করিতেন, বুঝিতে পারা যায় না। দেখিলে রাগও হয়, দুঃখও হয়। সাময়িক বাতাসের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন।

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস ও গঙ্গানারায়ণ নস্করের পাঁচালীও এক সময়ে নাম কিনিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন শেষোক্ত ব্যক্তিই আধুনিক পাঁচালীর স্বষ্টিকর্ত্তা।

পাঁচালীকারদিগের ভিতর গোবর্দ্ধন দাস, কেশব চাঁদ, নন্দলাল, যদু ঘোষ প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। পরেও অনেকতক আছেন।

আমাদের দেশে যাত্রা-অভিনয় বহুপূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; * ইহা হইতেই থিয়েটারের উৎপত্তি বলা চলে।

সমালোচকগণের মতে, এই সকল যাত্রার সঙ্গীতও বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন পক্ষে সাধারণ সাহায্য করে নাই।

* 'যাত্রা' শব্দটা বহুপ্রাচীন। আমরা কবি ভবভূতির নাটকে 'ভগবান কালপ্রিয়নাথের যাত্রা-মহোৎসব' দেখিতে পাই। ত্রয়োদশ শত বর্ষ পূর্ব্বেকার কথা।

প্রাচীন যাত্রাগুলির সর্ব্বপ্রথমে "গৌরচন্দ্রী" পাঠ হইত; তাহাতে বোধ হয়, শ্রীগৌরাঙ্গের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময় হইতে যাত্রাসমূহ বর্ত্তমান আকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অনেকে অনুমান করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের সময় হইতে বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণ-যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। সেকালের কৃষ্ণ-যাত্রায় গৌরচন্দ্রী পাঠের পর কৃষ্ণের নৃত্য ও তদন্তে "মণি-গোসাঞি"র আবির্ভাব হইত। রামযাত্রা বোধ হয় আরও প্রাচীন; কেহ কেহ অনুমান করেন, হিন্দু-রাজত্বের সময় হইতে রামযাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়। সে সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের "রামলীলা" গোছ কিছু হইবে। চণ্ডীযাত্রাও বহু প্রাচীন। কিন্তু 'রামায়ণ গান' ও 'চণ্ডীর গান'—রামযাত্রা ও চণ্ডীযাত্রা অপেক্ষা বাঙ্গালীর সমধিক প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল।

পুরাবিদ্‌গণ লিখিয়াছেন—মেগাস্থেনিসের লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, বর্ত্তমান যাত্রাভিনয়ের ন্যায় যাত্রার গান পাটলিপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রচলিত ছিল। শিবযাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং রামযাত্রা তৎপরবর্ত্তীকালে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন ও শাকম্ভরীর নৃপতি বিগ্রহপাল প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার অংশ সম্পন্ন করিতেন। কৃষ্ণযাত্রা রামযাত্রার বহুকাল পরে প্রচলিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে শিব-সঙ্গীত ও শক্তি-সঙ্গীত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। শাক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গীতমালার অনুকরণে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত প্রাচীন বাঙ্গালী বুদ্ধদেবের উপাখ্যান গীতাভিনয়ে পরিণত করিয়াছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবের যুগে কৃষ্ণলীলার সঙ্গীত-তরঙ্গ বঙ্গদেশকে একেবারে প্লাবিত করিয়াছিল। পূর্ব্বতন যাত্রায় গোষ্ঠযাত্রা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি পালা ছিল।

আর একটি বিষয় এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্য-

দেবের সময়ে রায় রামানন্দ নাট্যাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার যাত্রায় রমণী Actress ছিল। চরিতামৃতে বর্ণিত আছে, তিনি নির্ব্বিকার-চিত্তে ষোড়শী চতুর্দ্দশী যুবতী অভিনেত্রীদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা পাঠ মুখস্থ করাইয়া অভিনয় করাইতেন।

সময়ে সময়ে মহাপ্রভু স্বয়ং অভিনয় ব্যাপারে যোগদান করিতেন। চৈতন্য-মঙ্গল ও চৈতন্য-ভাগবত হইতে অবগত হওয়া যায় যে লীলাময় গোপীকার বেশে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে নৃত্যগীত করিতেন।

চন্দ্রশেখরের যাত্রার নাম ছিল "হরিবিলাস"। শেখরী যাত্রার গানের একটি নমুনা—(ভৈরবী)—

দশদিক নিরমল ভেল পরকাশ। সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর। দাড়িম্বে বসিয়া কীর বলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী। তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর কমল নিয়ড়ে আসি মিলয়ে সত্বর॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর! জাগল সকল লোক নাহি মান ডর॥
শেখরে শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া। চোর হৈয়া সাধুপারা রহিলা শুতিয়া॥

এমন গান আমাদের সেই পদাবলী-সাহিত্য মনে পড়াইয়া দেয়। রচনা ত সেই অমৃত-নিষ্যন্দিন্ যুগেরই বটে। পূর্ব্বেকার যাত্রায় কীর্ত্তনাঙ্গ সুরের লীলাতরঙ্গই অধিক দেখা যাইত।

শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রায় বীরভূম-নিবাসী পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সময়ের লোক। তৎপরে শ্রীদাম সুবল অধিকারী কৃষ্ণলীলা বিষয়ে যশ অর্জ্জন করেন। এই কবির সমসাময়িক লোচন অধিকারী 'অক্রূর সংবাদ' এবং 'নিমাই সন্ন্যাস' গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ও কুমারটুলীর বিখ্যাত বনমালী সরকারের বাটীতে গাহিয়া তাঁহাদিগকে একরূপ-মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়াছিলেন; তাঁহারা কবিকে অপরিমিত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। করুণ-

রসে বিপ্লাবিত হইবার আশঙ্কায় কলিকাতার অপর কোন ধনী ব্যক্তি ইহাকে গান গাহিবার জন্য আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। বদন অধিকারীর 'দান' 'মান' 'মাথুর' প্রভৃতির খুব নাম আছে। কৃষ্ণনগর-নিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী ও বিক্রমপুর-নিবাসী কালাচাঁদ পাল পর-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যাত্রায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী 'মহীরাবণ-বধ' পালায় এবং বাঁকুড়ার আনন্দ অধিকারী ও জয়চন্দ্র অধিকারী রামযাত্রায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ চণ্ডীযাত্রা ও বর্দ্ধমানের লাউসেন বড়াল 'মনসার ভাসান' পালা গাহিতেন এবং দুইজনেই স্ব স্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় যশস্বী ছিলেন।

নীলকমল সিংহ, দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, মদন মাষ্টার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আরও কতকগুলি প্রাচীন যাত্রাওয়ালা আছেন। ইঁহাদের গাহনার পালায় গান হয়ত কোন কোন স্থলে অজ্ঞাতনামা কবি কর্ত্তৃক রচিত, কোন কোনটি সুন্দর বলিয়া উল্লেখ করা চলে। অনেক স্থলে যাত্রার অধিকারীর নামেই গান প্রচলিত, কিন্তু রচনা অপর কাহারও।

বক্স ইলাহি বা সেখ বকাউল্লা ওরফে বোকো মুসলমান এক ভাল যাত্রাদলের অধিকারী ছিলেন। হুগলী জেলায় ইঁহার জন্ম। ইনি মুসলমান হইয়াও বাঙ্গালা ভাষায় অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। অনুপ্রাসে গীত-রচনায় বকাউল্লা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিওয়ালার দলে আণ্টনী ফিরিঙ্গি, যাত্রার দলে বোকো সেখ—দেখিলে, 'ভাই ভাই একঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই' বাণীটা সার্থক মনে হয়।

প্রাচীন যাত্রাওয়ালা প্রায় ছত্রিশ জনের নাম পাওয়া যায়। এই ছত্রিশ জনের মধ্যে বিশ্বনাথমাল, রামময় দাস, রাজনারায়ণ দাস, লোকনাথ চাষাধোপা, মহেশ ঠাকুর, কান্ত তেলী, রঘু তামুলী প্রভৃতির নামও

উল্লেখযোগ্য। মদন মাষ্টারের দল ভাঙ্গিয়া বৌ-মাষ্টার, বৌ-কুণ্ডের দল গঠিত হয়, সে ও ছিল মন্দ নয়।

যখন চারিধারে যুড়ীরা দাঁড়াইয়া সুকণ্ঠ বালকদিগের সহিত "শুন শুন রসিক সুজন" প্রভৃতি ধুয়া গাহিতে গাহিতে হাততালি দিত, তখন যাত্রার আসর মাৎ হইয়া যাইত। এখনকার কালে যাত্রার আসরে আর সেকালের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায় না।

প্রথমতঃ প্রাচীন যাত্রাগুলির প্রায় সকলের সাধারণ নাম ছিল 'কালীয় দমন।' কালীয়-দমন যাত্রা শুধুমাত্র কালীয় নাগের দমন নহে। বোধ হয় কোন যুগে যাত্রা-রচনার মূল ছিল তাহাই, সেই জন্য এই নাম। ইহার ভিতর নৌকাবিহার, গোষ্ঠ মানভঙ্গ, কংসবধ, প্রভাস প্রভৃতি সকল কৃষ্ণলীলাই থাকিত।

যাত্রার কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ঘটিত সঙ্গীত গুলির নাম ছিল 'ঝুমুর।' যাত্রার বালকগণ একত্র হইয়া ঐক্যতানে ঝুমুর গাহিত। বোধ হয় বালকগুলির ঘুমুর-বাঁধা পায়ে ঝুমুর ঝুমুর তাল পড়িত, তাহা হইতেই হয়ত এই নামের উৎপত্তি। উত্তরকালে এই ঝুমুরের অনুকরণে যে ঝুমুর দলের প্রবর্ত্তন হয়, তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া বিরহ, সখীসম্বাদ, খেউড়, লহর প্রভৃতি গান করিত। তখন গানে কু আসিয়া পড়িল। কবিওয়ালাগণের খেউড় গানের সুরের সহিত ঝুমুর গানের সুরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

ঈষৎ আঁচ্ দিবার উদ্দেশে পরমানন্দ অধিকারীর দলের একটি ঝুমুর শুনাই—

ও যার অঙ্গ বাঁকা, চরণ বাঁকা, বাঁকা যুগল আঁখি।
হৃদয় নিদয় পাষাণ ও তা'র শোন্ গো বিধুমুখি।
ও মন চুরী করে বাঁশীর স্বরে
ও তা জানে গো জগৎ জনে।

তার সঙ্গে যাই প্রেম করে, সে কি প্রেমের মরম জানে।*

ঝুমুর নাচ-গান সাঁওতালগণের মধ্যে খুব চলিত। কে কাহার নিকট হইতে লইয়াছে বলা যায় না।

রাঢ়দেশের দু একজন নামজাদা যাত্রাওয়ালার সুবিদিত পালা হইতে যাত্রার গানের বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য গুটিকতক গান আমরা উদ্ধৃত করিব।

গোপাল উড়ের "বিদ্যাসুন্দর" পালায় এক সময়ে খুব নাম ডাক রটিয়াছিল। শুনা যায়, গোপালে মালীর মনিব বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক এই পালা সাজাইতে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, কলিকাতার কোন ধনাঢ্য বাবু রাধামোহন সরকার বিদ্যাসুন্দরের এক পালা সংগঠন করিতেছিলেন, রিহাস'লের সময় একদিন রাস্তায় এক ফিরিওয়ালা "চাই ভাল কলা" হাঁকিয়া যাইতেছিল; তাহার মিঠা গলা শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল, তাহার রসিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সেই নূতন যাত্রার দলভুক্ত করা হয়, সেই কলা-ওয়ালাই সুনামখ্যাত গোপাল উড়িয়া। গোপাল উড়ের টপ্পায় এক সময়ে বঙ্গদেশ মাতিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর অভিনয় দেখিয়া একজন সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"কাশী যখন মালিনী সাজিতেন,

---

* শুনা যায়—দেবদাসী, রাইরাণী, মা ভবানী, যুগলমতি, বামাদাসী—প্রভৃতি স্ত্রীলোকের ঝুমুর দল ছিল; ইঁহাদের ঝুমুরে নাকি অশ্লীলতার লেশমাত্র ছিল না অথচ পদাবলী "মধুময়ী ও উচ্চভাব-পরিপূর্ণা।"

ময়ূরভঞ্জীয় গানও এই জাতীয় বোধ হয়; একটি শুনাই—

ভাসিয়ে প্রেমের তরী হরি যাচ্ছে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হল দায়।
একে ত ত্রিভঙ্গ বাঁকা আড় নয়নে চায়।
চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা বাঁশরী বাজায়॥

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন এই গানের সহিত কি অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি (নাচ?) থাকে।

ভোলানাথ বিদ্যা সাজিতেন, আর উমেশ যখন সুন্দর সাজিতেন, সাজিয়া হাততালি দিয়া যখন গান ধরিতেন, ঈষৎ হেলিতেন, দুলিতেন, বঙ্কিম নয়নে চাহিতেন, তখন মনে হইত, এই ধরাধামে বুঝি বিধাতার এক অপূর্ব্ব এবং অপরূপ সৃষ্টি দেখা দিল।" এখনকার কালে ভদ্রলোকের মজলিসে এরূপ হইলে লোকে বোধ হয় ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দেয়।

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার গান একটিও গোপালের দ্বারা রচিত নহে; নানা স্থানের নানা কবি আসিয়া গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, বহু "ওস্তাদ" বহু স্থান হইতে জুটিয়া এই সকল গানে সুর লাগাইয়াছিলেন; কিন্তু যাত্রার অধিকারী—গোপাল উড়ের নামেই গান চলিত। তাঁহার ঘাড়েই আমাদের কাঁঠাল ভাঙ্গিতে হইতেছে।*

একটি স্বভাব-বর্ণনার গান——মালিনীর বাসা—

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার, চারদিকে মালঞ্চ ঘেরা।
ভ্রমরাতে গুণ গুণ করে, কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া॥
ময়ূর ময়ূরী সনে আনন্দিত কুসুম-বনে
আমার এই ফুল-বাগানে বসন্ত নয় তিলেক ছাড়া॥

গানের ভাষা দেখিলেই বুঝা যায়, লোকে আখড়াই গাহনার—ওস্তাদী সুরের প্রতিক্রিয়া দেখিতে চাহিতেছিল। আর একটি গানের অংশ—

কি ফুল ফুটেছে মজার তারিফ, বাহোয়া কি বাহোয়া।
সৌরভে গা উল্লসে ওঠে, লাগ্‌লে গায়ে ফুলের হাওয়া॥

সুন্দর বৰ্দ্ধমানে আসিয়া বাসার তল্লাস করিতেছেন জানিতে পারিয়া বিধবা মালী-বৌ ইঙ্গিতে বুঝাইতেছে—

---

* অনেকেই জানেন, গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত লোকের রচিত গানও এই পালার মধ্যে আছে; তাঁহারা এই উড়িয়া-পুঙ্গবের নামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্য-মতঃপরম্! সেই জন্যই—সময়ের আব্‌ হাওয়া বুঝাইতেই আমাদের এই নিন্দনীয় সন্দর্ভের অবতারণা।

হায় রে দশা কি তামাসা বাসার জন্যে ভাব্‌চো কেনে।
হৃদ-কমলে দিতে বাসা আশা করে কতই জনে॥
শুন নাগর তোমায় বলি নিত্য নিত্য কুসুম তুলি
সঙ্গে সঙ্গে ফিরে অলি, এই সুখে থাকি বর্দ্ধমানে॥

গোপনে রাজকন্যা লাভের বেয়াড়া বায়না শুনিয়া বাড়ীওয়ালী মাসী হীরা সুন্দরকে শুনাইয়া দিতেছে—

কোথাকার হাবা ছেলে হাসি পায় শুনে।
সদা বলে কই মাসী তুই বিদ্যা দিলি নে—
আঁচলে কি বাঁধা আছে দিব তা এনে?

বিদ্যার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে সুন্দর সন্ন্যাসী-বেশে রাজসভায় আনা-গোনা করিতেছেন, সকলেই ভয় খাইয়াছে, বিদ্যার আয়ি—মালিনী মাসী—সর্ব্বনেশে পণের কথা তুলিয়া রাজনন্দিনীকে তামাসা করিতেছে—

ভাল ধ্বজা দিলি লো তুলে এ রাজাবই কুলে।
সন্ন্যাসিনী হয়ে রবি সন্ন্যাসী বুলে।
আখড়া-ধারী মহৎ আশ্রম অতিথি আস্‌বে রকম রকম
গাঁজাতে লাগাবি লো দম্ "ব্যোম কেদার" বলে॥

যাত্রার গানের ভাল মন্দ দিক্—দুই-ই এইরূপ গীত হইতে বুঝা যায়। চলিত কথায়—ইয়ারকির বুলীতে কেমন মজাদার গান বাঁধা চলে!

আমাদের লোকের রুচিকেও বাহবা দিতে হয়। ভদ্রলোকের ভবনে, ভদ্রলোকের আসরে, নিশ্চয়ই মাতা ভগিনী কন্যার শ্রবণ-গোচরে, নিশ্চয়ই পিতাপুত্র পর্য্যন্ত একত্র বসিয়া শুনিতেন—গুণসিন্ধু-রাজকুমার মালিনীকে "মাসী" সম্বোধন করাতে হীরা আড়খেমটা ধরিল—

"যাদু এমন কথা কেন বল্‌লি।
ভোরের বেলায় সুখের স্বপন, এমন সময় জাগালি।"

মালিনীর ফুল যোগাইতে বেলা দেখিয়া বিদ্যা কালেংড়া কাওয়ালীতে শুনাইয়া দিতেছে—

"ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ।
বলি, আবার কি পুরাণো প্রেম জ্বালিয়ে তুলেছ ?"

ভারতচন্দ্রও বকুলফুলের এমন সদগতি করিতে সাহসী হন নাই। এই সকল নীচ রসিকতায় সভাশুদ্ধ লোকের হাসির হর্‌রা আমরা যেন শুনিতে পাইতেছি। এমন সব গানের সঙ্গে থাকিত আবার নৃত্য—নৃত্য নয়, কাঁকাল দুলাইয়া লজ্জাকর অঙ্গভঙ্গী!

তখনকার যাত্রায় পাত্র পাত্রী সকলকে নাচিতেই হইত; নাচ না হইলে আসর জমিত না। কৃষ্ণের নৃত্য, রাধার নৃত্য, রাবণের নৃত্য, সীতার নৃত্য, কৈকেয়ীর নৃত্য—মেথর, ভিস্তি, মালিনী কি বিন্দা—সকলকেই নৃত্য দ্বারা দর্শক-মণ্ডলীর তৃপ্তিসাধন করিতে প্রয়াস পাইতে হইত; স্থান কাল পাত্র বিবেচনার আবশ্যক ছিল না।*

ঠোঁটে হাসি, ভাবভঙ্গীময় নৃত্য সহকারে মালিনীর মুখে—

"যামিনীতে কামিনীর ফুল নিত্য নে যায় চোরে" †

কিম্বা—

"এস যাদু আমার বাড়ী আমি দিব ভালবাসা।
যে আশায় এসেছ ও ধন, পূর্ণ হবে মনোআশা॥"

শুনিয়া বোধ হয় সভাস্থ সকলেই তারিফ করিতেন—কি কথার বাঁধুনি! ইহাই আসল কবিত্ব! চুট্‌কি রাগিণীতে আসর মাৎ হইয়া যাইত।

---

* জনৈক সমালোচক বেশ পরিচয় দিয়াছেন—
"গায়েন নাচে বায়েন নাচে নাচিছে দোহার। খাতা হাতে নৃত্য করে কবির সরকার॥"
ইহার আর একটি মতও বড়ই ঠিক—
"আসরের সজ্জা গজ্জা লজ্জা বাদে সব। সবটিতে একঠাই যেমন সম্ভব॥"

† গানটার এমন বিশ্রী ভাবের কথা আছে, পড়িতে শুনিতে লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হইতে হয়। সামাজিকগণ কি করিয়া যে এমন সব গানের, এমন সব পালার প্রশ্রয় দিতেন, আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। কি অদ্ভুত প্রবৃত্তি!

যে বিষবৃক্ষের বীজ ভারতচন্দ্র রোপন করিয়া গিয়াছিলেন, * উর্ব্বরা ক্ষেত্রেই পড়িয়াছিল; প্রায় শতবর্ষ পরেও উৎকলের সুসন্তান এই যাত্রাওয়ালা সুন্দরকে দেখাইয়া নাগরীগণের মুখ হইতে শক্করা আড়-খেমটায় বাহির করিয়াছেন—

রাখি ওরে হৃদ্‌মাঝারে পাই যদি সই ওই নাগরে।
নয়ন-ঠারে মন হরেছে প্রাণ কি সরে থাক্‌তে ঘরে॥
বাঁচিনে আর মদন-শরে   ঢলে পড়ি যৌবন ভরে॥
প্রাণসজনি উহার তরে   ঝাঁপ দিয়েছি প্রেমসাগরে॥

শুধু মালিনী মাসীই ধরা পড়ে নাই। এই বিদ্যাসুন্দর পালাই ছিল যাত্রার টেক্কা!

এই দলের কাহারও রচিত একটি প্রভাত-বর্ণনা শুনাই—অবশ্য কাওয়ালী;—বিদ্যার প্রতি সুন্দরের উক্তি—

গা তোল রে নিশি অবসান (প্রাণ)।
বাঁশ বনে ডাকে কাক   মালি কাটে কপিশাক
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান॥
আহ্লিকার মত আসি   উঠ ওলো প্রাণ-প্রেয়সি
অস্থানেতে গেল শশী   জাগিল সব প্রতিবাসী
বিধুমুখে মধুর হাসি,   কোকিল করে গান॥

তোফা!

এই সময়কার আর এক দলের বিদ্যাসুন্দর পালার একটি গানের দু ছত্র;—চোর ধরার পর নাগরীগণের উক্তি—

* আমরা ভারতচন্দ্রের উপর ঝাল ঝাড়ি, কেন না ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরই সব চেয়ে সুন্দর; কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হয়, চার চারখানি কাব্য বিদ্যাসুন্দর প্রায় একই সময়ে দর্শন দিয়াছিল—অশ্লীলতা হিসাবে এ বলে আমায় দ্যাখ ও বলে আমায় দ্যাখ! বলিহারি সে সময়কার, সমাজের পসন্দ। (তবু ক্ষেমানন্দ ও মধুসূদন রচিত দুইখানি বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখ আমরা করি নাই,—রচনাকাল অনির্দ্দিষ্ট।)

"সুন্দর পড়েছেন ধরা শুনেছ কি ও ঠাকুর-ঝি।
সোণার অঙ্গে মারুচে ছড়ি, হাতে দড়ি, বাকি আর কি ॥"

আর না—আমরাও ধন্যবাদ দিয়া, কবি,দর্শক ও শ্রোতাগণকে নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় হই।

সে সময়কার আর একজন "ডাকসাইটে" যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী; গোবিন্দের ছিল কৃষ্ণযাত্রা, ইহার মাথুর গান এক একটি বড় সুন্দর—

কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, ব্রজে হাহাকার পড়িয়াছে, শ্রীরাধার দুঃখ দেখিয়া গোপীগণ দূতীরূপে মথুরাপতির নিকট যাইতে উদ্যত, শ্রীমতী নিষেধ করিতেছেন—

তোরা যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে দূতি।
গেলে কথা কবে না সে নব ভূপতি ॥

কিন্তু এ ত মুখের কথা, অভিমানিনীর অন্তরের ইচ্ছা অন্যরূপ, তবু সংগোপন—

যদি যাস্ সে মধুপুরে আমার কথা কস্‌নে তারে
বৃন্দেরে তোর করে ধরে করি মিনতি ॥

কিন্তু বৃন্দাদূতী মনের ভাব বুঝিয়াছিল; সে যাইয়া মথুরেশকে তত্ত্ব জানাইল—

ব্রজের কুশল কব কি নব ভূপতি।
মা যশোদা পিতা নন্দ কাঁদিয়ে হয়েছে অন্ধ
বলে—দেখা দে রে প্রাণ-গোবিন্দ, কাঁদতেছে যশোমতী ॥
যমুনা পার হয়ে এলাম 'রাই মলো' রব শুনতে পেলাম
"রাই মলো, রাই মলো" বলে কাঁদতেছে সব যুবতী।
কোকিল কাঁদে তমাল ডালে ভ্রমর কাঁদে শতদলে
গোবিন্দদাসেতে বলে এমন সুখের হাটে ডাকাতি ॥

আমরাও না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না।

এই মাথুর গানের ভিতর অন্য রসের ছিটাফোঁটাও থাকে। একটি শুনাই—

শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি পাখী ধরেছি নয়ন-ফাঁদে।
তারে— হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিতাম ধরে প্রেম-শিকলেতে বেঁধে ॥
যখন—পড় পড় বলি দিতাম করতালি পাখী ডাকিত শ্রীরাধা বলে।
পাখী—কিছু দিন রয়ে শিকল কাটিয়ে এসেছে হেথায় উড়ে ॥
এখন—পরম্পরা শুনি কুব্জা নামে রাণী রেখেছে সে পাখী ধরে।
ওহে—দোহাই মহারাজ কইতে পাই লাজ এসেছে পাখী এ পারে ॥
আমি—কহি পুটাঞ্জলে তোমার তক্ত বিজে পাইতে সে কি পারে—
ওহে তার পাখী সে কি পাইতে পারে?

মধুকানের এইরূপ একটী গান পূর্ব্বে শুনাইয়াছি।

আমরা সকল জাতীয় গানের নমুনা দেখাইব; গোবিন্দ অধিকারীর আর একটী সুপ্রচারিত গান—শুক-শারীর দ্বন্দ্ব—

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥
শুক বলে—আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে—আমার রাধা বামে যতক্ষণ ॥—*
নৈলে শুধুই মদন ॥
শুক বলে—আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে—আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল —
নৈলে পারবে কেন?
শুক বলে—আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখা।
শারী বলে—আমার রাধার নামটি তাতে লেখা—
ঐ যে যায় গো দেখা ॥
শুক বলে—আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।

---

* গানটির মূল—অন্ততঃ এই দুই ছত্রের—চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে শুক-শারী মহাপ্রভুকে শুনাইয়া দিয়াছিল—

"রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।"

(মধ্যলীলা ১৭ প) ২০১

শারী বলে—আমার রাধার চরণ পাবে বলে—

চূড়া তাইতে হেলে।

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ যশোদা-জীবন।

শারী বলে—আমার রাধা জীবনের জীবন—

নৈলে শূন্য জীবন।

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ জগৎ-চিন্তামণি।

শারী বলে—আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী—

সে তোমার কৃষ্ণ জানে।

শুক বলে—আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।

শারী বলে—সত্য বটে বলে রাধার নাম—

নৈলে মিছে সে গান।

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।

শারী বলে—আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু—

নৈলে কে কার গুরু।

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।

শারী বলে—আমার রাধা প্রেমের লহরী—

প্রেমের ঢেউ কিশোরী।

শুক বলে—আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা।

শারী বলে—আমার রাধা করে আনাগোনা—

নৈলে যেত জানা।

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।

শারী বলে—আমার রাধার রূপে জগৎ আলো—

নৈলে আঁধার-কালো।

শুক বলে—আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।

শারী বলে—সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী—

নৈলে হত কাশীবাসী।

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ।

শারী বলে—আমার রাধা স্থগিত পবন—

সে যে স্থির পবন

শুক বলে—আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে—আমার রাধা জীবন করে দান—
থাকে কি আপনি প্রাণ ?
শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধাকৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল॥

এ ত কতকটা রঙ্গ-রহস্য; কিন্তু সুধু হাসিঠাট্টা নহে, গুরুগম্ভীর গানও আছে; একটি শুনাই—

শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীচরণারবিন্দ- মকরন্দ পান কর মন-ভৃঙ্গ।
বিষয়-কেতকী-কাননে ভ্রম কি, সেই বনে ভ্রম যে বনে ত্রিভঙ্গ॥
বৃন্দাবন-প্রেম-সরোবর মধ্য অনন্তরূপিনী কোটি গোপপদ্ম,
পদ্ম মধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যার মৃণাল সঙ্গ।
ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মুরতি মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি
রাখ রতি মতি ঐ মধুর ভাব প্রতি (মন) মধুপুরে যেন দিওনা ভঙ্গ॥
গুণ গুণ স্বরে গাও রাধাকৃষ্ণের গুণ মধু পাবে, যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ
বাড়িবে সদ্‌গুণ, ত্যজিবে বিগুণ নির্গুণ গোবিন্দ গায় গুণপ্রসঙ্গ॥

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে লোকের এমন সব পরমার্থিক সঙ্গীত অপেক্ষা ভাল লাগিত বোধ হয়—

"মদন আগুণ জ্বল্‌চে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী।"

অনেক যাত্রাওয়ালা, অনেক যাত্রার পালা-প্রণেতা এই সময়ে আছেন; আমরা আদর্শরূপে দুই প্রকার দুইজনকে ধরিয়াছি।

থিয়েটার অভিনয়ে যেমন Farce বা প্রহসন থাকে, যাত্রার পালায় তেমনি কালুয়া-ভুলুয়া থাকে, মট্‌রু থাকে, সং থাকে। এই সংএর পাল্লা হইতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও রেহাই পান নাই। মনে আছে, আমরা একবার এই ধরণের অভিনয়ে দেখিয়াছিলাম;—অল্পবয়স্ক কৃষ্ণ, রাধা তাঁহার পিতামহী-বয়সী; মানু-অভিমানের পালা সাঙ্গ হইলে, রাধা কৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইলেন; সখীরা গান ধরিল—

"চম্পক-বরণী রাধা শ্যাম কচি খোকা।
রাধা-শ্যামে শোভে যেন আরসুলো-কাঁচপোকা।"

দর্শকবৃন্দের আহ্লাদের ধূম দেখে কে? কৃষ্ণ-ভক্তিকে তারিফ করিতে হয়! হুতোমের জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণ্‌কে কেহ বোধ হয় ভুলেন নাই; তবু শুনাই—

তারিণি মা, হাতির উপর কেন এত আড়ি।
মানুষ মেলে টের্‌টা পেতে, তোমায় যেতে হত হরিণবাড়ী॥
সুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেত গড়াগড়ি।
পুলিশের বিচারে শেষে স'প্‌তো তোমায় গ্র্যাণ্‌ জুরী।
সিঙ্গি মামা টের্‌টা পেতেন ছুট্‌তে হতো উকিল-বাড়ী॥

স্বীকার করিতে হয় এ গান তবু পদে আছে।

এইবার আমরা যাত্রার মনোহারীত্বের একটু পরিচয় দিয়া কথা শেষ করি।

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ—গরাণহাটি, রেণেটি, মান্দারণি ও মনোহর সাই। উদ্ভব-স্থান হইতে বোধ হয় এই চারি নাম। প্রাণের কাঁদুনী গাহিতে মনোহর সাই সুরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে হয়। বৈষ্ণবগণ এই সুরে রচিত বিলাপ-গাথায় বাঙ্গালীর প্রাণ আন্‌চান্‌ করিয়া ছাড়িয়াছেন। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর বাঁধাবাঁধি সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া এই সুর মর্ম্ম স্পর্শ করে। কীর্ত্তনাঙ্গ সুরে বাঙ্গালীর গান আজ-কালকার নহে, বহু পুরাতন। পুরাতত্ত্ববিৎ সমালোচকগণ কহিয়াছেন—খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মহীপাল রাজার গীত-গায়কেরা কীর্ত্তন সুর প্রবর্ত্তিত করেন। মহাযান-সম্প্রদায়ী বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ এই সুরেই তাঁহাদের দোঁহাবলী গাহিতেন। শ্রীচৈতন্য প্রভুর চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের রাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের সভার রাজ-কবি জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলী কীর্ত্তন সুরে গীত হইত। পরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের গীতিমালাও মনোহর সাই কীর্ত্তন সুরে বাঙ্গালীর শ্রবণ জুড়াইত

বৈষ্ণব-গীতিপ্লাবন সময় হইতে এই সুর অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া ক্রমশঃ মাধুর্য্যের চরম সীমায় পঁহুছিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে মনোহর সাই সুরের বড় আদর ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী রচিত যাত্রার পালা * কতকগুলি আছে, তাহার মধ্যে "দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী," "স্বপ্নবিলাস," "বিচিত্র বিলাস" প্রসিদ্ধ। আমরা এই বাঙ্গাল-কবির মনোহর সাই সুরের একটি গান শুনাই;—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ধাবিতা বিরহোন্মাদিনী রাধিকাকে নর্ম্ম-সহচরী বুঝাইতেছে—

রাই, ধীরে ধীরে চল গজগামিনী।
অমন করে যাইস্ না যাইস্ না গো ধনি
(তোরে বারে বারে বারণ করি রাই!)
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু—(রাধে প্রেমময়ী!)
মরি মরি হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো।
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি?—(চঞ্চলা হইলি কেন?)
না জানি আজ কোথা পড়ে প্রাণ হারাবি গো।
কত কণ্টক আছে গো বনে;—(ধীরে যা গো কমলিনি!)
ফুটিবে দুটি চরণে গো!
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে—গহন কানন মাঝে!
(দেখিস্ ধনি দেখিস্ দেখিস্) কমল-পদে দংশে পাছে গো!
হলো নয়ন-ধারায় পিছল পথ—(আর কান্দিস্ না বিধুমুখী!)
(বলি) যাইস্ না রাধে এত দ্রুত গো।
আদের কান্ধে দুটি বাহু থুয়ে—(আমরা ত তোর সঙ্গে যাব)—
(কমলিনি) চল্ গো পথ নিরখিয়ে গো।

পূর্ব্ববঙ্গে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কবিত্ব-গৌরব সমধিক; সেখানে ইহাঁর নাম "বড় গোঁসাই।" কৃষ্ণকমল পরম ভাগবত ছিলেন। ঢাকাবাসীর

* গোস্বামী ঠাকুর 'যাত্রার পালা' বলেন নাই; "সঙ্গীত-বহুল নাটক" নাম ব্যবহার করিয়াছেন। এখনকার ভাষায় অপেরা বা গীতিনাট্য বলিতে হয়।

বকট গোস্বামী ঠাকুরের নামের—গানের—খাতিরের সীমা নাই। আমাদের দেশে এখনকার কালে যাত্রাওয়ালা নামের সঙ্গে তাচ্ছিল্য-ভাব আসিয়া পড়ে, কিন্তু বড় গোঁসাই ঠাকুর যাত্রার পালা-রচয়িতা হইয়াও প্রকৃত কবি। ইঁহার রচিত অনেক গান যথার্থই মনোরম। প্রেম-প্রতিদ্বন্দী চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছাপন্না রাধিকার রূপ দেখিয়া কহিতেছেন—

অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি।
(চরণ কমল হতেও সুকোমল গো!)
আল্‌তা পরাতো বঁধু কতই বাখানি।
এ কোমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে—
(বঁধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে)
হেন বাঞ্ছা হত যে পাতিয়ে দেই হিয়ে।

কি তপস্যার ফলে রাধাসুন্দরী কৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন, আপনি জানাইতেছেন—

প্রেম করে রাখালের সনে ফির্‌তে হবে বনে বনে
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে—
সখি আমায় যেতে যে হবে গো 'রাই' বলে বাজিলে বাঁশী;—
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল করিয়ে অতি পিচ্ছিল
চলাচল তাহাতে করিতেম্—
সখি আমায় চল্‌তে হবে যে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে!
হইলে আঁধার রাতি পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম্—
সদায় আমায় ফির্‌তে হবে যে গো, কণ্টক-কানন মাঝে।

আমরা সে চিরপরিচিত মানময়ী অভিমানিনী রাধাকে ভুলিয়া যাই; গোস্বামী ঠাকুরের এই ক্ষমাশীলা উদারহৃদয়া রাধা বলিয়া থাকেন—

বঁধু, আমার মত তোমার অনেক রমণী,
তোমার মত আমার তুমি গুণমণি।
যেমন দিনমণির কত কমলিনী,
কমলিনীগণের একই দিনমণি।

কৃষ্ণকমলের রাধা এক অভিনব চরিত্র ; প্রকৃতই রাই উন্মাদিনী !

দাসখতের সর্ত্তানুসারে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে মথুরা হইতে বাঁধিয়া আনিবেন বলাতে প্রেম-বিহ্বলা ভয়কাতরা হইয়া নিষেধ করিতেছেন—

বেঁধ না তার কমল-করে, ভৎর্সনা করো না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখ।
যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে, তাই ভেবে ফাটে মোর বুক॥

এ রাধিকা প্রাচীন বৈষ্ণব-কাব্য রত্নাগারেও দুর্লভ।*

গোস্বামী ঠাকুরের আর একটি গান,—বাৎসল্য রস কিঞ্চিৎ—

এ ঘর হতে ও ঘর যেতে অঞ্চল ধরি সাথে সাথে
বল্‌ত দে মা ননী খেতে,
সে ননী অবনীতে প'ড়ে র'ল গো!—

এখনও পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বৈরাগীগণ সারেঙ্গ বাজাইয়া, বালকগণ

---

* এই গানটি আর একটি মনোহর প্রাণের উচ্ছ্বাস স্মৃতি-পথে আনয়ন করে; রাধা বলিতেছেন—

"আমি মরি মরিব তারে বেঁধো না।
হে দূতি, তোর পায়ে ধরি তারে বেঁধো না।
সে আমারি প্রিয়—
সে যেখানে সেখানে থাকুক্, তারে রাধানাথ বই তো বলিবে না॥"

এইখানে আমরা কীর্ত্তনাঙ্গে একটু সখ্য-রসের পরিচয় না উঠাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। ব্রজ-বিধ্বংসকারী দুর্জ্জয় কালীয় নাগকে দমন করিবার উদ্দেশে বালক শ্রীকৃষ্ণ বিষময় কালীহ্রদে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন, আর দেখা নাই। সঙ্গী ব্রজবালকগণ অন্ধকার দেখিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পরস্পর বলাবলি করিতেছে—

চল চল সবে চল্, আমরা বলিগে মায়েরে গিয়ে।
তোর অঞ্চলের মণি, শুন গো জননী, এলাম ভাসায়ে দিয়ে॥
ব্রজকুল-শশী অস্ত হল এতদিনে, ভুবন শূন্য হল—
মোদের ফুরাইল আশা, নাহিক ভরসা, আমরা থাকিব কি ধন লয়ে!

বালক-কণ্ঠে কীর্ত্তনাঙ্গ সুরে এই গান শুনিতে শুনিতে আমাদের সেই ব্রজের কথাই মনে আসে, অশ্রুসম্বরণ দায় হইয়া পড়ে।

পথে পথে ঘুরিয়া, গাহিয়া বেড়ায়; প্রেমিক ভক্তবৃন্দ উদ্বেলিত হৃদয়ে শ্রবণ করেন, জননীগণের বসনাঞ্চল নয়ন-কোণে উঠে!

কবির "দিব্যোন্মাদের" এই গানটি তাঁহার রচিত 'স্বপ্নবিলাসের' এমনই সুন্দর আর কয় ছত্র মনে পড়াইয়া দেয়—

শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে!
যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরিয়া কাঁদে, "জননি দে ননী দে ননী বলে॥"
নীল কলেবর ধূলায় ধূসর বিধুমুখে যেন কত মধুর স্বর
সঞ্চারিয়ে ডাকে 'মা' বলে।
কত কাঁদে বাছা বলি সর সর আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্
নাহি অবসর, কেবা দিবে সর সর্ সর্ বলি ফেলিলাম ঠেলে॥
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন-চাঁদ,
পুন চাঁদ কাঁদে চাঁদ চাঁদ বলে।
যে চাঁদ নিছনি কোটি চাঁদ ছাঁদ সে কেন কাঁদিবে বলে চাঁদ চাঁদ
বল্‌লেম চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ
ঐ দেখ্ চাঁদ আছে তোর চরণ-তলে॥

যাত্রার পালা রচয়িতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী। ইনি যাত্রার নাম উজ্জল করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণকমলের অন্যান্য পালাও আছে; গোস্বামী ঠাকুর কথকতাও করিতেন। রসিক কথকের সরস কথকতায় আবালবৃদ্ধবনিতার চক্ষে অশ্রুর উৎস ছুটিত।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন; অতএব তিনি অধিক প্রাচীন কবি নহেন; কিন্তু তাঁহার মনোমদ পালাগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ মধ্যে রচিত, সেই হিসাবে তাঁহাকে এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা বোধ করি অন্যায় হইল না।

আমরা যে সকল কবিওয়ালা পাঁচালীকার, যাত্রাওয়ালার নামোল্লেখ করিয়াছি, সময় হিসাবে ঠিক পর পর বলা হয় নাই। অনেকের—

বিশেষতঃ কবিওয়ালাগণের—পরিচয় কুহেলিকাচ্ছন্ন; বহুস্থলে ঠিক সময় নির্দ্ধারণ করা অন্ধকারে লোষ্ট্র প্রক্ষেপ। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, দেড়শত দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার আমাদের বাড়ীর পার্শ্বের খবর আমরা জানি না, সংগ্রহ করাও সুসাধ্য নহে। মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে দুই চারিটি ব্যতীত, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত—এই শত বৎসরের মধ্যেই ইহাঁদের প্রাদুর্ভাব। এই অবধিই আমরা বঙ্গীয় কাব্যের—বঙ্গের কবিতার—প্রাচীন ভাগ ধরিয়াছি। ইহার পর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব—আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের উন্মেষ; সে অংশ আমরা প্রবন্ধান্তরে বলিব।

গীত গান হিসাবে এই যুগের মধ্যে হরি-সংকীর্ত্তন, বাউলের গান, কর্ত্তাভজাদলের "ভাবের গীত" প্রভৃতি রাশি রাশি আছে; ইহারও কতক কতক নিশ্চয় সুন্দর। সে সকলের যথেষ্ট পরিচয় দিবার স্থান আমাদের নাই।

"তাথৈয়া তাথৈয়া নাচত ফিরত গোপাল ননি চুরী করি খাঞিছে"

প্রভৃতি স্পষ্ট প্রাচীন বৈষ্ণবকবিগণের অনুকরণ কীর্ত্তনের গান ছাড়িয়া আমরা সচরাচর প্রচলিত দু একটি শুনাইব; এ গুলি অধিক পুরাতন রচনা নহে। একটি কীর্ত্তন—

হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে (বল মাধাই মধুর স্বরে)
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

নারদ ঋষি দিবানিশি বীণা-যন্ত্রে গান করে।
ঋষি যারে দেখে তারে বলে "বল হরি বদন ভরে॥"
গৌর নিতাই এরা দু ভাই নাম বিলায় ঘরে ঘরে।
এরা অযাচকে প্রেম যাচে জেতের বিচার না করে॥
নামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।
এই হরিনাম-সুধারস পিও রে বদন ভরে॥

হরি নামের গুণে গহন বনে একলা গেল ধ্রুব রে।
প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা পেলে শিলে ভাসে সাগরে॥
জগাই বলে আয় রে মাধাই গঙ্গাজলে স্নান করে।
নামের তরী ঘাটে বাঁধা ডাক্‌লে পরে পার করে॥

আর একটি—

এনেছি কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে "কে লবি আয়, কে লবি আয়।"
"প্রেম কে লবি, কে লবি আয়, প্রেম কে লবি, কে লবি আয়॥"
নিতাই আপনি মালী মাথায় ডালি প্রেম-ধন বিলায়ে যায়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদেপুর ভেসে যায়॥
এই ধর ধর লও হে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়।
নিতাই হরি-প্রেমে আপনি মেতে জগৎ মাতায়।
যে জন না প্রেম চায়, তারে যাচিয়া বিলায়॥

প্রাচীন কি আধুনিক কাহার রচিত জানি না, একটি অতীব হৃদয়গ্রাহী মধুর কীর্ত্তন—এইখানে শুনাইয়া রাখি—

যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি।
সে রূপ লুকালি কোথা করালবদনি (গো মা)?
একবার নাচ গো শ্যামা—
তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি করে, একবার নাচ গো শ্যামা;
করের অসি ফেলে মোহন বাঁশী লয়ে
একবার নাচ গো শ্যামা।
মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা পরে,
একবার নাচ গো শ্যামা।
সে রূপ কেন দেখি না গো মা?
গগনে বেলা বাড়িত রাণীর মন ব্যাকুল হত
বল্‌ত 'ধর রে ধর রে গোপাল ক্ষীর সর নবনী॥'
এলায়ে চাঁচর কেশ মা বেঁধে দিত বেণী (গো মা)
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে (গো মা)—
তাতে তাতা থেইয়া থেইয়া, তা তা থেইয়া থেইয়া

বাজিত নুপুর ধ্বনি।
ধ্বনি শুনি আস্‌ত যত ব্রজের রমণী (গো মা)
ও মা ভুবনমোহিনী।

এ রকম গান মন্তব্যের আবশ্যকতা রাখে না।

যখন বিলাসী বাঙ্গালী কবি-গানে, পাঁচালীতে, টপ্পায়, নেশায় আর মজায় মসগুল্ হইয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া আলবোলা টানিতেছিলেন, তখন চমক দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে এমন গানও গীত হইতেছিল—

হরিনাম খাসা গুড়ুক	ভুড়ুক ভুড়ুক	টান দেখি মন দিবানিশি।
নেশায় গা মেতে যাবে	মজা পাবে	মনে মনে হবে খুসি।
ভক্তি-কল্‌কেতে সেজে	টান্‌লে তেজে	হয় রে মজা বেশী বেশী।
প্রবৃত্তি-হুঁকো ধরে	যত্ন করে	দম্ লাগাও তায় বসে বসি।

আয়েসী লোককে প্রবৃত্তি মার্গ হইতে নিবৃত্তির পথে ফিরাইবার উদ্দেশে মন-রাখা কথায় বুঝাইবারই বোধ হয় প্রয়োজন ছিল।

আমোদের হ্রদে ডুবুডুবু সৌখীন ফুলবাবুকে চেতাইতে বাউল সাজিয়া, ফকির সাজিয়া, মাঝে মাঝে চিম্‌টি কাটাও আবশ্যক হইত। গোলক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে "দীন বাউলের" একটি বাউল গীত শুনাই—

বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে, শ্মশান-ঘাটে যাচ্চ চলে।
সঙ্গে সব কাঠের ভরা (হায় কি দশা)
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, লট বহরা, জাত বেহারার কাঁদে দুলে॥
অই শুন, ঘরে পরে সবাই কাঁদে, ছেলেরা কাঁদে "বাবা" বলে।
কোথা সে সব মমতা (হায রে দশা)
কোথা সে সব মমতা, কওনা কথা, এখন কি তা ভুলে গেলে?
ঘুরে যে দিল্লী লাহোর, ঢাকা সহর, টাকা মোহর নিয়ে এলে।
খেতে না পয়সা সিকি (হায় রে দশা)
খেতে না পয়সা সিকি, কও হে দেখি, তার কিছু কি সঙ্গে নিলে?
বুঙ্গ বেরঙ্গ শালের জোড়া, গাড়ী ঘোড়া, চেন ঘড়ী সব কোথায় থুলে।
হবে যে এমন দশা (হায় কি দশা)

হবে যে এমন দশা, দশম দশা, জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে?
শক্রতা প্রকাশিতে যাদের সাথে, হয়বেতে সেই সকলে,
বল্‌চে "ভাই ভালই হল" (ঐ দেখ সব)
বল্‌চে "ভাই ভালই হল, বালাই গেল, হাড় জুড়লো এত কালে।"
খেদে দীন বাউলে কয়, এ সমুদয় দেখে শুনেও লোক সকলে।
একটি দিন এ ভাবনা (হায় কি দশা)
একটি দিন এ ভাবনা, কেউ ভাবেনা, বিষয়-মদে থাকে ভুলে॥

এই যুগের শেষাশেষি সময়ে, "ফিকির চাঁদ" ফকিরের বাউল গীত দেখা দেয়। কবি আপনাকে "কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ', নামে জাহির করেন; প্রকৃত নাম—হরিনাথ মজুমদার। ইঁহার "বিজয়. বসন্ত" উপাখ্যান প্রসিদ্ধ।

কাঙ্গাল ফিকিরের একটি বাউল গীত—

মনে না বিবেক হলে ভেক লইলে কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি কোটা বাড়ী কিসে হবে সেই ভাবনা॥
বাহিরে তিলক ঝোলা জপের মালা দেখে ত ভাই সে ভুল্‌বে না।
বাহিরে মোড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা মনের মধ্যে কু-বাসনা॥
তাইতে মাগীর তরে ভিক্ষা করে বেড়াও আসল ঠিক থাকে না।
কাঙ্গাল কয়, কুবাসনা মনের মধ্যে থাক্‌লে না হয় উপাসনা।
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা, তবে ছাই কর ভাই কু-বাসনা॥

কাঙ্গালের একটি প্রাণের কাঁদুনী শুনাইব—

যদি ডাকার মতন পারিতাম ডাক্‌তে।
হায় রে তবে কি মা এমন করে তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌তে॥
আমি নাম জানিনে, ডাক্ জানিনে, আখার জানিনে মা কোন কথা বল্‌তে।
তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতে, আমার জনম গেল কাঁদতে।
দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি, আবার সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাক্‌তে।
তুমি মনে বসে মন দেখ মা, আমায় দেখা দেও না তাইতে॥
ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয় দয়া করে দেখা দাও আমাকে,—
আমি তোমার খাই মা তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম করতে॥

কাঙ্গাল যদি ছেলের মত তোমার ছেলে হত, তবে পারতে জানতে
কাঙ্গাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, নাহি সরতো বল্‌লে সরতে॥

টপ্পা-খেউড়-"ফূর্ত্তি"-প্লাবিত বঙ্গের এই যুগের অন্তিমকালে এমন সব প্রাণের কথা শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আমরা যেন একটু আরাম—একটু শান্তি পাই।

আমরা "কর্ত্তাভজা" দলের "ভাবের গীত" শুনাইব না; প্রায় এই ধাতুরই "গুরুসত্য" দলের একটি গীত উদ্ধৃত করি;—এই জাতীয় বিস্তর গান আছে—

জীবনে নাই রে আশা কর শ্রীগুরু-চরণ ভরসা
ও তোর মাটীর দেহের নাই ভরসা।
ও মন, এই দেহের গুমর মিছে ওরে নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে
কাল শমনে ফাঁদ পেতেছে ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা॥
ও মন, ভাই বল বন্ধু বল, সময়ে সকলি ভাল—
গুরু বিনে এ সংসারে কে করবে আর জিজ্ঞাসা।
ও মন, অষ্টম জনে কাষ্ঠ নেবে মেটে ঘড়া সঙ্গে দিবে
দুজনাতে কাঁধে লবে নদীর কূলে দিবে বাসা॥

এই সকল গানের কোন কোনটি হেঁয়ালী বিশেষ; চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদ মনে পড়াইয়া দেয়;—একটি উদাহরণ—

আছে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা।
মনের গাদ কাটলে রূপ পাবি দেখা।
দ্বিদলে মানুষের স্থিতি রে, চতুর্দ্দলে বারাম খানা
ও তার দশম দলে স্থিতি রেখে মণিপুরে পাবি রে দেখা।
মেঘের কোলে চাঁদ রয়েছে, চাঁদের কোলে দিব্য শোভা,
ও যার হয়েছে গুরুর কৃপা, সেই সে চাঁদের পাবে দেখা॥

"দেহতত্ত্ব" নামে এক সম্প্রদায় আছে, সে দলের গানও এই ধরণের।

এই সময়ে আর একজন সহজ সরল গীত-রচয়িতা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—প্যারী কবিরত্ন;—ইঁহার একটি গান শুনাই—

ওরে মন, তোমারে আজ বাদে কাল ভবে, পটল তুল্‌তে হবে।
এখনও উপায় আছে, ভেবে নে ভবানী ভবে॥
কোথা থাক্‌বে ঘড়ী বাড়ী পড়ে গড়াগড়ি যাবে।
গালপাট্টা কটা গোঁফে কে আদরে আতর মাখাবে॥
পোমেটম্‌ হেয়ারে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে।
বিধুমুখে নিধুর টপ্‌পা গান করে কে প্রাণ জুড়াবে॥
বুকের ছাতি ফুলিয়ে চাবুক মেরে কে জুড়ী হাঁকাবে।
আরামে আরামে গিয়ে খুসী হয়ে খাসী খাবে॥
রম্‌ টেনে রমণী সনে রমণে কে মজা নেবে।
দুটি নয়ন করে রাঙা রগ টেনে কে কথা কবে॥
টানা পাখা টাঙ্গিয়ে দিয়ে বৈঠকখানায় বাতাস খাবে।
ফুলের তোড়া সাম্‌নে রেখে সট্‌কা টেনে সাধ মেটাবে॥
রোগ হলে ডাক্তারে যখন নাড়ী টিপে জবাব দেবে।
তখন কুইল্‌ ধরে উইল্‌ করে পরের হাতে দিতে হবে॥
এখন একটি পয়সা ব্যয় কর না মহামায়ার মহোৎসবে।
এখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচ ভূতে সব লুটে খাবে॥
খাটে তুলে ঘাটে যখন সুন্দরী কাঠে সাধ মিটাবে।
প্যারী বলে যাবার সময় মোসাহেব কি সঙ্গে যাবে॥

ইহাঁর রচিত মাছ পাঁটা ডাল আলু প্রভৃতির উপর লম্বা লম্বা গান আছে, সে সকল আমাদের কাজ নাই; কিন্তু ইহাঁর একটি গান না উঠাইয়া থাকা যায় না—ভগবৎস্তোত্র (?)

কোথায় সে জন জানে কোন জন যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে অন্তরে বাহিরে মসিদে কি চর্চ্চে মন্দিরে॥
শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে
বনে প্রস্রবণে, শব্দে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে।
পাতে পোতে পথে, ঘাটে গোঁটে ঘটে,
তপে জপে যোগে, যাগে যোগী রটে
সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথরে প্রান্তরে॥

লণ্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে
বর্ম্মা বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্থানে
নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্ম-অণ্ড কি অণ্ড-বাহিরে।
গয়া গঙ্গা বারানসী বৃন্দাবনে
ঘোষপাড়া পেঁড়ো নদীয়ায় মদীনে
রিভার জর্ডনে, গার্ডেন অফ্ ইডেনে, শ্মশানে সমাজে কবরে॥
ভারত অশক্ত যে ভাব ধারণে
সাংখ্যে হয় না সখ্যা অদর্শ দর্শনে
বাইবেলে মিল্টনে, কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র-অন্তরে।
তিনি কর্ত্তা কি গোরাঙ্গ, নানক আল্লা যীশু
কালী কি কানাই বসু-শিশু বাসু
কোন নামে কে ডাকে, সাড়া দেন কাকে, স্বরূপ বলিতে সেই পারে॥
ব্রাহ্মে বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার
সহস্র-শীর্ষ সাকারে স্বীকার
সে যে কি আকার, বলে সাধ্য কার, ওকারে কি আছেন ওঙ্কারে।
কে বলিতে পারে পরে কোন বাস,
তাঁর কাঁচা কি পেণ্টুলেন ইজেরে উল্লাস
ব্যালে কি বাকলে, গুধুড়ি কম্বলে, কৌপিনে কি বাঘাম্বরে॥
ব্র্যাণ্ডি কি জিনে, সেরি কি স্যাম্পিনে
রুটি কি বিস্কুটে পলাণ্ডু লসুনে
মাল্পো মালসাভোগে, মেষে মোষে ছাগে, পাকা পাতা বাত আহারে।
বেণু বীণা বোলে, খমকে কি খোলে,
তোপে কি তাউসে, জয়ঢাকে ঢোলে
নেড়া নেড়ী দলে, বাউলের পালে সিঙ্গে কাড়া কাঁশী কাঁশরে।
শক্ররূপে স্বর্গে শুক্রানী সম্ভোগে
নরক নিকুরে শূকরী সংযোগে
মহাদুঃখে মুহাসুখে, রাগে রোগে, সমভাবে ভেবে পাই যাঁরে॥
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে

কাঁকরে কি আছেন রত্নের আকরে

প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে, সে নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে?

যিনি ধৈর্য্য ধরিয়া সমগ্র গানটি আমাদের সহিত পড়িতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে—এ এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী! ইহার ভিতর চর্চ্চ মসজিদ্ মন্দির—পিঁয়াজ রশুন মালসাভোগ কিছুই বাদ্ নাই। কিন্তু বিস্মিত হইবার কথা নহে। বাঙ্গালী জাতি—শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের কথাই বলিতেছি—এ সময়ে বাস্তবিকই ধর্ম্মবিষয়ে, আচার-ব্যবহার বিষয়ে একটু 'কেমন কেমন' হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন।* এই গানটি তখনকার 'উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত' বাঙ্গালীর মনের ভাব প্রকটিত করে। তবে মানিতে হয়, সহর অঞ্চলেই এ বাতাস জোর করিতেছিল; কিন্তু "কর্ত্তাভজা" "গুরুসত্যের" দল পল্লীগ্রামে নিরক্ষর লোকের কুটিরেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই। থাক্—এ সকল আলোচনায় বিরত থাকাই ভাল। পশ্চিমে-মেঘে গগনমণ্ডল ঘোর হইয়া আসিয়াছিল, প্রবল বাত্যা উঠিবার উপক্রম দেখা দিতেছিল।

গীতি-সাহিত্যের পরিচয় দিতে দিতে আমরা আমাদের কাছা-কাছি সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছি। উল্লিখিত গীত-রচয়িতাদিগের কেহ কেহ ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও জীবিত ছিলেন। ২।৩ জন অল্পদিন হইল গতাসু হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের রচনায় নবযুগের প্রভাব লক্ষিত হয় না, তাঁহাদের গানই আমরা তুলিয়াছি।

আমরা মুসলমান কবি রচিত ২।১টী বাঙ্গালা গান শুনাইয়াছি।

---

* এই ভাবের বশেই বুঝি শ্লোক উঠিয়াছিল—

"হেয়ার কল্‌ভিন পামরশ্চ কেরিমার্সমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

Hare, Colvin, Palmer, Carey, Marshman সাহেবগণের নাম বঙ্গবিখ্যাত। [illegible] হলে এই পঞ্চগোরার সন্নিবেশ বুঝি কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি বিশেষ।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে জনকতক বাঙ্গালী মুসলমান কবির রচিত সঙ্গীত-বিষয়ক কাব্যগ্রন্থও পাওয়া যায়; তন্মধ্যে রাগ রাগিণী, সুর তাল সম্বন্ধে পরিচয় ও উদাহরণ স্বরূপ গীতিমালা প্রদত্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থল বেশ সুন্দর। 'রাগমালা' 'তালনামা' 'সৃষ্টিপত্তন' 'ধ্যানমালা' 'রাগতাল' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গীতিকাব্য। উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার আর আমাদের স্থান নাই। (চট্টগ্রামের মুন্সী আবদুল করিম সাহেব প্রধানতঃ এই সকল পুঁথির আবিষ্কারক, জানাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।)

এই যুগের শেষ ভাগের সর্ব্বাপেক্ষা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পরিচয় দেওয়া আমাদের বাকি আছে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কবিওয়ালাদের দলে ইনিও একজন "বাঁধনদার" ছিলেন, কিন্তু ইঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি গান রচনায় নহে, ব্যঙ্গ-কবিতায়; সে কথা পরে বলিতেছি। ঈশ্বর গুপ্তের একটি গান শুনাইয়া গীতি-প্রসঙ্গ শেষ করি—

কে রে বামা বারিদ-বরণী?
তরুণী, ভালে ধরেছে তরণী;
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন-করণ কারণ চরণ শরণ লয়॥
বামা হাঁসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥
কে রে লোলিত রসনা বিকট দশনা
করিয়ে ঘোষনা প্রকাশে বাসনা
হয়েশবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়॥

গুপ্ত কবির রচনার দোষ গুণ এই গানেই কতক প্রকাশ; বঙ্গবাসী

তখন যমক অনুপ্রাসেরই ভক্ত ছিলেন ; শব্দ-কৌশলই এক সময়ে কবিত্বের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

যৎকিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া লই।—এক একবার চকিতের মত একটা কথা মনে উদয় হয়; এই যে প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া এত কবি পাঁচালী যাত্রা তর্জ্জা তুক্ক রসের গান দেশ ভাসাইতেছিল, দেশের অধিবাসী ইতর ভদ্র সকলেই আমোদে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন, ইহা হইতে কি প্রমাণ হয়? লোকের রুচি প্রবৃত্তি খামকা আদিরসে গলিয়া গিয়াছিল—এমন কি হয়? ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে দেশে তখন সুখ সচ্ছলতা ছিল; লোকের খাইয়া দাইয়া, গুড়ুক ফুঁকিয়া, টপ্পা গাহিয়া বেড়াইবার অবস্থা ছিল। তখন এখনকার মত অন্নের জন্য এত হাহাকার ছিল না; এত তরবেতরো অভাব ছিল না। সামাজিক অবস্থাও তখন ভিন্ন রকম ছিল; তখন পথে পথে এখনকার মত এত এত বড়লোক, এত এত গাড়ীঘুড়ী দেখা যাইত না বটে, কিন্তু যে কয়জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা ক্রোরপতি; আর তাঁহারা গুণীর আদর জানিতেন, আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব অনুগত আশ্রিত পোষ্যজনকে আনন্দের সহিত প্রতিপালন করিতেন, এত গলগ্রহ জ্ঞান ছিল না। তজ্জন্য অধিকাংশ লোকে এক রকমে আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাইতে পারিত। পাড়ায় পাড়ায় আখড়া, পাড়ায় পাড়ায় "নব রে নব নিতুই নব" গাহনার টক্করা টক্করী পড়িয়া যাইত। হায়, পাশ্চাত্য শিক্ষার বাতাসে সে ভাব অল্প দিনের ভিতর উবিয়া গেল! ঝড়ে তুফানে মন্দ অনেক জিনিষ ভাসিয়া গিয়াছিল, স্রোতের মুখে সঙ্গে সঙ্গে ভাল কিছু কিছুও যে যায় নাই এমন নহে। কিন্তু সে কথা থাক্।

বঙ্গের কবিতার (প্রাচীন অংশে) আর এক শাখার পরিচয় দিলেই উপস্থিত আমাদের কথা শেষ হয়;—অগেয় কবিতা।

এতক্ষণ আমরা যাহা দেখাইয়া আসিয়াছি, বঙ্গের সাহিত্য—প্রায় সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কাব্য-সাহিত্য—গীতি সাহিত্য—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গান, পাঁচালী ইত্যাদি। কিন্তু আদি হইতে অগেয় কবিতা—"কবিতা" ঠিক না হউক—মিত্রাক্ষর পদ্য আছে।

আমাদের এই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম শুভদর্শন আমরা পাই ডাক ও খনার বচনে।* এই 'বচন' পদ্যে রচিত। এই সকল "বচনে"—পদ্যমালায়—প্রকৃত কবিত্ব গুণ থাকুক আর নাই থাকুক—জ্যোতিষ ও কৃষিবিদ্যার সঙ্গে সেই দূর সময়ের বঙ্গীয় সমাজের, সংসারের, আচার ব্যবহারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে অস্বীকার করিবার জো নাই। গুটিকতক শ্লোক—

বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড। আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড॥

কিম্বা—

আদি অন্ত ভুঞ্জসি। ইষ্টদেব যেহ পুজসি॥
মরণেরু যদি ডর বাসসি। অসম্ভব কভু ন খায়সি॥

অথবা—

ভাষা বোল পাতে লেখি। বাটাহুব বোল পাতে সাখি॥
মধ্যস্থ যবে সমাধে ন্যায়। বলে ডাক বড় সুখ পায়॥
মধ্যস্থে যবে হেমাতি বুঝে। বলে ডাক নরকে পচে॥

---

* নেপালে বৌদ্ধপণ্ডিতগণের দ্বারা সুরক্ষিত, সংস্কৃত টিপ্পনি সংযুক্ত—'ডাকার্ণব' পুস্তকে বঙ্গীয় ডাকের বচন সকল উদ্ধৃত আছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত 'ডাকের বচন' অপেক্ষা সে গুলির ভাষা জটিল। ঐ সমস্ত বচন যে বৌদ্ধযুগীয় তাহা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই প্রকার শ্লোকসমূহ ভাষাতত্ত্ববিদ্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার জন্য আমরা আলাহিদা রাখিয়া দিই। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বেকার বঙ্গভাষা। (কিন্তু ইহার ভিতরও কোন কোন শব্দের আকার পরে আধুনিকত্ব লভিয়াছে নিশ্চয়।)

তার পর, মুখে মুখে চলিত হইয়া কালক্রমে যে গুলি কতকটা সহজে বোধগম্য হইয়া আসিয়াছে, সে গুলি হইতে আমরা বিবিধ শিক্ষা, নানা উপদেশ পাই। কতকগুলি অনন্ত জ্ঞানের—বহুদর্শীতার নিদর্শন;—চিরকাল প্রবাদ-বাক্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম। মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম॥
স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান। বলে ডাক স্বর্গে স্থান॥

কিম্বা—

ধর্ম্ম করিতে যবে জানি। পোখরি দিয়া রাখিব পানি॥

অথবা—

যে দেয় ভাত-শালা পানি-শালি। সে না যায় যমের বাড়ী॥

এ সকল ধর্ম্ম-উপদেশ।

ভাল দ্রব্য যখন পাব। কালিকারে তুলিয়া না থোব॥
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ। ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥
বলে ডাক এই সংসার। আপনা মলে কিসের আর॥

বা—

শূন্য কলসী শুক্‌না না। শুক্‌না ডালে ডাকে কা॥
যদি দেখ মাকুন্দ চোপা। এক পা না বেরিও বাপা॥
ডাক বলে এরেও ঠেলি। যদি না দেখি সমুখে তেলি॥

এ সকল নীতি-সূত্র।

(প্রথম [illegible] চার্ব্বাকিয়ানা, শেষটিতে রহস্য-ভাব একটু আছে মনে হয়।)

ঘরে আখা বাইরে রাঁধে। অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়। (ডাক বলে) এ নারী ঘর উজাড়॥

কিম্বা—

নিয়ড় পুখরী দূরে যায়। পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায় ॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে। (ডাক বলে) এ নারী ঘরে না টিকে ॥

অথবা—

রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি।
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে। তবু তার পূজার সাজে ॥
সুশীলা শুদ্ধবংশে উৎপত্তি। মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি ॥
রৌদ্রে কাঁটায় কুটায় রাঁধে। খড় কাট বর্ষাকে বাঁধে ॥
কাঁখে কলসী পানিকে যায়। হেঁট মুণ্ডে কাকেহ না চায় ॥
যেন যায় তেন আইসে। বলে ডাক গৃহিনী সেই সে ॥

এ গুলি পরিষ্কার সংসার-তত্ত্ব।

স্ত্রীচরিত্র-জ্ঞান এই ডাক নামক গোপের (ডাকিনী-স্বামীর বা) বড় সাধারণ ছিল না। এই গৃহস্থালীর কথায়, অন্তরের খবর বাহির করিয়া দেওয়ার ভঙ্গীতে কবিত্ব যে একেবারে নাই বলা চলে না।

খনার নাম বাঙ্গালীর কাছে জ্যোতিষ-বিদ্যার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম, সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ বরাহমিহিরের পুত্রবধুর নামও খনা; ইনিও অসাধারণ জ্যোতিষজ্ঞা—ছিলেন। জ্যোতিষজ্ঞান ও নামের মিল আছে বলিয়া অনেকে এই উভয় খনা অভিন্ন অনুমান করেন; তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয়, সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার বাঙ্গালার "খনার বচন" গুলি সেই আরও অর্দ্ধ সহস্রাব্দী পূর্ব্বেকার বিদুষী মহিলার জ্যোতিষ-সূত্রের অনুবাদ। খনা বচন বিস্তর মুখে মুখে চলন আছে—সবই ছন্দোবন্ধে।

গ্রহণ গণনা—

যেই মাসে যেই রাশি। তার সপ্তমে থাকে শশী।
যদি পায় পূর্ণমাসী। অবশ্য রাহু চায় আসি।

গর্ভ গননা—

গ্রাম গর্ভিনী ফলে যুতা। তিন দিয়া হর পুতা॥
একে শুত দুয়ে শুতা। তিন হৈলে গর্ভ মিথ্যা॥

এ সব জ্যোতিষ গণককারের বিদ্যা।

ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥
কাতিকের উন জলে। খনা বলে দুনো ফলে॥

কিম্বা—

দিনে রোদ রাতে জল। তাতে বাড়ে ধানের বল॥
খনা ডেকে বলে যান। রোদে ধান ছায়ায় পান॥

এ গুলি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুইয়া। থাক গিয়া তুই বাড়ীত বইয়া॥
দাতায় নারিকেল বখিলের বাঁশ। কমে না বাড়ে না বার মাস॥

অথবা—

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি। তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত। তার ভাগ্যে হাভাত॥

এ সকল কৃষিতত্ত্ব ও অর্থনীতির কথা।

প্রবাদ বাক্যের মত এই শ্রেণীর অনেক ছড়া পাওয়া যায়, সব গুলিতে ভণিতা নাই; ডাক বা খনার রচিত না হইতেও পারে; ভাষা দেখিলে বুঝা যায় বহু পূর্ব্বকালের গ্রাম্য রচনা। উদাহরণ—

মরা গঙ্গা বিশে শয়। তার অর্দ্ধ বাঁচে হয়॥
বাইশ বলদা তের ছাগলা। তার অর্দ্ধ বয়া পাগলা॥

ইহা গের সহস্র বৎসর কিম্বা আরও অধিক প্রাচীন আমাদের দেশের অগেয় কবিতা। পদ্য বলুন—ছড়া বলুন—ইহাই নমুনা।

বঙ্গভাষায় প্রবাদ বাক্যে যেমন ডাকের বোল, কৃষিতত্ত্বে ও জ্যোতিষ কথায় যেমন খনার বচন প্রসিদ্ধ, গণিত বিদ্যায় শুভঙ্করের "আর্য্যা" তেমনই সাধারণতঃ মুখে মুখে চলিত; প্রবচনের সামিল হইয়া পড়িয়াছে।

শুভঙ্কর দাস পরবর্ত্তী সময়ের লোক। তাঁহার—

কুড়্‌বা কুড়্‌বা কুড়্‌বা লিজ্যে। কাঠায় কুড়্‌বা কাঠায় লিজ্যে॥
কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ। দশ বিশ গণ্ডা কাঠায় জান॥

কিম্বা—

কাক চতুর্থে বটেক জানি। তিন ক্রান্তে বট বাখানি॥
নব দন্তী করিয়া সার। সাতাশ যবে বট বিচার॥
আশি তিলে বটং কর। লেখার গুরু শুভঙ্কর॥

এই সকল সূত্র অনেকেই শৈশবকালে নামতার সঙ্গে অভ্যাস করিয়া থাকিবেন। এই সকল ছড়ায় কবিত্ব না থাক্, রচনার প্রথায় মুখস্থ করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে মানিতে হয়। লেখার ভাব ভঙ্গীটা কাব্যিক বলা চলে।

বহু পুরাতন অপর কথায় আসা যাক্—
ভাটগণ বিবাহাদি উপলক্ষে পাত্রপাত্রীব গৃহে (পারিবারিক) যশঃ গান করিত; অনুষঙ্গক্রমে সময়ে সময়ে অপাত্রের অযশ গানও হইত। ইহা কুলজী বিশেষ। বঙ্গের পাল-ভূপতিগণের স্তুতিবাঞ্জক কবিতা কতক কতক পাওয়া যায়—বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন রচনা। এ সকলও সেই সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বেকার গাথা। ইহাও ছড়ার হিসাব। পদকল্পতরুর অনেক গীতে এই ভাট-গাথার উল্লেখ আছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক—তিন চারিশত বৎসরের প্রাচীন—ভাট-গাথার কিঞ্চিৎ নমুনা—

গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রুদ্রাক্ষমালা।
পরিচয়ের মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা॥

অপর—

জাতির কর্ত্তা রাজীব রায় মুলুকের সুবা।
তাঁর হুকুম ভুচ্ছ করে দত্ত হলেন বোবা॥

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে রীতিমত ইতিহাস গ্রন্থ নাই। রাশীকৃত

কুলপঞ্জী বা "কারিকা" পুঁথির উদ্ধার হইয়াছে, প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত। সে গুলি হইতে কতকমত কিম্বদন্তী-মিশ্রিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়; সে গুলিকে বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস বলা চলে।*

এই শ্রেণীর অনেক পুঁথির নাম "ঢাকুর"। ঢাকুর পদ্যও আছে গদ্যও আছে। 'ঢাকুর' শব্দটার উৎপত্তি কিছু কৌতুকাবহ। ঢাক বা ঢক্কা হইতে ঢক্কুর, ঢক্কুর হইতে ঢাকুর। জনশ্রুতি এইরূপ—পূর্ব্বতন কুলাচার্য্যগণ যখন কুলকাহিনী আওড়াইতেন, তখন বাজনা বাজিত, ঢাকে ঘা পড়িত; তাঁহারা বাদ্যসহ অঙ্গভঙ্গী করতঃ কুলকাহিনী কীর্ত্তন করিতেন। এখনও নাকি কোন কোন স্থলে কুলাচার্য্যগণ (ঢাকের অভাবে?) তাকিয়ায় আঘাত পূর্ব্বক কুল-পরিচয় বর্ণন করেন।

কুলজী গ্রন্থের কতক কতক কৌলিন্য-বিধাতা বল্লালসেনের আমল হইতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মেল-বন্ধনের সময় হইতে কুলপর্য্যায় লিপিবদ্ধ রাখা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেকালে লিখন-পঠনের সঙ্গে সম্বন্ধ আসিলে ছন্দোবদ্ধ না হইলে চলিত না—কাব্য-আকার চাইই চাই; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-নবশাখ প্রভৃতি সকল জাতির প্রাচীন বংশ-পরিচয় অধিকাংশই পদ্যে—পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে গ্রথিত। কুলাচার্য্য ঘটকঠাকুরগণই এই শ্রেণীর কাব্যের কবি। এই রাশি রাশি কুলজী-গ্রন্থ পদ্য-রচনা হইলেও আমরা সে সমস্তকে প্রকৃত কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রস্তুত নহি; সে সকলের পরিচয় আমরা "বঙ্গের কবিতা"র মধ্যে দিব না। নমুনা স্বরূপ রসাল অংশটুকু এক ছত্র দেখাইয়া যাই;—

(কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বিবাদ)

---

* ত্রিপুরার "রাজমালা"র কথা আমরা প্রথমভাগে বলিয়াছি; ইহার আরম্ভ [illegible]র পূর্ব্বে। আসামের "বুরুঞ্জি" ও উড়িষ্যার "মাদলা পাঞ্জী" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। ইং ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে এই দুই গ্রন্থের আরম্ভ।

দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন। বিপ্র সঙ্গে থাকি করে তীর্থ পর্য্যটন॥

পরিণামে যাহা দাঁড়াইল—

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী। অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি॥

এ তত্ত্ব সম্ভবতঃ অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু—

মুড়ালে মাথা উঠিবে চুল। মুস্তফীর হবে না কখনো কুল॥

কিম্বা—

গোড়পাড়ার নন্দ কিশোর দেবগ্রামের পাঁচু।
আর যত মিত্র আছেন কচু আর ঘেঁচু॥

অথবা—

হাত ঘুরায়ে বলে নুলো আ মরি এই কি তোমার কুল।
দেখ—ছিল ঢেঁকি, হলো তুল, আরো পরে হবে যে নির্ম্মূল॥

(এই "নুলো" প্রসিদ্ধ ঘটকরাজ—নুলো পঞ্চানন্দ।)

ঘটক-চূড়ামণিদিগের এমন সব সরস বুলী,—কেহ কেহ হয়ত ইহার ভিতর কবিত্বের আঘ্রাণ পাইবেন।*

আমরা কথকতার কথা কিছুই বলি নাই। কথকতা অতি শ্রবণ-যোগ্য ব্যাপার। বঙ্গদেশে কথকতা বহু পুরাতন, চির নূতন। সুকথকের "কথায়"—গানে—কবিত্ব প্রচুর, কিন্তু বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বিশেষ পরিচয় দিবার সুবিধা নাই। আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ—নিরক্ষর কুটিরবাসী স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত যে হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থের আখ্যান উপাখ্যান কতক কতক জানে এবং সম্ভবমত আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে, তাহার মূল নিদান এই কথকতা; প্রথমভাগেই আমরা সবিস্তারে সে কথা বলিয়াছি। আমাদের মনে রাখিতে হয়, কথক ঠাকুরের "কথা"ই কৃত্তিবাসের

* বাঙ্গালার অধিকাংশ লুপ্তপ্রায় কুলজী বা কারিকা পুঁথি উদ্ধার-বিষয়ে প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বসু বাবুর কৃতীত্ব সমধিক। বোধ হয় ইহা হইতেই তিনি কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে বিশেষরূপ সহায়তা করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

কাশীদাসের এবং অপরাপর অনেক বিখ্যাত কবির কাব্যের ভিত্তি। অন্ততঃ সেই পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বতন কাল হইতে আমাদের স্বল্প সময় পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কথকতার কবিত্বের, কথার সার্থকতার সুনাম যথেষ্ট ছিল; ইদানীং লোপ পাইতে বসিয়াছে। কথকের "কথা" হিন্দুর ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। সাবেক কালে কথকের "কথা" লোক-শিক্ষার প্রধান উপায় ছিল।*

সে কালের লোকেরা কথকদিগের বিলক্ষণ সমাদর ও গৌরব করিতেন। গৌরবের কারণও ছিল; তৎকালে কথকদিগের মধ্যে অনেক প্রকৃত পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। গঙ্গাধর, কৃষ্ণহরি, রামধন শিরোমণি, উদ্ধব ঠাকুর, লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ, ধরণীধর প্রভৃতি কথকগণের নাম লোকে ভক্তিসহকারে উল্লেখ করিয়া থাকে। উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ইংরাজী-ভক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকেও রামধন ঠাকুর ও শ্রীধর পাঠকের "কথা" শুনিতে শুনিতে অশ্রুপাত করিতে শুনা গিয়াছে।

কথকদিগের "কথার" সহিত কোন কোন বিষয়ে কতকগুলি বাঁধি গৎ থাকে। শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারদ প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে ত আছেই; তদ্ব্যতীত নগর, রণক্ষেত্র, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, রাত্রি এবং অন্যান্য বিষয়েও থাকে। কোন উপাখ্যান ব্যাখ্যান করিতে এই সকল বাঁধা বর্ণনা নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল গৎ সমাসবহুল যমক-অনুপ্রাসময়, সংস্কৃতাকার বাক্যাড়ম্বর,—সুর করিয়া আওড়াইবার সময় শুনায় বড় চমৎকার। কিঞ্চিৎ উদাহরণ—

রাত্রি—

---

* কথকতা লোকশিক্ষার এমন উপাদেয় উপায় যে কিছুদিন পূর্ব্বে কোন লর্ড বিশপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কথকতা প্রণালীতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে। কথানুযায়ী কাজও নাকি আরম্ভ হইয়াছিল।

'ঘোরা যামিনী, নিবিড়গাঢ়তমস্বিনী, শান্তা নলিনী, কুমুদগন্ধামোদিনী, পৃথ্বি ঝিল্লীরবোন্মাদিনী, বিহগরব ক্ষণবিধ্বংসিনী, নক্ষত্রনিকরজালমালব্যাপ্তা যামিনী, সভয়চকিতনয়না কামিনী, মনোনায়ক-নিকটাভিসারিকা নায়িকাগণ ক্ষণ ক্ষণ দিগ্-ভ্রান্ত্যাদি জন্য স্থগিত-চকিত-গতি কষ্টে সৃষ্টে গমন করিতেছেন।"

মেঘময় দিন—

"পূর্ব্ব দিগম্বর দেদীপ্যমান, শক্রধনুঃশোভিত নভোমণ্ডল, কাদম্বিনী সৌদামিনী-চঞ্চল, তদ্দর্শনোদ্বেজিতান্তঃকরণ মত্তকেকীরবারোহণকৃত দেবেন্দ্র নিজায়ুধ-বজ্র-নিক্ষেপ-শব্দিত ইরম্মদ-স্খলিত পতিতকণা সমুদ্র-গর্জ্জিত বজ্রপতন-ভয়ানক-ধ্বনি-প্রতিধ্বনি-শ্রবণ-সভয়-চকিত নয়নোদ্বেজিত পান্থজন, পক্ষীগণ গণিত-প্রমাদ সঙ্কট-ত্রাসিত এককালীন কুহু কুহু কলরব করিতেছে।"

পড়িতে শুনিতে মনে হয় না কি কোথায় বা লাগেন ঠাকুর বাণভট্ট! কিন্তু ইহাতে গুরু-গুরু আওয়াজ হয় বেশ, একটা ঘোরালো চিত্র ও ফুটিয়া উঠে। কথকতায় মধ্যে মধ্যে গানও থাকে এবং এমন শব্দ-বিভীষিকাও থাকে; এ গুলি গম্ভীর কণ্ঠে সুর করিয়া উচ্চারিত হয়। শ্রোতৃমণ্ডলী—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা (মনে রাখিবেন, অধিকাংশই স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ-জ্ঞানহীন লোক)—মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এরূপ বাক্য-বিন্যাসকে আপনারা কি কবিতা বলিবেন না? ভাষা ও ভাব নিতান্তই কাব্যিক—তার উপর আছে সুর লয়।

রামায়ণ, মহাভারত, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন অংশই "কথা"র প্রধান বিষয়। বৈষ্ণব গোস্বামী ঠাকুরগণই এই কথকতার মাধুর্য্যে সমধিক গুণপণা দেখাইয়া থাকেন।

শুনা যায়, প্রাচীন কথকতায় গান ছিল না, গান পরে প্রবর্ত্তিত হয়। এ সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক একটি কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ দিয়াছেন—একদা বাঁকুড়ার সোণামুখী-নিবাসী প্রসিদ্ধ কথক গঙ্গাধর শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের "কথা" কহিতেছিলেন। নিকটেই আর এক স্থানে "রামায়ণ গান" হইতেছিল। "কথা" শুনিতে লোক জমিত না, গানের

কাছেই ভিড় লাগিত। কথক ঠাকুর যেমন সুব্যাখ্যাত ছিলেন, তেমনই সুকণ্ঠি ও সদ্‌গায়কও ছিলেন। জন-সমাগমের অপ্রচুরতার কারণ অবধারণ করিয়া তিনি কথকতার ব্যাখ্যার সহিত মধ্যে মধ্যে প্রাসঙ্গিক গান জুড়িতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহার "কথা" ও তৎসহ ভাগবত-গান শুনিতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গীতের এমনই আকর্ষণী শক্তি!

গঙ্গাধর শিরোমণির পর কৃষ্ণহরি শিরোমণি কথকতাকে অনেক পল্লবিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন। গোবরডাঙ্গা-নিবাসী রামধন ঠাকুরও কথকতায় অনেক অঙ্গরাগ দিয়াছেন। অনেকের মতে ধরণী-ধরই কথকশ্রেষ্ঠ।

এইবার আমরা আর এক জাতীয় "কথা"র উত্থাপন করি। বাঙ্গালীর "ব্রতকথা।" এ "কথা" যে কতদিনকার প্রাচীন কে বলিতে পারে? আমাদের মনে রাখিতে হয়, "মুকুন্দরামের চণ্ডী" প্রভৃতি লৌকিক কাব্যোপাখ্যানের মূল এই ব্রতকথা। জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন—"কবির নিকট ব্রতকথা বাঙ্গালার আদিম কাব্য; ঐতিহাসিকের নিকট ইহা বঙ্গের গৃহ ও সমাজের, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের, পুরাতন ইতিহাস; আর মাতৃভক্ত বাঙ্গালীর নিকট ব্রতকথা বঙ্গজননীর স্তন-নিঃসৃত প্রথম ক্ষীরধারা।"

শিল শিলাটন শিলে বাটন শীলে আছেন ঘরে।
স্বর্গ হতে মহাদেব বলেন গৌরী কি ব্রত করে॥

অথবা—

সাবিত্রী সম সীতা। হই যেন পতিব্রতা॥
মনের সুখে করি ঘর। দাও মাগো এই বর॥

কিম্বা—

পাকা চুলে পরবো সিঁদুর। দয়া কর দয়াল ঠাকুর॥
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে। মরণ হয় যেন একগলা গঙ্গাজলে॥

প্রভৃতি, মেয়েলী ব্রতের ছড়ায়—আত্মীয়-স্বজনের সুখকামনা-পরায়ণা, ধর্ম্মপ্রাণা, চিবসহিষ্ণু হিন্দুকন্যার ঐহিক ও পারত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাসের কত কাহিনী স্ফুরিত! প্রকৃতির মন্ত্রপূত এই সকল ছড়ায় প্রকৃত কবিত্ব কি জড়িত নাই? সেঁজুতি ব্রত, দশপুত্তল ব্রত, গোকল ব্রত, তোষলা ব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, যমপুকুর ব্রত প্রভৃতি নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের—নিয়মপালনের ক্ষুদ্র গাথা আমাদের ব্রহ্মচারিণী নিষ্ঠাবতী ধর্ম্মসর্ব্বস্বা বিধবা দেবীদিগকে কিম্বা শঙ্খ-সিন্দূর-শোভিতা মঙ্গল-মূর্ত্তি গৃহলক্ষ্মী আত্মীয়াগণকে স্মৃতি-মন্দিরে আনয়ন করতঃ প্রাণকে সেই সংযম-সহিষ্ণুতা-ভক্তি-স্নেহ-করুণার চিত্রে উদ্বেলিত করিয়া তুলে।

আমাদের ব্যবহৃত এখনকার এই বঙ্গভাষার জন্মাবধি, এই অনূ্যন সহস্র বর্ষ ধরিয়া, বঙ্গের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে,—কত পদ্য, কত ছড়া, কত আকারে,—মেয়েলী ব্রতকথা রূপে, ছেলেভুলানো ছড়া রূপে, সাময়িক-তত্ত্ব-প্রচার কল্পে—রচিত হইয়া মুখে মুখে চলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এ সকলের ভিতর স্থলে স্থলে কবিত্ব-সৌরভ দুর্লভ নহে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাস নাই; উপন্যাসের বাস্তপুরুষ রূপকথা (উপকথা) আছে।* এই রূপকথা কতকালের পুরাতন কে বলিবে? কবির ভাষায় বলিতে গেলে—"এই যে আমাদের দেশের রূপকথা—বহুযুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব কত রাজ্য-পরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে; ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে; যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্য্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ

* আমরা গীতি-শাখার আদ্যভাগে মধুমালার গানের উল্লেখ করিয়াছি। সেইরূপ মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালার গান—ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প, সোণার কাটি রূপার কাটির গল্প,—কত গান গল্প আছে, তাহার আর শেষ নাই।

করিয়াছে ; সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশের চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে। নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।”

এই রূপকথা প্রায়শঃ গ্রাম্য চলিত ভাষায় রচিত মৌখিক গল্প ; ইহার মধ্যে মধ্যে ছড়া ও গান থাকে ; সে গানগল্প তুড়ী দিয়া উড়াইবার সামগ্রী নহে। অনেক স্থলে গল্প নাই বা লুপ্ত, সূত্ররূপে ক্ষুদ্র ছড়াই আছে।

আয় আয় চাঁদ মামা টিপ্ দিয়ে যা। চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ্ দিয়ে যা ॥

অথবা—

তাই তাই তাই। মামার বাড়ী যাই ॥

কিম্বা—

ঘুমপাড়ানে মাসীপিসি ঘুমের বাড়ী যেয়ো।
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো ॥

প্রভৃতি, কচি শিশুটিকে ভুলাইবার মন্ত্রে কি কবিত্ব নাই ?

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হচ্চে তিনটি কন্যে দান ॥

অথবা—

সাত ভাই চম্পা জাগ রে। কেন বোন্ পারুল ডাক রে ॥

এই সকল শিশু-মুখ-উচ্চারিত শাস্ত্র-ছাড়া, পুরাণাতিরিক্ত উপাখ্যানে—উপকথায় কবিত্ব-মাখা মাধুরী কি নিহিত নাই ?

বঁধুর পান খেয়োনাক ভাব্ নেগেছে।
ভাব্ ভাব্ ভাব্ কদমের ফুল ফুটে রয়েছে ॥

অথবা—

আমার কথাটি ফুরোলো। নটে গাছটি মুড়োলো ॥

প্রভৃতি, স্পষ্ট অর্থহীন, ভাবহীন, পরস্পর-সঙ্গতিহীন ছড়া—যে স্মৃতি যে ছবি মানস-পটে আনয়ন করে, তাহা কি কবিত্বময় নহে ? কিন্তু

এ কবিত্ব ভিন্ন জাতীয়; অভিধানে এ কবিত্বের অর্থ মিলে না; পণ্ডিতে এ কবিত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, শাস্ত্র-ইতিহাসে এ কবিত্বের মূল পাওয়া যায় না। ভাষার দৈন্য, ভাবের অপ্রগাঢ়তা সত্ত্বেও এই সকল সামান্য ছড়ার সহিত আমাদের সুখ-দুঃখের কত প্রাণের কাহিনী গ্রথিত!

কিন্তু থাক্—এ সকল ভাবের আবেগের কথা যাক্ *

অগেয় কবিতা বলিতে প্রকৃত পক্ষে যাহা বুঝায়—অর্থাৎ গীত হইবার উদ্দেশ্যে যে কবিতা রচিত নহে—তাহা বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে আমরা পাই। প্রবন্ধের অন্যান্য শাখায় দুই একখানির উল্লেখ ইতঃপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। (কাশীখণ্ডের অনুবাদ প্রভৃতি)।

আমরা বলিয়াছি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিহাস-গ্রন্থ নাই। কিন্তু

---

* "ঠাকুর মার ঝুলি" ও "ঠাকুরদাদার ঝুলি" প্রণেতা বাবু দক্ষিণা চরণ মিত্র মজুমদার এই জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ কথা লিখিয়াছেন। তিনি কথা-সাহিত্যকে চারি ভাগে বিভক্ত করিতে চাহেন:—(১) শিশু-সাহিত্য (রূপকথা), (২) মেয়েলী সাহিত্য (ব্রতকথা), (৩) পল্লী-সাহিত্য (গীতকথা), (৪) সভা-সাহিত্য (বৈঠকী বা রস-কথা)। তাঁহার মন্তব্যটুকু পরিষ্কার, উদ্ধৃত করাই ভাল;—"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কল্যাণে বাঙ্গালা ভাষার যে সকল প্রাচীন বস্তুর সন্ধান আমরা পাই, তন্মধ্যে বাঙ্গালার পল্লীর এই শ্রুতি-সাহিত্য (বা লোক-সাহিত্য) অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। ইহার 'নিরক্ষরা' ভাষা, লিখিত ভাষার মত এক অতি সুন্দর শ্রেণী বিভাগ করিয়া বাঙ্গালীর আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তক্ষেত্রের উপর সাহিত্যের এক বিরাট মন্দির গড়িয়াছিল। দেশের ছেলে মেয়েদের—সহজ কল্পনা বিকাশ করিতে, গৃহলক্ষ্মীদের প্রাণটিকে অতি কোমল ভাবে গৃহধর্ম্মে তন্ময় করিতে, দেশের ছোট বড় জনসাধারণের মন আমোদে বিহ্বল করিয়া শিক্ষা এবং সৌন্দর্য্যে সংস্থিত করিতে এবং বহির্ব্বাটিতে জ্ঞান ও নীতিসমূহকে হাসো উজ্জ্বল করিয়া চিত্তের ভিতরে প্রবেশ করাইতে, বাঙ্গালার অমৃতের কলস ইহার মধ্যে রক্ষিত ছিল।

সার্দ্ধ শতাব্দী প্রাচীন একখানি গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।* এখানি নামে পুরাণ, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, বরং ছোটখাটো ইতিহাস বলা চলে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় একখানি অশ্রুতপূর্ব্ব কাব্য সংগৃহীত হইয়াছে—"মহারাষ্ট্র পুরাণ।" পুঁথির রচয়িতার নাম গঙ্গারাম। সমগ্র 'পুরাণ'খানি কত বড় বা কয়খণ্ডে বিভক্ত, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। যে অংশটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রথম কাণ্ড মাত্র। এই কাণ্ডের নাম "ভাস্কর পরাভব।" পুঁথিখানির তারিখ—শকাব্দ ১৬৭২, সন ১১৫৮। বাঙ্গালা ১১৬৪ সালে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; সুতরাং পুঁথিখানি পলাশী-রঙ্গের ছয় বৎসর পূর্ব্বে লেখা। 'পুরাণ'ও 'ভাস্কর' শব্দ শুনিয়া যাঁহারা দেবদেবতার কথা পাইবেন মনে করিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক 'মহারাষ্ট্র' ও 'ভাস্কর' নাম দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থখানির বিষয় মারহাট্টা বা বর্গীর হাঙ্গামা বর্ণনা। ব্যাপারটা সেই ছড়া—

"ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে॥"

পুস্তকখানিতে তেমন কবিত্ব কিছুই নাই, গ্রাম্য অমার্জ্জিত ভাষা; তবে সত্যের সহিত জল্পনা কল্পনা মিশাইয়া কতক ঐতিহাসিক খবর আছে। একটু শুনাই—

জত গ্রামের লোক সব পলাইল—
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া। সোণার বাইনা পলায় কত নিক্তিহড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত। তামা পিতল লইয়া কাশারী পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাকনড়ি। জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ী॥

* "সমসের গাজীর গান" "চৌধুরীর লড়াই" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি নাতি-বৃহৎ পুথি মিলিয়াছে,—ছোটখাটো (স্থানীয়) ইতিহাস বিশেষ—সাময়িক গল্প নাম দেওয়াই ঠিক।

সঙ্খবণিক পলাএ করা লইয়া জত। চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত ॥
কাএস্ত বৈদ্য যত গ্রামে ছিল। বর্গীর নাম শুইনা সব পলাইল ॥
ভালমানষের স্ত্রীলোক জত হাঁটে নাই পথে। বর্গীর পলানে পেটারি লইল মাথে ॥
ক্ষেত্রি রাজপুত জত তলযারের ধনি। তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ য়মনি ॥
গোশাঞি মোহান্ত জত চোপালাএ চড়িয়া। বোচ্কা বুচ্কি লয় জয বাহুকে করিয়া ॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা। বিছন বলদের পিটে লাঙ্গল লইয়া ॥
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল। বর্গির নাম শুইনা সব পলাইল ॥
গর্ভবতী নারী জত না পারে চলিতে। দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে ॥
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল। বরগীর নাম শুইনা সব পলাইল ॥
দস বিস লোক আইসা পথে দাঁড়াইলা। তা সবারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা ॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই। লোকের পলান দেখিআ আমোরা পলাই ॥
কাঙ্গাল গরীব জত জাএ পলাইয়া। কেঁথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিআ ॥
বুড়াবুড়ী জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি। চাঞি ধানুক পলাএ কত ছাগের গলায় দড়ী ॥
ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল। বরগির ভয়ে সব পলাইল ॥
চাইর দিকে লোক পলাঞ ঠাঞি ঠাঞি। ছত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি ॥

কেবল পালা—পালা—পালা!

প্রায় সমসাময়িক লোক কর্ত্তৃক বর্ণিত এই ত দেশের লোকের অবস্থা। মুষ্টিমেয় ফৌজ লইয়া ইংরেজেরা এ সময়ে যে অতি সহজে বঙ্গ জয় করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা ত আদপে বিস্ময়ের কথা নহে। কারণ-নির্দ্দেশ বেশ—

"চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেখি আমোরা পলাই ॥"

দেখিবার বুঝিবার সাহস নাই—কেবল 'চাচা আপ্‌না বাঁচা।' কিন্তু বাঙ্গালী এ সময়েও কবি, পাঁচালী, ছড়া ছাড়ে নাই।* দেশে বীররস

* শুধু এ সময় কেন, ইহার অল্পদিন পরেই নিদারুণ "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর" প্রাণান্তকর দুর্ভিক্ষে দেশের অর্দ্ধেক লোক সাবাড় হইয়া গেল, কিন্তু যতদূর জানিতে পারা যায়, বোধ হয়, সেই সময়েই কবি-গানের খুব 'বোল্‌বোলাও'—অন্ততঃ নূতন রাজধানী কলিকাতাতে ত বটেই।

না থাকুক আদিরস প্রচুর পরিমাণে ছিল।

কবিওয়ালাদের পর পাঁচালীকারদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। ইঁহাদের পাঁচালী প্রাচীন পাঁচালী গান হইতে স্বতন্ত্র প্রথায় বিরচিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই পরবর্ত্তী পাঁচালীতে দুই প্রকার রচনা থাকিত, এক ছড়া, অপর গান। গান অংশের কতক পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি, ছড়া কিঞ্চিৎ শুনাইব। পাঁচালীর এই সকল ছড়াও সুর করিয়া গাওয়া চলে, গানের মতই শুনায়।

আধুনিক পাঁচালী-রচয়িতাগণের মধ্যে দাশুরায় (দাশরথি) শ্রেষ্ঠ, সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইঁহার রচিত অজস্র ছড়া আছে।

নমুনা—

(বসুদেব যোগমায়ার রূপ দেখিতেছেন)—

যেমন—তীর্থের সেরা কাশীধাম কর্ম্মের সেরা নিষ্কাম
নামের সেরা রামনাম তারকব্রহ্ম জানি।
পানের সেরা ঘৃত ক্ষীর দেশের সেরা গঙ্গাতীর
বেশের সেরা শ্রীপতির গোষ্ঠ বেশ খানি॥
বলের সেরা যোগবল ফলের সেরা মোক্ষফল
জলের সেরা গঙ্গাজল গুণের সেরা ফণী।
পুরাণের সেরা ভারত রথের সেরা পুষ্পক রথ
পুত্রের সেরা ভগীরথ বংশ-চূড়ামণি॥
মুনীর সেরা নারদ মুনী ফণীর সেরা অনন্ত ফণী
নদীর সেরা মন্দাকিনী পতিত-পাবনী।
পূজার সেরা আশ্বিনে পূজা মূর্ত্তির সেরা দশভুজা
[illegible] সেরা শেষ থাকে যায় সেই মুক্তি শুনি॥
[illegible] চাচর চুল ফুলের সেরা জবাফুল

ফুলের সেরা কমল ফুল করেন কমলযোনী।
তন্ত্রের সেরা নির্ব্বাণ তন্ত্র মন্ত্রের সেরা হরি-মন্ত্র
যন্ত্রের সেরা বীণাযন্ত্র বাজান নারদ মুনি॥
তিথির সেরা পূর্ণিমা তিথি ব্রতীর সেরা যজ্ঞে ব্রতী
স্মৃতির সেরা হরি-স্মৃতি বিপদনাশিনী।
মেঘের রৌদ্র ধূপের সেরা রামচন্দ্র ভূপের সেরা
তেমনি দেখেন রূপের সেরা হর-মনমোহিনী॥

দাশুরায়ের অন্য এক ধরণের ছড়া ;—(বৈষ্ণব-বৈরাগীর উপর তাঁর ভারি আক্রোশ)—

গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া যত অকাল-কুষ্মাণ্ড নেড়া
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি।
বলে গৌর ডাক রসনা গৌর মন্ত্রে উপাসনা
নিতাই বলে নৃত্য করে ধুলায় গড়াগড়ি॥
গৌর বলে আনন্দে মেতে একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে
বাগ্‌দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।
বিল্বপত্র জবার ফুল দেখ্‌তে নারেন চক্ষের শূল
কালীনাম শুন্‌লে কাণে হস্ত॥

* * * * *

কিবা ভক্তি কি তপস্বী জপের মালা সেবাদাসী
ভজন কুঠরী আইরি কাঠের বেড়া।
গোঁসাইকে পাঁচসিকে দিয়ে ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে
জাত্যাংশে কুলীন বড় নেড়া॥
ভজহরি শ্রীনিবাস বিদ্যাপতি নিতাইদাস
শাস্ত্র ইঁহাদের অগোচর নাই কিছু।
এক একজন কিবা বিদ্যাবন্ত করেন কিবা সিদ্ধান্ত
বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু॥

আর থাক।

আমরা কবিওয়ালাদের পরিচয় দিয়াছি ; তাঁহাদের গাহনার ওস্তাদী

গান ছিল; স্থলে স্থলে ছড়া-কাটাকাটি হেঁয়ালীও থাকিত। বিশেষতঃ যখন মধু ফুরাইয়া আসিতেছিল, তখন 'কবি' অর্থে ছড়া-কাটাকাটিই দাঁড়াইয়াছিল—(এখনও কতকটা তাই); ইহা আমরা মেয়ে-কবিওয়ালার কথায় দেখাইয়াছি। ভোলা ময়রার দলের পালা হইতে এই ধাতুর ছড়া একটি শুনাই—

নাটুর নীচে নড়ে নডডু নয় ভাই।
বৃন্দাবনে বনে দেখ বসু ঘোষের রাই॥
ঘোম্‌টা খুলে চোম্‌টা মারে কোম্‌টা বড় ভারি।
তিন লম্ফে লঙ্কা পার, হাস্‌চে শুকসারী॥
বাঁঝা মেয়ের বেটা হলো, আমাবস্যার চাঁদ।
আটুনি জবাব দিও, নৈলে বাধ্‌বে বড় ফাঁদ॥*

রাম বসু প্রভৃতির গানেও মধ্যে মধ্যে এমন দু একটি চরণ মিলে, হেঁয়ালী বলা চলে।

কবিওয়ালীদের দলের হেঁয়ালী ছড়া একটি শুনাই—

দল পিপি দল পিপি দলের ভিতর বাসা।
হাড্ডী নাই হড্ডী নাই মানুষ খাবার আশা॥

পাঠকবর্গই এই প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ঘাটনে চেষ্টা করুন, দেখিবেন কেয়াবাৎ কবিত্ব!

রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজা গিরীশচন্দ্রের সুরসিক সভাসদ একজন ছিলেন কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী। ইনি উপাধি পাইয়াছিলেন "রস-সাগর।" ইঁহার রচিত হেঁয়ালী-পূরণ বা সদ্যপ্রস্তুত উদ্ভট কবিতা বিলক্ষণ আমোদ-জনক। তাঁহার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করিলে,

---

* বলা বাহুল্য, এই অপূর্ব্ব হেঁয়ালীর অর্থগ্রহ আমাদের বিদ্যায় ঘটিয়া উঠে নাই; ইহার ভিতর দুষ্য কিছু থাকে, শ্রোতাগণ অজ্ঞতা-জনিত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। বিশ্বাস নাই, সময়টা বড় খারাপ। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ভোলা ময়রাকে বলিয়াছেন 'ক্ষণজন্মা পুরুষ।' তরজা, কবি, হেঁয়ালী—সবতাতেই তাহার হাতযশ ছিল।

তিনি ছন্দোবন্দে চমৎকাররূপে পাদ পূরণ করতঃ উত্তর দিতে পারিতেন। দু একটি শ্লোক দেখাই—

(১) "বড় দুঃখে সুখ"—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে। নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চখা কহে চখি প্রিয়ে এ বড় কৌতুক। বিধি হতে ব্যাধ ভাল—বড় দুঃখে সুখ॥

(২) "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর"—

কৃষ্ণের নগর কৃষ্ণনগর বাহির। বারোয়ারী মা কেটে হলেন চৌচির॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ী হইল বাহির। গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর॥

এইরূপ ছিল কবিতায় রহস্য-রসিকতা। ইঁহার কোন কোন উত্তর সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের ভাবানুবাদ।

রহস্যে না হইক, কবিতায় এইরূপ সমস্যা-পূরণ কবিওয়ালাদিগের মধ্যেও চলিত ছিল। কথিত আছে, একবার মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে কোন সভায়—"বঁড়শী বিঁধেছে যেন চাঁদে"—এই পদটি পূরণ করিবার প্রস্তাব উঠে; সভাস্থ বড় বড় পণ্ডিতবৃন্দ যখন ন্যায়-তর্কের অগাধ সলিল হাতড়াইয়া, হাবুডুবু খাইয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন তখন কবিওয়ালা হরুঠাকুরকে ডাক পড়িল; তিনি গামছা কাঁধে স্নানে যাইতেছিলেন, সেই বেশেই সভায় আসিয়া সদ্যসদ্যই উত্তর রচিয়াছিলেন—

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলী হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাহির করে,—বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥

রহস্য-কবিতায় আরও বড় এক কবির আমরা সাক্ষাৎ পাই। অগেয় কবিতার রচয়িতা হিসাবে প্রাচীন সাহিত্যে—অবশ্য বড় বেশী প্রাচীনের কথা হইতেছে না—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তেমন উৎকৃষ্ট কাব্য-রচয়িতা কেহই নাই,—সঙ্গীত-রচয়িতা কবিই ছিলেন। এই সময়কার নিরস্তপাদপদেশে ঈশ্বরচন্দ্র একাই ছিলেন কল্পতরু। দিনকতক ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-খ্যাতি খুব জাঁকাইয়াছিল।

গুপ্ত কবি বড় দরের প্রকৃত কবি না হইলেও পরিহাস-রসিকতায় সিদ্ধহস্ত। সুপণ্ডিত সিভিলিয়ান Beams সাহেব ঈশ্বর গুপ্তকে ভারতবর্ষের Rebelais নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা সুখপাঠ্য, ভাষা বেশ 'ঝর্‌ঝরে।' জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন—"স্বভাব বর্ণনে যেমন কবিকঙ্কণ (মুকুন্দরাম), পরমার্থ কালী বিষয়ে যেমন কবিরঞ্জন (রামপ্রসাদ), আদিরসে যেমন রায় গুণাকর (ভারতচন্দ্র), হাস্যরসে তেমনই ঈশ্বর গুপ্ত অদ্বিতীয় কবি।"

প্রাচীন সাহিত্য ধরিলে এ কথা মানিতে কাহারও আপত্তি হইবে না।

রহস্য-কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত পূর্ব্ববর্ত্তী সকলকেই হারাইয়া দিয়াছেন। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় পঞ্চাশ সহস্র শ্লোক কবিতা লিখিয়াছেন। ইঁহার ভিতর পরমার্থিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংসারিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ের সন্দর্ভ আছে।

ঈশ্বর গুপ্ত জন্মকবি ;—

রেতে মশা দিনে মাছি। এই নিয়ে ভাই কল্‌কেতায় আছি।

তাঁহার নাকি তিন বৎসর বয়সের রচনা।

ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ের কবি, সে সময়ে 'বাক্যের তরঙ্গ'ই কবি-গুণের প্রধান পরিচায়ক ছিল। গুপ্ত কবির রচনায় বাক্যচ্ছটা বহু স্থলে অতীব কৌতুকপ্রদ। তাঁহার—

মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে, ভাঙ্গা মন আর গড়ে না কো;

কিম্বা—

মধুর মধুর ধনি মুখ-শতদল। সলিলে ভাসিয়ে যায় চক্ষু ছল ছল॥

কবিত্বের সঙ্গে রসিকতা বড় সুন্দর।

কবির—

বিড়ালাক্ষি বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।

কিম্বা—

বিবিজান চলে যান লবেজান করে।

অথবা—

ভেড়া হয়ে তুড়ী মেরে টপ্ পা গীত গেয়ে। গোচে গাচে বাবু হন পচা শালী চেয়ে।
কোনরূপে পিত্তিরক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে। শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে বেণো জলে নেয়ে॥

শুধুমাত্র ব্যঙ্গ শ্লেষ নহে, কবির ভাষায় বাস্তব চিত্র।

তাঁহার—

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু—
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আম্‌লা তুলে মাম্‌লা গাম্‌লা ভাঙ্গে না;
আমরা ভূষি পেলেই খুসী হবো ঘুসি খেলে বাঁচ্‌বো না॥

সে সময়কার রাজনীতি-কুশলী বাঙ্গালীর সুন্দর পরিচয়। ইদানীন্তন বোধ হয় এমন সব কথা আর খাটে না।

কবির—

মাথামুণ্ড ঘুরে গেল মাথামুণ্ড লিখে।

কিম্বা—

বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।

পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চশিক্ষানবীশদিগের প্রতি তীব্র বিদ্রূপবাণ।

স্ত্রী-শিক্ষার উপর ঝাল্—

বিদ্যা বলে অবিদ্যার অপরূপ ক্রিয়া।
মূর্খ হয়ে বেঁচে থাক্ আল্‌পনা দিয়া॥

বিধবা-বিবাহ আইন সম্বন্ধে—

সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি চুল গুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥

সমাজ-সংস্কারকদিগের উপর ভ্রূকুটি।

গুপ্ত-কবির সাংসারিক জ্ঞানের, উদার হৃদয়ের উৎকট পরিচয়—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা কৃপনের ঘরে॥

মাতৃ-ভাষার প্রতি তাঁহার টান—

যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ গুণ গীত
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা পূরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে॥

তাঁহার স্বদেশ-প্রেম—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এমন কথা যিনি বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

শব্দের উপর কবির দখল বুঝাইতে গুটিকতক পংক্তি উঠাই—

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার। আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে উপাধি পেয়েছি। জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত গুপ্ত কিছু নয়। তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়॥

কিন্তু পরমেশ্বরের কথায়ও ঈশ্বর ব্যঙ্গ ছাড়িতে পারেন না—

কহিতে না পার কথা কি রাখিব নাম। তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম॥

এক কথায় সাহেবদের নৃত্যগীত বর্ণনা—

গুড় গুড় গুম্ গুম্ লাফে লাফে তাল। তাঁরা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

তাঁহার তপ্সে মাছ—

কষিত-কণক-কান্তি কমনীয় কায়। গালভরা গোঁপদাড়ী তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে। মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥

কিম্বা পাঁটা—

> সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে। আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে ॥
> হাড়কাঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাঙ্গ। সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাঙ্গ্ ছ্যাড্যাঙ্গ্ ॥
> এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা। নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা ॥

অথবা আনারস—

> লুন মেখে লেবুরস রসে যুক্ত করি। চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি।
> টুকি টুকি খেলে পরে রসে ভরে গাল। নেচে উঠে নন্দলাল মুখে পড়ে লাল ॥

এই জাতীয় কবিতা, এই রঙ্গরস, বাক্‌পটুতা—ইহা হইতেই গুপ্ত কবির প্রকৃত পরিচয় মিলে।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় একটা দারুণ দোষ বর্ত্তমান ; মধ্যে মধ্যে অশ্লীল অংশ আছে ; সেটা সময়ের—লোকরুচিরই দোষ বলিতে হয়।

ঈশ্বর গুপ্তের নাম হইলেই "প্রভাকর" "পাষণ্ড-পীড়ন" ও "রসরাজ" সংবাদ-পত্রের খেউড়-লড়াইয়ের কথা মনে আসে ; সে যে কি কদর্য্য বর্ণনা করা যাইতে পারে না। ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে দেশের গণ্য মান্য ভদ্রলোক পর্য্যন্ত এই ইতরামী আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের নামের সঙ্গে আর একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হয় :—রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি গুপ্ত-কবির কাছে শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বঙ্গসাহিত্যে ঢল নামিল।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক বাণী উদ্ধৃত করিয়া আমরা ঈশ্বরগুপ্তের সহিত বঙ্গের কবিতার প্রাচীন অংশের উপসংহার করি।

"আজিকার দিনে অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়, হউক সুন্দর কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালীর কথায় খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত পাই না। ঈশ্বর গুপ্তের

কবিতায় সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না, জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই সাবেক ভাবের শেষ গণনীয় কবি। অতঃপর নব রাগে রঞ্জিত হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল; আঁধার টুটিতেছিল; তপোবনোত্থিত বেদধ্বনির প্রতিধ্বনির ন্যায় গুরুগম্ভীর স্তোত্র-মন্ত্র শ্রুত হইতেছিল—

"তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন?
মহামায়া-নিদ্রাবেশে দেখিছ স্বপন।
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন॥"

বঙ্গ-ভারতীর শতদল-কুঞ্জ ফুটোন্মুখ হইয়া উঠিল; সারস্বত-কুঞ্জের দু একটি প্রথম বিহঙ্গের কল-কূজন সহ পূর্ব্ব গগণ হইতে প্রভাতী রাগিণীর মৃদুল মূর্চ্ছনা প্রাতঃসমীরে ভাসিয়া আসিতেছিল—

"অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক-সিন্দূর-ফোঁটা কে তোমার শিরে দিল?
হাসিতছ মৃদু মৃদু——"

অনতিবিলম্বে বালার্ক জ্যোতির্ম্ময় প্রভাকর হইয়া সমুজ্জল কিরণমালায় সমগ্র বঙ্গদেশ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল—

পদ্মস্পর্শে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মিলি নয়ন-পদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে। উল্লাসে হাসিলা
কুসুম-কুন্তলা মহী—মুক্তামন্ত্র গলে।
উৎসবে মঙ্গল-বাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বর-লহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সম-প্রেমাকাঙ্খী হেম সূর্য্যমুখী।

কিন্তু সে কথা এখন নয়; আপাততঃ বিদায়।